ষাণ্মাসিক সূচী

বৈশাখ—আশ্বিন, ১৩৫০

শনিবারের চিঠি,
বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ

কবি-পূজা

জ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। মহাপুরুষের জন্মদিনে যেরূপ পূজা প্রার্থনা উৎসব আদি করিতে হয়, দেশের এই ভীষণ দুর্দিনে তাহা উপযুক্তরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়; তথাপি বাহ্যিক নর আড়ম্বরে প্রয়োজন কি? অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন পারিলেই আমাদের কল্যাণ হইবে, আমাদের চিত্ত কিছুক্ষণের নির্মুক্ত হইয়া আনন্দ ও অভয়-আশ্বাসে পূর্ণ হইবে, মহাপুরুষের আত্মার সহিত যোগ স্থাপন করিয়া আমরা এই ঘোর অন্ধকারেও আলোক দেখিতে পাইব। আজ এই উপলক্ষ্যে সমগ্র বাঙালী র হইয়া আমরা রবীন্দ্রনাথকে ভগবানের আশীর্বাদরূপে আমাদের র স্মরণ ও বরণ করিব।

কবির জন্মদিনই আছে, মৃত্যুদিন নাই। অপর সকল মহাপুরুষের অমর হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকে—কিন্তু কবির শুধুই নয়, দেহও অমর হইয়া জাতির প্রত্যক্ষগোচরে বিরাজ করে। কাব্যই কবির দেহ, কবির প্রাণ ও মনের মূর্তিটি কাব্যের মধ্যে ভাবে প্রকাশ পায়, কণ্ঠস্বরটি পর্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায়। এব আমরা আজ মনে করিব না যে, রবীন্দ্রনাথ গত হইয়াছেন, রা প্রত্যক্ষভাবেই তাঁহার অর্চনা করিব, তাঁহার সেই মূর্তি রা দেখিয়া কীর্তন ও প্রদক্ষিণ করিব।

কিন্তু কবিকে শুধুই স্মরণ ও কীর্তনের দ্বারা অর্চনা করিলে চলিবে কবির সেই কাব্যশরীরে যে আত্মার প্রকাশ হইয়াছে, সেই টিকে উত্তমরূপে দর্শন করিয়া তাঁহার সেই বাণীকে আমাদের র সফল করিয়া তুলিতে হইবে। জাতির আত্মোপলব্ধির যে সকল আছে, তাহার মধ্যে কবিদের যে মন্ত্রদৃষ্টি যুগে যুগে সাহিত্যে ত হইয়া থাকে তাহাই বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ। ভারতীয় হিন্দু সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত ও পুষ্ট করিয়াছে বাল্মীকি ও ব্যাসের

মহাকাব্য, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য। যাঁহারা বেদ রচনা করিয়াছিলেন তাঁহারাও কবি ছিলেন—কবি নামটি একটি বড় নাম। পদ্য রচনা করিতে পারিলেই কবি হয় না; যে দৃষ্টির সাহায্যে জীবন ও জগতের রহস্য মনুষ্যজাতির হৃদয়ে উদ্ঘাটিত হয়, সেই দৃষ্টিই কবি-প্রতিভা। যাহা কিছু দেখিতেছি তাহার অন্তরালে যে আর একটা মহান্ সত্তা সুন্দর ও সত্যরূপে অবস্থান করিতেছে তাহার সংবাদ কবিরাই তাঁহাদের দিব্য অনুভূতির বলে প্রকাশিত করিয়া থাকেন, আর কেহ তেমন পারেন না। মনের কথা, প্রাণের কথা, আত্মার কথা কবিই—যাঁহার যেমন দৃষ্টি তিনি তেমন ভাবে আমাদের হৃদয়-গোচর করিয়া আমাদিগকে দিব্যচক্ষু দান করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথের মত কবি আমাদের দেশে অল্পই জন্মিয়াছেন, সমগ্র বাঙালী জাতির কাব্যচেতনা যেন তাঁহার মধ্যেই চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। অতএব রবীন্দ্রনাথকে উত্তমরূপে জানিতে পারিলে আমাদের জাতিগত প্রতিভা, গূঢ়তম প্রবৃত্তি ও তাহার সীমা আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিব; এবং এ জাতির মনোজীবনের ভবিষ্যৎ বিকাশধারায় সেই জ্ঞান অনেক পরিমাণে সাহায্য করিবে। আজ আমি এই বিষয়ে অতি সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা মাত্র [illegible]লব; আশা করি, আপনারা তাহা প্রণিধান ক[illegible]র্ব।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি কথা আমাদের মনে প্রায়ই উ[illegible] রবীন্দ্র-প্রতিভা কি একটা যুগের শেষ পরিণাম? অর্থাৎ র[illegible] কবি-জীবনে যে সাধনা ও সিদ্ধিলাভ আমরা দেখিয়াছি, তাঁহা[illegible] রচনায় যে একটি বিশেষ ভাবাদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা কি ঐ যুগের সত্য এবং তাহারই পূর্ণপ্রকাশ? সে যুগের পূর্ব্বে আ[illegible] দেশে এমন দৃষ্টি কাহারও ছিল না, অথবা পরেও কাহারও ঘটিবে [illegible] তাঁহার বাণী কি সত্য সত্যই অতিশয় স্বতন্ত্র? রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যজীব[illegible] জগৎ সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছিলেন, তাঁহার ভাবচিন্তার সেই নবীনতা এবং সেই অতি উচ্চ আদর্শবাদ কি তাঁহার নিজেরই ক[illegible] ন্ন? যদি তাহাই হয় তবে সন্দেহ হইতে পারে যে, তাহা [illegible] কাব্যসৃষ্টিতেই অপূর্ব্ব হইয়া আছে ও থাকিবে, ব্যবহারিক জী

কান কালেই তাহা সত্য হইতে পারিবে না। কারণ, আমরা এ কথা জানি যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা একটা অতি সূক্ষ্ম স্বপ্নসৌন্দর্য্যের আকুলতা সৃষ্টি করে—মন মুগ্ধ হয়, তাঁহার সেই ভাষার অক্ষরগুলিতে পর্য্যন্ত যেন একটি মোহিনী শক্তির আকর্ষণ আছে। সে কাব্য পাঠ করিয়া আমরা অতি উচ্চভাবের রসাবেশে বিহ্বল হই—খুব বড় একটা কিছুর প্রেরণা অনুভব করি; কিন্তু বাস্তব জীবনের বাস্তব সমস্যার মীমাংসা যে উপায়ে যে বুদ্ধির দ্বারা আমরা করিয়া থাকি, তাহার সহিত উহার যেন কোন সম্পর্ক নাই। কবি যে আদর্শ-সত্য ও আদর্শ-সুন্দরের গান আমাদিগকে অবিরত শুনাইয়া থাকেন, তাঁহার মহত্ত্ব আমরা স্বীকার করি; কিন্তু যে জীবনে তাহাকে সত্য করিয়া তোলা সম্ভব, সে জীবন আমাদের পক্ষে দুর্লভ—এখন তো নাই-ই, ভবিষ্যতেও কখনও সেই জীবন যাপন করা সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ। তবে কি রবীন্দ্রনাথের বাণী কেবল মনকেই মুগ্ধ করে—বক্ষে বাহুতে শক্তি সঞ্চার করে না? এমন কথা মনে হইতে পারে বটে। রবীন্দ্রনাথ এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদেরই কবি, যাঁহারা অতি সৌখিন মনোবিলাসী—রবীন্দ্রনাথের গান তাঁহাদেরই প্রাণ স্পর্শ করে, যাঁহারা সূক্ষ্ম কাব্যরসের চর্চ্চা করিয়া থাকেন; সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী যে ধরনের গান শুনিয়া পুলকিত হয়, তাহাতে অনুভূতির গভীরতা, ভাবের সেই অপার্থিব মনোহারিতা নাই। এমন কি, রবীন্দ্রকাব্য-প্রীতি যে সমাজে সহজেই সংক্রামিত হইতে দেখা যায়, সে সমাজও সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজ নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ এবং নানা তত্ত্ব ও ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ ছাড়িয়া দিলেও দেখা যাইবে যে, তাঁর গল্প-উপন্যাসও সাধারণ পাঠককে ততটা মুগ্ধ করে না, যতটা অন্য লেখকগণের উপন্যাস করিয়া থাকে। ইহার একটা কারণ অবশ্য যে, প্রত্যেক যুগেরই একটা নিজস্ব রুচি আছে। সাধারণ পাঠক তাহাদের সমসাময়িক লেখকের প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট হয়, রবীন্দ্রনাথ শেষের দিকে আর সমসাময়িক ছিলেন না। তথাপি 'গোরা', 'চোখের বালি' 'নৌকাডুবি'র পাঠক কোন কালেই অল্প কথা নয়; অথচ আমার যতদূর স্মরণ হয়, সমসাময়িক কালেও

ঐগুলির তেমন জনপ্রিয়তা ছিল না, একটি বিশিষ্ট পাঠকমণ্ডলীই সেগুলির রসাস্বাদন করিয়া চরিতার্থ হইতেন। এ সকল হইতে মনে হইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ একটা বিশিষ্ট কালের বিশিষ্ট কবি, এবং তাঁহার সেই অসাধারণ কবি-প্রতিভা আমাদের জাতির ও সাহিত্যের একটা মহা গৌরব হইলেও, রবীন্দ্রনাথের যুগও যেমন শেষ হইয়াছে, তেমনই সেই অতি উচ্চ আদর্শবাদ ও অতি সূক্ষ্ম কাব্যকলার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আমাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গী নয়—তাহাকে আমরা সাহিত্যের মণিকোঠার রত্নখচিত কৌটায় সযত্নে রাখিয়া দিব, এবং অবসরকালে মধ্যে মধ্যে সেই কৌটা খুলিয়া তাহার সেই মহার্ঘতায় মুগ্ধ হইব এবং গর্ব্ববোধ করিব। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে আমাদের পক্ষে তাহার মত দুর্ভাগ্য আর কিছু নাই।

আসল কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথ একটা সনাতন সত্যকেই যুগ-চেতনার উৎকৃষ্ট ভাষায় ও ভঙ্গিতে তাঁহার কাব্যে রূপ দিয়াছিলেন, একটি পরম সত্যকে সকল বাস্তবতার উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনি মানবাত্মার উচ্চাধিকার কিছুতেই ক্ষুণ্ণ করিতে চাহেন নাই। আমরা যেখানে নানা দৈহিক ও মানসিক বাধা ও বন্ধনের সহিত সন্ধি করিয়া চলিতে চাই, রবীন্দ্রনাথ সেখানে তাহা করিতে প্রস্তুত নহেন। মানুষ তাহার ভাবনা-কামনায়—তাহার সর্ব্ববিধ সাধনায়—যাহা পরম শ্রেয়ঃ ও সত্য তাহাকেই মানিবে—প্রকৃতির পারবশ্য স্বীকার করিয়া পুরুষ কিছুতেই আত্মভ্রষ্ট হইবে না, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে সর্ব্বত্র একটা অত্যুচ্চ আদর্শ শুধুই প্রচার করেন নাই, সেই আদর্শকে অতিশয় সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ মানুষের দুর্ব্বলতাকে অতি গভীর সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিলেও তাঁহার মানব-প্রেম কখনও মানুষের ক্ষুদ্রতা, দুর্ব্বলতা বা অধঃপতনকে গৌরবযুক্ত করিতে চায় নাই; মানুষ যত ক্ষুদ্র হউক, সে যতই দরিদ্র বা অশিক্ষিত হউক, তাহার মধ্যেও যে মানবাত্মা আছে, তিনি তাহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়াছেন; কিন্তু গল্পে, কবিতায়, প্রবন্ধে ও উপন্যাসে তিনি কোথাও

মানুষের গ্লানি বা চরিত্রহীনতাকে বড় করিয়া চিত্রিত করেন নাই, বরং অতিশয় তুচ্ছ জীবনের মধ্যেও তিনি সত্য ও সৌন্দর্য্যই আবিষ্কার করিয়াছেন। এ যুগের এই অধর্ম্ম ও অন্যায়, অশক্তি ও অপ্রেমের বাস্তব দৌরাত্ম্যও তাঁহাকে কিছুমাত্র সংশয়াচ্ছন্ন করিতে পারে নাই—তিনি সকল অনাচার-অবিচারের ঊর্দ্ধে মানুষের আত্মাকে উদ্বোধন করিয়াছেন—সত্য ও সুন্দরের আদর্শটিকে সর্ব্বদা সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন, কারণ তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মানুষের আত্মার পরাজয় হইতে পারে না। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, রবীন্দ্রনাথ কোন একটা যুগের বিশিষ্ট যুগধর্ম্মকে গ্রাহ্য করেন নাই—দেশ ও কালগত ইতিহাসকেই মানুষের একমাত্র পরিচয় বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। এই যে মনোভাব—এই যে শাশ্বত সত্যের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা—ইহাই ভারতবর্ষের সনাতন শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভায় সেই ভারতীয়-আত্মদর্শনের মূল তত্ত্বটি মানুষের জীবনের সত্যরূপে ধরা দিয়াছিল—রবীন্দ্রনাথ সেই আত্মা ভিন্ন আর কিছুকেই বিশ্বাস করেন নাই। আমরা সেই দিব্য-দৃষ্টির অধিকারী নই বলিয়া আমাদের মনে হয়—রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম একটা উৎকৃষ্ট কবিধর্ম্ম মাত্র, বাস্তবজগৎ ও বাস্তবজীবনের সহিত তাহার সম্পর্ক তেমন দৃঢ় নয়, এবং রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে একটা উচ্চ ভাবস্বর্গে আরোহণ করিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন মাত্র—সে স্বর্গে বেশিক্ষণ বাস করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। কথাটা বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের মত মানুষের পক্ষে সত্য বটে, কিন্তু চিরযুগের চিরন্তন মানুষের পক্ষে তাহা সত্য নয়। ইহা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ যেখানে বসিয়া গান গাহিয়াছেন তাহা আমাদের এই জগতের অনেক ঊর্দ্ধে—আমরা যেমন বদ্ধ, তিনি ছিলেন তেমনই মুক্ত—তাঁহার আত্মিক শক্তি আমাদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। ঠিক সেই কারণেই তিনি সত্যকার কবি, এবং এত বড় কবি। যাহা আমরা দেখি না তিনি তাহা দেখিয়াছিলেন, যাহা আমরা ভাবি না তিনি তাহা ভাবিয়াছিলেন। যে আশা আমরা করি না তিনি তাহা করিতেন, আমাদের যাহা অন্ধকার রাত্রি, তাঁহার নিকটে তাহাই ছিল দীপ্ত

দিব্যালোক। সেই দৃষ্টিই তো সত্যকার কবিদৃষ্টি। যুগে যুগে এই দৃষ্টির দ্বারাই কবিগণ মানুষের চৈতন্তকে প্রবুদ্ধ করেন, কবিই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, আমরা মরি নাই ও মরিব না। সকলেই যদি বাস্তবকে ও যুগধর্ম্মকেই সত্য মনে করিয়া মোহগ্রস্ত হয়, তবে আমরা চাহিব কাহার দিকে? কাহার কণ্ঠের আশ্বাসবাণী শুনিয়া আমরা উদ্ধারের আশা করিব? কবিই বার বার ডাকিয়া বলেন "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—আমি অন্ধকারের পারে সেই হিরণ্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে দেখিয়াছি—তোমরা মৃত্যুভয় করিও না, তোমরা সকলেই অমৃতের পুত্র"। গীতার একটি শ্লোকে এই পুরুষকেই কবি বলা হইয়াছে, যথা—

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণঃ তমসঃ পরস্তাৎ।

অতএব, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রেরণা শ্রেষ্ঠ প্রেরণাই বটে; এবং তিনি যে কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা বাস্তবানুগামী নয় বলিয়াই আর এক অর্থে মহামূল্যবান।

রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা আমরা সকলেই মুগ্ধ হইয়া পাঠ করি, কিন্তু তাহার মধ্যে কবিমানসের যে গভীর রহস্য রহিয়াছে তাহা বুঝিবার অবসর আমাদের হয় না। এমন বিচিত্র ও অফুরন্ত রস, এমন অবারিত ছন্দ ও সুর, এমন সৌন্দর্য্য-কল্পনা ও ভাবসৌকুমার্য্য, এমন আনন্দ তাঁহার কাব্যে অজস্র ধারায় প্রবাহিত হয় কেমন করিয়া? ইহার একমাত্র উত্তর, রবীন্দ্রনাথের মন ছিল মুক্ত, সকল সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া আপনার আত্মাকে তিনি দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এমন নির্ভয়ে আপন আনন্দকে তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দিতে পারিতেন। মুক্ত আত্মার স্বভাবই আনন্দ; যেখানে একটু পীড়া বা বেদনা তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিত, সেইখানেই তিনি আত্মার সেই আনন্দকে ছন্দে ও সুরে উৎসারিত করিয়া আশ্বস্ত হইতেন। দেশের অবস্থা, জাতির দুঃখ-দুর্দ্দশা তাঁহাকে কম অভিভূত করিত না, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই তিনি স্মরণ করিতেন, মানুষের আত্মা এ-সকলের ঊর্দ্ধে। ইংরেজ কবি যেখানে বলিতেন, "Man has but to

will it and there shall be no evil in the world," সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, মানুষ যদি আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করে তবে তাহার কোন ভয় কোন দুঃখই থাকিবে না। ইহাকেই আমি ভারতীয় 'আত্মদর্শন' বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ সেই দর্শনকে কাব্যে রূপান্তরিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, রবীন্দ্রকাব্যের কাব্যরস উপলব্ধি করিতে হইলে, সর্ব্বদা ইহাই স্মরণ রাখা আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিব, তাহা হয়তো সকলে জানিলেও ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখেন না। আমাদের দেশে, এ কালের এই সমাজে—যে সমাজে মানুষ দীর্ঘ দাসত্বের ফলে প্রায় মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে—সেই দেশের সেই সমাজে, এতবড় একজন কবির অভ্যুদয় কেমন করিয়া সম্ভব হইল? রবীন্দ্রনাথ যে বংশে যে ঘরে জন্মিয়াছিলেন, শৈশব ও বাল্য হইতেই যে সকল প্রভাবের মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছেন, তাঁহার কবি-মন যেভাবে লালিত ও পুষ্ট হইয়াছিল, দেশের ও বিদেশের বড় বড় গুণীব্যক্তির সাহচর্য্য তিনি যেরূপ লাভ করিয়াছিলেন—সর্ব্বপ্রকার আভিজাত্য তাঁহার হৃদয়-মনকে যেভাবে পুষ্ট করিয়াছিল, তাহা ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, এ প্রতিভার বিকাশে বিধাতা সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। এ যেন মাটি জল আলো বাতাস—সকলই অনুকূল, এবং সেই অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথ নামক একটি মনুষ্য-ফুলকে সহস্রদলে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য। এমন আয়োজন আর কখনও হয় নাই এবং হইবেও না। শুধুই অলোকসামান্য প্রতিভার বীজটিই নয়, তাহাকে প্রস্ফুটিত ও পূর্ণবিকশিত করিবার জন্য এ যেন এক মহাশিল্পীর একান্ত সাধনা। বিশ্বকর্ম্মা বিধাতার যেন হঠাৎ একটা খেয়াল হইয়াছিল যে, তিনি মানুষের হৃদয় ও মন লইয়া একটি অপূর্ব্ব কারুসামগ্রী নির্ম্মাণ করিবেন, ঠিক যেমনটি তিনি আগে কখনও করেন নাই। সাহিত্যের ইতিহাসে দেশে দেশে ও কালে কালে অনেক কবির উদয় হইয়াছে—শ্রেষ্ঠ কবির আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু কবির জীবন-গঠনে বিধাতার এমন নিপুণতা এমন সতর্কতা বোধ হয় আর কোথাও দেখা যায় নাই।

আবার এ কবির ভাবজীবনে দুই বিপরীত ভাবধারার মিলন ঘটিয়াছে। শুধুই প্রাচীন ও আধুনিক নয়—ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ও য়ুরোপীয় প্রকৃতিবাদ এই দুইয়ের গঙ্গাযমুনা সঙ্গম হইয়াছে; এমনটি পৃথিবীর আর কোন কবির জীবনে এ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মানবীয় ভাবসাধনার একটি পূর্ণতর অভিব্যক্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ হেন কবির জন্মস্থান হইল ভারতবর্ষ, আবার শুধুই ভারতবর্ষ নয়—বাংলার জল মাটি দিয়া তাঁহার দেহ নির্ম্মাণ হইল। ইহারও একটা অর্থ নিশ্চয় আছে—সেই অর্থ চিন্তা করিয়া আমরা যদি একটু গর্ব্ব অনুভব করি, তাহা হইলে আশা করি, দুর্ব্বল মানুষের পক্ষে তাহা গর্হিত হইবে না। কিন্তু ইহাও স্মরণ করিতেছি যে, এমনটি আর হইবে না—হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই হইবে না। তাই রবীন্দ্রনাথ ভারতের কবি ও চিরযুগের কবি বলিয়া পূর্ব্বে যে মন্তব্য করিয়াছি, তাহা সত্ত্বেও বলিতে হয়, যে দেশেই হউক, যে যুগেই হউক, রবীন্দ্রনাথের মত কবি বিধাতার এক আশ্চর্য্য কীর্ত্তি—অতিশয় স্বতন্ত্র ও তুলনাহীন। এজন্য রবীন্দ্রনাথকে একটু পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে, তাঁহার কাব্যকে একটা পৃথক মূল্য দিতে হইবে।

আজ আর বেশি কিছু বলিবার অবসর নাই। আমি শেষে কেবল একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, তিনি এতই ঊর্দ্ধে অবস্থান করিতেছেন যে, আমাদের এই মর্ত্ত্যজীবনে বাস্তব সুখদুঃখের মধ্যে তাঁহাকে পাইবার উপায় নাই। কবি যতই ঊর্দ্ধে উঠিয়া গান করুন না কেন, শেষ পর্য্যন্ত তিনি তো জীবনেরই ব্যাখ্যাকার, ইংরেজ সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড এই ব্যাখ্যাকেই 'criticism of life' বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিও যে জীবনকে অতিক্রম করে নাই, বরং জীবনের গভীরতম তলদেশে সে দৃষ্টি প্রবেশ করিতে পারিত, তাহার অজস্র প্রমাণ তাঁহার রচনারাশির মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। কবির কবিত্বের একটা খুব বড় প্রমাণ এই যে, কবি এমন সকল উক্তি করেন যাহা জাতির বা ব্যক্তির জীবনে বার বার সত্য হইয়া উঠে—সুখে-দুঃখে,

সম্পদে-বিপদে আমরা সেই সকল উক্তির যাথার্থ্য অনুভব করিয়া চমকিত হই, মনে হয়, যেন কবি এইক্ষণে আমাদের সঙ্গেই রহিয়াছেন—ঠিক এই দুঃখ বা এই সুখ যেন তিনি আমাদের মতই ভোগ করিতেছেন, এবং তাহারই সাক্ষাৎ আবেগে তিনি সেই উক্তি করিতেছেন। অর্থাৎ, বড় কবিরা prophet বা দ্রষ্টা—তাঁহাদের উক্তির মধ্যে মনুষ্যজীবন-নাট্যের এমন সব ভাব-গভীর ঘটনা বাণীমন্ত্রে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে—যাহা চিরদিনের সত্য—মানুষের বা জাতির জীবনে বার বার ঘটিয়া থাকে। ইহাও কবির সেই দিব্যদৃষ্টির একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এইরূপ একটি প্রমাণ আমি এইখানে উদ্ধৃত করিব। আজ মহাকালের যে মূর্ত্তি আমাদিগকে ভীত-ত্রস্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে—যে ঘোর অন্ধকার চারিদিকে ঘেরিয়া আসিতেছে, তাহার মত বাস্তব আর কি হইতে পারে? রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় ঠিক এই বাস্তব অবস্থার যে ভাব-রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে—তাহাতে মনে হইবে, কবি যেন ঠিক এই মুহূর্ত্তে এখনই এই গান গাহিয়া-উঠিলেন—অথচ এই কবিতায় যে অবস্থার বর্ণনা রহিয়াছে, তাহার এমন তীব্র অনুভূতি ইতিপূর্ব্বে আমাদের জীবনে ঘটিবার কারণ ছিল না। কিন্তু আজ যখন সেই কবিতাটি পাঠ করি, তখন মনে হয়, কবি যেন এইক্ষণে আমাদেরই কণ্ঠের রুদ্ধ আর্ত্তধ্বনিকে এক দিব্যসঙ্গীতে উৎসারিত করিয়া দিলেন—

আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে, ওগো
দিক্‌দিগন্ত ঢাকি'!—
আজিকে আমরা কাঁদিয়া শুধাই সঘনে ওগো,
আমরা খাঁচার পাখী;—
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি কি আসিল প্রলয় রাত্রি ঘোর?
চিরদিবসের আলোক গেল কি মুছিয়া?
চিরদিবসের আশ্বাস গেল ঘুচিয়া?
দেবতার কৃপা আকাশের তলে
কোথা কিছু নাহি বাকি?—
তোমাপানে চাই, কাঁদিয়া শুধাই
আমরা খাঁচার পাখী।

* * *

আজি দেখ ওই পূর্ব্ব অচলে চাহিয়া, হোথা
কিছুই না যায় দেখা,—
আজি কোন দিকে তিমিরপ্রান্ত দাহিয়া, হোথা
পড়ে নি সোনার রেখা।
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি শৃঙ্খল বাজে অতি সুকঠোর।
আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহি রে,
কার সন্ধান করি অন্তরে-বাহিরে।
মরীচিকা ল'য়ে জুড়াব নয়ন
আপনারে দিব ফাঁকি
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজি
আমরা খাঁচার পাখী।
ওগো আমাদের এই ভয়াতুর বেদনা যেন
তোমারে না দেয় ব্যথা।
পিঞ্জর দ্বারে বসিয়া তুমিও কেঁদ না যেন
ল'য়ে বৃথা আকুলতা।
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর।
তোমার চরণে নাহি তো লোহডোর।
সকল মেঘের ঊর্দ্ধে যাও গো উড়িয়া,
সেথা ঢাল তান বিমল শূন্য জুড়িয়া,—
"নেবে নি, নেবে নি প্রভাতের রবি"
কহ আমাদের ডাকি',
মুদিয়া নয়ান শুনি সেই গান
আমরা খাঁচার পাখী।

এই গানটির একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন—এবং সেই ব্যাখ্যা হইতেই রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির বা কাব্যমন্ত্রেরও একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইবে। এই গানে রবীন্দ্রনাথ মানুষের একটি নিদারুণ অবস্থার কল্পনা করিয়াছেন—সে অবস্থা যে বাহিরে ইতিপূর্ব্বে কখনও এমন ঘোরতর হইয়া উঠিয়াছিল তাহার সংবাদ সেকালের ইতিহাসে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তিনি কি উপলক্ষ্যে এই গান রচনা করিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা নাই। অতএব ইহাকে কবির নিজেরই অন্তরের একটা

আধ্যাত্মিক সঙ্কট বলিয়া মনে করাই অসঙ্গত হইবে না। ভারতবাসীর দাসত্ব-অবস্থাই সহসা কোন সময়ে তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল—কবি সহসা সেই ব্যথা আপনার বুকে অতি তীব্রভাবে অনুভব করিয়াই এমন আর্ত্তকণ্ঠে গাহিয়া উঠিয়াছিলেন—এমন অনুমানও হয়তো মিথ্যা নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটা সঙ্কীর্ণ অর্থও যেমন করা যায়, তেমনই তাহার একটি সার্ব্বভৌমিক ব্যাপক অর্থও আছে; ইহা রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রেরণার বৈশিষ্ট্য—তাঁহার সকল অনুভূতি বিশ্বজনীনতায় গভীর ও উদার হইয়া উঠে। কবিতার একটা সঙ্কীর্ণ অর্থ যেমন আমাদের হৃদয়কে সহজে স্পর্শ করে, তেমনই, শুধুই আমাদের দেশের, আমাদের জাতির দুর্দ্দশাই এই কবিতার উপলক্ষ্য না হইয়া—আজিকার জগতে মানবজাতির যে নিদারুণ আধ্যাত্মিক সঙ্কট উপস্থিত, তাহাও এ কবিতার উপলক্ষ্য হইতে পারে। এ যেন এক বিরাট কারাগৃহের অন্ধকারে আশাহীন আনন্দহীন মানবাত্মার আর্ত্তরব। এইখানে রবীন্দ্রনাথের সেই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কবি যাহাকে 'হৃদয়বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন তাহা মানুষেরই সেই আত্মা—যাহা শত বন্ধন সত্ত্বেও মুক্ত, যাহা সকল মোহ ও দুর্দ্দশার ঊর্দ্ধে উঠিয়া আপনার জ্ঞান ও শক্তিকে সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারে। এখানে কবি আপনার আত্মাকেই মুক্ত থাকিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে বলিতেছেন; নিম্নে যত অন্ধকারই ঘনাইয়া উঠুক—সেই আত্মাই অন্ধকারের ওপারে ধ্রুবজ্যোতির সন্ধান পায়—নিজের প্রতি বিশ্বাস হারায় না, বাহিরের ঘনঘটা অন্তরের সেই আলোক নির্ব্বাপিত করিতে পারে না। আত্মাই আত্মার একমাত্র আশ্রয়, অতএব কবি এই ঘোর দুর্দ্দিনে সেই আত্মার নিকটেই নিরাশায় আশা ও অন্ধকারে আলোক ভিক্ষা করিতেছেন। সকল মানুষের পক্ষেই ইহা সত্য। কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু—আত্মার মত 'হৃদয়বন্ধু' আর নাই—গীতায় শ্রীভগবান সেই কথাই বলিয়াছেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

অতএব এই গান শুধু আমাদের অবস্থায় নয়—জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় সমগ্র মানবজাতির কণ্ঠে এই গানই আজ ধ্বনিত হওয়া উচিত।

আশা করি এই গান ও তাহার এই ব্যাখ্যা হইতেই রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম্মের পরিচয় আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। এই কবিতার প্রসঙ্গেই আর একটি কথা মনে পড়িল—রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির অজস্রতা। এই অপূর্ব্ব সুন্দর কবিতাটিও রবীন্দ্রনাথের কবিতারাশির মধ্যে প্রায় অপরিচিত অবস্থায় পড়িয়া আছে—তাহার কারণ, এই কবি দুই হাতে এত উৎকৃষ্ট কবিতা এমন ভাবে ছড়াইয়া গিয়াছেন যে, তাহার সকলগুলিকে কুড়াইবার সময়ও আমরা পাই না; তা ছাড়া এ যেন God's plenty—এত দিকে এত উপচিয়া উঠিতেছে যে, যতই নষ্ট হউক তথাপি অভাব বোধ হয় না। এইরূপ উৎকৃষ্ট কবিতা পাঁচ-সাতটি রচনা করিতে পারিলেও কত কবির কবিজন্ম সার্থক হয়—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির প্রাচুর্য্য এমনই যে, এরূপ কবিতাও দুই-দশটা হারাইয়া গেলে হিসাবে ধরা পড়ে না।

আজ কবির জন্মদিন উপলক্ষ্যে আমরা এই যেটুকু তাঁহার স্মরণ ও কীর্ত্তন করিলাম, তাহাতে যেন ইহাই দৃঢ় প্রত্যয় করিতে পারি যে, কবির মৃত্যু নাই—রবীন্দ্রনাথ চিরদিন আমাদের সঙ্গে আছেন ও থাকিবেন। যুগের পর যুগ অতীত হইবে—জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহে আমাদের মত কত মানুষ ভাসিয়া যাইবে, সমাজে ও রাষ্ট্রে কত বিপ্লব ঘটিবে, আজিকার মতই ঘোর ঘনঘটায় আকাশ যেমন আচ্ছন্ন হইবে, তেমনই আলোকের প্লাবনে, আনন্দের কলরোলে, ধরণী উৎসবময়ী হইবে—কিন্তু কোন কালেই কবি রবীন্দ্রনাথের তিরোধান ঘটিবে না, অতি দূরতম ভবিষ্যতেও আমাদের বংশধরগণ ঠিক এমনই ভাবে কবির অতি নিকট-সান্নিধ্য লাভ করিবে, তাঁহারই গানের ভাষায় ও সুরে বাংলার প্রাণ, বাঙালীর বাঙালীত্ব অমর হইয়া থাকিবে।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

নারায়ণগঞ্জ-"বাণীমেলা"র রবীন্দ্র-জন্মতিথি উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

[শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত]

বোলপুর

ভাষাতত্ত্ব

...হইল—হইয়াছে। করিল—করিয়াছে ইত্যাদি। গিল—গিয়াছে হইতে পারিত। যখন কথাটা "গেল" তখন "গিয়াছে" হইতেই হইবে এমন কথা নাই। এক সময় কথাটা ছিল "গইল" কিন্তু এখন আর তাহা নাই। এরূপ পরিবর্ত্তনকে আমল না দিলে কথিত ও লিখিত ভাষার মধ্যে ব্যবধান ক্রমে অত্যধিক হইয়া উঠিবে। এক সময় লিখিত বাংলায় "আমারদিগের" কথা ব্যবহৃত হইত এখন তাহার স্থানে "আমাদের" হইয়াছে। পূর্ব্বে লেখা হইত "করহ" এখন লেখা হয় "কর"—পূর্ব্বে লেখা হইত "করিহ" এখন লেখা হয় "করিয়ো"। এ বড় অধিক দিনের কথা নয়। ভাবিয়া দেখুন "নয়" কথাটা পূর্ব্বে "নহে" ছাড়া অন্য কোনো আকারে ব্যবহৃত হইত না—এখন ছাপার অক্ষরে "নয়" সহ্য করিতেছেন কিরূপে? ক্রমে ক্রমে একে একে ভাষাটাকে আধুনিক ব্যবহারের উপযোগী করিয়া আনিতে হইবে। Chaucerএর ইংরেজী চিরদিন টেঁকে নাই। রামমোহন রায়ের ভাষাটা একবার পড়িয়া দেখিবেন।... ইতি ১৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১২।

নিয়ম ও আনন্দ

এ জগতে যদি অমোঘ নিয়ম না থাকিত তবে ত্রাহি ত্রাহি করিতে হইত। নিয়ম ব্যতীত প্রকাশ হইতেই পারে না। খেলা করিতে গেলেও খেলার নিয়ম মানিতে হয় নতুবা খেলায় আমোদই হয় না, তাহা উন্মত্ততা হয় মাত্র। এই নিয়মই যখন তাঁহার ইচ্ছা—তখন

আমাদের ইচ্ছাকে এই নিয়মের অনুগত না করিলে দুঃখই পাইতে হইবে—যখন বিশ্বের ইচ্ছাকে তাঁহার নিয়ম জানিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া লইব—তখনই তাঁহার আনন্দের সহিত আমার আনন্দের মিলন হইবে। যতদিন বিদ্রোহ করিব, মানিতে চাহিব না, ততদিন পরাভূত হইতে হইবে।

বিধাতার রাজ্যে যেখানে নিয়ম সেখানে বাহুল্য নাই এই কথা যখন মানুষ জানে তখনই সে নির্ভয় নিশ্চিন্ত হয়। অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ—তেমন প্রসাদে আমাদের প্রয়োজন নাই। তাঁহার ইচ্ছা উচ্ছৃঙ্খল ইচ্ছা নহে এই জন্যেই বিশ্বে তাঁহার ইচ্ছাকে আমরা নিয়মরূপে দেখিতে পারি—এবং তাঁহার ইচ্ছার সহিত যোগ দিয়া আমরা সতর্কতা লাভ করিতে পারি।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বস্তুরাজ্যে তাঁহার ইচ্ছাকে আমরা নিয়মরূপে দেখি—কিন্তু কেবলই যে জগতে নিয়মকে দেখি তাহার বেশী কিছুই দেখি না তাহা নহে। পয়ারে চোদ্দ অক্ষরের নড়চড় হইবার জো নাই—তাহার ভাষা ছন্দ ও অর্থের সুবিহিত সুসঙ্গতি আছে—কিন্তু আমরা যদি পয়ারে কেবল চোদ্দ অক্ষরই দেখিতাম অথবা কেবলই প্রত্যেক শব্দের ও পদের সহিত একটা যুক্তিসঙ্গত অর্থ আছে ইহাই জানিতাম তবে তাহাকে কাব্যই বলিতাম না। কিন্তু কাব্যের সমস্ত অটল অমোঘ স্খলনহীন নিয়মের ভিতর দিয়াই তাহার গভীরতম সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীত, কাব্যকর্ত্তার অন্তরতম আনন্দ ও প্রেম প্রকাশ পাইতেছে সেইজন্যই তাহা কাব্য। আলঙ্কারিক তাহার মধ্যে অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম দেখিয়া বাহবা দেয়—বৈয়াকরণ তাহার মধ্যে ব্যাকরণের সূত্র ঠিকমত বজায় আছে দেখিয়া পুলকিত হয়, অভিধানবাগীশ তাহার শব্দ ও অর্থের সঙ্গতি দেখিয়া খুসি হইয়া নস্য লইতে থাকে—কিন্তু সমস্ত নিয়ম ও সঙ্গতির ভিতর হইতে নিয়ম ও সঙ্গতির অতীত আনন্দ তাহারাই দেখে যাহারা রসিক—তাহারা ইহার মধ্যে কবির নিয়মনৈপুণ্য দেখে না, কবির আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখে। তাহারা যখন জগৎকে দেখে তখন বৈজ্ঞানিকের মত কেবল সত্যকেই দেখে না দার্শনিকের মত চিত্তকেও দেখে, এবং কবির মত

আনন্দকে দেখে—কারণ তাহার নিজের মধ্যে সত্য আছে, চিত্ত আছে, আনন্দ আছে—তাহার মধ্যে কার্য-কারণ-শৃঙ্খল-সঙ্গত নিয়ম-বন্ধনও আছে, চেতনাময় গতিশক্তিও আছে এবং আনন্দময় মুক্তির অনুভূতিও আছে—জগতের মধ্যে যখন সে এই তিনের যোগ দেখে তখনি সচ্চিদানন্দকে দেখে, এবং তখনি তাহার দেখা সম্পূর্ণ হয়। নতুবা যখন একটাকে দেখে অন্যটাকে দেখে না তখনই সে বিদ্রোহ করে, অহংকার করে, তর্ক করিতে থাকে এবং নীরস হইয়া মরে। আনন্দ আছে অতএব নিয়ম নাই এ কথা যেমন মিথ্যা, নিয়ম আছে অতএব আনন্দ নাই, এ কথাও তেমনি মিথ্যা। আনন্দ হইতেই নিয়ম হইয়াছে নতুবা নিয়ম আমাদিগকে জর্জরিত করিত, নিয়মের মধ্য দিয়াই আনন্দ প্রকাশ পায় নতুবা জগতে কোথাও আমরা সৌন্দর্য দেখিতাম না, প্রেম উপলব্ধি করিতাম না। ইতি ৮ই কার্তিক ১৩১৩।

নববর্ষ

···আজ বর্ষ শেষ—কাল এখানে নববর্ষের উৎসব হবে। প্রার্থনা করি যে, নববর্ষ কেবল পঞ্জিকার প্রথম পাতে দেখা না দিয়ে যেন জীবনের মধ্যে আবির্ভূত হয়। আর কোনো সার্থকতা চাইনে। নূতন জীবন চাই। পুরাতনের যত ভয় লজ্জা দুঃখের জের যেন আর না টেনে আনতে হয়, একেবারে সব সাফ করে দিয়ে বড় রাস্তায় যেন বেরিয়ে পড়তে পারি। আর সমস্তেরই মৃত্যু আছে কেবল আবর্জনারই মৃত্যু নেই না কি ?

নববর্ষ আপনার জন্য পরিপূর্ণ কল্যাণের ভার অঞ্চলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন করে নিয়ে আসুক এই প্রার্থনা করি। অর্থাৎ যাই নিয়ে আসুক সুখই হউক দুঃখই হউক আপনি তাকে অপরাজিত চিত্তে গ্রহণ করবার শক্তি প্রাপ্ত করুন।···ইতি ৩১শে চৈত্র ১৩১৫।

সমাজ-ভয়

...আমাদের প্রত্যেকের ভীরুতা সম্মিলিত হইয়াই ত সমাজভয় জিনিষটা জুজুর মত জাগিয়া উঠিয়াছে। সমাজের অন্যায় অত্যাচার স্বীকার করিব না ইহাতে যতই দুঃখ পাই না কেন, এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারিলে তবেই একদিন সমাজ সিধা হইতে পরিবে—নিজের বুকের রক্ত দিয়া যতই ইহার খোরাক জোগাইবেন বুকের রক্তের প্রতি ইহার লোভ ও দাবী ততই আরো বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। বক্তৃতা করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া ইহার যথার্থ প্রতিকার হয় না—কারণ, যে সকল প্রথা সমাজের লোককে বেদনা দিতেছে তাহারা যে বেদনাকর ইহা বুঝাইবার জন্য কোনো বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। সমাজের লোক যেদিন উঠিয়া দাঁড়াইয়া সমাজের মুখে তুড়ি মারিয়া বলিতে পারিবে কেয়ার করি না তোমাকে—তুমি যা খুসি তাই কর—তখনই সমাজ ভালমানুষটির মত তাড়াতাড়ি রফানিষ্পত্তি করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে।...ইতি ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮।

"কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম"

"কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" বক্তৃতাটি যাতে বহু সংখ্যক পাঠকের হাতে গিয়ে পৌঁছয় এই মনে করেই প্রবাসী ও ভারতীতে ছাপিয়েছি। সবুজ পত্রের পাঠক অল্প এবং এবারে অনেক বিলম্বে ওটা ছাপা হওয়াতে সবুজ পত্র বেরুবার আগেই অন্য কাগজে ছাপতে হল। ঐ বক্তৃতাটি যদি কেবল মাত্র সাহিত্যের সামগ্রী হত তাহলে কথাই ছিল না।...ইতি ১৮ই ভাদ্র ১৩২৪।

স্বৈরিণী

ঝুটো মতি পিল্‌টির গহনা—
আমার যা-কিছু আছে, লহ না ;
যে কথা শুনিতে চাই ও মুখে,
একবার সে কথাটি কহ না।

সহজ সুখেরে করি পরিহার
শান্তি-মণির সাতনরী হার
অবহেলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ,
জান কি অতল জলে দরিয়ায় ?

কি সুখ পেয়েছ সারা জীবনে,—
'পাউডারে', সাবানে ও 'রিবনে' ?
নিতি-নব বন্ধুরে বাঁধিতে
ফিরিয়াছ কি বাগানে কি বনে ?

হায় ওরে রূপজীবী ললনা,
এত আশা, এত কলা ছলনা,—
একটি ফুলের লাগি জীবনে
কিছুই সফল তব হ'ল না !

আদরের দোলনায় দুলেছ,
হৃদয়ের বেদনা কি ভুলেছ ?
আপন যা-কিছু সব বিকায়ে
কি ধন কুড়ায়ে ঘরে তুলেছ ?

এমন পূজার ফুল হায় রে,
না লাগিল দেবের সেবায় রে !
বাসি বাস শ্বসি মরে আকাশে
ঝরা দল কাদায় লুটায় রে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

সংসারবিষবৃক্ষস্য

ইশারায় ওরা ডাক দেয় দিদি, আলোছায়াময় ছবিতে,
সিনেমা না টকি, তোমরা যাহারে কও ;
মাসিক, সাপ্তাহিকের পাতায় ডাকে যে তরুণ কবিতে—
ডুবিবে Sure ; স্বেচ্ছাসেবিকা হও !
অলিতে গলিতে খড়খড়ি-পথে কান পাতা এই ভুবনে,
ভুবন অর্থে পোড়া এ বাংলা দেশ—
লাইন ধরিয়া ট্রাম চলে, Bus ? দুপথে চলি যে দু বোনে ,
কেউ 'পরবাসী'—কেউ পড়ি 'সন্দেশ' ।

—প্রমথ

মহাস্থবির জাতক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কিছুক্ষণ বাদে ছোটলাট অর্থাৎ তখনকার দিনের লেফ্‌টেনান্ট গবর্ণর, তার একটু পরে বড়লাট অর্থাৎ গবর্ণর জেনারেল বড় বড় ফিটনে চ'ড়ে এল। তারা আসতেই সেই কামানের সারির একটা একটা ক'রে ফুটতে লাগল, দুম্—দাম্।

স্থবির অস্থিরকে বললে, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

তাদের সামনেই একেবারে দড়ি ধ'রে একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। বয়েস তার সাতাশ-আটাশ বছর হবে। বেঁটে আর বেশ গুণ্ডা-গোছের চেহারা। বোধ হয় মাস খানেক আগে তার মাথা কামানো হয়েছিল, এখন আধ ইঞ্চিটাক খোঁচা খোঁচা চুল বেরিয়েছে—এই লোকটা এতক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে খুব মজার মজার কথা ব'লে লোক হাসাচ্ছিল। স্থবিরের কথা শুনতে পেয়ে সে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললে, যুদ্ধ এখনও শুরু হতে দেরি আছে খোকা।

লোকটা এমন ভাবে কথাগুলো বললে যে, আশপাশের লোকগুলো সব হেসে উঠল। স্থবির অপ্রস্তুত হয়ে এমন একটা ভাব দেখাতে লাগল, যেন কথাগুলো তাকে উদ্দেশ ক'রে বলা হয় নি। ঠিক সেই সময় মাঠের মধ্যে চড়চড় ক'রে আওয়াজ হতেই সবাই সেদিকে ফিরে দেখলে যে, গোরা পল্টনের সার বন্দুক ছুঁড়ছে। গোরাদের বন্দুকের আওয়াজ শেষ হ'তেই দিশী সৈন্যরা বন্দুক ছুঁড়লে। তারপরে ফটাফট চটাচট দুমদাম শব্দের পাগলা হররা শুরু হয়ে গেল।

মাঠের মধ্যেকার এই মহাযুদ্ধ দর্শকদের প্রাণেও অনুপ্রাণিত হতে বিলম্ব হ'ল না। হঠাৎ তাদের মধ্যেও ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেল। এই রকম যখন সামনে-পেছনে ভীষণ ঠেলাঠেলি চলেছে, সেই সময় পেছন থেকে একটা প্রবল ধাক্কা আসায় সামনের সেই বেঁটে গুণ্ডা লোকটা কি রকমে ছিটকে একেবারে দড়ির ওপারে গিয়ে পড়ল।

দড়ির ধারে ধারে ঘুরে যে পাহারাওয়ালা সেখানকার শান্তি রক্ষা করছিল, এই দৃশ্য দেখে সে তিন লাফে সেখানে এসে হাতের রুল দিয়ে লোকটার মাথায় সজোরে টাই টাই ক'রে আট-দশ ঘা বসিয়ে দিলে।

নিমেষের মধ্যে সেই বিষম ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি থেমে গেল। স্তম্ভিত জনমণ্ডলী নির্বাক বিস্ময়ে সেই পাহারাওয়ালাটার দিকে চেয়ে রইল। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশের লোক সেই ভিড়ের মধ্যে ছিল —পাঁচ বছরের শিশু থেকে আরম্ভ ক'রে সত্তর বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত— ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, ভদ্রলোক, ছোটলোক, কেরানী, ব্যবসাদার ও অন্য চাকুরে; কারুর মুখ দিয়ে একটি ছোট প্রতিবাদ—একটু সহানুভূতির ভাষা বেরুল না।

এই অত্যাচারের মধ্যেই বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের বীজ প্রোথিত হয়েছিল।

মার খাবার সময় লোকটার মুখে যে যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠল, স্থবির চারদিকে চেয়ে দেখলে, অনেকের মুখে সেই যাতনার প্রতিবিম্ব পড়েছে। একবার পেছনে ফিরে দেখলে, স্থিরের চোখ দুটো ছলছল করছে।

মানুষ মানুষকে মারছে—এ দৃশ্য স্থবিরের চোখে নতুন নয়। তাঁর বাবা তো প্রায় প্রতিদিনই স্থিরকে মারেন। পাঁচ বছর জীবনের মধ্যে সেও মার খেয়েছে অনেকবার। কিন্তু প্রহারের এমন বীভৎস রূপ ইতিপূর্ব্বে সে দেখে নি। তার মনে হতে লাগল, ঐ লোকটার বদলে তার বাবা যদি ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন! এই চিন্তা তার মনকে আঁকড়ে ধ'রে এমন পীড়া দিতে লাগল যে, সে অস্থির হয়ে উঠল।

বাবার হাতে প্রহারকে সে অত্যন্ত ভয় করত, কিন্তু সেদিন সে বুঝতে পারলে, পুলিসের মার বাবার মারের চেয়ে অনেক সাংঘাতিক।

প্রহৃত লোকটা ঐ ভাবে লাঞ্ছিত হয়ে দু-পা পেছিয়ে এসে আবার লাইনবন্দী হয়ে দাঁড়াল। লজ্জায় অপমানে সে আর কারুর দিকে না চেয়ে মাঠের দিকে চেয়ে রইল। মিনিটখানেক এই ভাবে কাটবার

পর ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন লোক চেঁচিয়ে তাকে বললে, এই, তোমার মাথা ফেটে গেছে—রক্ত পড়ছে যে!

সবার দৃষ্টি একসঙ্গে গিয়ে পড়ল তার মাথার ওপরে। দেখা গেল, তার দুই কাঁধ আর ঘাড়ের কাছে জামাটা রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে। স্থবির দেখলে, তার কানের পার্শ দিয়ে রক্তের একটা সরু ধারা এসে নেমে জামার ওপর পড়ছে।

এই দৃশ্য দেখে জনতার মধ্যে একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। এদের মধ্যে যারা অসমসাহসী, তারা সেই কনস্টেবলের অমানুষিক অত্যাচারের ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। মাঠের মধ্যে তখনও ঝুম-ঝাম, চড়পড় আওয়াজ চলেছে—হঠাৎ সেই চার-পাঁচ সার মানুষের স্তর ভেদ ক'রে মহাদেব একেবারে সামনে এসে আহত লোকটাকে ধ'রে চীৎকার ক'রে উঠলেন, এই, কে—কোন্ পাহারাওয়ালা তোমায় মেরেছে?

পাহারাওয়ালার মারের ধমক তখনও সে সামলে উঠতে পারে নি। তার হয়তো মনে হ'ল, এ লোকটাও বোধ হয় পুলিসেরই লোক। একজন মাথা ফাটিয়ে গেছে, এ বোধ হয় হাতটা পাটা ভেঙে দেবে।

মহাদেব আবার চীৎকার ক'রে উঠলেন, কে মেরেছে বল?

ইতিমধ্যে যে পাহারাওয়ালাটা মেরেছিল, বীরদর্পে পা ফেলতে ফেলতে সে সেখানে এসে দাঁড়াল। আহত লোকটা কাঁপতে কাঁপতে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, ঐ লোকটা মেরেছে।

পাহারাওয়ালাটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ধমকে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে?

মহাদেব তাকে বলতে লাগলেন, তুমি একে মেরেছ? দেখ দিকিন এর মাথাটা ফেটে গিয়েছে। পুলিসের চাকরি কর ব'লে কি মানুষের চামড়া তোমার গায়ে নেই? ওর যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে তো ওকে ধ'রে নিয়ে থানায় যাও, হাকিম আছে, সে সাজা দেবে। তুমি কে হে সাজা দেবার?

পাহারাওয়ালা মহাদেবকে ধমকে উঠল, তুমি কে হে?

প্রশ্ন শুনে মহাদেব একটু হকচকিয়ে গেলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন, আমাকে চিনতে পারছ না—আমি তোমার বাবা!

পেছনের লোকেরা হো-হো ক'রে হেসে উঠল। স্থির ও স্থবির—তারা এই বয়সেই বাপকে কিছু কিছু চিনেছিল, তারা হাসতে পারলে না। মহাবিপদের সূচনায় তাদের শিশুহৃদয় শঙ্কিত হয়ে উঠল। স্থবিরের মনে হতে লাগল, এই সময় মা যদি কাছে থাকত, তা হ'লে এই হাঙ্গামা আর বাড়তেই পারত না।

মহাদেবের মুখে ঐ কথা। তার ওপরে যে লোকগুলো এতক্ষণ তার দাপটের চোটে কেঁচো হয়ে ছিল, তাদের সেই ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি শুনে পাহারাওয়ালা-পুঙ্গব একেবারে তেলে বেগুনে জ্ব'লে উঠে চীৎকার ক'রে উঠল, কি বললে?

মহাদেব নীচু হয়ে দড়ি গ'লে বাইরে একেবারে তার সামনে গিয়ে তারস্বরে চীৎকার ক'রে উঠলেন, আমি তোর বাপ। এই নিরপরাধ লোককে এমনই নির্দয়ভাবে প্রহার করার জন্যে আমি তোমায় এমন সাজা দোব যে, চিরকাল বাবাকে মনে থাকবে।

এবার আর জনতার মধ্যে হাসির হর্‌রা উঠল না, বরং ব্যাপারটা ক্রমেই সাংঘাতিক আকার ধারণ করছে দেখে ভিড়ের লোক আস্তে আস্তে স'রে পড়তে আরম্ভ করল।

আজকের দিনে বাঙালীর চোখে এ ব্যাপারটা অত্যন্ত লজ্জাকর ঠেকতে পারে; কিন্তু ক্রীশ্চান আঠারো শো ছিয়ানব্বই অব্দে কলকাতার নকল যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পাহারাওয়ালাকে গালাগালি দেওয়া এবং মারতে উদ্যত হওয়া তো দূরের কথা, সে দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখতে পারে এমন লোকও এক লক্ষে একটাও ছিল না।

কথাগুলো ব'লেই মহাদেব গায়ের র‍্যাপারখানা খুলে ভিড়ের মধ্যে ফেলে দিতেই স্থির সেখানা লুফে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিলে। ওদিকে পাহারাওয়ালাটা ফিরে গজ পঁচিশেক দূরে তার জুড়িদারকে হাঁকলে। জুড়িদার তখন সেদিককার ভিড়ের ওপর রুলের গুঁতো

চালিয়ে শান্তিরক্ষার চেষ্টা করছিল। একবার এদিকে চেয়ে আবার নিজের কর্তব্যের দিকে মন দিলে।

জুড়িদারের মুখ দেখে পাহারাওয়ালার বুকে বোধ হয় সাহস ফিরে এল। সে রুল উঁচিয়ে মহাদেবকে বললে, শূয়োরের বাচ্চা, শিগগির দড়ির ওপারে যাও, নইলে এই রুল দেখছ—

মহাদেব এবার জামাটা খুলে মাঠের ওপর ফেলে দিয়ে বললেন, তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে—

এই ব'লে তার হাত থেকে রুলটা টপাস ক'রে কেড়ে নিয়ে বললেন, মাথার পাগড়ি খোল, এর খালি মাথায় যেমন মেরেছ তেমনই তোমারও খালি মাথায় মারব—যতক্ষণ না রক্ত বেরোয়—

মহাদেবের চুয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাতি আর সাড়ে উনিশ ইঞ্চি বাহুর বেড় দেখে পাহারাওয়ালার বাচ্চা স্তম্ভিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মহাদেব চীৎকার করতে লাগলেন, খোল মাথার পাগড়ি। পাগড়ির ওপরে মারলে লাগবে না, তোমার খালি মাথায় মারব—বেটা, মনে করেছ কি? খোল পাগড়ি—

প্রতি নিশ্বাসে তিনি যেন ফুলতে লাগলেন।

পাহারাওয়ালার মুখে বাক্য নেই। রুল ফেলে সে চ'লেও যেতে পারে না। ততক্ষণে ভিড় অনেক পাতলা হয়ে গেছে; ওদিকে একটু দূরে এমন ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেছে যে, তিন-চারটে পাহারাওয়ালা মিলে ভিড়ের ওপরে নির্দয় রুল পিটেও সামলাতে পারছে না। স্থবির ও অস্থির হাউমাউ ক'রে কান্না জুড়ে দিয়েছে। স্থির বেচারী বাপের ক্যাপারখানা হাতে নিয়ে কাঁদ-কাঁদ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। মাঠের মধ্যে ধুমধাম ফটাফট তো চলেইছে—সব আওয়াজ ছাপিয়ে মহাদেবের গলা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে—খোল পাগড়ি, নিজের হাতে খুলতে হবে। মাথায় রুলের বাড়ি কি রকম লাগে, তা তোমাকে একটু বুঝিয়ে দোব।

এদিকে ভিড় একটু পাতলা হ'তেই আহত লোকটি ব'সে পড়েছিল। মহাদেব যখন এই ভাবে চেঁচাচ্ছেন, তারই মধ্যে সে তার

পড়ল। ভিড়ের লোকেরা বলতে লাগল, অজ্ঞান হয়ে গেছে। হাওয়া ছেড়ে দাও, স'রে যাও—

কথাগুলো মহাদেবের কানে যেতেই তিনি পেছন ফিরে দাঁড়ালেন। তারপরে কলটা মাটিতে ফেলে, একেবারে সেই লোকটার পাশে গিয়ে ব'সে পড়লেন। পাগারাওয়ালানন্দন ইত্যবসরে তার কলটা টপ ক'রে তুলে নিয়ে বীর পদভরে বিপরীত দিকে হনহন ক'রে চ'লে গেল।

মহাদেব বললেন, কেউ দয়া ক'রে একটু জল এনে দিতে পারেন, লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন বললে, এখানে জল কোথায়? ঐ পুকুর আছে একটু দূরে।

মহাদেব একবার করুণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে টপ ক'রে মাটি থেকে জামাটা তুলে কাঁধে ফেললেন। তারপরে ঠিক সেই ভাবেই টপ ক'রে লোকটাকে দু-হাতে তুলে ভিড় ঠেলে ফাঁকায় গিয়ে চীৎকার ক'রে বললেন, স্থির, স্থবির, অস্থির, বেরিয়ে এস।

হুকুম পাওয়ামাত্র ছেলেরা ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপরে মহাদেব হু হু শব্দে ছুটতে আরম্ভ ক'রে দিলেন—ছেলেরা তাঁর পিছু পিছু ছুটতে লাগল।

আজকের বেঙ্গল ক্লাবের সামনে মাঠের মধ্যে যে বড় পুকুর আছে, মহাদেব দৌড়তে দৌড়তে এসে সেখানে লোকটাকে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। দৌড়বার সময় ঝাঁকুনির চোটেই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক, লোকটার ততক্ষণে জ্ঞান ফিরে এসেছিল। তাকে মাটিতে শুইয়ে দিতেই সে ফ্যালফ্যাল ক'রে চাইতে লাগল। মহাদেবের সেদিকে হুঁশই নেই, তিনি তড়তড় ক'রে পাড় দিয়ে জলের দিকে নেমে গেলেন।

ঘাটবিহীন পুকুর, চারদিকেই আঘাটা। গড়ানে পাড় দিয়ে জলের দিকে এগুতে গিয়ে কি রকম ক'রে পা হড়কে মহাদেব একেবারে প্রায় কোমর জলের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। তারপরে সে কি টানাটানি আর ধস্তাধস্তি! পুষ্করিণী পাঁকে পরিপূর্ণ। মহাদেবের দুই পা একেবারে

হাঁটু অবধি পাঁকে ব'সে যাচ্ছে। এক পা তোলেন তো আর এক পা ব'সে যায়—ভারী শরীর, পাঁকে সামলাতে পারেন না। কিছুক্ষণ আগেই যে লোক ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের পাহারাওয়ালাকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, এক হাঁটু পাঁকের মধ্যে তাঁর এই আঁকুপাঁকু অসহায় অবস্থা দেখলে করুণার উদ্রেক হয়।

যা হোক, অনেক কষ্টে সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে তো তিনি পাড়ে উঠলেন। একপাটি জুতো জলের তলাতেই র'য়ে গেল। ওদিকে আহত লোকটি ততক্ষণে উঠে বসেছে। মহাদেব কোঁচা নিংড়ে নিংড়ে তার ক্ষতস্থান ধুয়ে দিতে লাগলেন। একবারে হ'ল না, বার দু-তিন কোঁচা ভিজিয়ে আনতে হ'ল। তারপরে কোঁচাটা ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ আরম্ভ হ'ল। সে এক অদ্ভুত ব্যাণ্ডেজ! একটা চোখের একটুখানি ছাড়া লোকটার কান মাথা মুখ গলা পর্যন্ত সব সেই ব্যাণ্ডেজে ঢাকা প'ড়ে গেল।

যা হোক, পঞ্চাশ বার খুলে ঠিক ক'রে আবার বেঁধে, আবার খুলে, এই রকমে ঘণ্টাখানেক ধ'রে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার পালা শেষ ক'রে মহাদেব আবার জলে নামলেন জুতো খুঁজতে। কিন্তু আধ ঘণ্টা ধ'রে জলের মধ্যে ডুবোডুবি ক'রেও সে পাটির যখন কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন তিনি হতাশ হয়ে উঠে পড়লেন। তাঁর মাথা থেকে পা সর্বাঙ্গ কর্দমলিপ্ত, ধুতি যতটুকু অবশিষ্ট আছে তার দ্বারা কোন রকমেই ভদ্রভাবে লজ্জা-নিবারণ হয় না।

অত্যন্ত বিষণ্ণমুখে জামাটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে তিনি কাঁধে ফেলে ফিরের হাত থেকে র‍্যাপারটা নিয়ে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিলেন। তারপরে সেই কাদা-লেপ্টানো একপাটি জুতো হাতে নিয়ে ছেলেদের বললেন, চল।

লোকটা তখনও সেখানে ব'সে ছিল। দু-পা এগিয়ে গিয়ে মহাদেব আবার তার কাছে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বাড়ি যেতে পারবে?

ব্যাণ্ডেজমণ্ডিত মুখ তুলে মহাদেবের দিকে কৃতজ্ঞভাবে কিছুক্ষণ

চেয়ে থেকে সে বললে, বাবু, তুমি বড় ভাল লোক। তুমি বড় ভাল লোক। তুমি বাড়ি যাও, আমি একলাই যেতে পারব।

মহাদেব একটু হেসে বললেন, এমন তামাসা আর দেখতে এস না—বুঝলে?

চৌরঙ্গীর রাস্তা দিয়ে মহাদেব চলেছেন। আবক্ষ কালো দাড়ি কাদা ও জলে প্রায় জটিয়া-বাবা। গায়ে একখানা রুক্ষ কমলালেবু রঙের আলোয়ান, পরনে আধখানা ধুতি, হাতে কাদামাখানো একপাটি জুতো। পেছনে তিন ছেলে গটগট ক'রে চলেছে। দুধারী লোক এই অপূর্ব শোভাযাত্রা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেখতে লাগল।

মহাদেবের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর দৃষ্টি একেবারে সম্মুখে নিবদ্ধ, মুখে বাক্য নেই, ছেলেদের উপদেশ দেওয়া বন্ধ। তারা পেছনে আছে কি না আছে সে জ্ঞানও তাঁর নেই—বনবন ক'রে তিনি এগিয়ে চলেছেন। ছেলেরা তাঁর সঙ্গে সমানে চলতে পারছে না, ক্রমেই পেছিয়ে পড়ছে। এমনই ক'রে পিতা ও পুত্রদের ব্যবধান বাড়তে লাগল। তারপরে কখন যে তিনি দৃষ্টির আড়ালে জনতার মধ্যে হারিয়ে গেলেন, ছেলেরা তা বুঝতেই পারলে না।

স্থির, স্থবির ও অস্থির তাদের শিশুসামর্থ্যে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি চলেছে। বাপকে দেখতে না পেলেও রাস্তা তাদের চেনা। হঠাৎ স্থবিরের মনে পড়ল, পকেটের কমলালেবুটা তখনও অনাদৃত অবস্থায় প'ড়ে আছে। টপ ক'রে পকেটের মধ্যে হাত পুরে আধ-ছাড়ানো লেবুটা বের ক'রে সে খেতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

আর এক রাত্রিশেষের কথা। মাঘ মাসের প্রায় মাঝামাঝি, ব্রাহ্মসমাজের উৎসব চলেছে। রাত্রি প্রভাত হ'লেই ১১ই মাঘ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। এই এগারোই মাঘ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোকেদের বড়দিন। মহাদেব রাত্রি তিনটের উঠে উপাসনা সেরে ছেলেদের তুলেছেন। তারা মনে করেছিল, বাবা একলাই ভোরে মন্দিরে চ'লে যাবেন, কিন্তু তা হয় নি।

মফস্বলের অনেক ব্রাহ্মপরিবার এই উৎসব উপলক্ষ্যে কলকাতায় আসেন। এই ১১ই মাঘের দিনটা অনেকেই সারাদিন ও রাত্রের উপাসনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মন্দির ও মন্দিরপ্রাঙ্গণে কাটান। কলকাতাবাসী অনেকেও তাই করেন। এই সময়ে দূর থেকে এমন অনেক ছেলেমেয়ে সেখানে আসে, যাদের বছরের মধ্যে উৎসবের এই দিনগুলি ছাড়া অন্য সময়ে আর আসা হয়ে ওঠে না। এই দিনগুলি ছোট ছেলেমেয়েদের মহা আনন্দের দিন। কত পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে। কত মজার কথা, কত রকমের খেলা—শাসনমুক্ত নিরঙ্কুশ সেই দুর্লভ দিন—চণ্ডালের ধূলিতে স্বাতী নক্ষত্রের জলের মতন দুর্লভ সেই দিনটির সকাল মন্দিরে ব'সে উপাসনার জন্যে তৈরি হয় নি।

স্থির, স্থবির ও অস্থির তিনজনেই বাপের ডাকে উঠে পড়েছে বটে, কিন্তু বুকের মধ্যে আপত্তির দুর্নিবার মাথা খুঁড়ে মরছে।

মহাদেব ছেলেদের বললেন, উপাসনা সেরে নিয়ে চল, স্নান ক'রে মন্দিরে যেতে হবে।

মাঘ মাসে রাত চারটের সময় এমন কথা শুনলে পৃথিবীর কোন্ শিশুর মনে ভগবান সম্বন্ধে প্রেমভাব থাকতে পারে! তবুও হুকুম পাওয়া মাত্র তিন ভাই টপটপ আসন পিঁড়ি হয়ে ব'সে গেল, তারপরে হাত জোড় ক'রে চোখ বুজে ফেললে।

ছেলেদের মা প্রতিবাদ ক'রে বললেন, এই মাঘের শেষরাত্রে বুড়ো মানুষে ঠাণ্ডা জল মুখে দিতে পারে না, আর তুমি এই কচি ছেলেগুলোকে নাইয়ে মারবে না কি?

অন্য দিন হ'লে এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে লেগে যেত বাক্যের মহাসমর। কিন্তু এগারোই মাঘের প্রাতঃকাল, তার ওপরে মন্দিরে যাবার মুখে স্ত্রী'র সঙ্গে একটা ঝগড়া হাঙ্গামা হয় এটা মহাদেব চান না। তাই বিশেষ কথা-কাটাকাটি না ক'রে তিনি বললেন, স্নান ক'রে দেহে ও মনে পবিত্র হয়ে ঈশ্বরের উপাসনা-মন্দিরে যাবে—এর শীতকাল গ্রীষ্মকাল নেই।

বাস্‌! এমন অকাট্য যুক্তির ওপর ছেলেদের মা আর কোন কথা কইলেন না। ছেলেরাও কোন আপত্তি জানালে না। আপত্তি করবার মতন দুঃসাহস তাদের নেই। বাপের মুখ থেকে দ্বিতীয় বার হুকুম বের হওয়ার আগেই ওয়ান—টু—থ্রি—ঠিক ড্রিলের চালে স্থির, স্থবির ও অস্থির অঙ্গের আবরণ ও লজ্জা-নিবারণ খুলে ফেলে বিনাবাক্যব্যয়ে কদম্বকণ্টকিত দেহে সুড়সুড় ক'রে চ'লে গেল একতলার উঠোনের কোণে জলের কলের কাছে। অত রাত্রে বা অত ভোরে কলে জল নেই। হিমঠাণ্ডা চৌবাচ্চার জলে নর্থওয়েস্ট সোপ কোম্পানির সাবানের ঘর্ষণে তাদের দেহ পবিত্র হতে লাগল।

স্নান করাতে করাতে মহাদেব ছেলেদের বললেন, তোমরা ব্রাহ্মঘরে জন্মেছ, একটু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও।

ছেলেরা মনে মনে ধন্যবাদের ভাষা খুঁজতে লাগল। শিশু তারা, ভাষাজ্ঞান তখনও পরিপক্ক হয় নি।

সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির। এগারোই মাঘ উপলক্ষ্যে মন্দিরের ভেতর বার নানা লতাপাতা ও ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। ভেতরে গ্যাসের বাতি জ্বলছে, সিঁড়িতে দুটো বড় বড় গ্যাসের ঝাড় জ্বলছে, আর চলেছে খোলকরতালসহ কীর্ত্তন।

মহাদেব তিন ছেলেকে নিয়ে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে বেদীর নীচে যেখানে কার্পেট পাতা আছে, তারই এক কোণে গিয়ে বসলেন। তাঁদের আগেও দু-চারটি ব্যাকুলাত্মা এসে স্থান সংগ্রহ করেছেন। সর্বাঙ্গ র‍্যাপারে মোড়া এক একটি আধুনিক ধ্যানীমূর্ত্তির মতন দেখাচ্ছে তাঁদের। কার্পেটের আর এক কোণে কয়েকজন মিলে ভীষণ হুঙ্কারে কীর্ত্তন করছেন, তীক্ষ্ণ বিষবাণী সম সতত দংশায় রে—

মহাদেব ব'সেই চক্ষু বুজলেন। তাঁর দেখাদেখি ছেলেরাও চক্ষু বুজল। ঈশ্বর অকৃতজ্ঞ নন, স্নান করবার সময় বিনা কারণে তারা তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল, তিনিও অচিরেই তাদের চোখে ঘুমের প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে ভোরের ওঠার দুঃখ ভুলিয়ে দিলেন।

কতক্ষণ এই ভাবে চলল। ঢুলতে ঢুলতে মাথায় একটা প্রচণ্ড

আঘাত লাগায় স্থবিরের ঘুম ছুটে গেল। সে দেখলে অস্থিরের মাথাটা ঝুলে একেবারে তার নাকের গোড়ায় এসেছে। অস্থিরের মাথাতেও চোট লেগেছিল। সেও চোখ চেয়ে দেখলে স্থবিরের মাথাটা তার মাথার সামনে। দুজনে চোখোচোখি হতেই তারা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, বাপের চোখ কোথায়!

মহাদেব নির্বিকল্প হয়ে চোখ বুজে পিঠ সোজা ক'রে বুক চিতিয়ে ব'সে আছেন, দেখে তারা নিশ্চিন্ত হ'ল বটে, কিন্তু চোখ বুজতে আর সাহস করলে না। কি জানি বিশ্বাসঘাতক ঘুম ইতিপূর্ব্বে পাঠমন্দিরে অনেক লাঞ্ছনার কারণ হয়েছে, ব্রহ্মমন্দিরে এত লোকের সামনে সে ব্যাপারের পুনরভিনয় যাতে না হয়, সে বিষয়ে তারা সচেতন হবার চেষ্টা করতে লাগল।

স্থবির চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। কীর্ত্তনীয়ার দল ইতিমধ্যে শ্রান্ত হয়ে যে যার একটু জায়গা যোগাড় ক'রে র‍্যাপারে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে বসেছেন। একটু আগেই এই লোকগুলিই যে বিবিধ ভঙ্গিতে বদন ব্যাদান ও অস্বাভাবিক হস্তপদ চালনা ক'রে বিশ্বব্যাপী বন্ধনের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানাচ্ছিল, এখন তাদের শান্ত মুখমণ্ডল ও সমাহিত অবস্থা দেখে তা বোঝবার জো নেই। মন্দির-গৃহ লোকে পরিপূর্ণ। গ্যাসের আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানলা-দরজা দিয়ে ভোরের মৃদু আলো আসায় ফুলসজ্জায় সজ্জিত মন্দির-গৃহের দেওয়াল থাম ও বেদী অপূর্ব্ব শ্রীতে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। কীর্ত্তনীয়াদের কণ্ঠনিঃসৃত সেই গগনভেদী আর্ত্তনাদ স্তব্ধ হওয়ায় সেখানে অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য বিরাজ করছে। সকলেই উন্মুখ আগ্রহে যেন কিসের প্রতীক্ষায় রয়েছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সেই আধ-আলো আধ-অন্ধকারের বুকে হঠাৎ ভৈরবীর সুরধারা নেমে এল করুণার প্রস্রবণের মত—

ভোর হ'ল মলিন দুখরাতি
হেরি তব বিমল মুখভাতি—

স্থবির দেখতে পেলে, তাদের একটু দূরে একজন কালো প্রিয়দর্শন যুবক কোকিলকণ্ঠে গান শুরু করেছে। গানের যাথার্থ্য অথবা

তাৎপর্য বোঝবার মতন বয়স বা শিক্ষা তার তখনও হয় নি, তবুও তার মনে হতে লাগল, তীক্ষ্ণ বিষব্যাণীর ওপর এ যেন বিশল্যকরণীর প্রলেপ, কোথা থেকে—কোন্ অদৃশ্য লোক থেকে আসছে যেন আশার বাণী, কি আনন্দের উৎস রয়েছে ভৈরবের ঐ হুঙ্কারে—রাত্রি চারটের সময় উঠে সেই ঠাণ্ডা জলে স্নান, সকালবেলাকার অমন আড্ডার বদলে বয়স্কদের সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে তন্ময় হয়ে ব'সে ঈশ্বরারাধনার কৃচ্ছ্রসাধন বালকের মনে যে বিদ্রোহের ঝড় তুলেছিল, নিমেষে তা অপসারিত হয়ে গেল।

গান শেষ হতেই আচার্য্য ঢুকলেন মন্দিরে। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের মুখ্য আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণ ব্যক্তি। লম্বা দাড়ির অধিকাংশই পাকা। মাথায় বিরল রুক্ষ কেশ। গায়ে একটা সবুজ রঙের ফ্লানেলের শার্ট। মুখ দেখলেই মনে হয়, সাধারণ লোকের সঙ্গে এঁর যেন কোথায় একটা প্রভেদ রয়েছে। স্থবির শাস্ত্রী মশায়কে চিনত। চলতি কথায় বলতে গেলে, তিনি তাদের কুলগুরু। শাস্ত্রী মশায় তার পিতাকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন; মহাদেবের বিবাহেও তিনি পৌরোহিত্য করেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মরা গুরু মানে না, তাই বোধ হয় গুরু না ভেবে তারা তাঁকে গুরুর চাইতে আরও বড় একটা কিছু মনে করত। যাক, শাস্ত্রী মশায় এসে বেদীতে উঠে বসলেন। দু-তিনটি যুবক খাতা পেন্সিল নিয়ে বেদীমূলে ব'সে গেল আচার্য্যের উপদেশ সঙ্গে সঙ্গে লিখে নেবার জন্যে। শাস্ত্রী মশায় বেদীর ওপরে আসন পিঁড়ি হয়ে ব'সে ভাঙা গলায় বললেন, সঙ্গীত।

সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে বাজনার শব্দ ও তার সঙ্গে গান আরম্ভ হয়ে গেল।

সঙ্গীতান্তে শাস্ত্রী মশায় চীৎকার ক'রে কি সব বলতে আরম্ভ করলেন। সে সব ভাল ভাল কথা, গূঢ় তার অর্থ, নানা অলঙ্কারপূর্ণ সে ভাষা—শিশুর কাছে তা প্রহেলিকা। স্থবিরের মনে হতে লাগল, এ যেন একটা ইস্কুল। বেদীর ওপরে ব'সে আছেন ঐ মাস্টার মশায়—চেঁচিয়ে পাঠ বুঝিয়ে দিচ্ছেন। চতুর্দিকে এই সব নরনারী, তারা ছাত্র ও ছাত্রীর

ফল। এ ইস্কুলের ছাত্রছাত্রীকে বোধ হয় 'নাড়ুগোপাল' হতে হয় না, গলায় তাদের ইটের মেডেলও ঝোলে না। সে একবার বাপের দিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজে ফেললে।

পেছনে হেলান দেবার একটু দেওয়াল পাবার ফলে এবারের নিদ্রাটি স্থবিরের বেশ গাঢ়ই হয়েছিল—হঠাৎ কান্নার আওয়াজে তার অমন মনোরম ঘুম ছুটে গেল। চোখ চেয়ে সে দেখতে পেলে, তার পাশেই একটি বৃদ্ধ হেঁচকি তুলে কাঁদছে আর বিড়বিড় ক'রে কি বলছে।

ব্যাপারটা স্থবিরের কাছে ভারী অদ্ভুত ঠেকল। সে তার আশপাশে তাকিয়ে দেখলে, আরও দু-তিনজন ভদ্রলোক ঐ রকম হেঁচকি তুলে কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। স্থবিরদের কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে একটি ভদ্রলোক ব'সে ছিলেন, তাঁকে তারা চিনত। এই লোকটি সমাজের মধ্যে একজন নামজাদা গম্ভীর ও রাশভারী লোক। সে দেখলে, ইনিও নিঃশব্দে অশ্রুবিসর্জন করছেন। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুজল তাঁর বিশাল দাড়ির এখানে সেখানে আটকে নোলকের মত দুলছে।

এই দৃশ্য দেখে স্থবির, স্থির বুঝতে পারলে, ব্যাপারটি বিশেষ সুবিধাজনক নয়। নিশ্চয় কোনও অপরাধের জন্যে শাস্ত্রী মশায় তাঁদের ধমক দিচ্ছেন।

ইতিমধ্যে শাস্ত্রী মশায় চীৎকার ক'রে উঠলেন, ঐ যে বিহঙ্গ শূন্যপথে মুক্তপক্ষে প্রয়াণ করিল—

স্থবিরের পাশের লোকটি, যিনি এতক্ষণ কান্নার সঙ্গে বিড়বিড় ক'রে বকছিলেন, হঠাৎ ডাক ছেড়ে ফুকরে উঠলেন, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়—

স্থবির ভাবলে, এবার বোধ হয় শাস্ত্রী মশায় বেদী ছেড়ে নেমে এসে এঁদের প্রহার আরম্ভ করবেন। সে সন্ত্রস্ত হয়ে র‍্যাপারখানা টেনে গায়ের সঙ্গে সেঁটে উদ্গ্রীব হয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়, তারই অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু শাস্ত্রী মশায় বেদী থেকে নামলেন না। তাঁর চীৎকারের মধ্যে ক্রন্দনের সুরটা যেন ক্রমেই ক'মে আসতে লাগল। ক্রমে তা যেন

একেবারে করুণ সুরে এসে পৌঁছল। তাঁর কণ্ঠস্বর ধাপে ধাপে নামতে নামতে শেষে অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

শিবনাথ শাস্ত্রী স্থবিরের পিতৃগুরু। তিনি যতক্ষণ চীৎকার ক'রে পুরুষোচিত অভিব্যক্তিতে ব'লে যাচ্ছিলেন, ততক্ষণ তার ভালই লাগছিল। শুধু যে ভাল লাগছিল তা নয়, তাদেরই শাস্ত্রী মশায় যে এতগুলো লোককে ধমকে কাঁদিয়ে বিপর্যস্ত ক'রে তুলছিলেন, তার মধ্যে নিজেও সে খানিকটা গৌরব অনুভব করছিল। কিন্তু হঠাৎ তাঁর সুরও অনুনয়ের পর্দায় নেমে আসায় তার শিশুচিত্ত শুধু বিহ্বল নয়, কিছু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল। স্থবিরের মনে হতে লাগল, কে সে নিষ্ঠুর, কোথায় তার বাড়ি, কেমন ভীষণ তার চেহারা, কত শক্তি সে ধরে, যাকে এমন ভাবে অনুনয় করা হচ্ছে, অতিবড় পাষাণও যাতে দ্রবীভূত হয়?

স্থবির স্থির করলে, বড় হয়ে এইজনকে খুঁজে বার করতেই হবে।

আজও স্থবির তারই অনুসন্ধানে ফিরছে।

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

ওরা

তাঁর সন্ধানে ওরা কি দিবে ?
কেমনে বা তাঁরে চিনি   ধরা দিয়ে যেন দিদি,
ছড়াইয়া আপনারে ঘিরিবে।
যত পথ চলি তাই   হারাই, কভু না পাই,
তাঁরি সাথে খেলা করে সকলে,
ওরা মাঝখানে থাকি   তোমায়, মোর যে কাঁদি—
দাঁড়িয়ে কি মিলাইবে সকলে ?

কোথা তুমি

তোমারই অন্তরবহ্নি এ দুর্দ্দিনে রবে নির্ব্বাপিত
চিরন্তন অগ্নিহোত্রী ? হে তরুণ, তুমি যে সাগ্নিক !
শঙ্কাহীন বীর্য্যবান বীর তুমি অপ্রমত্ত-চিত্ত
সমস্ত জীবন জ্বালি পথ-প্রান্তে দেখায়েছ দিক
যুগে যুগে চিরকাল ; কীর্ত্তিকথা তব সমুজ্জ্বল
ইতিহাসে আছে লেখা জ্বলন্ত অক্ষরে, আছে লেখা
স্মৃতিপটে, আশার কল্পনা-নভে করে ঝলমল
স্বর্ণবর্ণ মহিমায়। কোথা তুমি আজ ? দাও দেখা,
উদ্ভাসিত কর অন্ধকার, হে অগ্রণী চিরন্তন,
আদর্শ-প্রদীপ্ত তব মনীষায়। আছ তুমি জানি,
তবে কেন কষ্ট, ক্ষোভ, অসম্মান, সহস্র বন্ধন
পুঞ্জীভূত হতাশায় প্রতি পদে পরাজয়-গ্লানি ?
হে যৌবন-ভগবান, হে ভাস্বর, বীর মূর্ত্তি ধর
অন্ধকার যজ্ঞকুণ্ডে প্রাণ-অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর

"বনফুল"

এই যে!

বর্ণশ্রেষ্ঠ বেদশিক্ষিত আমি, পড়েছি গুরুকুলে,
হায় হায়, তুমি ভুলে গেছ বাবা, কোথায় পতিকুলে।
আমিই শিখায় বাঁধিয়া পকেট, মুখে ছেড়েছি হরেক রকেট,
মোর ছবি কত তুলেছে লকেট হিসাবে রাখার দিব না,
আমার সঙ্গে সিনেমায় আমি বেবী হইয়াছে কত দামী দামী,
কত মেয়ে পটিয়েছে আমি সবে দিই উদ্দীপনা।
কানে কানে মোর আলাপ—"কমলে কামিনী" দেখ উঠে যায়
(আকাশে আমার মনের বিমান।) মাটিতে হঠাতে।

—প্রকাশ

সোনার পদ্ম

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আদালতের বারান্দা

সরকারী উকিল ও পূর্ব-পরিচিত দারোগা

দারোগা। কালীচরণ তো স্বীকার করেছে, তবে আবার সাক্ষীর হাঙ্গামা করছেন কেন সার্?

উকিল। সে শুধু বলেছে, আমি খুন করেছি। এ ছাড়া সে একটি কথাও বলে নি। সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রমাণ করতে হবে, এ খুন সে খুন করবার উদ্দেশ্যেই করেছে। এটা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়।

দারোগা। সাক্ষী তো আমাদের একটি সার্—তারাচরণের স্ত্রী।

উকিল। তার চেয়ে ভাল সাক্ষী আর হতে পারত না দারোগাবাবু। সে নিজ চোখে সমস্ত দেখেছে। আপনি যান, তাকে একটু জলটল খাইয়ে সুস্থ করুন। টিফিনের পরই সাক্ষীর তলব হবে। (প্রস্থান)

আনন্দচরণের প্রবেশ

আনন্দ। এই যে দারোগাবাবু!

দারোগা। আনন্দবাবু? কিছু বলছেন?

আনন্দ। কুকুর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না দারোগাবাবু?

দারোগা। হুলিয়া পাঠিয়েছি। কিন্তু ধরা পড়ল কই?

আনন্দ। কিন্তু গুরুচরণ সাউকে এ মামলায় আপনারা আসামী করলেন না কেন?

দারোগা। প্রমাণ কই বলুন? গুরুচরণ এমন ভাবে কাজ করেছে যে, এক বিন্দু প্রমাণ কোথাও পাওয়া গেল না। আমি একবার তারাচরণের স্ত্রীকে দেখি। এখুনি সাক্ষীর তলব হবে। (প্রস্থান)

জ্ঞানদাচরণ বিপরীত দিকে চলিয়া যাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে সেই দিক হইতে প্রবেশ করিলেন সন্ন্যাসীবেশী ধনদাপ্রসাদ

জ্ঞানদা। আপনি ?

ধনদা। জ্ঞানদা ? (জ্ঞানদা প্রণাম করিল, ধনদা মাথায় হাত দিলেন

জ্ঞানদা। আপনি কেন এলেন ?

ধনদা। কালীচরণ নিজের ছেলেকে খুন করেছে, তার বিচার হচ্ছে ?

জ্ঞানদা। হ্যাঁ।

ধনদা। খবরের কাগজে সংবাদটা দেখলাম। দেখে না এ পারলাম না।

জ্ঞানদা। আপনি না এলেই কিন্তু ভাল করতেন।

ধনদা। ভাল-মন্দ বিচারটা বৈষয়িক বুদ্ধি জ্ঞানদা ; সংসারের সঙ্গে বুদ্ধিটাও বিসর্জন দিয়েছি।

জ্ঞানদা। কালীকে কি আপনি রক্ষা করতে চান ?

ধনদা। করতে আমি কিছুই চাই না। তবু আমি না এসে পারল না।

জ্ঞানদা। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি এইখান থেকে ফিরুন।

ধনদা। কেন জ্ঞানদা ?

জ্ঞানদা। বিচারের সময় যে সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা উঠবে—

ধনদা। পদ্মর কথা বলছ ? (জ্ঞানদা নীরব হইয়া রহি

ধনদা। পদ্মর কথা স্বীকার করবার জন্যেই আমি এসেছি জ্ঞানদা।

জ্ঞানদা। সে কথা তো সমস্ত লোকেই জানে।

ধনদা। না, জানে না। তুমিও জান না। জান অর্ধ সত্য। সত্যকে প্রয়োজন হ'লে সর্বসমক্ষে স্বীকার করতে হবে আমা আমি তো ফিরে যেতে পারব না।

জ্ঞানদা। আমি আপনাকে মিনতি করছি—

ধনদা। ও অনুরোধ ক'রো না জ্ঞানদা, সে হয় না।

কথা উল্লেখ করবার অধিকার আমার নেই জানি, কিন্তু তবু আমি উল্লেখ না ক'রে পারছি না যে, সভ্যতার অভিনব বিবর্ত্তনের ফলে যে সমস্ত দণ্ড আজ নিষ্ঠুর নৃশংস ব'লে রহিত হয়েছে, সেই শাস্তিও আজ যদি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয়, তবুও এ অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি হবে না। এক শত বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের দেশে ডাকাতি রাহাজানি নরহত্যার অপরাধে, অপরাধীর শরীরকে দ্বিধা-বিভিন্ন ক'রে প্রকাণ্ড রাজপথের পাশে, গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হ'ত। পিতৃমাতৃ-পুত্রকন্যা-হত্যায় হাতীর পায়ের তলায় দিয়ে মারার ব্যবস্থা ছিল। সর্পদংশনের চরমদণ্ডের ব্যবস্থাও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে লঘু দণ্ড ব'লেই আমার মনে হয়। ধর্ম্মাবতার! এ পাপ এত বড় পাপ, এত ভীষণ পাপ, যা পৃথিবীও সইতে পারে না—

পদ্ম। (উকিলের কথার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং শুনিতেছিল এবং ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতেছিল। সে এইবার চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সম্মুখে আসিল) না না না। সে আমার পাপ। সে আমার পাপ। সে আমার পাপ। ওগো জজসাহেব, তুমি বিচার কর। আমাকে সাজা দাও।

সরকারী উকিল। কে? কে তুমি?

ইন্‌স্পেক্টর। ইওর অনার, এই মেয়েটি, আসামী যতদিন জেল-হাজতে এসেছে, ততদিন জেল-কম্পাউণ্ডের চারিদিকে চীৎকার ক'রে বেড়ায়। বোধ হয় পাগল।

পদ্ম। না না, আমি পাগল নই। জজসাহেব, আমিই পাপী, তুমি আমার বিচার কর।

জজ। কি বলতে চাও তুমি? তুমি কে?

পদ্ম। আমার নাম পদ্ম।

সরকারী উকিল। তুমি পদ্ম বাগদিনী? ইওর অনার, এ মেয়েটি ওই আসামীর কুলত্যাগিনী ভগ্নী—এ হার্লট।

পদ্ম। হ্যাঁ হজুর, আমি পাপ পদ্ম, সর্ব্বনাশী পদ্ম। আমার পাপেই এ সর্ব্বনাশ ঘটেছে হজুর। তুমি বিচার কর, আমাকে সাজা দাও।

জজ। কি বলছ তুমি? কি করেছ?

পদ্ম। আমি বিধবা মেয়ে, রায়বাবুকে দেখে আমি কেন ভুললাম? আমাকে দেখে রায়বাবুর বড় ছেলে কেন পাগল হয়ে উঠল? দাদা আমাকে ধুলো ঝেড়ে বাড়ি নিয়ে এল, কেন আমি তবু থাকতে পারলাম না? পেটের জ্বালা আমি কেন সইতে পারলাম না? ওগো জজসাহেব, আমি কেন মরতে পারলাম না, কেন মরতে পারলাম না? (বলিতে বলিতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল)

জজ। পুওর গার্ল, আই পিটি হার।

পদ্ম। বিচার কর জজসাহেব, বিচার কর।

জজ। ঈশ্বর সে বিচার করবেন। এখন তুমি যদি এই তারাচরণের খুন সম্বন্ধে কিছু বলতে চাও তো বল। এর সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ?

পদ্ম। বিচার ক'রে দেখ তুমি, এ খুন আমি করেছি।

জয়া। (অগ্রসর হইয়া আসিল) না না। ওই রাক্ষস—ওই খুনে—ওই দৈত্যি। আমি নিজের চোখে দেখেছি। জজসাহেব, তুমি বিচার কর।

জজ। ওয়েল, হু ইজ শী?

সরকারী উকিল। এই মেয়েটিই আমাদের প্রধান সাক্ষী, হুজুর অনার—মৃত তারাচরণের স্ত্রী, এই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী।

জজ। (জয়ার প্রতি) তুমি এই খুন নিজের চোখে দেখেছ?

জয়া। নিজের চোখে দেখেছি। জজসাহেব—হুজুর, দেখে আমি চীৎকার করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। ছুটে এগিয়ে যেতে চাইলাম, কিন্তু সর্বাঙ্গ থরথর ক'রে কাঁপছিল, মাটিতে প'ড়ে গেলাম, যেতে পারলাম না। তবু হুজুর, চোখ বুজি নি, পলক পড়ে নি, চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল; সমস্ত—সমস্ত আমি নিজের চোখে দেখেছি। ওই—ওই—ওই রাক্ষস তাকে খুন করেছে।

পদ্ম। না না। ব্রহ্মশাপে সর্পাঘাত হয়, বজ্রাঘাত হয়, হুজুর, তার অঙ্গে

দায়ী কি পাপ, না বাজ? আমি বলছি, আমার পাপে হয়েছে, জজসাহেব, তুমি বিচার কর।

জজ। ইন্‌স্পেক্টর, পদ্মকে তুমি বাইরে নিয়ে যাও।

ইন্‌স্পেক্টর। তুমি বাইরে এস।

পদ্ম। না না না।

ইন্‌স্পেক্টর। কন্‌স্টেব্‌ল!

পদ্ম। না না না, আমি যাব না, আমি যাব না। আমার পাপ।

ধনদা অগ্রসর হইয়া আসিলেন

ধনদা। পদ্ম! অধীর হোস নি।

পদ্ম। এই—এই—জজসাহেব, এই সকল পাপের মূল, এই—এই—

কালী। পদ্ম!

পদ্ম স্তব্ধ হইল

কালী। যা। এখান থেকে যা তুই।

কনস্টেব্‌ল তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল

কালী। তুমিও এসেছ বড়বাবু? (ধনদা মাথা নত করিলেন) বড় খোকাবাবুর শোধ দেখতে এসেছ?

জজ। লেট আস প্রোসিড মিঃ বোস। সাক্ষীকে ডকে উঠতে বলুন।

ইন্‌স্পেক্টর সাক্ষীর ডকের দরজা খুলিয়া দিল

উকিল। জয়া বাগদিনী, তুমি যাও, ওখানে গিয়ে দাঁড়াও।

কালী। না। তুমি যেও না বউমা। হুজুর—

জয়া। রাক্ষস! খুনে! অত্তর পেট তোর ছেলেকে খেয়েও ভরে নি, এখনও তোর বাঁচতে সাধ?

কালী। হুজুর, আমি নিজেই সব কবুল খাচ্ছি। ছেলেকে আমি খুন করেছি, সে কথা তো আমি গরকবুল খাই নি। তবু তোমরা আমাকে ফাঁসি দেবে না। সব কথা না শুনে—। একটু জল, একটু জল পাব হুজুর?

জজ। ইন্‌স্পেক্টর! (ইন্‌স্পেক্টর দ্রুত চলিয়া গেল)

কালী। ধর্মাবতার!

জজ। অপেক্ষা কর, জল নিয়ে আসছে।

কালী। আর আমি চুপ ক'রে থাকতে পারছি না হুজুর। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, তবু আর চুপ ক'রে থাকতে পারছি না।

ইন্‌স্পেক্টর জল লইয়া আসিল, কালী দুই হাত বাড়াইয়া জলের গ্লাস লইয়া নিঃশেষে পান করিল

কালী। হুজুর, মনে করেছিলাম, বংশের কলঙ্কের কথা মরণ পর্যন্ত বলব না। কিন্তু সে না শুনে তোমরা যখন ফাঁসি দেবে না, তখন বলি। হুজুর, বউমা বলেছে, আমার অভর পেট। হ্যাঁ, আমার পেট অভরই বটে। শুধু আমার কেন, আমার বাবার, আমার মায়ের, আমার ঠাকুরদাদার—সবারই পেট অভর। পেটের দায়ে, হুজুর, রায়বাবুদের জন্যে দাঙ্গাবাজি ঘর-জ্বালানো ছিল আমাদের পেশা। বাবুদের চাকরান জমি আমরা ভোগ করতাম। আমার ছেলে তারাচরণের পেট শুধু অভর ছিল না হুজুর, পেটের দায়ে সে লাঠিয়ালি করে নি। সে ছিল কবিয়াল। সে বলত, 'যে বাঁশেতে লাঠি হয় মন, সেই বাঁশে হয় মোহন বাঁশী।' সে লাঠিয়ালি করে নি, তাই রায়বাবু আমাদের চাকরান জমি বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়েছিল। আমি তখন জেলে। ফিরে এসে রায়বাবুর কাছে গেলাম জমির জন্যে, হুজুর, এই অভর পেটের জন্যে। কেন গিয়েছিলাম, আঃ, আমি কেন গিয়েছিলাম! (সে স্তব্ধ হইয়া কাঠগড়ার রেলিঙে মাথা রাখিল)

সরকারী উকিল। কালীচরণ!

কালী। বলতে পারছি না হুজুর, বলতে আমি পারব না।

সরকারী উকিল। আমি জিজ্ঞাসা করছি তোমাকে। তুমি সেখানে গিয়ে দেখলে তোমার বিধবা বোন পদ্মকে? রায়বাবু তাকে ভৈরবী ক'রে নিজের বাগান-বাড়িতে রেখেছিল?

কালী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল

উকিল। দেখে তোমার ইজ্জতে আঘাত লাগল?

কালী। ইজ্জৎ? (হাসিল) ছোটলোকের ইজ্জৎ? হুজুর, গরিবের

ছোটজাতের ঘরে সুন্দরী মেয়ে হ'লে দেবতার নৈবিদ্যির মত বড়-লোকের—উঁচুজাতের নৈবিদ্যি হয়। সে কথা নয়।

জজ। তবে ?

কালী। সে কথা আমি বলতে পারব না। না, আমি বলব না।

ধনদাপ্রসাদ এতক্ষণ স্থির মূর্ত্তির মত বসিয়া ছিলেন, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন

ধনদা। ধর্ম্মাধিকরণের যদি অনুমতি হয়, তবে আমি সে কথা বলব।

জজ। তুমি ?

ধনদা। উপস্থিত আমি সন্ন্যাসী। সংসার-জীবনে আমার নাম ছিল ধনদাপ্রসাদ রায়। আমিই ছিলাম সেই জমিদার—রায়বাবু।

সরকারী উকিল জজসাহেবকে কি বলিলেন

জজ। বলুন, আপনি কি বলতে চান বলুন ?

ধনদাপ্রসাদ সাক্ষীর কাঠগড়ায় প্রবেশ করিলেন

ধনদা। মহামান্য বিচারক, আমি সন্ন্যাসী, সত্যই আমার একমাত্র দেবতা। আমি মিথ্যা বলব না। যে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সত্যকে কালীচরণ উচ্চারণ করতে পারছে না, সেই সত্যকে আমি স্বীকার করব। কালীচরণই আমাকে এ সত্য জানিয়েছিল। আমি জানতাম না। আমি জানতাম না যে, রূপমোহে ধর্ম্মের ভানে যে পদ্মকে আমি ব্যাভিচারসঙ্গিনী করেছিলাম, সে বাগদিনীর গর্ভে আমারই পিতার ব্যাভিচার-পাপের ফল ; সে আমার ভগ্নী।

জজ। মাই গড ! (সমস্ত আদালতে একটা অস্ফুট গুঞ্জন উঠিল)

ধনদা। আমি জানতাম না। প্রথমে বিশ্বাসও করি নি। কিন্তু কালীচরণ দেখিয়ে দিলে আমার মুখে এই জরুল, এই তিল ; পদ্মর মুখেও ঠিক এক জায়গায় এমনই জরুল, এমনই তিল ; কালীর মুখেও দেখলাম তাই। মনে পড়ল, আমার বাবার মুখেও ছিল এমনই জরুল, এমনই তিল। আশ্চর্য্যের কথা হুজুর, পদ্মর মুখের ওই তিলের সৌন্দর্য্যই আমাকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করেছিল। (ধনদাচরণ স্তব্ধ হইলেন)

জজ। আর আপনার কিছু বলবার আছে ?

ধনদা। আছে।

জজ। বলুন।

ধনদা। ধর্ম্মাধিকরণের সম্মুখে সত্যকে আংশিকভাবে গোপন করলে, সেও হবে মিথ্যাচরণের সামিল। ধর্ম্মাবতার, আমার পিতার পাপ, আমার পাপ, তখন বংশধর আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তারও পাপদৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল এই পদ্মর ওপর। বংশের পশুত্ব তার মধ্যে চরমতম উন্মত্ততায় আত্মপ্রকাশ করেছিল—উন্মত্ত পশুতে আর তাতে কোন প্রভেদ ছিল না।

কালী। আমি তাকে জানোয়ারের মতই খুন করেছিলাম।

সরকারী উকিল। প্রমদাবাবুকে তুমি খুন করেছ?

কালী। হাঁ। তার আগে দাঙ্গাবাজিতে লোকের মাথা কাটিয়েছি, লোক মরেছে, কিন্তু সে তো খুন নয়, সে লড়াই। আর এ—ওঃ—ওঃ—! বড়বাবু, সেদিন তুমি আমাকে অভিসম্পাত দিয়েছিলে। তোমার অভিসম্পাতেই—

ধনদা। না কালীচরণ, না।

কালী। তবে? কেন আমি খুন করলাম তারাচরণকে? সে আমায় 'বাবা' ব'লে ডেকেছিল, কেন আমার মনে হ'ল, বড়খোকাবাবু তোমাকে ডাকছে? হুজুর, ওই ভুলেই আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। রাত্রে যখন পথিক খুন করতাম, তখন প্রতিজনকেই মনে হ'ত বড়খোকাবাবু। সেদিনও অন্ধকার রাত্রে পথের ওপর ব'সে ছিলাম, বাদলায় সর্ব্বাঙ্গ ভিজে হিম হয়ে যাচ্ছিল, ঘন ঘন মদের ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছিলাম। চামড়ার মত পুরু অন্ধকার, তারই মধ্যে হঠাৎ দেখলাম, সাদা কাঠির মত কি নড়ছে। মাথার মধ্যে খেলে গেল—বড়খোকাবাবু। লাফিয়ে উঠলাম, মারলাম কাবড়া। সে পড়ল। চীৎকার ক'রে উঠল, 'বাবা!' আমি ঠিক শুনলাম বড়খোকাবাবুর আওয়াজ। ছুটে গিয়ে—। আঃ—আঃ—আঃ—!
(অধীর হইয়া উঠিল)

সরকারী উকিল। কালীচরণ! কালীচরণ!

কালী। আঃ—হুজুর, আমি বড়খোকাবাবুকে খুন করেছি, কত পথিক খুন করেছি, শেষে আমার নিজের ছেলেকে খুন করেছি; বিচার কর, আমাকে সাজা দাও, আমাকে ফাঁসি দাও।

আদালত স্তব্ধ

কালী। তবে হুজুর, ফাঁসির আগে একদিন আমাকে পেট ভ'রে খেতে দিও হুজুর। ভাল—খুব ভাল খাবার, অভর পেটে পেট ভ'রে আমাকে খেতে দিও।

জজ। মিঃ বোস, আপনার কিছু বক্তব্য থাকলে বলুন।

উকিল। ইওর অনার, এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য কিছু নেই।

জজ। (জুরীদের প্রতি) জেণ্ট্‌ল্‌মেন, আসামী নিজেই অপরাধ স্বীকার করেছে। আপনাদের মত?

ফোর্‌ম্যান। ইওর অনার, আসামী দোষী।

কালী। জয় হোক, হুজুরদের জয় হোক।

ফোর্‌ম্যান। কিন্তু হুজুর, আসামীর প্রতি ফাঁসির আদেশের পরিবর্ত্তে, আমরা যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন-দণ্ড দিতে ধর্ম্মাধিকরণকে অনুরোধ করি।

কালী। না না, ফাঁসি, ফাঁসি, হুজুর আমাকে ফাঁসি দাও।

ফোর্‌ম্যান। আসামীর যে পাপ, যে অপরাধ, তার যোগ্য শাস্তির বিধান মানুষের দণ্ডবিধিতে নেই ব'লেই সমগ্র বিশ্বের অদৃশ্য বিচারক নিজে তার দণ্ডবিধান করেছেন। এক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড দিলে ঈশ্বরের বিধানকে লঙ্ঘন করা হবে ব'লে আমরা মনে করি।

জজ। আই অ্যাক্‌সেপ্ট ইওর ভার্‌ডিক্‌ট।

কালী। ভগবান! ঈশ্বর! বলতে পার হুজুর, আবার যদি পালিয়ে গিয়ে আমি মানুষ খুন করি, তবে তোমাদের ভগবান আমাকে আর কোন্ সাজা দেবে? আর তো আমার তারাচরণ নেই?

জজ। Transportation for life—আসামীর প্রতি যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন-দণ্ডের আদেশ দেওয়া হ'ল।

কালীচরণ পাগলের মত হাসিতে লাগিল

ইন্‌স্পেক্টর। চুপ—চুপ—চুপ কর তুমি।

অজ। ওর মনের আবেগ শেষ করতে দাও ইন্‌স্পেক্টর—সেটুকু দয়া দেখাতে কার্পণ্য ক'রো না।

কালী। দয়া! বিচার! ঈশ্বরের দণ্ড! (হাস্য)

ধনদা। কালী! কালী!

কালী। দয়া! বিচার! ঈশ্বরের দণ্ড! (উচ্চহাস্য)

ধনদা অগ্রসর হইয়া আসিলেন

ধনদা। কালীচরণ!

কালী। বড়বাবু?

ধনদা। চুপ কর, স্থির হ।

কালী। বড়বাবু, তুমি আমার মনিব, আমার ভাই। একটা উপকার কর হুজুর। জজসাহেবকে ব'লে আমার ফাঁসির হুকুম করিয়ে দাও। ফাঁসি। ফাঁসি। বলতে পার, কি ক'রে—কি নিয়ে বেঁচে থাকব আমি?

ধনদা। ভগবানের নামকে স্মরণ কর কালী—

কালী। (চীৎকার করিয়া উঠিল) না না না। তার নাম তুমি আমার কাছে ক'রো না। ছোট জাত—পাপী আমি, তার নাম নিয়ে কি করব? কি হবে? সে আমার কি করেছে? কি দিয়েছে?

ধনদা। না না কালী, ও কথা বলিস নি। তাঁর বিধান—

কালী। তার বিধান? ভগবানের বিধান। (উচ্চহাস্য)

ধনদা। কালী!

কালী। মানি না, মানি না। যে ভগবানের বিধানে তোমার বাবা আমার মাকে ভুলিয়েছিল, তাকে আমি মানি না। যে ভগবানের বিধানে তুমি পদ্মকে ভৈরবী করিয়েছিলে—

ধনদা। কালীচরণ, আমাকে ক্ষমা কর। ওরে, আমাকে তুই ক্ষমা কর।

কালী। যে ভগবানের বিধানে আমাদের বাপের সম্পত্তি সব তুমি পাও, তোমার ছেলেরা পায়, আর আমার চাকরান জমি বাজেয়াপ্ত হয়, তাকে আমি মানি না। যে ভগবানের বিধানে তুমি বামুন, আমি বাগদী; যার বিধানে তোমাদের জমিতে এত ধান, ঘরে

সিন্দুকে এত আসবাব এত ধন, তোমাদের এত সুখ, আর আমার গড়া ক্ষেত চ'লে যায়, ভাঙা ঘরে জল পড়ে, পোষপার্ব্বণের দিনে পেটের জ্বালায় বোন বেরিয়ে চ'লে যায়, তাকে আমি মানি না। বলতে পার বড়বাবু, তার বিধানে কেন তুমি দুধে ভাতে পেট পুরে খাও, ফেলে দাও, পোষা কুকুরকে দাও, তবু তোমার ফুরোয় না, আর আমি কেন একবেলা আধপেটা খেতে পাই না, স্ত্রীপুত্রের মুখে তুলে দিতে পাই না? কেন? কেন? কেন?

ধনদা। অপরাধ, আমার অপরাধ, আমার পিতৃপুরুষের অপরাধ আমি স্বীকার করছি কালীচরণ। এ বিধান ভগবানের নয়। এ বিধান মানুষের গড়া বিধান। এ বিধান থাকবে না, ভেঙে যাবে। আমি বলছি তোকে, ভেঙে যাবে।

কালী। কবে? কবে? কবে?

ইন্‌স্পেক্টর। (ধনদাকে) আপনি আর কথা বলবেন না। আপনি এখান থেকে চ'লে যান।

ধনদা। কালী, পারিস তো আমায় ক্ষমা করিস ভাই। (প্রস্থান)

ইন্‌স্পেক্টর। এস তুমি।

কালী। (জয়ার দিকে চাহিয়া) বউমা!

জয়া ফিরিয়া চাহিল। সেই মুহূর্তেই বাহিরে শব্দ উঠিল 'খুন! খুন!' এবং শব্দকে ছাপাইয়া জাগিয়া উঠিল পদ্মের হাস্যধ্বনি। বুকে ছুরিকাবিদ্ধ অবস্থায় ধনদাপ্রসাদ পিছনে ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন কন্‌স্টেবল পদ্মকে ধরিয়া লইয়া প্রবেশ করিল। পদ্ম হা-হা করিয়া হাসিতেছিল

কন্‌স্টেব্‌ল। এই খুন করেছে, এই।

পদ্ম। (হাসিতে হাসিতে) তোমার ছুরি, তোমার বুকেই বসিয়ে দিয়েছি।

কালী। পদ্ম!

ধনদা। (যন্ত্রণার মধ্যে) কালী, এইবার আমাকে ক্ষমা কর কালী।

কালী। (ধনদার পাশে বসিল, তারপর উপরের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল) ভগবান, ভগবান, দয়া কর দয়াময়। ক্ষমা কর ঠাকুর।

বড়বাবুকে ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা কর, পল্লকে ক্ষমা কর। মানুষকে ক্ষমা কর প্রভু। ভগবান, মানুষকে তুমি হিংসে ভুলিয়ে দাও, তাকে পেট ভ'রে খেতে দাও, তাকে তুমি সুখ দাও, তুমি তার চোখের সামনে থাক। তাকে তুমি শান্তি দাও ঠাকুর।

জয়া। (সেও হঠাৎ নতজানু হইয়া বলিল) ঠাকুর, আমার শ্বশুরকে তুমি ক্ষমা কর ঠাকুর। দয়াময়!

যবনিকা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন

সেদিন—
নিবনিব সূর্যদীপদান বাঁকা চাঁদ জেগেছে আকাশে
মিনতির মত শাখে ফুল ফুটেছিল গন্ধ ভেসে আসে
বাঁধা নীড়ে ফিরেছিল পাখী আমলকী-শ্যামল-আরামে
প্রেমের সায়াহ্নখানি ধীরে তোমায় আমায় ঘিরে নামে।
মোর পাশে তুমি ছিলে, ছিলে মোর কাছে, মোর মাঝে তুমি,
মোর ভাল তব চূড়া হতে সিন্দূরের বহ্নি নিল চুমি,
ছুঁয়েছিল মোর কর্ণপাশ ভীরু তব কানে-বলা ভাষা
সহসা শুনিল বিশ্বলোপী—অন্ধ এক সন্ধ্যাভরা ভাষা।
"অস্তরাল হোক কৃষ্ণমায়া, নির্ব্বাণীর জলুক মণিকা,
যে আলো দেখিতে চাও চাও, সে আলোক সূর্য্যে নাই শিখা
যে নীড় বাঁধিতে চাও চাও, সে নীড় বাঁধে নি কোনো পাখী"
প্রেমের সায়াহ্নখানি, প্রিয়ে, এ কি বহ্নিগান গেল রাখি?
সেদিন—
সে তুমি ছিলে না সেথা হায় যে আমারে বারবার ডাকে
যে ফুল ফোটাতে চাই:চাই সে ফুল ফোটে না কোনো শাখে।

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

কঞ্চুক

রায় বাহাদুর লোকেন গুপ্ত অকস্মাৎ নিজেকে অসুস্থ বোধ করলেন। ফাল্গুনের প্রসন্ন প্রভাত। আকাশে বাতাসে বসন্তের উষ্ণ মদিরতার আমেজ দিলেও দেবতা নগাধিরাজের পায়ের তলায় এই ছোট শহরটিতে অবসিত শীতের মৃদু তীক্ষ্ণতা এখনও জড়িয়ে আছে। শালখানাকে একেবারে পায়ের পাতা পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে রায় বাহাদুর সদ্যোপ্রাপ্ত খবরের কাগজখানা খুলে ব'সে ছিলেন।—রাশিয়ান ফ্রন্ট, টিউনিসিয়া, প্রশান্ত মহাসাগর, বোমাহত কলকাতা।

ডেক-চেয়ারের হাতলে ধূমায়িত কোকোর পেয়ালা ছড়াচ্ছে মিষ্টি চকোলেটের গন্ধ; সম্মুখের লনটা শিশিরে ভেজা নানা জাতের বিলিতী ফুলে একাকার হয়ে আছে—ডালিয়া, ক্যালেণ্ডুল, লার্কস্পার্ক, ক্রিসান্থিমাম। রঙের অপরূপ সমারোহ। লনের বাইরে কালো পিচের পথ পেরিয়েই ঘোড়দৌড়ের মাঠ, তার ওপারে মরা তিস্তার ধূ ধূ বালু-বিস্তার সকালের কুয়াশায় অস্পষ্ট। সূর্যের প্রথম আলোয় সে কুয়াশা যেন অধীর হয়ে গ'লে পড়ছিল।

হঠাৎ তিস্তার দিক থেকে এল একটা কনকনে তীব্র বাতাস। লম্বা-ডাঁটাওলা ফ্লক্স আর লার্কস্পার্কগুলো নুইয়ে পড়ল মাটিতে, থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল ডালিয়ার ভীত পাপড়িগুলি। লোকেন গুপ্তের শুভ্র চুলের মধ্যে খেয়ালীর মত আঙুল বুলিয়ে দিলে, পায়ের কাছে শালের প্রান্তটিকে দুলিয়ে দিলে; কয়েকবার শিথিল হাতের ভেতর দিয়ে খবরের কাগজটা খ'সে পড়ল বুকের ওপর। অর্দ্ধনিমীলিত দুটি চোখে কে যেন দুটি সিল্কের পর্দা নামিয়ে দিলে, বাঁ হাতের আংটিতে গোমেদ পাথরটা ঝিকমিক ক'রে উঠল চকিত জিজ্ঞাসার মত। আর ডেক-চেয়ারের হাতলে মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে ছড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এল সোনালী ফুলকাটা কোকোর পেয়ালাটা।

চুরুট দিতে এসে ব্যাপারটা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করলে মেজ বউমা। বললে, চুপ ক'রে কি ভাবছেন বাবা, কোকোটা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। রায় বাহাদুর উত্তর দিলেন না।

ডাক্তারেরা বললেন, অ্যাপোপ্লেক্সি। আর যাওয়ার আগে এই ভেবে আক্ষেপ ক'রে গেলেন যে, শহরের বড়লোকেরা যদি চিকিৎসাপত্র করবার কোন সুযোগ না দিয়ে বিনা আড়ম্বরে এই রকম অভদ্রের মত মরতে শুরু করেন, তা হ'লে তাঁদের ব্যবসা তুলে দিতে হবে।

লোকেন গুপ্ত মারা গেলেন। এক্ষেত্রে ঠিক মারা গেলেন বললে আভিধানিক সংজ্ঞাটা খাটো হয়ে যাবে, এই ছোট শহরটির পক্ষে ঘটনাটা ইন্দ্রপতনের মতই গুরুতর এবং শোকাবহ, বিদ্যুৎবেগে খবরটা শুধু শহরময় ছড়িয়ে পড়ল তাই নয়, আধ ঘণ্টার মধ্যে বিদ্যুৎদূত ছুটোছুটি করতে লাগল কাশ্মীর থেকে কুমারিকা পর্যন্ত— ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে।

বাড়ির সামনে মোটরের একটা ছোটখাটো শোভাযাত্রা। চা-বাগানের সেক্রেটারিয়া থেকে শুরু ক'রে জেলার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট অবধি সকলে সহানুভূতি জানিয়ে গেলেন। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অকস্মাৎ অজাতশত্রু হয়ে উঠেছেন লোকেন গুপ্ত। সরকারের খয়ের খাঁ ব'লে এতদিন যারা তাঁর নিন্দাবাদ করত, কিংবা গত জেলা-বোর্ডের নির্বাচনে যারা তাঁর নামে অকথ্য রটনা করেছিল, এই মুহূর্তে তাদের শোকোচ্ছ্বাস দেখলে লোকান্তরিত লোকটি কৃতার্থ বোধ করতেন নিশ্চয়ই।

রুমালে চোখ মুছতে মুছতে বড় ছেলে বীরেন গুপ্ত খালি পায়ে বেরিয়ে এলেন। বললেন, আপনাদের অনুমতি নিয়ে তা হ'লে শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করা যাক।

শহরের প্রধান উকিল মোহিনীবাবু দার্শনিকতার সুর টেনে বললেন, হ্যাঁ, যখন চ'লেই গেছেন, তখন নশ্বর দেহটাকে আটকে মুক্তপুরুষকে আর বাধা দেওয়া কেন?

শোকগম্ভীর কণ্ঠে বীরেন বললেন, চ'লে গেছেন, অবশ্য যাওয়ার জন্যে তিনি তৈরি হয়েই ছিলেন। কিন্তু আমরা—

গীতার শ্লোক আবৃত্তি ক'রে মোহিনীবাবু বললেন, পুণ্যাত্মা লোক! আক্ষেপ ক'রে আর কি করবেন বলুন?

আক্ষেপ ক'রে অবশ্য কোনও লাভ নেই, কিন্তু লোকেন গুপ্ত সত্যি সত্যিই যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে ছিলেন না।

চল্লিশ বছর আগে যখন তিনি প্রথম এখানে আসেন, তখনও এই শহরটির ভাল ক'রে পত্তন হয় নি। জঙ্গল আর অস্বাস্থ্য—বর্ষার সময় ঢল-নামা তিস্তার প্রমত্ত আক্ষেপ। তারপর দেখতে দেখতে ছায়াচিত্রের মত অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে বদলে গেল এই শহরের শ্রীছন্দ। বাণিজ্যলক্ষ্মী ডুয়ার্সের চা-বাগানে আঁচল ঝেড়ে দিয়ে গেলেন, ভিভিডেণ্ডের বনিয়াদে মাথা তুলে দাঁড়াল এই পরিপাটি সমৃদ্ধ শহরটি আর সেই সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রায় বাহাদুরও ফেঁপে উঠতে লাগলেন, ওকালতির উপসর্গ টা নগণ্য রইল মাত্র।

চল্লিশ বছর কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে। বিদেশ থেকে এসে ভাগ্যকে জয় করবার পথে যে সমস্ত অন্তরায়, তাদের প্রত্যেকটির সঙ্গে অসংকোচে মুখোমুখী হয়েছেন তিনি। তারপর এতকাল সুদীর্ঘ পরিশ্রমের শেষে এই বিশ্রাম, এই পুরস্কার।

তিনটি ছেলে, অযোগ্য অপদার্থ কেউ নয়। বড় ছেলে বীরেন গুপ্ত উকিল, চা-বাগানের কল্যাণে রোজগারের চাড় না থাকলেও তাঁর পসার দিনের পর দিন উঠছে ফলাও হয়ে। মেজ ছেলে হীরেন গুপ্ত এম. বি. ডাক্তার, তা ছাড়া তিন-চারটে চা-বাগানের ডিরেক্টার। ছোট ছেলে নীরেন গুপ্ত কেমিস্ট্রিতে প্রথম হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছিল, বোমার বিশৃঙ্খলায় কিছুদিনের জন্যে এখানে এসেছে আশ্রয় নিতে।

তিনটি বউ, ছেলেদের পাশে বেমানান নয়। বড় বউ সুলতাই গৃহিণী, দুটি সন্তানের মা হয়েও কিশোরীর মত লঘু ও মনোরম তাঁর স্বাস্থ্য। মেজ বউ উমার ছেলেপুলে নেই, কিন্তু চেহারাটি ভারিক্কী আর গম্ভীর, সংসারের কাজকর্ম তারই তত্ত্বাবধানে। ছোট বউ লাবণ্য

গ্র্যাজুয়েট, মাত্র তিন মাস আগে বিয়ে হয়েছে। গানে হাসিতে এবং অকারণ লঘুতায় সে সমস্ত বাড়িটাকে রেখেছে মুখরিত ক'রে।

লোকেন গুপ্ত বিপত্নীক। জীবনের অর্দ্ধপথে মিসেস গুপ্ত তাঁকে ছেড়ে গেছেন। কিন্তু প্রত্যেকটি মুহূর্ত তখন নিশ্ছিদ্র আর জমাট, পাশ থেকে কে খ'সে পড়ল, ফিরে তাকাবার সময় কি তখন ছিল! ১৯১৬—১৭ সাল। চা-বাগানে বুমিং সিজন চলছে, দাউদাউ ক'রে আগুন জলছে শেয়ারের বাজারে, মৃতপ্রায় বাগানগুলো আকস্মিকভাবে সজীব হয়ে ডিভিডেণ্ড দিতে শুরু করেছে।...কিন্তু এল বার্দ্ধক্য, এল বিরাম, চাব্বিশটা বছর হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সাবানের বুদ্বুদের মত। প্রতিযোগিতা, কোলাহল, কোটা আর কোটেশন ; ধুলো আর পেট্রোলের গন্ধ পার হয়ে নীল বাল্বের আলোয় স্নিগ্ধ একটি নিভৃত কক্ষে যখন তিনি নিশ্বাস ফেলার সুযোগ পেলেন, তখন প্রবল একটা শূন্যতায় মনটা উঠল হুহু ক'রে। তিনটি পুত্রবধূ এগিয়ে এল সে শূন্যতা পূর্ণ করতে, সেবায় যত্নে লোকেন গুপ্ত সে ক্ষতিটা ভুলে থাকবার অবকাশ পেলেন।

বিশ্রাম—সারা জীবন সংগ্রামের পর স্নিগ্ধ নির্লিপ্ত বিশ্রাম। জলাজলির ঊর্দ্ধে বিক্ষোভের নেপথ্যে। বাইরের বারান্দায় একখানা ডেক-চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে লোকেন গুপ্ত দেখলেন, নীড়যাত্রী চখা-চখীর পাখায় সঙ্গে সঙ্গে তিস্তার বালুচরে নামছে নিস্তরঙ্গ মলিন সন্ধ্যা—তাঁর চিন্তাচঞ্চল ক্ষুব্ধ মস্তিষ্কে বৈরাগ্যের একটা প্রগাঢ় শান্তির মত। এই অনাসক্ত নির্লিপ্তের মাঝখানে লোকেন গুপ্ত আরও কয়েকটি দিন বাঁচতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন মধুর আনন্দের আরও কয়েকটি শিথিল মুহূর্ত।

এই তো কাল রাত্রের কথা। সন্ধ্যায় রায় বাহাদুরের অন্তঃপুরে একটা আসর বসেছিল। বিরাট এবং ব্যাপক কিছু নয়, নিতান্তই ঘরোয়া আসর। এই সব ছোটখাটো আনন্দ-চক্রে সমস্ত মন মুক্ত ক'রে দেওয়া লোকেন গুপ্ত অত্যন্ত পছন্দ করেন, সাংসারিক সম্পর্কগুলো এখানে যেন স্বচ্ছতায় অনেকটা সহজ হয়ে আসে। পুত্র বা পুত্রবধূর

সঙ্গে সব সময়ে একটা সম্মানজনক দূরত্ব বাঁচিয়ে চলবার মত রক্ষণশীলতা তাঁর ছিল না।

কিছুদিন থেকেই রায় বাহাদুরের শরীর ভাল নয়। একটা চেঞ্জের কথা চলছিল। ঘরের কাছেই দার্জিলিং জেলায় তিনটে ছোট বড় শহর, কিন্তু ছেঁড়া জুতোর মতই বহুপরিচিত আর বিরক্তিকর। নাইনিতাল, ওয়ালটেয়ার, মসৌরী, দেরাদুন, এমন কি সিমুলতলা পর্যন্ত আলোচনা চলতে লাগল, কিন্তু কোনটাই আমল পেল না।

মেজ ছেলে হীরেনই সমস্ত সমস্যার সমাধান করলেন শেষে। তিনি ডাক্তার মানুষ, তাই তাঁর মতামতে একটা চরম সিদ্ধান্তের ভাব আছে। গম্ভীর স্বরে বললেন, ওসব ক্যাপাবেব্‌ল স্যানাটোরিয়াম মানেই টাকার শ্রাদ্ধ। কাজ কতটা হবে সে তো দেখা চাই। আমার মতে, মেডিক্যাল অ্যাড্‌ভাইসের দিক থেকে, পুরী গেলেই সব-চাইতে ভাল হবে।

সুলতা ইতস্তত ক'রে বললেন, পুরী? বড্ড পুরনো হয়ে গেছে না?

পুরনো! হীরেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, পুরনো ঘিয়ের কদর বোঝ? পুরনো ভৈতুলের অ্যাক্‌টিভিটি জান? সার্জারি হচ্ছে ডাক্তারী বিদ্যের সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন, কিন্তু—

সুলতার মুখে ভীতি প্রকাশ পেল, আমার ঘাট হয়েছে ঠাকুরপো।

রায় বাহাদুর স্মিত হাস্যে বললেন, তা পুরীই ভাল। সমুদ্রস্নান হবে, তা ছাড়া দারু-ব্রহ্মও আছেন। জীবনের দিনগুলো তো কাটিয়ে এসেছি, এই ফাঁকে কিছু পুণ্য অর্জ্জন ক'রে নিলে মন্দ কি?

লাবণ্য রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। এক কোণে অর্গ্যানটা নিয়ে টুংটাং ক'রে কিছু একটা বাজাবার চেষ্টা করছিল, এতক্ষণে উঠে এল। বললে, পুরী! সমুদ্র! কী ভীষণ! গ্র্যাণ্ড! আচ্ছা মেজদি, কীট্‌সের সেই লাইনগুলো তোমার মনে আছে—একটি উন্মুক্ত বাতায়ন, আর তার সামনে উচ্ছ্বসিত ফেনিল সমুদ্র?

এতক্ষণ উমা তার সরল চোখ দুটি বিস্ফারিত ক'রে সমস্ত আলোচনা শুনছিল। গ্রামের এবং গরিবের মেয়ে, লেখাপড়া বিশেষ শেখবার

সুযোগ পায় নি। শুধু রূপের দিক বিচার ক'রেই রায় বাহাদুর তাকে ঘরে এনেছিলেন। লঘু পরিহাসের ভেতর লাবণ্য মাঝে মাঝে এই ভাবে তার নিরক্ষরতাকে কটাক্ষ করে।

জানি না, যাঃ।

জান না? আচ্ছা, উডহাউসের The girl who was too simple পড় নি? ভীষণ! গ্র্যাণ্ড গল্পটা মেজদি, ঠিক তোমার সঙ্গে মিলে যায়।

আবার? তোর 'ভীষণ, গ্র্যাণ্ড' নিয়ে আমাকে তুই এই ভাবে জ্বালাবি নাকি? উমার কণ্ঠস্বর করুণ হয়ে এল, বললে, আপনার বি. এ. পাস বউমাকে আমার সঙ্গে লাগতে বারণ ক'রে দিন বাবা।

রায় বাহাদুর সহাস্যে বললেন, সত্যিই তো, কি অন্যায়!

অন্যায়? তা হ'লে তুমি চ'টে গেছ মেজদি! বাস্তবিক চটলে কি ভীষণ গ্র্যাণ্ড দেখায় তোমাকে! লাবণ্য এগিয়ে এসে দু হাতে উমার গলা জড়িয়ে ধরলে, আমার ওপর রাগ ক'রে তুমি থাকতে পার? পার তুমি?

উমা হেসে ফেলে বললে, এটা একেবারে পাগল।

সুলতা সস্নেহে বললেন, দুটোতে জমেছে ভাল। দিন রাত ঝগড়া আর ভাব।

বীরেন এতক্ষণ গভীর মনোযোগ দিয়ে টাইম-টেব্‌লের সমুদ্রমন্থন করছিলেন। চোখ তুলে বললেন, বেশ, তা হ'লে পুরীতেই যাওয়া যাক। আমার এক ক্লায়েন্ট আছে ওখানে—স্বর্গদ্বারের ওপর, তার মস্ত খালি বাড়ি, সেখানেই টেলিগ্রাম ক'রে দিই, কি বলেন?

রায় বাহাদুর বললেন, দাও।

হীরেন চিন্তিত মুখে বললেন, আমার মনে হয়, মেডিক্যাল স্ট্যাণ্ড পয়েন্টে—

সুলতা বাধা দিয়ে বললেন, দোহাই ঠাকুরপো, তোমার কি মনে হয়, তা শুনিয়ে আমাদের আর ভয় পাইয়ে দিও না, ওসব তোমার রুগীদের জনিও বরং।

পরম ঔদার্য্যভরে অনুকম্পার হাসি হাসলেন হীরেন।

উমা এর মধ্যে কখন নীরেনকে তার পড়বার ঘর থেকে টেনে এনেছে। বড় বড় চুল, চশমার কাচ এক ইঞ্চি পুরু। শামুকের মত ঘরের কোণে নিজেকে সংকুচিত ক'রে রেখে ডি. এস-সি. পাবার অক্লান্ত সাধনা চলছে তার।

আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমার মতলবটা কি, শুনি? অত পড়লে মানুষ যে পাগল হয়ে যায়, জান না বুঝি?

জানি, জানি। কিন্তু নোটটা শেষ করতে দাও বউদি।

বীরেন লঘুভাবে ধমক দিলেন।

একটু বিশ্রাম কর্ তো নীরু। তাতে তোর ডক্টরেট আটকে থাকবে না। দু দিনের জন্যে এসেছিস, কোথায় একটু রিক্রিয়েশন হবে, তা নয়—

এক্জ্যাক্টলি! হীরেন কথাটাকে ধ'রে ফেললেন, ব্রেনকে ওভারট্যাক্স ক'রে শেষে একটা কাণ্ড ঘটাবি তুই। এমনিতেই শরীর যা দেখছি, ক্যাল্সিয়াম তো এক্ষুনি দরকার। আমি বরং কাল থেকে তোকে প্রেস্ক্রিপশন ক'রে দোব একটা।

নীরেন সভয়ে বললে, না, প্রেস্ক্রিপশনের কোনও দরকার হয় নি এখনও।

বীরেন বললেন, সবাই মিলে পুরী যাওয়ার প্রোগ্রাম হয়ে গেল তিন মাসের মত। নেহাৎ মন্দ হবে না বোধ হয়। তোর কোনও আপত্তি নেই তো?

আমার? আমার আবার কি আপত্তি? পুরী, সে বেশ তো। নীরেন যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল।

বাঃ, যাচ্ছ যে? আবার বই মুখে নিয়ে বসবার মতলব, না? উমা ধমকে উঠল, ওসব চলবে না, লুডো খেলতে হবে এখন।

লুডো? শেষ পর্য্যন্ত লুডো খেলব তোমাদের সঙ্গে! কিন্তু জেতবার দুরাশা এতটুকু আছে নাকি?

কি, জিতব না? চুরি করবে ভেবেছ বুঝি? আচ্ছা এস তো

দেখি। বড়দি, তুমি ব'স ঠাকুরপোর সঙ্গে, আমি আর ছোট এক দলে। বাবা, আপনি দেখবেন কিন্তু, ঠাকুরপো ভীষণ চুরি করে।

রায় বাহাদুর হাসলেন। আনন্দে আর তৃপ্তিতে মনের প্রান্তগুলি উছলে পড়ছে। স্বাচ্ছন্দ্যে, বিশ্বাসে আর ভালবাসায় গড়া একটি আদর্শ সংসার। কোথাও অভিযোগ নেই, অপূর্ণতা নেই কোনখানে। সারা জীবন ধ'রে, তিনি এমনই একটি স্বপ্নমধুর কোমল বিশ্রামেরই প্রত্যাশা করেছিলেন বুঝি। একটি আদর্শ সংসার। রত্নের মত তিনটি ছেলে, লক্ষ্মীর মত তিনটি বউ। সহসা তাঁর মনে প'ড়ে গেল, বয়স বড় বেশি হয়েছে, দেহের শিরাপেশীগুলি বড় বেশি এসেছে শিথিল হয়ে। নীল বাল্‌বের আলোয় ঠাণ্ডা এই ঘরটি, বাইরের বারান্দায় অস্থিতের ওই কম্পিত ছায়াগুলো, খোলা জানলা দিয়ে তিস্তার স্নিগ্ধ বাতাস, অন্তঃপুরের এই মধুচক্র, বড় তাড়াতাড়ি, বড় নির্মমভাবে ফুরিয়ে যাবে তারা। এক নিশ্বাসে বুকের মধ্যে অনেকখানি বাতাস টেনে নিলেন লোকেন গুপ্ত। তাঁর বাঁচতে ইচ্ছা করছে, অদ্ভুতভাবে বাঁচতে ইচ্ছা করছে, আজ দীর্ঘ দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, অফুরন্ত কাল ধ'রে অব্যাহতভাবে।

কিন্তু পরের দিন সকালেই লোকেন গুপ্ত মারা গেলেন।

বাইরে লোকের ভিড় বাড়তে শুরু হয়েছে। শহরে এতবড় একটা বিরাট ব্যাপার অনেকদিন ঘটে নি। ইন্দ্রপতন। সামনের লনটা নানা স্তরের লোকে বোঝাই হয়ে গেছে।

চন্দনকাঠ বোধ হয় পাওয়া যাবে না, তবুও তার জন্যে ছুটোছুটির বিরাম নেই। কোথা থেকে এর মধ্যেই সংকীর্তনের দল এসে পড়েছে একটা, ঊর্ধ্ববাহু নৃত্যের সঙ্গে গান চলেছে তাদের—

"অন্তকালে গৌরহরি
শরণ দিও ওই চরণে—"

রায় বাহাদুর লোকেন গুপ্তের মৃত্যু। বিনা আড়ম্বরে এতবড় অনুষ্ঠানটা কোনও মতে ঘটতে পারে না। আজকালকার দিনে তামার

পয়সা দুর্লভ, তবুও পঞ্চাশ টাকার খুচরো যথাসম্ভব ভাঙিয়ে আনা হয়েছে। শবযাত্রার পথে পথে ছড়িয়ে যেতে হবে।

কর্ত্তব্য এখানে প্রবল, অতএব শোকের সময় নয়। তাই বীরেন গুপ্ত এ অবস্থাতেও যতটা সম্ভব সব দেখাশোনা ক'রে বেড়াচ্ছেন। আর রায় বাহাদুরের পায়ের কাছে মাথা নত ক'রে স্তব্ধ হয়ে ব'সে আছে নীরেন।

টেলিগ্রাম। এর মধ্যেই কণ্ডোলেন্স টেলিগ্রাম আসতে শুরু হয়েছে, সহানুভূতি জানিয়েছেন বাংলার প্রধান মন্ত্রী। লোকেন গুপ্তের জীবনের চাইতে মৃত্যুটাকে কম গৌরবময় বলা ঠিক নয়, হয়তো বা বেশিই।

এরই মধ্যে এক ফাঁকে বীরেন এসে অন্তঃপুরে দেখা দিলেন।

শুনছ ?

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুলতা। বললেন, ডাকছিলে ? এই যে, গীতা আর নামাবলী বের ক'রে আনলুম। আর কিছু লাগবে কি ?

বলছি। সতর্ক চোখে বীরেন চারদিকে তাকালেন একবার। বাইরে কোলাহল বেড়েই চলেছে, রায় বাহাদুরের মৃত্যুটা শহরের পক্ষে ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকবে নিশ্চয়ই। কীর্ত্তনের ধুয়াটা প্রবলভাবে শোনা যাচ্ছে—অন্তকালে শরণ দিও গৌর হে, গৌর হে—

না, কোথাও কেউ নেই। বীরেন চাপা গলায় বললেন, বাবার আয়রন-সেফের চাবিটা তোমার কাছে আছে তো ?

সুলতার শোকার্ত্ত মুখে বিস্ময় প্রকাশ পেল।

আছে। কিন্তু এখন চাবি দিয়ে কি হবে ?

কাজ আছে।

সুলতা আর প্রশ্ন করলেন না। চাবি খুলে দিতেই রায় বাহাদুরের শোবার ঘরের দিকে নিঃশব্দপদে বীরেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মন্থর গতিতে উমা এসে দর্শন দিলে। আসন্ন বর্ষণের জমাট কালো মেঘের মত থমথম করছে তার গম্ভীর মুখ। লোকে তাকে যতখানি বোকা ভাবে, সত্যি সত্যিই ততখানি বোকা তা হ'লে সে নয়।

তুমি ওঁকে কি খুলে দিলে বড়দি ?

সুলতা ভ্রূকুটি করলেন, শুভ্র সুন্দর ললাটে বিরক্তির রেখা। বললেন, কি আর দোব ?

উমার কণ্ঠস্বর তিক্ত আর সন্দিগ্ধ শোনাল, বাবার আয়রন-সেফের চাবি, তাই না ?

সুলতা বিরক্তি দমনের চেষ্টা করলেন না, বেশ তো, তাতেই বা ক্ষতি কি ?

ক্ষতি ? না, ক্ষতি কিছুই নেই। উমার সমস্ত মুখ হিংসায় কদাকার হয়ে উঠল, বললে, কিন্তু এভাবে আর দুজনকে কি ফাঁকি দেওয়া উচিত ? এতে কি ভাল হবে ?

সুলতার দুই চোখে বিদ্যুৎ জ্বলতে লাগল।

শবযাত্রার সমস্ত আয়োজন তৈরি। চন্দনকাঠের ব্যবস্থাও হয়ে গেছে একরকম। শহরের বিশিষ্ট-ব্যক্তিরা সবাই শবানুগমন করবেন।

ফুল দিয়ে সাজানো হচ্ছে রায় বাহাদুরের দেহ। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দিশী বিলিতী ফুলের আবরণ। প্রশান্ত মুখের ওপর সূর্যের আলো ছড়িয়ে আছে, রুপোর মত জ্বলছে শুভ্র চুলগুলি। জীবনের পরিপূর্ণ তৃপ্তির মাঝখানে রায় বাহাদুর ঘুমিয়ে পড়েছেন। সমস্ত কর্মের অবসান, সমস্ত চাঞ্চল্য আজ নির্বাপিত, এমন কি হৃৎপিণ্ডের দুর্বল আলোড়নটি পর্যন্ত। মৃত্যু নয়, নির্বাণ।

সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়ায় বাতাস ভ'রে উঠছে। সংকীর্তনের দলটা ভাবের ঝোঁকে যেন মাতামাতি করছে একেবারে। মণ্ডলঘাটের শ্মশানে যেতে হবে, অনেকটা পথ। বেলা বাড়ছে, আর দেরি করা চলে না।

লাবণ্যের তাগিদে নীরেন একবার উঠে এল অন্তঃপুরে। রায় বাহাদুরের এই আকস্মিক মৃত্যুটা এখনও সমস্ত শিরা-স্নায়ুর উপর ক্রিয়া করছে তার। মায়ের কথা তার মনে পড়ে না, শৈশব-বাল্যের স্নেহ-বুভুক্ষু মনটা তার তৃপ্তি পেয়েছে বাপের সাহচর্যে। সেই স্নেহ, সেই

ভালবাসার উৎসটা আজ সত্যিই যে বন্ধ হয়ে গেল, বৈজ্ঞানিক নীরেন এখনও যেন সেটাকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

এমন অসময়ে কি প্রয়োজন থাকতে পারে লাবণ্যের? ছেলে-মানুষিরও তো একটা সীমা থাকা দরকার!

কিন্তু লাবণ্য ছেলেমানুষ নয়।

ধারালো ক্ষুরের ফলার মত তার কথাগুলো নীরেনের মোহাচ্ছন্ন মনের ওপর এসে পড়ল, ওদিকে আয়রন-সেফের চাবি নিয়ে ভেতরে কি কাণ্ড হচ্ছে জান?

নির্বোধ বিস্ময়ে নীরেন বললে, না।

তুমি তো কিছু জানবেই না। কিন্তু এঁরা যে সব ভাগাভাগি ক'রে নিচ্ছেন, এখনও কি চোখ বুজেই থাকতে হবে?

নীরেনের সমস্ত মুখ কঠিন হয়ে উঠল পাথরের মত। ঘৃণায় সমস্ত মনটা শিউরে উঠছে, যেন একটা ক্লেদাক্ত সরীসৃপ তার গায়ের ওপর দিয়ে চ'লে গেল কিলবিল ক'রে।

এসব কথা ভাববার এইটেই কি উপযুক্ত সময়? তা ছাড়া তুমি শিক্ষিতা মেয়ে লাবণ্য। লাবণ্যের কণ্ঠস্বরে প্রখর উগ্রতা উঠল পরিস্ফুট হয়ে, বললে, শিক্ষিতা ব'লেই কি ইডিয়ট হতে হবে? এ সব নোংরা আবহাওয়া আর কতদিন স্ট্যাণ্ড করা চলে; চোখে ধুলো দিয়ে সব ঠকিয়ে নেবে, কিন্তু মুখ গুঁজে ব'সে থাকব, কথাটি অবধি কইব না, সেণ্ট পলের মত অমন বিরাট উদারতা আমার নেই।

নীরেনের সর্বাঙ্গে যেন ভয়ঙ্কর একটা ঝড় ভেঙে পড়বার উপক্রম করছে, কঠিন তার হাতের মুঠি। কিন্তু নীরেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী ছাত্র, আর লক্ত-ম্যারেজের স্ত্রী লাবণ্য। জীবনটাও প্রাগৈতিহাসিক রুচিতে আর স্বীকৃত নয়, তাই স্ত্রীর দিকে একটা জলন্ত দৃষ্টিই কেবল ছুঁড়ে দিয়ে নিরুত্তরে বেরিয়ে গেল নীরেন।

সংকীর্তনের প্রবল কোলাহলে আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রে এগিয়ে চলেছে শবযাত্রীর দল। চন্দনের আর ফুলের মালায় সজ্জিত খাট

বাহাদুরের প্রসন্ন মুখশ্রী নিরুদ্বেগ তৃপ্তিতে যেন ঘুমিয়ে আছে। বুকে গীতার ওপর হাত দুখানা একসঙ্গে জড়ো করা, আংটিতে গেরিমাটি-রঙা গোমেদ পাথরের টুকরোটা জ্ব'লে জ্ব'লে উঠছে বিস্মিত জিজ্ঞাসার মত। ধূপের সুগন্ধি ধোঁয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন।

তিস্তার দিক থেকে উঠে এসেছে শনশনে একটা ঠাণ্ডা বাতাস। ক্রিসান্থিমাম, জিনিয়া আর জিরেনিয়ামে সাত রঙের দোলা। শূন্য ডেক-চেয়ারটার পাশে এতক্ষণের অলক্ষিত খবরের কাগজটা সেই বাতাসে খসখস ক'রে উড়ে যাচ্ছে।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

রবার

রবার দেখেছ, ভুল কাটাকুটি যা ঘষিয়া ফেল তুলে,
সে রবার নয়, নয় তা যা থাকে মোটরে ট্রেনে ও ট্রামে,
এ সেই বস্তু—যত টানো বাড়ে, ফুঁয়ে ফেটে যায় ফুলে
কাটিবার আগে কেহ নাহি জানে কখন বৃদ্ধি থামে।
দেখ নাই ? তবে দেখ আমাদের, রবার-ধর্মী মোরা,
যত টানিতেছ তত বাড়িতেছি, কাণ্ড এ অদ্ভুত ;
পাঁচ টাকা চাল চল্লিশ হ'ল ধুতি বারো টাকা জোড়া,
যত বাড়ে টান তত সহি, করি একটু বা খুঁত খুঁত।
চালে ও আটায় তেলে কয়লায় খাবো ও পরিধেয়ে
টানে টানে মোরা বেলুনের মত ফুলিয়া হয়েছি ঢোল,
সুতার বাঁধন কেউ যদি কাটে ফেলিব আকাশ ছেয়ে—
তারপর চিরশান্তিপ্রাপ্তি, বল হরি হরিবোল।
জয়তু রবার, মোদের সবার আমরাই নাহি ক্ষয়,
ফুলিবার মত ফুলেছি—ঘটুক কণ্টক-পরিচয়।

প্রাচীন পারসীক হইতে

১

সেদিন দাঁড়ালে তুমি দর্পণের পাশে,
মুকুরে পড়িল ছায়া, সে এক বিস্ময়!
ধূর্জটির স্বপ্নে-গড়া মানসেতে ভাসে
পদ্ম যেন সহস্রদলের। শূন্যময়
চরাচরে উদ্ভাসিল যেন অকস্মাৎ
সদ্যস্ফুট বিশ্বশতদল। বিধাতার
চিত্তে যেন উদ্বেলিল আদি-ব্যাকুলতা
সৃষ্টির প্রয়াসে। যেন লাবণ্য তোমার
তোমা হতে ভিন্ন হয়ে করে দৃষ্টিপাত
মুখে তব। কি বিস্ময়, পরম মত্ততা!

উত্তর সমুদ্রে কোন্ মেরুর তপন
চেয়ে থাকে আপনার মুগ্ধ ছায়াপানে
সেখানে নাস্তিক ভেদ বাস্তব, স্বপন,
ছায়া সেথা সত্যতর কবিরা তা জানে।

২

তোমার চুম্বন, সখী, পরশমাণিক
লাগায়েছে চক্ষে মোর; তাই দশদিক
বিকাশে প্রণয়-স্বপ্ন কুঙ্কুম-সিন্দূর
বনান্তের পাড়-টানা সুপ্ত দিগ্বধূর
অম্লান ললাটে; মাটির ধরিত্রী এই
অনায়াস কৌতূহলে হ'ল মুহূর্তেই
স্বর্ণমৃগ; অকস্মাৎ গোধূলির চেলি
শর্বরীর বরবরে কে দিল যে মেলি?

পরশ-মাণিক স্পর্শে এ কি হ'ল আজ!
আকাশে ছড়ায় কেন নক্ষত্রের লাজ?
উদয়-সীমান্তে চলে অপ্সরীর দল
মেঘে মেঘে নিঙাড়িয়া সিক্ত চেলাঞ্চল
মানস-পাবন-অঙ্গে। পরশমাণিক
পরশিয়া করেছে মোরে তোমার মানিক।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

"শনিবারের চিঠি", সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

"পঁচিশে বৈশাখ" নানা জায়গায় রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব হয়ে গেল। ঠিকই হয়েছে। মহাপুরুষেরা মরণ-সাগরপারেও অমর; তাঁদের আবির্ভাবের দিনটিই স্মরণীয়; আমাদের দেশের প্রথাও তাই। কিন্তু দুঃখ এই যে, রবীন্দ্র-জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানগুলির অধিকাংশই শুভবুদ্ধির অভাবে সংযম-শালীনতা-বর্জিত; রবীন্দ্রনাথের নামের অন্তরালে অনুষ্ঠাতাদের আপন বা প্রতিষ্ঠানের নামটাকেই বড় ক'রে তোলবার চেষ্টামাত্র। দৃষ্টান্ত দিই।

বেশীর ভাগ উৎসবের বিবরণ খবরের কাগজে যা বেরিয়েছে, তা প'ড়ে দেখা গেল, আমাদের সভাসমিতিতে নতুন একটি পদের সৃষ্টি হয়েছে; সে পদধারীর নাম "প্রধান অতিথি"। রবীন্দ্র-জন্মতিথিতে আবার 'অতিথি' কি? সেই পুণ্যতিথিই তো অতিথি,—অতিথি তো সেদিন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর কোলে। আর রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে তিনি ছাড়া আবার "প্রধান"ই বা কে? বাকী যাঁরা, তাঁর কাছে তাঁরা সবাই তো সমান। আর সবাই সমান যেখানে, সেখানে কোন ব্যক্তিকে বিশেষ পদ-মর্যাদাদানের অর্থই বা কি, সার্থকতাই বা কি? মীরাবাঈ বৃন্দাবনে জীবগোস্বামীর দর্শনপ্রার্থিনী হ'লে গোঁসাইজী বলেন যে, তিনি তো 'প্রকৃতি'র মুখ দেখতে পারেন না। মীরাবাঈয়ের কানে সে কথা গেলে তিনি ব'লে পাঠান, বৃন্দাবনে সবই তো 'প্রকৃতি', 'পুরুষ' তো সেখানে একমাত্র তিনি—শ্রীকৃষ্ণ। রবীন্দ্র-জন্মোৎসবেও সেই কথা খাটে; সেখানে "প্রধান" অপ্রধান নেই,—কেন না তাঁর কাছে তো সবাই সমান;—হোন না কেন "প্রধান অতিথি" স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী-মশাই, কি হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ-মশাই কি শ্রীমান সজনীকান্ত দাস। রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে কবিকে ছাড়া আর কাউকে বিশেষ সম্মান দান নিতান্ত অশোভন ও একান্ত বিসদৃশ এ-কথাটাও কি ব'লে দিতে হবে? এ উৎসব কি একটা ভোজের ব্যাপার যে, একজন "Chief Guest" থাকবেন? আমরা যা কিছু করি তারই মধ্যে বিলাতী কায়দা একটু না ঢোকাতে পারলে সুখ পাই না। রবীন্দ্র-জন্মোৎসবেও কি শেষে তাই হবে?

এবার কবির জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানে সাত-আট জায়গা থেকে নিমন্ত্রণ-পত্র এসেছে। তার মধ্যে অনেকগুলির ন্যাকামির গন্ধে-মেশা আধ-আধ ভাষা বিরবিরা জাগায়। কিন্তু তার চাইতেও বেশী পীড়া দেয়—সব কিছু ছাড়িয়ে, সব কিছু ছাপিয়ে অনুষ্ঠাতাদের আত্মঘোষণা। একটি দৃষ্টান্ত দিই। প্রতিষ্ঠানটির নাম ও স্থান বাদ দিয়ে নিমন্ত্রণ-পত্রটির অবিকল নকল নীচে ক'রে দিলাম। আমন্ত্রণলিপির—

১ম পৃষ্ঠায়—প্রতিষ্ঠানের নাম। তার নীচে অজ্ঞাতনামা একজনের হস্তাক্ষরে লাইন-ব্লকে ছাপা দু'লাইন কবিতা :—

"রৌদ্র চেয়ে তারকিনী অমানিশা বেশি দীপ্তিমতী
নিঃশব্দ শুভ্রতা চেয়ে কালো লেখা ভাস্বর, শাশ্বতী।"

অবশ্য ব'লে দিতে হবে না কাউকে যে এ কবিতা রবীন্দ্রনাথের নয়। দেখা যাচ্ছে অনুষ্ঠাতারা আর যাই করুন, গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজায় বিশ্বাস করেন না।

২য় পৃষ্ঠায়—কালো মোটা বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছে এই নামগুলি—

সভাপতি—শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত

অনুষ্ঠানে মাঙ্গলিক পাঠ—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

উদ্বোধক—শ্রীশিশির ভাদুড়ী

প্রধান অতিথি—শ্রীসজনীকান্ত দাস।

সভায় উপস্থিত থাকবেন—

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবুদ্ধদেব বসু	শ্রীপ্রতিভা বসু
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	শ্রীপ্রবোধ সান্যাল
শ্রীপরিমল দাস	শ্রীনীহাররঞ্জন দাসগুপ্ত
শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য	শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
শ্রীবাণী রায়	কবি গোলাম মোস্তাফা
শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়	মিঃ কে. রায়, আই-সি-এস্।
প্রাক্তন সচিব শ্রীনিকেতন।	সঙ্গীতাংশে—
মিস্ শাহলা খান্	অধ্যাপক—শ্রীসত্যেন চৌধুরী
শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরবীন্দ্রমোহন বসু
শ্রীরূপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	গীতশ্রী—ভাস্বতী চট্টোপাধ্যায়।

অর পৃষ্ঠায়—উপরের নামাবলী যে-হরফে ছাপা হয়েছে, তার চাইতে অনেক ছোট হরফে ছাপা রয়েছে—

১৪ • • • রোড
উ • • •, হ • •—

সুধী,

'চিরনূতনের দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ'

—ঐদিন সপোষ্ঠী যোগদান ক'রে উৎসবকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলুন—এই কামনা করি।

• • সাহিত্যচক্রের পক্ষে
• • • • মুখোপাধ্যায়,
সভাপতি

স্থান—• • •, সিনেমাগৃহ

কাল—সকাল ৯টা (৯ই মে রবিবার)

রূপ—পঁচিশে বোশেখ উৎসব

সভাপতির নামটি ও স্থানটি মোটা কালো হরফে ছাপা হয়েছে, বাকী সব ছোট টাইপে।

সব দেখে শুনে বলতে ইচ্ছে করে, হায় রে! যাঁরা রবীন্দ্রনাথের "পঁচিশে বৈশাখ" (পূরবী) কবিতার দু'লাইন নির্ভুল উদ্ধার করতে পারেন না, তাঁরা করছেন তাঁর জন্মোৎসব।

যাঁদের সভাসৌষ্ঠববর্দ্ধনের জন্য একজন সাহিত্যিক সভাপতিকে দিয়ে কুলোয় না; চাই আবার 'মাঙ্গলিক' পাঠের জন্য একজন সাংবাদিক (যাতে খবরের কাগজে রিপোর্টটা ভাল বের হয়); চাই 'উদ্বোধক' রূপে একজন নট (যাতে থিয়েটার-পাগলা লোকগুলিও জালে ধরা পড়ে), চাই "শনিবারের চিঠি"র সম্পাদককে 'প্রধান অতিথি' রূপে (যাতে দুর্মুখের মুখ বন্ধ হয়),—যাঁদের এত কল-কিকির, তাঁদের রবীন্দ্র-জন্মোৎসবকে একটা হুজুগ ছাড়া আর কি বলব?

যাঁদের রবীন্দ্র-জন্মোৎসব-সভায় লোক আকর্ষণের জন্য কারা কারা সেখানে উপস্থিত থাকবেন, ছাপতে হয় তাঁদেরও নাম—এই এক নতুন কায়দা দেখলাম—তাঁরা করছেন কবির প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন! আর সেই 'লিষ্টি'র মধ্যে নেই কে? একজন জজ-ব্যারিষ্টার 'আই-সি-এস' আছেন; "কবিতা"র সম্পাদক আছেন; তাঁর পরম সুহৃৎ "শনিবারের চিঠি"র কর্তা তো 'প্রধান' হয়েই আছেন (তবু কিন্তু বুদ্ধদেব বসু সস্ত্রীক সভা থেকে উঠে আসেন নি!); হিন্দু আছেন, মুসলমান আছেন, এমন কি জেনানাও আছেন। বিজ্ঞাপনপত্রে সব কিছুই আছে, কিন্তু যাঁর জন্মতিথি-উৎসব তিনি কোথায় খুঁজে বার করুন তো! তিনি ঐ তৃতীয় পৃষ্ঠার এক কোণে কোন রকমে স্থান পেয়েছেন—আপন কবিতার ছন্দ-পতিত দুর্দশায় নিতান্ত ম্রিয়মাণ অবস্থায়।

সম্পাদক-মশায়, রবীন্দ্র-জন্মোৎসব কি শেষে স্কুল-কলেজের ছেলেদের সরস্বতী-পূজায় সামিল হবে? এবং ভবদীয় "প্রধান-আতিথ্যে"?

২৬শে বৈশাখ, ১৩৫০ — অমল হোম

[মহামান্য জুলিয়াস সীজারকে মহামতি ব্রুটাস যখন আঘাত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মুখচ্ছবি কিরূপ হইয়াছিল, কোনও শিল্পী তাহা চিত্রবদ্ধ করেন নাই, শুধু সীজারের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "তুমিও ব্রুটাস" আর্তনাদ আজও স্মরণীয় হইয়া আছে। শ্রীযুক্ত অমল হোম নূতন করিয়া সেই আর্তনাদের সুযোগ এই পত্রাঘাতের দ্বারা কাহাকেও কাহাকেও দিলেন। আমাদের অপরাধ অজ্ঞানকৃত, অপরের চক্র ও চক্রান্ত প্রসূত, সুতরাং আমরা ক্ষমার্হ। অমলবাবু বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের প্রবাদ-খ্যাত বহুভাতারী নারীদের মত সভাপতিদের যে লজ্জা দিতে পারিয়াছেন, ইহাতেই আমরা কৌতুক বোধ করিয়াছি। বৃহত্তর মাপে জন্মের আরতির প্রথম সূচনা হয় বাংলা দেশে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে—রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে, সেই ব্যাপারে হোম-মহাশয়ই কর্ণধার ছিলেন; তাহার পর হইতে আজ পর্যন্ত তাঁহারই পন্থা অনুসরণ করিয়া যাহা ঘটিয়াছে, তাহার বিচার একমাত্র তিনিই করিতে পারেন।—স. শ. চি.]

মায়া

নিতাই আমাদের ভীষণ ঠকাইয়াছে। শত্রুর মুখে ছাই দিয়া আমরা তার বন্ধুবান্ধব কম ছিলাম না। একদিন হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর হইয়া সকলের সঙ্গই সে ত্যাগ করিল। আমরা নাকি ভয়ানক বাজে কথা বলি আর অকারণ পরচর্চা করি, এই তার অভিযোগ। আমাদের সাহচর্য্যে তার নাকি উন্নতি হইবার কোন আশা নাই।

বুঝিতে কষ্ট হইল না যে সে নারীবন্ধু পাইয়াছে, তাই পুরুষের সান্নিধ্য আর তাঁর ভাল লাগিতেছে না। নারীঘটিত ব্যাপার আমাদেরও ছিল, তবে তা অভিজাত নয়, এই যা।

তার প্রেমে পড়িবার লক্ষণ আমরা আবিষ্কার করিলাম, যখন কলেজ ষ্ট্রীটে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে একটি কুমারী মেয়ের পশ্চাতে তাহাকে ট্রামে উঠিতে দেখা গেল। এস্‌প্ল্যানেডে নামিয়া দুজনেই বালিগঞ্জের ট্রাম ধরিল।

আর একবার উদয়শঙ্করের নৃত্যে তার বাঁদিকে যে সুন্দরী মেয়েটি বসিয়াছিল শ্যামল দেখিয়াছে, সে আমাদের দেখা পূর্ব্বের মেয়েটি না হইয়া যায় না, বিবরণ শুনিয়াই বোঝা গেল।

পরে ওয়েলিংটনের প্রদর্শনীতে বেনারসী-পরা যে বধূটিকে তাহারই সঙ্গে সঙ্গে স্টলে ঘুরিতে দেখিল অনাদি, সে যে তাহারই পরিণীতা সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি থাকিতে পারে?

শুনিয়া আমরা প্রত্যেকেই দুঃখিত হইলাম দুইটি কারণে, আমাদের না জানাইয়া বিবাহ করা, এবং নিতাইয়ের বধূ সুন্দরী ও বিদুষী হওয়া।

মেয়েটি যে ধনীর কন্যা এ সংবাদ আনিল সুরজিৎ এক "ইন আউট" লেখা প্রাসাদোপম সৌধের ভিতরে তাহাদের মোটর ঢুকিতে দেখিয়া।

—নিতাইয়ের স্ত্রীকে আমার দেখিবার প্রবল বাসনা চরিতার্থ হইল চিত্রার এক শো'র পরে অগ্রপশ্চাৎ মানিকজোড়কে দেখিয়া। নিতাই কথা না বলাতে আমি ইন্‌ট্রোডিউস্‌ড হইতে পারিলাম না।

এক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও নিতাই আবার বিবাহ করিয়াছে, তা জানিতে

আমাদের দেখা হইল না, একটি পল্লীবাসিনীর সঙ্গে তাহার ভাবকেন্দ্র ভ্রমণের প্রবাহে।

দুই স্ত্রী লইয়া গৃহবিবাদের ইতিহাসও পাইলাম তাহারই এক প্রতিবেশীর কাছ হইতে।

সন্তান না হওয়াতে তার একটি ছেলেকে সে পোষ্য লইয়াছে, বছর আটেক বাদে এ তথ্যও পৌঁছিল।

কিন্তু কাল নিতাইকে সপ্তপদীতে ফিরিতে সে বলিল, আজও অবিবাহিতই আছে এবং আমরা যা কিছু সে... শুনিয়াছি কিছু অজানা মেয়েদের আকস্মিক সান্নিধ্যবশত, কিছু আত্মীয়া-এসকর্টিং-প্রসূত মায়াবাদের ফল।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

হও দীপান্বিতা

অনশনক্লিষ্ট তনু বিবর্ণ পাণ্ডুর,
লাবণ্য মুছিয়া গেছে লোল নিষ্পেষণে,
অবলুপ্ত রক্তিমাভা পক্ক বিম্বাধরে,
সুজলা সুফলা নহ, শ্যাম-বিনম্রতা
উঠিয়াছে রুক্ষ হয়ে ঊষর মরুর
রূঢ় স্পর্শে; অন্ধকার নেমেছে গগনে;
পান করি তপ্ত রক্ত, এতদিন পরে
হ'লে আজ ছিন্নমস্তা, আঘাত-বিক্ষতা।

একদিন ছিলে তুমি ভুবনমোহিনী,
রূপে নিরুপমা, আজ ক্ষীণা জরতী;
আসন্ন প্রলয়ক্ষণে কনক-কিঙ্কিণী
বাজে তব, রুদ্ররবে, প্রকম্পিত করি
দশ দিক ক্ষণে ক্ষণে; জ্বলিয়াছে চিতা;
সার্থক আলোকে তুমি হও দীপান্বিতা।

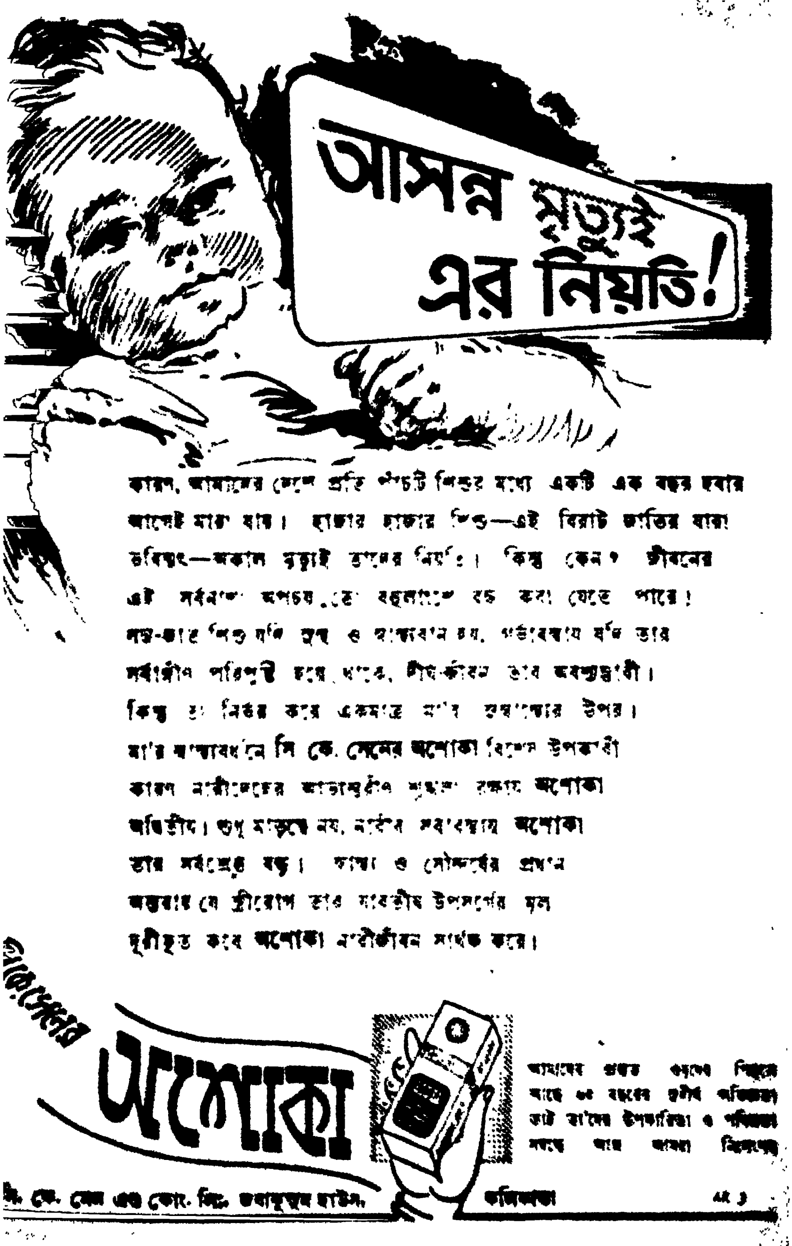
শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়


রঙীন পাড়ের অবস্থা সঙ্গীন
মহালক্ষ্মী
কটন মিলস লিমিটেড

সূচী

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫০


গিনি স্বর্ণের
হালফ্যাসনের অলঙ্কার
এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স


আসন্ন মৃত্যুই
এর নিয়তি!
কারণ, আমাদের দেশে প্রতি পাঁচটি শিশুর মধ্যে একটি এক বছর হবার আগেই মারা যায়। হাজার হাজার শিশু—এই বিরাট জাতির যারা ভবিষ্যৎ—অকাল মৃত্যুই তাদের নিয়তি। কিন্তু কেন? জীবনের এই সর্বনাশা অপচয় তো বহুলাংশে বন্ধ করা যেতে পারে!
সদ্য-জাত শিশু যদি সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান হয়, শৈশবাবস্থায় যদি তার সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি হয়ে থাকে, দীর্ঘ-জীবন তার অবশ্যম্ভাবী।
কিন্তু তা নির্ভর করে একমাত্র মা'র সুস্বাস্থ্যের উপর।
মা'র স্বাস্থ্যবর্ধনে সি. কে. সেনের অশোকা বিশেষ উপকারী
কারণ নারীদেহের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষায় অশোকা অদ্বিতীয়। শুধু মাতৃত্বে নয়, নারীর সর্বাবস্থায় অশোকা তার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের প্রধান অন্তরায় যে স্ত্রীরোগ তার যাবতীয় উপসর্গের মূল দূরীভূত করে অশোকা নারীজীবন সার্থক করে।
সি.কে.সেনের
অশোকা
আমাদের প্রস্তুত ঔষধের পিছনে আছে ৬৮ বছরের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাই তাদের উপকারিতা ও পবিত্রতা সম্বন্ধে আর কথা নিষ্প্রয়োজন
সি. কে. সেন এণ্ড কোং. লিঃ. জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা


ণে-গন্ধে অতুলনীয়
বাথগেটের সুবাসিত
ক্যাষ্টর অয়েল
আপনার
পিতামহ ও পিতাম
এই কেশ তৈলই
ব্যবহার করিতে
নকল হইতে সাবধান
Bathgate & Co
CHEMISTS
CALCUTT


চায়ের কথা
ব্রুক বণ্ড



ভারতীয় চায়ের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট
LIPTONS
TEA
লিপ্টনের
জাকুজা হোয়াইট্ লেবেল
এবং টি গার্ল চা

। শনিবারের চিঠি
১৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০

কবি-পূজা

আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। মহাপুরুষের জন্মদিনে যেরূপ পূজা প্রার্থনা উৎসব আদি করিতে হয়, দেশের এই ভীষণ দুর্দিনে তাহা উপযুক্তরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়; তথাপি বাহ্যিক অনুষ্ঠানের আড়ম্বরে প্রয়োজন কি? অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে পারিলেই আমাদের কল্যাণ হইবে, আমাদের চিত্ত কিছুক্ষণের জন্য মালিন্যমুক্ত হইয়া আনন্দ ও অভয়-আশ্বাসে পূর্ণ হইবে, মহাপুরুষের মহান্ আত্মার সহিত যোগ স্থাপন করিয়া আমরা এই ঘোর অন্ধকারেও একটু আলোক দেখিতে পাইব। আজ এই উপলক্ষ্যে সমগ্র বাঙালী জাতির হইয়া আমরা রবীন্দ্রনাথকে ভগবানের আশীর্ব্বাদরূপে আমাদের অন্তরে স্মরণ ও বরণ করিব।

কবির জন্মদিনই আছে, মৃত্যুদিন নাই। অপর সকল মহাপুরুষের আত্মা অমর হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকে—কিন্তু কবির শুধুই আত্মা নয়, দেহও অমর হইয়া জাতির প্রত্যক্ষগোচরে বিরাজ করে। কারণ কাব্যই কবির দেহ, কবির প্রাণ ও মনের মূর্ত্তিটি কাব্যের মধ্যে নিখুঁতভাবে প্রকাশ পায়, কণ্ঠস্বরটি পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব আমরা আজ মনে করিব না যে, রবীন্দ্রনাথ গত হইয়াছেন, আমরা প্রত্যক্ষভাবেই তাঁহার অর্চ্চনা করিব, তাঁহার সেই মূর্ত্তি বেড়িয়া বেড়িয়া কীর্ত্তন ও প্রদক্ষিণ করিব।

কিন্তু কবিকে শুধুই স্মরণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা অর্চ্চনা করিলে চলিবে না, কবির সেই কাব্যশরীরে যে আত্মার প্রকাশ হইয়াছে, সেই আত্মাটিকে উত্তমরূপে দর্শন করিয়া তাঁহার সেই বাণীকে আমাদের সাধনায় সফল করিয়া তুলিতে হইবে। জাতির আত্মোপলব্ধির যে সকল উপায় আছে, তাহার মধ্যে কবিগণের যে মন্ত্রদৃষ্টি যুগে যুগে সাহিত্যে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে তাহাই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভারতীয় হিন্দু জাতির সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত ও পুষ্ট করিয়াছে বাল্মীকি ও ব্যাসের

মহাকাব্য, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য। যাঁহারা বেদ রচনা করিয়াছিলেন তাঁহারাও কবি ছিলেন—কবি নামটি একটি বড় নাম। পদ্য রচনা করিতে পারিলেই কবি হয় না; যে দৃষ্টির সাহায্যে জীবন ও জগতের রহস্য মনুষ্যজাতির হৃদয়ে উদ্‌ঘাটিত হয়, সেই দৃষ্টিই কবি-প্রতিভা। যাহা কিছু দেখিতেছি তাহার অন্তরালে যে আর একটা মহান্ সত্তা সুন্দর ও সত্যরূপে অবস্থান করিতেছে তাহার সংবাদ কবিরাই তাঁহাদের দিব্য অনুভূতির বলে প্রকাশিত করিয়া থাকেন, আর কেহ তেমন পারেন না। মনের কথা, প্রাণের কথা, আত্মার কথা কবিই—যাঁহার যেমন দৃষ্টি তিনি তেমন ভাবে আমাদের হৃদয়-গোচর করিয়া আমাদিগকে দিব্যচক্ষু দান করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথের মত কবি আমাদের দেশে অল্পই জন্মিয়াছেন, সমগ্র বাঙালী জাতির কাব্যচেতনা যেন তাঁহার মধ্যেই চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। অতএব রবীন্দ্রনাথকে উত্তমরূপে জানিতে পারিলে আমাদের জাতিগত প্রতিভার গূঢ়তম প্রবৃত্তি ও তাহার সীমা আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিব; এবং এ জাতির মনোজীবনের ভবিষ্যৎ বিকাশধারায় সেই জ্ঞান অনেক পরিমাণে সাহায্য করিবে। আজ আমি এই বিষয়ে অতি সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা মাত্র বলিব; আশা করি, আপনারা তাহা প্রণিধান করিবেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি কথা আমাদের মনে প্রায়ই উদয় হয়। রবীন্দ্র-প্রতিভা কি একটা যুগের শেষ পরিণাম? অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনে যে সাধনা ও সিদ্ধিলাভ আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার যাবতীয় রচনায় যে একটি বিশেষ ভাবাদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা কি কেবল ঐ যুগের সত্য এবং তাহারই পূর্ণপ্রকাশ? সে যুগের পূর্ব্বে আমাদের দেশে এমন দৃষ্টি কাহারও ছিল না, অথবা পরেও কাহারও ঘটিবে না? তাঁহার বাণী কি সত্য সত্যই অতিশয় স্বতন্ত্র? রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যজীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছিলেন, তাঁহার ভাবচিন্তার সেই বিশ্বজনীনতা এবং সেই অতি উচ্চ আদর্শবাদ কি তাঁহার নিজেরই কল্পনার ফল? যদি তাহাই হয় তবে সন্দেহ হইতে পারে যে, তাহা কেবল কাব্যসৃষ্টিতেই অপূর্ব্ব হইয়া আছে ও থাকিবে, ব্যবহারিক জীবনে

কোন কালেই তাহা সত্য হইতে পারিবে না। কারণ, আমরা এ কথা জানি যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা একটা অতি সূক্ষ্ম স্বপ্নসৌন্দর্য্যের আকুলতা সৃষ্টি করে—মন মুগ্ধ হয়, তাঁহার সেই ভাষার অক্ষরগুলিতে পর্য্যন্ত যেন একটি মোহিনী শক্তির আকর্ষণ আছে। সে কাব্য পাঠ করিয়া আমরা অতি উচ্চভাবের রসাবেশে বিহ্বল হই—খুব বড় একটা কিছুর প্রেরণা অনুভব করি; কিন্তু বাস্তব জীবনের বাস্তব সমস্যার মীমাংসা যে উপায়ে যে বুদ্ধির দ্বারা আমরা করিয়া থাকি, তাহার সহিত উহার যেন কোন সম্পর্ক নাই। কবি যে আদর্শ-সত্য ও আদর্শ-সুন্দরের গান আমাদিগকে নিরন্তর শুনাইয়া থাকেন, তাহার মহত্ত্ব আমরা স্বীকার করি; কিন্তু যে জীবনে তাহাকে সত্য করিয়া তোলা সম্ভব, সে জীবন আমাদের পক্ষে দুর্লভ—এখন তো নহেই, ভবিষ্যতেও কখনও সেই জীবন যাপন করা সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ। তবে কি রবীন্দ্রনাথের বাণী কেবল মনকেই মুগ্ধ করে—বক্ষে বাহুতে শক্তি সঞ্চার করে না? এমন কথা মনে হইতে পারে বটে। রবীন্দ্রনাথ এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদেরই কবি, যাঁহারা অতি শৌখিন মনোবিলাসী—রবীন্দ্রনাথের গান তাঁহাদেরই প্রাণ স্পর্শ করে, যাঁহারা সূক্ষ্ম কাব্যরসের চর্চ্চা করিয়া থাকেন; সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী রেডিও-যোগে যে ধরনের গান শুনিয়া পুলকিত হয়, তাহাতে অনুভূতির সেই সূক্ষ্মতা, ভাবের সেই অপার্থিব মনোহারিতা নাই। এমন কি, সম্প্রতি রবীন্দ্রকাব্য-প্রীতি যে সমাজে সহজেই সংক্রামিত হইতে দেখা যায়, সেই সমাজও সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজ নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-রাশি এবং নানা তত্ত্ব ও ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ ছাড়িয়া দিলেও দেখা যাইবে যে, তাঁহার গল্প-উপন্যাসও সাধারণ পাঠককে ততটা মুগ্ধ করে না, যতটা পরবর্ত্তী লেখকগণের উপন্যাস করিয়া থাকে। ইহার একটা কারণ অবশ্য এই যে, প্রত্যেক যুগেরই একটা নিজস্ব রুচি আছে। সাধারণ পাঠক-সমাজ তাহাদের সমসাময়িক লেখকের প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট হয়, রবীন্দ্রনাথ শেষের দিকে আর সমসাময়িক ছিলেন না। তথাপি 'গল্পগুচ্ছ', 'চোখের বালি' 'নৌকাডুবি'র পাঠক কোন কালেই অল্প হইবার কথা নয়; অথচ আমার যতদূর স্মরণ হয়, সমসাময়িক কালেও

ঐগুলির তেমন জনপ্রিয়তা ছিল না, একটি বিশিষ্ট পাঠকমণ্ডলীই সেগুলির রসাস্বাদন করিয়া চরিতার্থ হইতেন। এ সকল হইতে মনে হইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ একটা বিশিষ্ট কালের বিশিষ্ট কবি, এবং তাঁহার সেই অসাধারণ কবি-প্রতিভা আমাদের জাতির ও সাহিত্যের একটা মহা গৌরব হইলেও, রবীন্দ্রনাথের যুগও যেমন শেষ হইয়াছে, তেমনই সেই অতি উচ্চ আদর্শবাদ ও অতি সূক্ষ্ম কাব্যকলার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আমাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গী নয়—তাহাকে আমরা সাহিত্যের মণিকোঠার রত্নখচিত কৌটায় সযত্নে রাখিয়া দিব, এবং অবসরকালে মধ্যে মধ্যে সেই কৌটা খুলিয়া তাহার সেই মহার্ঘতায় মুগ্ধ হইব এবং গর্ব্ববোধ করিব। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে আমাদের পক্ষে তাহার মত দুর্ভাগ্য আর কিছু নাই।

আসল কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথ একটা সনাতন সত্যকেই যুগ-চেতনার উৎকৃষ্ট ভাষায় ও ভঙ্গিতে তাঁহার কাব্যে রূপ দিয়াছিলেন, একটি পরম সত্যকে সকল বাস্তবতার ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনি মানবাত্মার উচ্চাধিকার কিছুতেই ক্ষুণ্ণ করিতে চাহেন নাই। আমরা যেখানে নানা দৈহিক ও মানসিক বাধা ও বন্ধনের সহিত সন্ধি করিয়া চলিতে চাই, রবীন্দ্রনাথ সেখানে তাহা করিতে প্রস্তুত নহেন। মানুষ তাহার ভাবনা-কামনার—তাহার সর্ব্ববিধ সাধনার—যাহা পরম শ্রেয়ঃ ও সত্য তাহাকেই মানিবে—প্রকৃতির পারবশ্য স্বীকার করিয়া পুরুষ কিছুতেই আত্মভ্রষ্ট হইবে না, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে সর্ব্বত্র একটা অত্যুচ্চ আদর্শ শুধুই প্রচার করেন নাই, সেই আদর্শকে অতিশয় সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ মানুষের দুর্ব্বলতাকে অতি গভীর সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিলেও তাঁহার মানব-প্রেম কখনও মানুষের ক্ষুদ্রতা, দুর্ব্বলতা বা অধঃপতনকে দোষমুক্ত করিতে চায় নাই; মানুষ যত ক্ষুদ্র হউক, সে যতই দরিদ্র বা অশিক্ষিত হউক, তাহার মধ্যেও যে মানবাত্মা আছে, তিনি তাহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়াছেন; কিন্তু গল্পে, কবিতায়, প্রবন্ধে ও উপন্যাসে তিনি কোথাও

মানুষের গ্লানি বা চরিত্রহীনতাকে বড় করিয়া চিত্রিত করেন নাই, বরং অতিশয় তুচ্ছ জীবনের মধ্যেও তিনি সত্য ও সৌন্দর্য্যই আবিষ্কার করিয়াছেন। এ যুগের এই অধর্ম ও অন্যায়, অশক্তি ও অপ্রেমের বাস্তব দৌরাত্ম্যও তাঁহাকে কিছুমাত্র সংশয়াচ্ছন্ন করিতে পারে নাই—তিনি সকল অনাচার-অবিচারের ঊর্দ্ধে মানুষের আত্মাকে উদ্বোধন করিয়াছেন—সত্য ও সুন্দরের আদর্শটিকে সর্ব্বদা সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন, কারণ তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মানুষের আত্মার পরাজয় হইতে পারে না। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, রবীন্দ্রনাথ কোন একটা যুগের বিশিষ্ট যুগধর্ম্মকে গ্রাহ্য করেন নাই—দেশ ও কালগত ইতিহাসকেই মানুষের একমাত্র পরিচয় বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। এই যে মনোভাব—এই যে শাশ্বত সত্যের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা—ইহাই ভারতবর্ষের সনাতন শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভায় সেই ভারতীয়-আত্মদর্শনের মূল তত্ত্বটি মানুষের জীবনের সত্যরূপে ধরা দিয়াছিল—রবীন্দ্রনাথ সেই আত্মা ভিন্ন আর কিছুকেই বিশ্বাস করেন নাই। আমরা সেই দিব্য-দৃষ্টির অধিকারী নই বলিয়া আমাদের মনে হয়—রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম একটা উৎকৃষ্ট কবিধর্ম্ম মাত্র, বাস্তবজগৎ ও বাস্তবজীবনের সহিত তাহার সম্পর্ক তেমন দৃঢ় নয়, এবং রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে একটা উচ্চ ভাবস্বর্গে আরোহণ করিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন মাত্র—সে স্বর্গে বেশিক্ষণ বাস করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। কথাটা বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের মত মানুষের পক্ষে সত্য বটে, কিন্তু চিরযুগের চিরন্তন মানুষের পক্ষে তাহা সত্য নয়। ইহা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ যেখানে বসিয়া গান গাহিয়াছেন তাহা আমাদের এই জগতের অনেক ঊর্দ্ধে—আমরা যেমন বদ্ধ, তিনি ছিলেন তেমনই মুক্ত—তাঁহার আত্মিক শক্তি আমাদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। ঠিক সেই কারণেই তিনি সত্যকার কবি, এবং এত বড় কবি। যাহা আমরা দেখি না তিনি তাহা দেখিয়াছিলেন, যাহা আমরা ভাবি না তিনি তাহা ভাবিয়াছিলেন। যে আশা আমরা করি না তিনি তাহা করিতেন, আমাদের যাহা অন্ধকার রাত্রি, তাঁহার নিকটে তাহাই ছিল রৌদ্র

দিবালোক। সেই দৃষ্টিই তো সত্যকার কবিদৃষ্টি। যুগে যুগে এই দৃষ্টির দ্বারাই কবিগণ মানুষের চৈতন্যকে প্রবুদ্ধ করেন, কবিই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, আমরা মরি নাই ও মরিব না। সকলেই যদি বাস্তবকে ও যুগধর্ম্মকেই সত্য মনে করিয়া মোহগ্রস্ত হয়, তবে আমরা চাহিব কাহার দিকে? কাহার কণ্ঠের আশ্বাসবাণী শুনিয়া আমরা উদ্ধারের আশা করিব? কবিই বার বার ডাকিয়া বলেন "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—আমি অন্ধকারের পারে সেই হিরণ্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে দেখিয়াছি—তোমরা মৃত্যুভয় করিও না, তোমরা সকলেই অমৃতের পুত্র"। গীতার একটি শ্লোকে এই পুরুষকেই কবি বলা হইয়াছে, যথা—

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

অতএব, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রেরণা শ্রেষ্ঠ প্রেরণাই বটে; এবং তিনি যে কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা বাস্তবানুগামী নয় বলিয়াই আর এক অর্থে মহামূল্যবান।

রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা আমরা সকলেই মুগ্ধ হইয়া পাঠ করি, কিন্তু তাহার মধ্যে কবিমানসের যে গভীর রহস্য রহিয়াছে তাহা বুঝিবার অবসর আমাদের হয় না। এমন বিচিত্র ও অফুরন্ত রস, এমন অবারিত ছন্দ ও সুর, এমন সৌন্দর্য্য-কল্পনা ও ভাবসৌকুমার্য্য, এমন আনন্দ তাঁহার কাব্যে অজস্র ধারায় প্রবাহিত হয় কেমন করিয়া? ইহার একমাত্র উত্তর, রবীন্দ্রনাথের মন ছিল মুক্ত, সকল সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া আপনার আত্মাকে তিনি দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এমন নির্ভয়ে আপন আনন্দকে তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দিতে পারিতেন। মুক্ত আত্মার স্বভাবই আনন্দ; যেখানে একটু পীড়া বা বেদনা তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিত, সেইখানেই তিনি আত্মার সেই আনন্দকে ছন্দে ও সুরে উৎসারিত করিয়া আশ্বস্ত হইতেন। দেশের অবস্থা, জাতির দুঃখ-দুর্দ্দশা তাঁহাকে কম অভিভূত করিত না, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই তিনি স্মরণ করিতেন, মানুষের আত্মা এ-সকলের ঊর্দ্ধে। ইংরেজ কবি যেখানে বলিতেছেন, "Man has but to

will it and there shall be no evil in the world," সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলিতেন, মানুষ যদি আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করে তবে তাহার কোন ভয় কোন দুঃখই থাকিবে না। ইহাকেই আমি ভারতীয় 'আত্মদর্শন' বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ সেই দর্শনকে কাব্যে রূপান্তরিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, রবীন্দ্রকাব্যের কাব্যরস উপলব্ধি করিতে হইলে, সর্ব্বদা ইহাই স্মরণ রাখা আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিব, তাহা হয়তো সকলে জানিলেও ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখেন না। আমাদের দেশে, এ কালের এই সমাজে—যে সমাজে মানুষ দীর্ঘ দাসত্বের ফলে প্রায় মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে—সেই দেশের সেই সমাজে, এতবড় একজন কবির অভ্যুদয় কেমন করিয়া সম্ভব হইল? রবীন্দ্রনাথ যে বংশে যে ঘরে জন্মিয়াছিলেন, শৈশব ও বাল্য হইতেই যে সকল প্রভাবের মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছেন, তাঁহার কবি-মন যেভাবে লালিত ও পুষ্ট হইয়াছিল, দেশের ও বিদেশের বড় বড় গুণীব্যক্তির সাহচর্য্য তিনি যেরূপ লাভ করিয়াছিলেন—সর্ব্বপ্রকার আভিজাত্য তাঁহার হৃদয়-মনকে যেভাবে পুষ্ট করিয়াছিল, তাহা ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, এ প্রতিভার বিকাশে বিধাতা সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। এ যেন মাটি জল আলো বাতাস—সকলই অনুকূল, এবং সেই অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথ নামক একটি মনুষ্য-ফুলকে সহস্রদলে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য। এমন আয়োজন আর কখনও হয় নাই এবং হইবেও না। শুধুই অলোকসামান্য প্রতিভার বীজটিই নয়, তাহাকে প্রস্ফুটিত ও পূর্ণবিকশিত করিবার জন্য এ যেন এক মহাশিল্পীর একান্ত সাধনা। বিশ্বকর্ম্মা বিধাতার যেন হঠাৎ একটা খেয়াল হইয়াছিল যে, তিনি মানুষের হৃদয় ও মন লইয়া একটি অপূর্ব্ব কারুসামগ্রী নির্ম্মাণ করিবেন, ঠিক যেমনটি তিনি আগে কখনও করেন নাই। সাহিত্যের ইতিহাসে দেশে দেশে ও কালে কালে অনেক কবির উদয় হইয়াছে—শ্রেষ্ঠ কবির আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু কবির জীবন-গঠনে বিধাতার এমন নিপুণতা এমন সতর্কতা বোধ হয় আর কোথাও দেখা যায় নাই।

আবার এ কবির ভাবজীবনে দুই বিপরীত ভাবধারার মিলন ঘটিয়াছে ; শুধুই প্রাচীন ও আধুনিক নয়—ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ও য়ুরোপীয় প্রকৃতিবাদ এই দুইয়ের গঙ্গাযমুনা সঙ্গম হইয়াছে ; এমনটি পৃথিবীর আর কোন কবির জীবনে এ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মানবীয় ভাবসাধনার একটি পূর্ণতর অভিব্যক্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ হেন কবির জন্মস্থান হইল ভারতবর্ষ, আবার শুধুই ভারতবর্ষ নয়—বাংলার জল মাটি দিয়া তাঁহার দেহ নির্মাণ হইল। ইহারও একটা অর্থ নিশ্চয় আছে—সেই অর্থ চিন্তা করিয়া আমরা যদি একটু গর্ব অনুভব করি, তাহা হইলে আশা করি, দুর্বল মানুষের পক্ষে তাহা গর্হিত হইবে না। কিন্তু ইহাও স্মরণ করিতেছি যে, এমনটি আর হইবে না—হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই হইবে না। তাই রবীন্দ্রনাথ ভারতের কবি ও চিরযুগের কবি বলিয়া পূর্বে যে মন্তব্য করিয়াছি, তাহা সত্ত্বেও বলিতে হয়, যে দেশেরই হউক, যে যুগেরই হউক, রবীন্দ্রনাথের মত কবি বিধাতার এক আশ্চর্য কীর্তি—অতিশয় স্বতন্ত্র ও তুলনাহীন। এজন্য রবীন্দ্রনাথকে একটু পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে, তাঁহার কাব্যকে একটা পৃথক মূল্য দিতে হইবে।

আজ আর বেশি কিছু বলিবার অবসর নাই। আমি শেষে কেবল একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, তিনি এতই ঊর্ধ্বে অবস্থান করিতেছেন যে, আমাদের এই মর্ত্যজীবনে বাস্তব সুখদুঃখের মধ্যে তাঁহাকে পাইবার উপায় নাই। কবি যতই ঊর্ধ্বে উঠিয়া গান করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত তিনি তো জীবনেরই ব্যাখ্যাকার, ইংরেজ সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড এই ব্যাখ্যাকেই 'criticism of life' বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিও যে জীবনকে অতিক্রম করে নাই, বরং জীবনের গভীরতম তলদেশে সে দৃষ্টি প্রবেশ করিতে পারিত, তাহার অজস্র প্রমাণ তাঁহার রচনারাশির মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। কবির কবিত্বের একটা খুব বড় প্রমাণ এই যে, কবি এমন সকল উক্তি করেন যাহা সাংসারিক বা ব্যক্তিক জীবনে বার বার সত্য হইয়া উঠে—সুখে-দুঃখে,

সম্পদে-বিপদে আমরা সেই সকল উক্তির যাথার্থ্য অনুভব করিয়া চমকিত হই, মনে হয়, যেন কবি এইক্ষণে আমাদের সঙ্গেই রহিয়াছেন—ঠিক এই দুঃখ বা এই সুখ যেন তিনি আমাদের মতই ভোগ করিতেছেন, এবং তাহারই সাক্ষাৎ আবেগে তিনি সেই উক্তি করিতেছেন। অর্থাৎ, বড় কবিরা prophet বা দ্রষ্টা—তাঁহাদের উক্তির মধ্যে মনুষ্যজীবন-নাট্যের এমন সব ভাব-গম্ভীর ঘটনা বাণীময়ে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে—যাহা চিরদিনের সত্য—মানুষের বা জাতির জীবনে বার বার ঘটিয়া থাকে। ইহাও কবির সেই দিব্যদৃষ্টির একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এইরূপ একটি প্রমাণ আমি এইখানে উদ্ধৃত করিব। আজ মহাকালের যে মূর্ত্তি আমাদিগকে ভীত-ত্রস্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে—যে ঘোর অন্ধকার চারিদিকে ঘেরিয়া আসিতেছে, তাহার মত বাস্তব আর কি হইতে পারে? রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় ঠিক এই বাস্তব অবস্থার যে ভাব-রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে—তাহাতে মনে হইবে, কবি যেন ঠিক এই মুহূর্ত্তে এখনই এই গান গাহিয়া উঠিলেন—অথচ এই কবিতায় যে অবস্থার বর্ণনা রহিয়াছে, তাহার এমন তীব্র অনুভূতি ইতিপূর্ব্বে আমাদের জীবনে ঘটিবার কারণ ছিল না। কিন্তু আজ যখন সেই কবিতাটি পাঠ করি, তখন মনে হয়, কবি যেন এইক্ষণে আমাদেরই কণ্ঠের রুদ্ধ আর্ত্তধ্বনিকে এক দিব্যসঙ্গীতে উৎসারিত করিয়া দিলেন—

আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে, ওগো
দিক্‌দিগন্ত ঢাকি'!—
আজিকে আমরা কাঁদিয়া শুধাই সঘনে ওগো,
আমরা খাঁচার পাখী;—
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি কি আসিল প্রলয় রাত্রি ঘোর?
চিরদিবসের আলোক গেল কি মুছিয়া?
চিরদিবসের আশ্বাস গেল ঘুচিয়া?
দেবতার কৃপা আকাশের তলে
কোথা কিছু নাহি বাকি?—
তোমাপানে চাই, কাঁদিয়া শুধাই
আমরা খাঁচার পাখী।

আজি দেখ ওই পূর্ব্ব অচলে চাহিয়া, হোথা
কিছুই না যায় দেখা,—
আজি কোন দিকে তিমিরপ্রান্ত দাহিয়া, হোথা
পড়ে নি সোনার রেখা।
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি শৃঙ্খল বাজে অতি সুকঠোর।
আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহি রে,
কার সন্ধান করি অন্তরে-বাহিরে!
মরীচিকা ল'য়ে জুড়াব নয়ন
আপনারে দিব ফাঁকি
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজি
আমরা খাঁচার পাখী!
ওগো আমাদের এই ভয়াতুর বেদনা যেন
তোমারে না দেয় ব্যথা!
পিঞ্জর দ্বারে বসিয়া তুমিও কেঁদ না যেন
ল'য়ে বৃথা আকুলতা!
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর।
তোমার চরণে নাহি তো লৌহডোর!
সকল মেঘের ঊর্দ্ধে যাও গো উড়িয়া,
সেথা ঢাল তান বিমল শূন্য জুড়িয়া,—
"নেবে নি, নেবে নি প্রভাতের রবি"
কহ আমাদের ডাকি',
মুদিয়া নয়ান শুনি সেই গান
আমরা খাঁচার পাখী।

এই গানটির একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন—এবং সেই ব্যাখ্যা হইতেই রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির বা কাব্যমন্ত্রেরও একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইবে। এই গানে রবীন্দ্রনাথ মানুষের একটি নিদারুণ অবস্থার কল্পনা করিয়াছেন—সে অবস্থা যে বাহিরে ইতিপূর্ব্বে কখনও এমন ঘোরতর হইয়া উঠিয়াছিল তাহার সংবাদ সেকালের ইতিহাসে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তিনি কি উপলক্ষ্যে এই গান রচনা করিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা নাই। অতএব ইহাকে কবির নিজেরই অন্তরের একটা

আধ্যাত্মিক সঙ্কট বলিয়া মনে করাই অসঙ্গত হইবে না। ভারতবাসীর দাসত্ব-অবস্থাই সহসা কোন সময়ে তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল—কবি সহসা সেই ব্যথা আপনার বক্ষে অতি তীব্রভাবে অনুভব করিয়াই এমন আর্ত্তকণ্ঠে গাহিয়া উঠিয়াছিলেন—এমন অনুমানও হয়তো মিথ্যা নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটা সঙ্কীর্ণ অর্থও যেমন করা যায়, তেমনই তাহার একটি সার্ব্বভৌমিক ব্যাপক অর্থও আছে; ইহা রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রেরণার বৈশিষ্ট্য—তাঁহার সকল অনুভূতি বিশ্বজনীনতায় গভীর ও উদার হইয়া উঠে। কবিতার একটা সঙ্কীর্ণ অর্থ যেমন আমাদের হৃদয়কে সহজে স্পর্শ করে, তেমনই, শুধুই আমাদের দেশের, আমাদের জাতির দুর্দ্দশাই এই কবিতার উপলক্ষ্য না হইয়া—আজিকার জগতে মানবজাতির যে নিদারুণ আধ্যাত্মিক সঙ্কট উপস্থিত, তাহাও এ কবিতার উপলক্ষ্য হইতে পারে। এ যেন এক বিরাট কারাগৃহের অন্ধকারে আশাহীন আনন্দহীন মানবাত্মার আর্ত্তরব। এইখানে রবীন্দ্রনাথের সেই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কবি যাহাকে 'হৃদয়বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন তাহা মানুষেরই সেই আত্মা—যাহা শত বন্ধন সত্ত্বেও মুক্ত, যাহা সকল মোহ ও দুর্দ্দশার ঊর্দ্ধে উঠিয়া আপনার জ্ঞান ও শক্তিকে সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারে। এখানে কবি আপনার আত্মাকেই মুক্ত থাকিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে বলিতেছেন; নিম্নে যত অন্ধকারই ঘনাইয়া উঠুক—সেই আত্মাই অন্ধকারের ওপারে ধ্রুবজ্যোতির সন্ধান পায়—নিজের প্রতি বিশ্বাস হারায় না, বাহিরের ঘনঘটা অন্তরের সেই আলোক নির্ব্বাপিত করিতে পারে না। আত্মাই আত্মার একমাত্র আশ্রয়, অতএব কবি এই ঘোর দুর্দ্দিনে সেই আত্মার নিকটেই নিরাশায় আশা ও অন্ধকারে আলোক ভিক্ষা করিতেছেন। সকল মানুষের পক্ষেই ইহা সত্য। কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু—আত্মার মত 'হৃদয়বন্ধু' আর নাই—গীতায় শ্রীভগবান সেই কথাই বলিয়াছেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

অতএব এই গান শুধু আমাদের অবস্থায় নয়—জগতের বর্তমান অবস্থায় সমগ্র মানবজাতির কণ্ঠে এই গানই আজ ধ্বনিত হওয়া উচিত।

আশা করি এই গান ও তাহার এই ব্যাখ্যা হইতেই রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের পরিচয় আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। এই কবিতার প্রসঙ্গেই আর একটি কথা মনে পড়িল—রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির অজস্রতা। এই অপূর্ব্ব সুন্দর কবিতাটিও রবীন্দ্রনাথের কবিতারাশির মধ্যে প্রায় অপরিচিত অবস্থায় পড়িয়া আছে—তাহার কারণ, এই কবি দুই হাতে এত উৎকৃষ্ট কবিতা এমন ভাবে ছড়াইয়া গিয়াছেন যে, তাহার সকল-গুলিকে কুড়াইবার সময়ও আমরা পাই না; তা ছাড়া এ যেন God's plenty—এত দিকে এত উপচিয়া উঠিতেছে যে, যতই নষ্ট হউক তথাপি অভাব বোধ হয় না। এইরূপ উৎকৃষ্ট কবিতা পাঁচ-সাতটি রচনা করিতে পারিলেও কত কবির কবিজন্ম সার্থক হয়—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির প্রাচুর্য্য এমনই যে, এরূপ কবিতাও দুই-দশটা হারাইয়া গেলে হিসাবে ধরা পড়ে না।

আজ কবির জন্মদিন উপলক্ষ্যে আমরা এই যেটুকু তাঁহার স্মরণ ও কীর্ত্তন করিলাম, তাহাতে যেন ইহাই দৃঢ় প্রত্যয় করিতে পারি যে, কবির মৃত্যু নাই—রবীন্দ্রনাথ চিরদিন আমাদের সঙ্গে আছেন ও থাকিবেন। যুগের পর যুগ অতীত হইবে—জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহে আমাদের মত কত মানুষ ভাসিয়া যাইবে, সমাজে ও রাষ্ট্রে কত বিপ্লব ঘটিবে, আজিকার মতই ঘোর ঘনঘটায় আকাশ যেমন আচ্ছন্ন হইবে, তেমনই আলোকের প্লাবনে, আনন্দের কলরোলে, ধরণী উৎসব-ময়ী হইবে—কিন্তু কোন কালেই কবি রবীন্দ্রনাথের তিরোধান ঘটিবে না, অতি দূরতম ভবিষ্যতেও আমাদের বংশধরগণ ঠিক এমনই ভাবে কবির অতি নিকট-সান্নিধ্য লাভ করিবে, তাঁহারই গানের ভাষায় ও সুরে বাংলার প্রাণ, বাঙালীর বাঙালীত্ব অমর হইয়া থাকিবে।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বারাকপুর—"শনিবেলা"র রবীন্দ্র-জন্মতিথি উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

[শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত]

বোলপুর

ভাষাতত্ত্ব

…হইল—হইয়াছে। করিল—করিয়াছে ইত্যাদি। গিল—গিয়াছে হইতে পারিত। যখন কথাটা "গেল" তখন "গিয়াছে" হইতেই হইবে এমন কথা নাই। এক সময় কথাটা ছিল "গইল" কিন্তু এখন আর তাহা নাই। এরূপ পরিবর্ত্তনকে আমল না দিলে কথিত ও লিখিত ভাষায় মধ্যে ব্যবধান ক্রমে অত্যধিক হইয়া উঠিবে। এক সময় লিখিত বাংলায় "আমারদিগের" কথা ব্যবহৃত হইত এখন তাহার স্থানে "আমাদের" হইয়াছে। পূর্ব্বে লেখা হইত "করহ" এখন লেখা হয় "কর"—পূর্ব্বে লেখা হইত "করিহ" এখন লেখা হয় "করিয়ো"। এ বড় অধিক দিনের কথা নয়। ভাবিয়া দেখুন "নয়" কথাটা পূর্ব্বে "নহে" ছাড়া অন্য কোনো আকারে ব্যবহৃত হইত না—এখন ছাপার অক্ষরে "নয়" সহ্য করিতেছেন কিরূপে? ক্রমে ক্রমে একে একে ভাষাটাকে আধুনিক ব্যবহারের উপযোগী করিয়া আনিতে হইবে। Chaucerএর ইংরেজী চিরদিন টেঁকে নাই। রামমোহন রায়ের ভাষাটা একবার পড়িয়া দেখিবেন।… ইতি ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১২।

নিয়ম ও আনন্দ

এ জগতে যদি অমোঘ নিয়ম না থাকিত তবে ত্রাহি ত্রাহি করিতে হইত। নিয়ম ব্যতীত প্রকাশ হইতেই পারে না। খেলা করিতে গেলেও খেলার নিয়ম মানিতে হয় নতুবা খেলায় আমোদই হয় না, তাহা উন্মত্ততা হয় মাত্র। এই নিয়মই যখন তাঁহার ইচ্ছা—তখন

আমাদের ইচ্ছাকে এই নিয়মের অনুগত না করিলে দুঃখই পাইতে হইবে—যখন বিশ্বের ইচ্ছাকে তাঁহার নিয়ম জানিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া লইব—তখনই তাঁহার আনন্দের সহিত আমার আনন্দের মিলন হইবে। যতদিন বিদ্রোহ করিব, মানিতে চাহিব না, ততদিন পরাভূত হইতে হইবে।

বিধাতার রাজ্যে যেখানে নিয়ম সেখানে ব্যত্যয় নাই এই কথা যখন মানুষ জানে তখনই সে নির্ভয় নিশ্চিন্ত হয়। অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ—তেমন প্রসাদে আমাদের প্রয়োজন নাই। তাঁহার ইচ্ছা উচ্ছৃঙ্খল ইচ্ছা নহে এই জন্যেই বিশ্বে তাঁহার ইচ্ছাকে আমরা নিয়মরূপে দেখিতে পারি—এবং তাঁহার ইচ্ছার সহিত যোগ দিয়া আমরা সতর্কতা লাভ করিতে পারি।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বস্তুরাজ্যে তাঁহার ইচ্ছাকে আমরা নিয়মরূপে দেখি—কিন্তু কেবলই যে জগতে নিয়মকে দেখি তাহার বেশী কিছুই দেখি না তাহা নহে। পয়ারে চোদ্দ অক্ষরের নড়চড় হইবার জো নাই—তাহার ভাষা ছন্দ ও অর্থের সুবিহিত সুসঙ্গতি আছে—কিন্তু আমরা যদি পয়ারে কেবল চোদ্দ অক্ষরই দেখিতাম অথবা কেবলই প্রত্যেক শব্দের ও পদের সহিত একটা যুক্তিসঙ্গত অর্থ আছে ইহাই জানিতাম তবে তাহাকে কাব্যই বলিতাম না। কিন্তু কাব্যের সমস্ত অটল অমোঘ স্খলনহীন নিয়মের ভিতর দিয়াই তাহার গভীরতম সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীত, কাব্যকর্ত্তার অন্তরতম আনন্দ ও প্রেম প্রকাশ পাইতেছে সেইজন্যই তাহা কাব্য। আলঙ্কারিক তাহার মধ্যে অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম দেখিয়া বাহবা দেয়—বৈয়াকরণ তাহার মধ্যে ব্যাকরণের সূত্র ঠিকমত বজায় আছে দেখিয়া পুলকিত হয়, অভিধানবাগীশ তাহার শব্দ ও অর্থের সঙ্গতি দেখিয়া খুসি হইয়া নস্য লইতে থাকে—কিন্তু সমস্ত নিয়ম ও সঙ্গতির ভিতর হইতে নিয়ম ও সঙ্গতির অতীত আনন্দ তাহারাই দেখে যাহারা রসিক—তাহারা ইহার মধ্যে কবির নিয়মনৈপুণ্য দেখে না, কবির আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখে। তাহারা যখন জগৎকে দেখে তখন বৈজ্ঞানিকের মত কেবল সত্যকেই দেখে না দার্শনিকের মত চিন্তকেও দেখে, এবং কবির মত

আনন্দকে দেখে—কারণ তাহার নিজের মধ্যে সত্য আছে, চিত্ত আছে, আনন্দ আছে—তাহার মধ্যে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল-সঙ্গত নিয়ম-বন্ধনও আছে, চেতনাময় গতিশক্তিও আছে এবং আনন্দময় মুক্তির অনুভূতিও আছে—জগতের মধ্যে যখন সে এই তিনের যোগ দেখে তখনি সচ্চিদানন্দকে দেখে, এবং তখনি তাহার দেখা সম্পূর্ণ হয়। নতুবা যখন একটাকে দেখে অন্যটাকে দেখে না তখনই সে বিদ্রোহ করে, অহঙ্কার করে, তর্ক করিতে থাকে এবং নীরস হইয়া মরে। আনন্দ আছে অতএব নিয়ম নাই এ কথা যেমন মিথ্যা, নিয়ম আছে অতএব আনন্দ নাই, এ কথাও তেমনি মিথ্যা। আনন্দ হইতেই নিয়ম হইয়াছে নতুবা নিয়ম আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিত, নিয়মের মধ্য দিয়াই আনন্দ প্রকাশ পায় নতুবা জগতে কোথাও আমরা সৌন্দর্য্য দেখিতাম না, প্রেম উপলব্ধি করিতাম না। ইতি ৮ই কার্ত্তিক ১৩১৩।

নববর্ষ

...আজ বর্ষ শেষ—কাল এখানে নববর্ষের উৎসব হবে। প্রার্থনা করি যে, নববর্ষ কেবল পঞ্জিকার প্রথম পাতে দেখা না দিয়ে যেন জীবনের মধ্যে আবির্ভূত হয়। আর কোনো সার্থকতা চাইনে। নূতন জীবন চাই। পুরাতনের মৃত ভয় লজ্জা দুঃখের জের যেন আর না টেনে আনতে হয়, একেবারে সব সাফ করে দিয়ে বড় রাস্তায় যেন বেরিয়ে পড়তে পারি। আর সমস্তেরই মৃত্যু আছে কেবল আবর্জ্জনারই মৃত্যু নেই না কি?

নববর্ষ আপনার অঙ্ক পরিপূর্ণ কল্যাণের ভার অঞ্চলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন করে নিয়ে আসুক এই প্রার্থনা করি। অর্থাৎ যাই নিয়ে আসুক সুখই হউক দুঃখই হউক আপনি তাকে অপরাজিত চিত্তে গ্রহণ করবার শক্তি লাভ করুন।...ইতি ৩১শে চৈত্র ১৩১৫

সমাজ-ভয়

...আমাদের প্রত্যেকের ভীরুতা সম্মিলিত হইয়াই ত সমাজভয় জিনিষটা জুজুর মত জাগিয়া উঠিয়াছে। সমাজের অন্যায় অত্যাচার স্বীকার করিব না ইহাতে যতই দুঃখ পাই না কেন, এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারিলে তবেই একদিন সমাজ সিধা হইতে পারিবে—নিজের বুকের রক্ত দিয়া যতই ইহার খোরাক জোগাইবেন বুকের রক্তের প্রতি ইহার লোভ ও দাবী ততই আরো বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। বক্তৃতা করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া ইহার যথার্থ প্রতিকার হয় না—কারণ, যে সকল প্রথা সমাজের লোককে বেদনা দিতেছে তাহারা যে বেদনাকর ইহা বুঝাইবার জন্য কোনো বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। সমাজের লোক যেদিন উঠিয়া দাঁড়াইয়া সমাজের মুখে তুড়ি মারিয়া বলিতে পারিবে কেয়ার করি না তোমাকে—তুমি যা খুসি তাই কর—তখনই সমাজ ভালমানুষটির মত তাড়াতাড়ি রফানিষ্পত্তি করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে।...ইতি ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮।

"কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম"

"কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" বক্তৃতাটি যাতে বহু সংখ্যক পাঠকের হাতে গিয়ে পৌঁছয় এই মনে করেই প্রবাসী ও ভারতীতে ছাপিয়েছি। সবুজ পত্রের পাঠক অল্প এবং এবারে অনেক বিলম্বে ওটা ছাপা হওয়াতে সবুজ পত্র বেরুবার আগেই অন্য কাগজে ছাপতে হল। ঐ বক্তৃতাটি যদি কেবল মাত্র সাহিত্যের সামগ্রী হত তাহলে কথাই ছিল না।...ইতি ১৮ই ভাদ্র ১৩২৪।

স্বৈরিণী

ছাড়ো এ মতি মিছুটির গহনা—
আমার যা-কিছু আছে, লহ এ ;
যে কথা শুনিতে চাই ও মুখে,
একবার সে কথাটি কহ না।

সহজ-সুখেরে করি পরিহার
শান্তি-মণির মালিকাটী হার
অবহেলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ,
জান কি অতল জলে মরিয়াছ ?

কি সুখ পেয়েছ সারা জীবনে,—
'পাউডারে', সাবানে ও 'রিবনে' ?
নিতি-নব বঁধুরে বাঁধিতে
কিনিয়াছ কি বাগানে কি বনে ?

হায় ওরে রূপজীবী ললনা,
এত আশা, এত কলা ছলনা,—
একটি ফুলের লাগি জীবনে
কিছুই সফল তব হ'ল না।

আদরের দোলনায় দুলেছ,
হৃদয়ের বেদনা কি ভুলেছ ?
আপন যা-কিছু সব বিকায়ে
কি ধন কুড়ায়ে ঘরে তুলেছ ?

এমন পূজার ফুল কার রে,
না লাগিল দেবের সেবায় যে !
কাঁদি বাস বসি মরে আকাশে
ঝরা দল কাদায় লুটায় রে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

সংসারবিষবৃক্ষ

ইস্কুলের তরে ডাক দেয় যদি, আজো ছাত্রগণ হবিতে,
নিবেদন এ টিকি. তোমরা যাহারে কও ;
মাসিক, সাপ্তাহিকের পাতায় ডাকে যে তাপ কবিতে—
ভুলিবে Sure ; সেবাসেবিকা হও।
অতীতে বসিতে অনাদি-পথে কাঁপ পাতা এই ভুবনে,
ভুবন অর্ধে পোড়া এ বাংলা দেশ—
সাহিত্য ঘুচিবা ট্রাম চড়, Bus ? চুপসে চলি যে দু ফোনে ;
সেই পাকশালী—চেষ্টা, পড়ি 'অন্দেশ'।

—শ্রীবাণ

মহাস্থবির জাতক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কিছুক্ষণ বাদে ছোটলাট অর্থাৎ তখনকার দিনের লেফ্‌টেনান্ট গবর্ণর, তার একটু পরে বড়লাট অর্থাৎ গবর্ণর জেনারেল বড় বড় ফিটনে চ'ড়ে এল। তারা আসতেই সেই কামানের সারির একটা একটা ক'রে ফুটতে লাগল, দুম্—দাম্।

স্থবির অস্থিরকে বললে, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

তাদের সামনেই একেবারে দড়ি ধ'রে একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। বয়েস তার সাতাশ-আটাশ বছর হবে। বেঁটে আর বেশ ষণ্ডা-গোছের চেহারা। বোধ হয় মাস খানেক আগে তার মাথা কামানো হয়েছিল, এখন আধ ইঞ্চিটাক খোঁচা খোঁচা চুল বেরিয়েছে—এই লোকটা এতক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে খুব মজার মজার কথা ব'লে লোক হাসাচ্ছিল। স্থবিরের কথা শুনতে পেয়ে সে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললে, যুদ্ধ এখনও শুরু হতে দেরি আছে খোকা।

লোকটা এমন ভাবে কথাগুলো বললে যে, আশপাশের লোকগুলো সব হেসে উঠল। স্থবির অপ্রস্তুত হয়ে এমন একটা ভাব দেখাতে লাগল, যেন কথাগুলো তাকে উদ্দেশ ক'রে বলা হয় নি। ঠিক সেই সময় মাঠের মধ্যে চড়চড় ক'রে আওয়াজ হতেই সবাই সেদিকে ফিরে দেখলে যে, গোরা পল্টনের সার বন্দুক ছুঁড়ছে। গোরাদের বন্দুকের আওয়াজ শেষ হ'তেই দিশী সৈন্যরা বন্দুক ছুঁড়লে। তারপরে কটাকট চটাচট দুমদাম শব্দের পাগলা হর্‌রা শুরু হয়ে গেল।

মাঠের মধ্যেকার এই যুদ্ধানুষ্ঠান দর্শকদের প্রাণেও অনুপ্রাণিত হতে বিলম্ব হ'ল না। হঠাৎ তাদের মধ্যেও ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেল। এই রকম যখন সামনে-পেছনে ভীষণ ঠেলাঠেলি চলেছে, সেই সময় পেছন থেকে একটা প্রবল ধাক্কা আসায় সামনের সেই বেঁটে ষণ্ডা লোকটা কি রকমে ছিটকে একেবারে দড়ির ওপারে গিয়ে পড়ল।

দড়ির ধারে ধারে ঘুরে যে পাহারাওয়ালা সেখানকার শান্তি রক্ষা করছিল, এই দৃশ্য দেখে সে তিন লাফে সেখানে এসে হাতের রুল দিয়ে লোকটার মাথায় সজোরে ঠাঁই ঠাঁই ক'রে আট-দশ ঘা বসিয়ে দিলে।

নিমেষের মধ্যে সেই বিষম ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি থেমে গেল। স্তম্ভিত জনমণ্ডলী নির্ব্বাক বিস্ময়ে সেই পাহারাওয়ালাটার দিকে চেয়ে রইল। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশের লোক সেই ভিড়ের মধ্যে ছিল —পাঁচ বছরের শিশু থেকে আরম্ভ ক'রে সত্তর বছরের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত— ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, ভদ্রলোক, ছোটলোক, কেরানী, ব্যবসাদার ও অন্য চাকুরে; কারুর মুখ দিয়ে একটা ছোট প্রতিবাদ—একটু সহানুভূতির ভাষা বেরুল না।

এই অত্যাচারের মধ্যেই বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের বীজ প্রোথিত হয়েছিল।

মার খাবার সময় লোকটার মুখে যে যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠল, স্থবির চারদিকে চেয়ে দেখলে, অনেকের মুখে সেই যাতনার প্রতিবিম্ব পড়েছে। একবার পেছনে ফিরে দেখলে, স্থিরের চোখ দুটো ছলছল করছে।

মানুষ মানুষকে মারছে—এ দৃশ্য স্থবিরের চোখে নতুন নয়। তার বাবা তো প্রায় প্রতিদিনই স্থিরকে মারেন। পাঁচ বছর জীবনের মধ্যে সেও মার খেয়েছে অনেকবার। কিন্তু প্রহারের এমন বীভৎস রূপ ইতিপূর্ব্বে সে দেখে নি। তার মনে হতে লাগল, ঐ লোকটার বদলে তার বাবা যদি ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন! এই চিন্তা তার মনকে আঁকড়ে ধ'রে এমন পীড়া দিতে লাগল যে, সে অস্থির হয়ে উঠল।

বাবার হাতে প্রহারকে সে অত্যন্ত ভয় করত, কিন্তু সেদিন সে বুঝতে পারলে, পুলিসের মার বাবার মারের চেয়ে অনেক সাংঘাতিক।

প্রহৃত লোকটা ঐ ভাবে লাঞ্ছিত হয়ে দু-পা পেছিয়ে এসে আবার লাইনবন্দী হয়ে দাঁড়াল। লজ্জায় অপমানে সে আর কারুর দিকে না চেয়ে মাঠের দিকে চেয়ে রইল। মিনিটখানেক এই ভাবে কাটবার

পর ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন লোক চেঁচিয়ে তাকে বললে, এই, তোমার মাথা ফেটে গেছে—রক্ত পড়ছে যে।

সবার দৃষ্টি একসঙ্গে গিয়ে পড়ল তার মাথার ওপরে। দেখা গেল, তার দুই কাঁধ আর ঘাড়ের কাছে জামাটা রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে। স্থবির দেখলে, তার কানের পাশ দিয়ে রক্তের একটা সরু ধারা এসে নেমে জামার ওপর পড়ছে।

এই দৃশ্য দেখে জনতার মধ্যে একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। এদের মধ্যে যারা অসমসাহসী, তারা সেই কনস্টেবলের অমানুষিক অত্যাচারের ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। মাঠের মধ্যে তখনও দুম-দাম, চড়পড় আওয়াজ চলেছে—হঠাৎ সেই চার-পাঁচ সার মানুষের স্তর ভেদ ক'রে মহাদেব একেবারে সামনে এসে আহত লোকটাকে ধ'রে চীৎকার ক'রে উঠলেন, এই, কে—কোন্ পাহারাওয়ালা তোমায় মেরেছে ?

পাহারাওয়ালার মারের ধমক তখনও সে সামলে উঠতে পারে নি। তার হয়তো মনে হ'ল, এ লোকটাও বোধ হয় পুলিসেরই লোক। একজন মাথা ফাটিয়ে গেছে, এ বোধ হয় হাতটা পাটা ভেঙে দেবে।

মহাদেব আবার চীৎকার ক'রে উঠলেন, কে মেরেছে বল ?

ইতিমধ্যে যে পাহারাওয়ালাটা মেরেছিল, বীরদর্পে পা ফেলতে ফেলতে সে সেখানে এসে দাঁড়াল। আহত লোকটা কাঁপতে কাঁপতে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, ঐ লোকটা মেরেছে।

পাহারাওয়ালাটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ধমকে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে ?

মহাদেব তাকে বলতে লাগলেন, তুমি একে মেরেছ ? দেখ দিকিন এর মাথাটা ফেটে গিয়েছে। পুলিসের চাকরি কর ব'লে কি মানুষের চামড়া তোমার গায়ে নেই ? ওর যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে তো ওকে ধ'রে নিয়ে থানায় যাও, হাকিম আছে, সে সাজা দেবে। তুমি কে হে সাজা দেবার ?

পাহারাওয়ালা মহাদেবকে ধমকে উঠল, তুমি কে হে ?

প্রশ্ন শুনে মহাদেব একটু হকচকিয়ে গেলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন, আমাকে চিনতে পারছ না—আমি তোমার বাবা!

পেছনের লোকেরা হো-হো ক'রে হেসে উঠল। স্থির ও স্থবির—তারা এই বয়সেই বাপকে কিছু কিছু চিনেছিল, তারা হাসতে পারলে না। মহাবিপদের সূচনায় তাদের শিশুহৃদয় শঙ্কিত হয়ে উঠল। স্থবিরের মনে হতে লাগল, এই সময় মা যদি কাছে থাকত, তা হ'লে এই হাঙ্গামা আর বাড়তেই পারত না।

মহাদেবের মুখে ঐ কথা। তার ওপরে যে লোকগুলো এতক্ষণ তার দাপটের চোটে কেঁচো হয়ে ছিল, তাদের সেই ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি শুনে পাহারাওয়ালা-পুঙ্গব একেবারে তেলে বেগুনে জ্ব'লে উঠে চীৎকার ক'রে উঠল, কি বললে?

মহাদেব নীচু হয়ে দড়ি গ'লে বাইরে একেবারে তার সামনে গিয়ে তারস্বরে চীৎকার ক'রে উঠলেন, আমি তোর বাপ। এই নিরপরাধ লোককে এমনই নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করার জন্যে আমি তোমায় এমন সাজা দোব যে, চিরকাল বাবাকে মনে থাকবে।

এবার আর জনতার মধ্যে হাসির হর্‌রা উঠল না, বরং ব্যাপারটা ক্রমেই সাংঘাতিক আকার ধারণ করছে দেখে ভিড়ের লোক আস্তে আস্তে স'রে পড়তে আরম্ভ করল।

আজকের দিনে বাঙালীর চোখে এ ব্যাপারটা অত্যন্ত লজ্জাকর ঠেকতে পারে; কিন্তু ক্রীশ্চান আঠারো শো ছিয়ানব্বই অব্দে কলকাতার সকল যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পাহারাওয়ালাকে গালাগালি দেওয়া এবং মারতে উদ্যত হওয়া তো দূরের কথা, সে দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখতে পারে এমন লোকও এক লক্ষে একটাও ছিল না।

কথাগুলো ব'লেই মহাদেব গায়ের র‍্যাপারখানা খুলে ভিড়ের মধ্যে ফেলে দিতেই স্থির সেখানা লুফে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিলে। ওদিকে পাহারাওয়ালাটা ফিরে গজ পঁচিশেক দূরে তার জুড়িদারকে হাঁকলে। জুড়িদার তখন সেদিককার ভিড়ের ওপর রুলের গুঁতো

চালিয়ে শান্তিরক্ষার চেষ্টা করছিল। একবার এদিকে চেয়ে আবার নিজের কর্তব্যের দিকে মন দিলে।

ছড়িদারের মুখ দেখে পাহারাওয়ালার বুকে বোধ হয় সাহস ফিরে এল। সে রুল উঁচিয়ে মহাদেবকে বললে, শূয়োরের বাচ্চা, শিগগির দড়ির ওপারে যাও, নইলে এই রুল দেখছ—

মহাদেব এবার জামাটা খুলে মাঠের ওপর ফেলে দিয়ে বললেন, তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে—

এই ব'লে তার হাত থেকে রুলটা টপাস ক'রে কেড়ে নিয়ে বললেন, মাথার পাগড়ি খোল, এর খালি মাথায় যেমন মেরেছ তেমনই তোমারও খালি মাথায় মারব—যতক্ষণ না রক্ত বেরোয়—

মহাদেবের চুয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাতি আর সাড়ে উনিশ ইঞ্চি বাহুর বেড় দেখে পাহারাওয়ালার বাচ্চা স্তম্ভিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মহাদেব চীৎকার করতে লাগলেন, খোল মাথার পাগড়ি। পাগড়ির ওপরে মারলে লাগবে না, তোমার খালি মাথায় মারব—বেটা, মনে করেছ কি? খোল পাগড়ি—

প্রতি নিশ্বাসে তিনি যেন ফুলতে লাগলেন।

পাহারাওয়ালার মুখে বাক্য নেই। রুল ফেলে সে চ'লেও যেতে পারে না। ততক্ষণে ভিড় অনেক পাতলা হয়ে গেছে; ওদিকে একটু দূরে এমন ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেছে যে, তিন-চারটে পাহারাওয়ালা মিলে ভিড়ের ওপরে নির্দয় রুল পিটেও সামলাতে পারছে না। স্থবির ও অস্থির হাউহাউ ক'রে কান্না জুড়ে দিয়েছে। স্থির বেচারী বাপের ব্যাগারখানা হাতে নিয়ে কাঁদ-কাঁদ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। মাঠের মধ্যে দুমদাম খটাখট তো চলেইছে—সব আওয়াজ ছাপিয়ে মহাদেবের গলা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে—খোল পাগড়ি, নিজের হাতে খুলতে হবে। মাথায় রুলের বাড়ি কি রকম লাগে, তা তোমাকে একটু বুঝিয়ে দোব।

এদিকে ভিড় একটু পাতলা হ'তেই আহত লোকটি ব'সে পড়েছিল। মহাদেব যখন এই ভাবে চেঁচাচ্ছেন, তারই মধ্যে সে ভয়ে

পড়ল। ভিড়ের লোকেরা বলতে লাগল, অজ্ঞান হয়ে গেছে। হাওয়া ছেড়ে দাও, স'রে যাও—

কথাগুলো মহাদেবের কানে যেতেই তিনি পেছন ফিরে দাঁড়ালেন। তারপরে কলটা মাটিতে ফেলে, একেবারে সেই লোকটার পাশে গিয়ে ব'সে পড়লেন। পাগলাবাওয়ালানন্দন ইত্যবসরে তার কলটা টপ ক'রে তুলে নিয়ে ধীর পদভরে বিপরীত দিকে হনহন ক'রে চ'লে গেল।

মহাদেব বললেন, কেউ দয়া ক'রে একটু জল এনে দিতে পারেন, লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন বললে, এখানে জল কোথায়? ঐ পুকুর আছে একটু দূরে।

মহাদেব একবার করুণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে টপ ক'রে মাটি থেকে জামাটা তুলে কাঁধে ফেললেন। তারপরে ঠিক সেই ভাবেই টপ ক'রে লোকটাকে দু-হাতে তুলে ভিড় ঠেলে ফাঁকায় গিয়ে চীৎকার ক'রে বললেন, স্থির, স্থবির, অস্থির, বেরিয়ে এস।

হুকুম পাওয়ামাত্র ছেলেরা ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপরে মহাদেব হু-হু শব্দে ছুটতে আরম্ভ ক'রে দিলেন—ছেলেরা তাঁর পিছু পিছু ছুটতে লাগল।

আজকের বেঙ্গল ক্লাবের সামনে মাঠের মধ্যে যে বড় পুকুর আছে, মহাদেব দৌড়তে দৌড়তে এসে সেখানে লোকটাকে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। দৌড়বার সময় ঝাঁকুনির চোটেই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক, লোকটার ততক্ষণে জ্ঞান ফিরে এসেছিল। তাকে মাটিতে শুইয়ে দিতেই সে ক্যালক্যাল ক'রে চাইতে লাগল। মহাদেবের সেদিকে হুঁশই নেই, তিনি তড়তড় ক'রে পাড় দিয়ে জলের দিকে নেমে গেলেন।

ঘাটবিহীন পুকুর, চারদিকেই আঘাটা। গড়ানে পাড় দিয়ে জলের দিকে এগুতে গিয়ে কি রকম ক'রে পা হড়কে মহাদেব একেবারে প্রায় কোমর জলের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। তারপরে সে কি টানাটানি আর ধস্তাধস্তি! পুষ্করিণী পাঁকে পরিপূর্ণ। মহাদেবের দুই পা একেবারে

হাঁটু অবধি পাঁকে ব'সে যাচ্ছে। এক পা তোলেন তো আর এক পা ধ'সে যায়—ভারী শরীর, পাঁকে সামলাতে পারেন না। কিছুক্ষণ আগেই যে লোক ব্রিটিশ গবর্মেন্টের পাহারাওয়ালাকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, এক হাঁটু পাঁকের মধ্যে তাঁর এই আঁকুপাঁকু অসহায় অবস্থা দেখলে করুণার উদ্রেক হয়।

যা হোক, অনেক কষ্টে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়ে তো তিনি পাড়ে উঠলেন। একপাটি জুতো জলের তলাতেই র'য়ে গেল। ওদিকে আস্তে লোকটি ততক্ষণে উঠে বসেছে। মহাদেব কোঁচা নিংড়ে নিংড়ে তার ক্ষতস্থান ধুয়ে দিতে লাগলেন। একবারে হ'ল না, বার দু-তিন কোঁচা ভিজিয়ে আনতে হ'ল। তারপরে কোঁচাটা ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ আরম্ভ হ'ল। সে এক অদ্ভুত ব্যাণ্ডেজ! একটা চোখের একটুখানি ছাড়া লোকটার কান মাথা মুখ গলা পর্য্যন্ত সব সেই ব্যাণ্ডেজে ঢাকা প'ড়ে গেল।

যা হোক, পঞ্চাশ বার খুলে ঠিক ক'রে আবার বেঁধে, আবার খুলে, এই রকমে ঘণ্টাখানেক ধ'রে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার পালা শেষ ক'রে মহাদেব আবার জলে নামলেন জুতো খুঁজতে। কিন্তু আধ ঘণ্টা ধ'রে জলের মধ্যে ডুবোডুবি ক'রেও সে পাটির যখন কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন তিনি হতাশ হয়ে উঠে পড়লেন। তাঁর মাথা থেকে পা সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমলিপ্ত, ধুতি যতটুকু অবশিষ্ট আছে তার দ্বারা কোন রকমেই ভদ্রভাবে লজ্জা-নিবারণ হয় না।

অত্যন্ত বিষণ্ণমুখে জামাটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে তিনি কাঁধে ফেলে ফিরের হাতে থেকে র‍্যাপারটা নিয়ে সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে নিলেন। তারপরে সেই কাদা-লেপ্টানো একপাটি জুতো হাতে নিয়ে ছেলেদের বললেন, চল।

লোকটা তখনও সেখানে ব'সে ছিল। দু-পা এগিয়ে গিয়ে মহাদেব আবার তার কাছে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বাড়ি যেতে পারবে?

ব্যাণ্ডেজমণ্ডিত মুখ তুলে মহাদেবের দিকে কৃতজ্ঞভাবে কিছুক্ষণ

চেয়ে থেকে সে বললে, বাবু, তুমি বড় ভাল লোক। তুমি বড় ভাল লোক। তুমি বাড়ি যাও, আমি একলাই যেতে পারব।

মহাদেব একটু হেসে বললেন, এমন তামাশা আর দেখতে এস না—বুঝলে?

চৌরঙ্গীর রাস্তা দিয়ে মহাদেব চলেছেন। আবক্ষ কালো দাড়ি কাদা ও জলে প্রায় জটিয়া-বাবা। গায়ে একখানা রুক্ষ কমলালেবু রঙের আলোয়ান, পরনে আধখানা ধুতি, হাতে কাদামাখানো একপাটি জুতো। পেছনে তিন ছেলে গটগট ক'রে চলেছে। দুধারী লোক এই অপূর্ব শোভাযাত্রা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেখতে লাগল।

মহাদেবের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর দৃষ্টি একেবারে সম্মুখে নিবদ্ধ, মুখে বাক্য নেই, ছেলেদের উপদেশ দেওয়া বন্ধ। তারা পেছনে আছে কি না আছে সে জ্ঞানও তাঁর নেই—বনবন ক'রে তিনি এগিয়ে চলেছেন। ছেলেরা তাঁর সঙ্গে সমানে চলতে পারছে না, ক্রমেই পেছিয়ে পড়ছে। এমনই ক'রে পিতা ও পুত্রদের ব্যবধান বাড়তে লাগল। তারপরে কখন যে তিনি দৃষ্টির আড়ালে জনতার মধ্যে হারিয়ে গেলেন, ছেলেরা তা বুঝতেই পারলে না।

স্থির, স্থবির ও অস্থির তাদের শিশুসামর্থ্যে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি চলেছে। বাপকে দেখতে না পেলেও রাস্তা তাদের চেনা। হঠাৎ স্থবিরের মনে পড়ল, পকেটের কমলালেবুটা তখনও অনাদৃত অবস্থায় প'ড়ে আছে। টপ ক'রে পকেটের মধ্যে হাত পুরে আধ-ছাড়ানো লেবুটা বের ক'রে সে খেতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

আর এক রাত্রিশেষের কথা। মাঘ মাসের প্রায় মাঝামাঝি, ব্রাহ্মসমাজের উৎসব চলেছে। রাত্রি প্রভাত হ'লেই ১১ই মাঘ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। এই এগারোই মাঘ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোকদের বড়দিন। মহাদেব রাত্রি তিনটের উঠে উপাসনা সেরে ছেলেদের তুলেছেন। তারা মনে করেছিল, বাবা একলাই ভোরে মন্দিরে চ'লে যাবেন, কিন্তু তা হয় নি।

মফস্বলের অনেক ব্রাহ্মপরিবার এই উৎসব উপলক্ষ্যে কলকাতায় আসেন। এই ১১ই মাঘের দিনটা অনেকেই সারাদিন ও রাত্রের উপাসনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মন্দির ও মন্দিরপ্রাঙ্গণে কাটান। কলকাতাবাসী অনেকেও তাই করেন। এই সময়ে দূর থেকে এমন অনেক ছেলেমেয়ে সেখানে আসে; যাদের বছরের মধ্যে উৎসবের এই দিনগুলি ছাড়া অন্য সময়ে আর আসা হয়ে ওঠে না। এই দিনগুলি ছোট ছেলেমেয়েদের মহা আনন্দের দিন। কত পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে। কত মজার কথা, কত রকমের খেলা—শাসনমুক্ত নিরঙ্কুশ সেই দুর্লভ দিন—চণ্ডালের খুলিতে স্বাতী নক্ষত্রের জলের মতন দুর্লভ সেই দিনটির সকাল মন্দিরে ব'সে উপাসনার জন্যে তৈরি হয় নি।

স্থির, সুস্থির ও অস্থির তিনজনেই বাপের ডাকে উঠে পড়েছে বটে, কিন্তু বুকের মধ্যে আপত্তির ঘূর্ণিবায়ু মাথা খুঁড়ে মরছে।

মহাদেব ছেলেদের বললেন, উপাসনা সেরে নিয়ে চল্, স্নান ক'রে মন্দিরে যেতে হবে।

মাঘ মাসে রাত চারটের সময় এমন কথা শুনলে পৃথিবীর কোন্ শিশুর মনে ভগবান সম্বন্ধে প্রেমভাব থাকতে পারে! তবুও হুকুম পাওয়া মাত্র তিন ভাই টপটপ আসন পিঁড়ি হয়ে ব'সে গেল, তারপরে হাত জোড় ক'রে চোখ বুজে ফেললে।

ছেলেদের মা প্রতিবাদ ক'রে বললেন, এই মাঘের শেষরাত্রে বুড়ো মানুষে ঠাণ্ডা জল মুখে দিতে পারে না, আর তুমি এই কচি ছেলেগুলোকে নাইয়ে মারবে না কি?

অন্য দিন হ'লে এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে লেগে যেত বাক্যের মহাসমর। কিন্তু এগারোই মাঘের প্রাতঃকাল, তার ওপরে মন্দিরে যাবার মুখে স্ত্রীর সঙ্গে একটা ঝগড়া হাঙ্গামা হয় এটা মহাদেব চান না। তাই বিশেষ কথা-কাটাকাটি না ক'রে তিনি বললেন, স্নান ক'রে দেহে ও মনে পবিত্র হয়ে ঈশ্বরের উপাসনা-মন্দিরে যাবে—এর শীতকাল গ্রীষ্মকাল নেই।

বাপ্‌! এমন অকাট্য যুক্তির ওপর ছেলেদের মা আর কোন কথা কইলেন না। ছেলেরাও কোন আপত্তি জানালে না। আপত্তি করবার মতন দুঃসাহস তাদের নেই। বাপের মুখ থেকে দ্বিতীয় বার হুকুম বের হওয়ার আগেই ওয়ান—টু—থ্রি—ঠিক ড্রিলের চালে স্থির, স্থবির ও অস্থির অঙ্গের আবরণ ও লজ্জা-নিবারণ খুলে ফেলে বিনাবাক্যব্যয়ে কদম্বকণ্টকিত দেহে সুড়সুড় ক'রে চ'লে গেল একতলার উঠোনের কোণে জলের কলের কাছে। অত রাত্রে বা এত ভোরে কলে জল নেই। হিমঠাণ্ডা চৌবাচ্চার জলে নর্থওয়েস্ট সোপ কোম্পানির সাবানের ঘর্ষণে তাদের দেহ পবিত্র হতে লাগল।

স্নান করাতে করাতে মহাদেব ছেলেদের বললেন, তোমরা ব্রাহ্মঘরে জন্মেছ, এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও।

ছেলেরা মনে মনে ধন্যবাদের ভাষা খুঁজতে লাগল। শিশু তারা, ভাষাজ্ঞান তখনও পরিপক্ক হয় নি।

সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির। এগারোই মাঘ উপলক্ষ্যে মন্দিরের ভেতর বার নানা লতাপাতা ও ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। ভেতরে গ্যাসের বাতি জ্বলছে, সিলিঙে ছুটো বড় বড় গ্যাসের ঝাড় জ্বলছে, আর চলেছে খোলকরতালসহ কীর্তন।

মহাদেব তিন ছেলেকে নিয়ে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে বেদীর নীচে যেখানে কার্পেট পাতা আছে, তারই এক কোণে গিয়ে বসলেন। তাদের আগেও দু-চারটি ব্যাকুলাত্মা এসে স্থান সংগ্রহ করেছেন। সর্বাঙ্গ র‍্যাপারে মোড়া এক একটি আধুনিক ধ্যানীমূর্তির মতন দেখাচ্ছে তাঁদের। কার্পেটের আর এক কোণে কয়েকজন মিলে ভীষণ হুঙ্কারে কীর্তন করছেন, তীক্ষ্ণ বিষব্যাপী সম সক্ত দংশায় রে—

মহাদেব ব'সেই চক্ষু বুজলেন। তাঁর দেখাদেখি ছেলেরাও চক্ষু বুজল। ঈশ্বর অকৃতজ্ঞ নন, স্নান করবার সময় বিনা কারণে তারা তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল, তিনিও অচিরেই তাদের চোখে ঘুমের প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে জোরে ওঠার দুঃখ ভুলিয়ে দিলেন।

কতক্ষণ এই ভাবে চলল। ঢুলতে ঢুলতে মাথায় একটা প্রচণ্ড

আঘাত লাগায় স্থবিরের ঘুম ছুটে গেল। সে দেখলে অস্থিরের মাথাটা ঢুলে একেবারে তার নাকের গোড়ায় এসেছে। অস্থিরের মাথাতেও চোট লেগেছিল। সেও চোখ চেয়ে দেখলে স্থবিরের মাথাটা তার মাথার সামনে। দুজনে চোখোচোখি হতেই তারা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, বাপের চোখ কোথায়!

মহাদেব নির্ব্বিকল্প হয়ে চোখ বুজে পিঠ সোজা ক'রে বুক চিতিয়ে ব'সে আছেন, দেখে তারা নিশ্চিন্ত হ'ল বটে, কিন্তু চোখ বুজতে আর সাহস করলে না। কি জানি বিশ্বাসঘাতক ঘুম ইতিপূর্ব্বে পাঠমন্দিরে অনেক লাঞ্ছনার কারণ হয়েছে, ব্রহ্মমন্দিরে এত লোকের সামনে সে ব্যাপারের পুনরভিনয় যাতে না হয়, সে বিষয়ে তারা সচেতন হবার চেষ্টা করতে লাগল।

স্থবির চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। কীর্ত্তনীয়ার দল ততক্ষণে শ্রান্ত হয়ে যে যার একটু জায়গা যোগাড় ক'রে র‍্যাপারে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে ধ্যানস্থ হয়ে বসেছেন। একটু আগেই এই লোকগুলিই যে বিবিধ ভঙ্গিতে বদন ব্যাদান ও অস্বাভাবিক হস্তপদ চালনা ক'রে বিশ্ববাসীর দংশনের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানাচ্ছিল, এখন তাদের শান্ত মুখমণ্ডল ও সমাহিত অবস্থা দেখে তা বোঝবার জো নেই। মন্দির-গৃহ লোকে পরিপূর্ণ। গ্যাসের আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানলা-দরজা দিয়ে ভোরের মৃদু আলো আসায় ফুলসজ্জায় সজ্জিত মন্দির-গৃহের দেওয়াল থাম ও বেদী অপূর্ব্ব শ্রীতে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। কীর্ত্তনীয়াদের কণ্ঠনিঃসৃত সেই গগনভেদী আর্ত্তনাদ স্তব্ধ হওয়ায় সেখানে অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য বিরাজ করছে। সকলেই উন্মুখ আগ্রহে যেন কিসের প্রতীক্ষায় রয়েছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সেই আধ-আলো আধ-অন্ধকারের বুকে হঠাৎ ভৈরবীর সুরধারা নেমে এল করুণার প্রস্রবণের মত—

ভোর হ'ল মলিন দুখরাতি
হেরি তব বিমল মুখভাতি—

স্থবির দেখতে পেলে, তাদের একটু দূরে একজন কালো প্রিয়দর্শন যুবক কোকিলকণ্ঠে গান শুরু করেছে। গানের যাথার্থ অথবা

তাৎপর্য বোঝবার মতন বয়স বা শিক্ষা তার তখনও হয় নি, তবুও তার মনে হতে লাগল, তীক্ষ্ণ বিষব্যালীর ওপর এ যেন বিশল্যকরণীর প্রলেপ, কোথা থেকে—কোন্ অদৃশ্য লোক থেকে আসছে যেন আশার বাণী, কি আনন্দের উৎস রয়েছে ভৈরবের ঐ ভৃঙ্গারে,—রাত্রি চারটের সময় উঠে সেই ঠাণ্ডা জলে স্নান, সকালবেলাকার অমন আড্ডার বদলে বয়স্কদের সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে তন্ময় হয়ে ব'সে ঈশ্বরারাধনার কৃচ্ছ্রসাধন বালকের মনে যে বিদ্রোহের ঝড় তুলেছিল, নিমেষে তা অপসারিত হয়ে গেল।

গান শেষ হতেই আচার্য্য ঢুকলেন মন্দিরে। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের মুখ্য আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণ ব্যক্তি। লম্বা দাড়ির অধিকাংশই পাকা। মাথায় বিরল রুক্ষ কেশ। গায়ে একটা সবুজ রঙের ফ্লানেলের শার্ট। মুখ দেখলেই মনে হয়, সাধারণ লোকের সঙ্গে এঁর যেন কোথায় একটা প্রভেদ রয়েছে। স্থবির শাস্ত্রী মশায়কে চিনত। চলতি কথায় বলতে গেলে, তিনি তাদের কুলগুরু। শাস্ত্রী মশায় তার পিতাকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন; মহাদেবের বিবাহেও তিনি পৌরোহিত্য করেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মরা গুরু মানে না, তাই বোধ হয় গুরু না ভেবে তারা তাঁকে গুরুর চাইতে আরও বড় একটা কিছু মনে করত। যাক, শাস্ত্রী মশায় এসে বেদীতে উঠে বসলেন। দু-তিনটি যুবক খাতা পেন্সিল নিয়ে বেদীমূলে ব'সে গেল আচার্য্যের উপদেশ সঙ্গে সঙ্গে লিখে নেবার জন্যে। শাস্ত্রী মশায় বেদীর ওপরে আসন পিঁড়ি হয়ে ব'সে ভাঙা গলায় বললেন, সঙ্গীত।

সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে বাজনার শব্দ ও তার সঙ্গে গান আরম্ভ হয়ে গেল।

সঙ্গীতান্তে শাস্ত্রী মশায় চীৎকার ক'রে কি সব বলতে আরম্ভ করলেন। সে সব ভাল ভাল কথা, গূঢ় তার অর্থ, নানা অলঙ্কারপূর্ণ সে ভাষা—শিশুর কাছে তা প্রহেলিকা। স্থবিরের মনে হতে লাগল, এ যেন একটা ইস্কুল। বেদীর ওপরে ব'সে আছেন ঐ মাস্টার মশায়—চেঁচিয়ে পাঠ বুঝিয়ে দিচ্ছেন। চতুর্দ্দিকে এই সব নরনারী, তারা ছাত্র ও ছাত্রীর

বন। এ ইস্কুলের ছাত্রছাত্রীকে বোধ হয় 'নাড়ুগোপাল' হতে হয় না, গলায় তাদের ইটের মেডেলও ঝোলে না। সে একবার বাপের দিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজে ফেললে।

পেছনে হেলান দেবার একটু দেওয়াল পাবার ফলে এবারের নিদ্রাটি স্থবিরের বেশ গাঢ়ই হয়েছিল—হঠাৎ কান্নার আওয়াজে তার অমন মনোরম ঘুম ছুটে গেল। চোখ চেয়ে সে দেখতে পেলে, তার পাশেই একটি বৃদ্ধ হেঁচকি তুলে কাঁদছে আর বিড়বিড় ক'রে কি বলছে।

ব্যাপারটা স্থবিরের কাছে ভারী অদ্ভুত ঠেকল। সে তার আশপাশে তাকিয়ে দেখলে, আরও দু-তিনজন ভদ্রলোক ঐ রকম হেঁচকি তুলে কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। স্থবিরদের কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে একটি ভদ্রলোক ব'সে ছিলেন, তাঁকে তারা চিনত। এই লোকটি সমাজের মধ্যে একজন নামজাদা গম্ভীর ও রাসভারী লোক। সে দেখলে, ইনিও নিঃশব্দে অশ্রুবিসর্জন করছেন। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুজল তাঁর বিশাল দাড়ির এখানে সেখানে আটকে নোলকের মত দুলছে।

এই দৃশ্য দেখে স্থবির, স্থির বুঝতে পারলে, ব্যাপারটি বিশেষ সুবিধাজনক নয়। নিশ্চয় কোনও অপরাধের জন্যে শাস্ত্রী মশায় তাঁদের ধমক দিচ্ছেন।

ইতিমধ্যে শাস্ত্রী মশায় চীৎকার ক'রে উঠলেন, ঐ যে বিচক্ষ শুক্লপথে মুক্তপথে প্রয়াণ করিল—

স্থবিরের পাশের লোকটি, যিনি এতক্ষণ কান্নার সঙ্গে বিড়বিড় ক'রে বকছিলেন, হঠাৎ ডাক ছেড়ে ডুকরে উঠলেন, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়—

স্থবির ভাবলে, এবার বোধ হয় শাস্ত্রী মশায় বেদী ছেড়ে নেমে এসে এঁদের প্রহার আরম্ভ করবেন। সে সন্ত্রস্ত হয়ে র‍্যাপারখানা টেনে গায়ের সঙ্গে সেঁটে উদ্‌গ্রীব হয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়, তারই অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু শাস্ত্রী মশায় বেদী থেকে নামলেন না। তাঁর চীৎকারের মধ্যে ধমকের সুরটা যেন ক্রমেই ক'মে আসতে লাগল। ক্রমে তা যেন

একেবারে করুণ হয়ে এসে পৌছল। তাঁর কণ্ঠস্বর ধাপে ধাপে নামতে নামতে শেষে অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

শিবনাথ শাস্ত্রী স্থবিরের পিতৃগুরু। তিনি যতক্ষণ চীৎকার ক'রে পুরুষোচিত অভিব্যক্তিতে ব'লে যাচ্ছিলেন, ততক্ষণ তার ভালই লাগছিল। শুধু যে ভাল লাগছিল তা নয়, তাদেরই শাস্ত্রী মশায় যে এতগুলো লোককে ধমকে কাঁদিয়ে বিপর্যাস্ত ক'রে তুলছিলেন, তার মধ্যে নিজেও সে খানিকটা গৌরব অনুভব করছিল। কিন্তু হঠাৎ তাঁর সুরও অনুনয়ের পর্দায় নেমে আসায় তার শিশুচিত্ত শুধু বিহ্বল নয়, কিছু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল। স্থবিরের মনে হতে লাগল, কে সে নিষ্ঠুর, কোথায় তার বাড়ি, কেমন ভীষণ তার চেহারা, কত শক্তি সে ধরে, যাকে এমন ভাবে অনুনয় করা হচ্ছে, অতিবড় পাষাণও যাতে দ্রবীভূত হয়?

স্থবির স্থির করলে, বড় হয়ে এইজনকে খুঁজে বার করতেই হবে।

আজও স্থবির তারই অনুসন্ধানে ফিরছে।

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

ওরা

তাঁর সন্ধানে ওরা কি দিবে ?
কেমনে বা তাঁরে চিনি ধরা দিতে যেন দিনি,
ছড়াইয়া আপনারে ঘিরিবে !
বহু পথ চলি তাই হারাই, কভু বা পাই,
তাঁরি সাথে খেলা করে সকলে ;
ওরা মাঝখানে থাকি ভোলায়, মোর যে কাঁদি—
বাঁচিবে কি চিনাইবে নকলে ?

কোথা তুমি

তোমারই অন্তরবহ্নি এ দুর্দিনে রবে নির্বাপিত
চিরন্তন অগ্নিহোত্রী ? হে তরুণ, তুমি যে সাগ্নিক !
শঙ্কাহীন বীর্য্যবান বীর তুমি অপ্রমত্ত-চিত্ত
সমস্ত জীবন জ্বালি পথ-প্রান্তে দেখায়েছ দিক
যুগে যুগে চিরকাল ; কীর্ত্তিকথা তব সমুজ্জ্বল
ইতিহাসে আছে লেখা জলন্ত অক্ষরে, আছে লেখা
স্মৃতিপটে, আশার কল্পনা-নভে করে ঝলমল
সপ্তবর্ণ মহিমায়। কোথা তুমি আজ ? দাও দেখা,
উদ্ভাসিত কর অন্ধকার, হে অগ্রণী চিরন্তন,
আদর্শ-প্রদীপ্ত তব মনীষায়। আছ তুমি জানি,
তবে কেন কষ্ট, ক্ষোভ, অসম্মান, সহস্র বন্ধন
পুঞ্জীভূত হতাশায় প্রতি পদে পরাজয়-গ্লানি ?
হে যৌবন-ভগবান, হে ভাস্বর, ধীর মূর্ত্তি ধর
অন্ধকার যজ্ঞকুণ্ডে প্রাণ-অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর।

"বনফুল"

এই যে!

সর্ব্বদাই দেখিত আমি, পকেটি পকেটে,
হায় হায়, তুমি ভুলে গেছ দাদা, কেনাকাটার পতিখুতে ;
আমিই পিতার মারিয়া পকেট, পুত্রে দিয়েছি তরুণ রকেট,
মোর ছবি কত অজান লকেট হিসাব তাহার দিব না,
আমার সঙ্গে সিনেমার লাগি দেখা হয়েছে কত রাধা রাণী,
বঙ্কু দেখে পশ্চিমেতে আমি সবে দিই উদ্দীপনা।
কাহারে কাহারে মোর অভ্যাস—"কমলে কামিনী" দেখে উঠে যান,
(আকাশে আমার কলের বিমান !) আমরে হোঁচটে।

—টাকা

সোনার পদ্ম

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আদালতের বারান্দা

সরকারী উকিল ও পূর্ব-পরিচিত দারোগা

দারোগা। কালীচরণ তো স্বীকার করেছে, তবে আবার সাক্ষীর হাঙ্গামা করছেন কেন স্যার?

উকিল। সে শুধু বলেছে, আমি খুন করেছি। এ ছাড়া সে একটি কথাও বলে নি। সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রমাণ করতে হবে, এ খুন সে খুন করবার উদ্দেশ্যেই করেছে। এটা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়।

দারোগা। সাক্ষী তো আমাদের একটি মাত্র—তারাচরণের স্ত্রী।

উকিল। তার চেয়ে ভাল সাক্ষী আর হতে পারে না দারোগাবাবু। সে নিজ চোখে সমস্ত দেখেছে। আপনি বরং তাকে একটু ফলটল খাইয়ে সুস্থ করুন। টিফিনের পরই সাক্ষীর তলব হবে। (প্রস্থান)

আনন্দচরণের প্রবেশ

আনন্দ। এই যে দারোগাবাবু!

দারোগা। আনন্দবাবু? কিছু বলছেন?

আনন্দ। খুকুর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না দারোগাবাবু?

দারোগা। হুলিয়া পাঠিয়েছি। কিন্তু ধরা পড়ল কই?

আনন্দ। কিন্তু গুরুচরণ সাউকে এ মামলায় আপনারা আসামী করলেন না কেন?

দারোগা। প্রমাণ কই বলুন? গুরুচরণ এমন ভাবে কাজ করেছে যে, এক বিন্দু প্রমাণ কোথাও পাওয়া গেল না। আমি একবার তারাচরণের স্ত্রীকে দেখি। এখুনি সাক্ষীর তলব হবে। (প্রস্থান)

জ্ঞানদাচরণ বিপরীত দিকে চলিয়া যাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে সেই দিক হইতে প্রবেশ করিলেন সন্ন্যাসীবেশী ধনদাপ্রসাদ

জ্ঞানদা। আপনি?

ধনদা। জ্ঞানদা? (জ্ঞানদা প্রণাম করিল, ধনদা মাথায় হাত দিলেন)

জ্ঞানদা। আপনি কেন এলেন?

ধনদা। কালীচরণ নিজের ছেলেকে খুন করেছে, তার বিচার হচ্ছে?

জ্ঞানদা। হাঁ।

ধনদা। খবরের কাগজে সংবাদটা দেখলাম। দেখে না এসে পারলাম না।

জ্ঞানদা। আপনি না এলেই কিন্তু ভাল করতেন।

ধনদা। ভাল-মন্দ বিচারটা বৈষয়িক বুদ্ধি জ্ঞানদা; সংসারের সঙ্গে ও বুদ্ধিটাও বিসর্জন দিয়েছি।

জ্ঞানদা। কালীকে কি আপনি রক্ষা করতে চান?

ধনদা। করতে আমি কিছুই চাই না। তবু আমি না এসে পারলাম না।

জ্ঞানদা। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি এইখান থেকেই ফিরুন।

ধনদা। কেন জ্ঞানদা?

জ্ঞানদা। বিচারের সময় যে সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা উঠবে—

ধনদা। পদ্মর কথা বলছ? (জ্ঞানদা নীরব হইয়া রহিল)

ধনদা। পদ্মর কথা স্বীকার করবার জন্যেই আমি এসেছি জ্ঞানদা।

জ্ঞানদা। সে কথা তো সমস্ত লোকেই জানে।

ধনদা। না, জানে না। তুমিও জান না। জান অর্দ্ধ সত্য। পূর্ণ সত্যকে প্রয়োজন হ'লে সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করতে হবে আমাকে। আমি তো ফিরে যেতে পারব না।

জ্ঞানদা। আমি আপনাকে মিনতি করছি—

ধনদা। ও অনুরোধ ক'রো না জ্ঞানদা, সে হয় না।

জ্ঞানদা। কালীচরণের ওপর আপনার এত মমতা কেন?

ধনদা। মমতা কালীচরণের ওপর নয় জ্ঞানদা। মমতা রায়-বংশের ওপর। রায়-বংশের জন্যেই চিন্তিত হয়ে আমি এখানে এসেছি।

জ্ঞানদা। রায়-বংশের প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও হয় নি বাবা? দাদার মৃত্যুতে—

ধনদা। প্রমদার মৃত্যুর কথা তুমি জান?

জ্ঞানদা। আপনি বলুন, তাতেও কি রায়-বংশের পাপ-মুক্তি হয় নি?

ধনদা। না, হয় নি।

জ্ঞানদা। বাবা!

ধনদা। শুনে সহ্য করবার যদি সাহস থাকে, তবে আদালতে এস। নইলে আমার অনুরোধ, তুমি বাড়ি ফিরে যাও।

নেপথ্যে উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—চুপ! চুপ! সব চুপ!

আমি যাই জ্ঞানদা। বিচার বোধ হয় আরম্ভ হ'ল। তুমি বাড়ি ফিরে যাও জ্ঞানদা।

জ্ঞানদা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া চিন্তা করিল ও দ্রুত প্রস্থান করিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

দায়রা-জজের আদালত। জজ, জুরী, উকিল ও আদালতের কর্মচারী। কাঠগড়ায় কালীচরণ নিস্পন্দ মূর্তির মত দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে সাক্ষীর কাঠগড়া তখনও শূন্য। এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে জ্ঞানদা। সরকারী উকিল বক্তৃতা করিতেছে। পুলিস-ইন্স্পেক্টর, কন্‌ষ্টেবল প্রভৃতি

কালীচরণের চুল সাদা হইয়া গিয়াছে, মুখে চোখে অপরিমেয় শীর্ণতা, তাহার দৃষ্টি শূন্য। ধনদাপ্রসাদ প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইলেন

সরকারী উকিল। ইওর অনার, গত ২৫এ আষাঢ়, এই কালীচরণ বাগদী তার অভ্যাসমত অপেক্ষা করছিল অন্ধকার রাত্রির আবরণে পথের ধারে; সেই সময় এসে পড়ে তার নিজের ছেলে তারাচরণ বাগদী, নরঘাতকের পৈশাচিক নেশায় উন্মত্ত হয়ে কালীচরণ তারাচরণকে হত্যা করেছে। বিচার শেষ হবার পূর্বে শাস্তির

কথা উল্লেখ করবার অধিকার আমার নেই জানি, কিন্তু তবু আমি উল্লেখ না ক'রে পারছি না যে, সভ্যতার অভিনব বিবর্তনের ফলে যে সমস্ত দণ্ড আজ নিষ্ঠুর নৃশংস ব'লে রহিত হয়েছে, সেই শাস্তিও আজ যদি বর্তমান ক্ষেত্রে পুনরায় প্রবর্তিত হয়, তবুও এ অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি হবে না। এক শত বৎসর পূর্বেও আমাদের দেশে ডাকাতি রাহাজানি নরহত্যার অপরাধে, অপরাধীর শরীরকে দ্বিধা-বিভিন্ন ক'রে প্রকাণ্ড রাজপথের পাশে, গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হ'ত। পিতৃমাতৃ-পুত্রকন্যা-হত্যায় হাতীর পায়ের তলায় দিয়ে মারার ব্যবস্থা ছিল। সর্পদংশনের চরমদণ্ডের ব্যবস্থাও বর্তমান ক্ষেত্রে লঘু দণ্ড ব'লেই আমার মনে হয়। ধর্মাবতার! এ পাপ এত বড় পাপ, এত ভীষণ পাপ, যা পৃথিবীও সইতে পারে না—

পদ্ম। (উকিলের কথার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং শুনিতেছিল এবং ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতেছিল। সে এইবার চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সম্মুখে আসিল) না না না। সে আমার পাপ। সে আমার পাপ। সে আমার পাপ। ওগো জজসাহেব, তুমি বিচার কর। আমাকে সাজা দাও।

সরকারী উকিল। কে? কে তুমি?

ইন্‌স্পেক্টর। ইওর অনার, এই মেয়েটি, আসামী যতদিন জেল-হাজতে এসেছে, ততদিন জেল-কম্পাউণ্ডের চারিদিকে চীৎকার ক'রে বেড়ায়। বোধ হয় পাগল।

পদ্ম। না না, আমি পাগল নই। জজসাহেব, আমিই পাপী, তুমি আমার বিচার কর।

জজ। কি বলতে চাও তুমি? তুমি কে?

পদ্ম। আমার নাম পদ্ম।

সরকারী উকিল। তুমি পদ্ম বাগদিনী? ইওর অনার, এ মেয়েটি ওই আসামীর কুলত্যাগিনী ভগ্নী—এ চার্জটি।

পদ্ম। হ্যাঁ হুজুর, আমি পাপ পদ্ম, সর্বনাশী পদ্ম। আমার পাপেই এ সর্বনাশ ঘটেছে হুজুর। তুমি বিচার কর, আমাকে সাজা দাও।

জজ। কি বলছ তুমি? কি করেছ?

পদ্ম। আমি বিধবা মেয়ে, রায়বাবুকে দেখে আমি কেন ভুললাম? আমাকে দেখে রায়বাবুর বড় ছেলে কেন পাগল হয়ে উঠল? দাদা আমাকে ধুলো ঝেড়ে বাড়ি নিয়ে এল, কেন আমি তবু থাকতে পারলাম না? পেটের জ্বালা আমি কেন সইতে পারলাম না? ওগো জজসাহেব, আমি কেন মরতে পারলাম না, কেন মরতে পারলাম না? (বলিতে বলিতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল)

জজ। পুওর গার্ল, আই পিটি হার।

পদ্ম। বিচার কর জজসাহেব, বিচার কর।

জজ। ঈশ্বর সে বিচার করবেন। এখন তুমি যদি এই তারাচরণের খুন সম্বন্ধে কিছু বলতে চাও তো বল। এর সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ?

পদ্ম। বিচার ক'রে দেখ তুমি, এ খুন আমি করেছি।

জয়া। (অগ্রসর হইয়া আসিল) না না। ওই রাক্ষস—ওই খুনে—ওই দৈত্য। আমি নিজের চোখে দেখেছি। জজসাহেব, তুমি বিচার কর।

জজ। ওয়েল, হু ইজ শী?

সরকারী উকিল। এই মেয়েটিই আমাদের প্রধান সাক্ষী, ইওর অনার—মৃত তারাচরণের স্ত্রী, এই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী।

জজ। (জয়ার প্রতি) তুমি এই খুন নিজের চোখে দেখেছ?

জয়া। নিজের চোখে দেখেছি। জজসাহেব—হুজুর, দেখে আমি চীৎকার করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। ছুটে এগিয়ে যেতে চাইলাম, কিন্তু সর্বাঙ্গ থরথর ক'রে কাঁপছিল, মাটিতে প'ড়ে গেলাম, যেতে পারলাম না। তবু হুজুর, চোখ বুজি নি, পলক পড়ে নি, চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল; সমস্ত—সমস্ত আমি নিজের চোখে দেখেছি। ওই—ওই—ওই রাক্ষস তাকে খুন করেছে।

পদ্ম। না না। ব্রহ্মশাপে সর্পাঘাত হয়, বজ্রাঘাত হয়, হুজুর, তার জন্যে

দায়ী কি পাপ, না বাজ? আমি বলছি, আমার পাপে হয়েছে, জজসাহেব, তুমি বিচার কর।

জজ। ইন্‌স্পেক্টর, পদ্মকে তুমি বাইরে নিয়ে যাও।

ইন্‌স্পেক্টর। তুমি বাইরে এস।

পদ্ম। না না না।

ইন্‌স্পেক্টর। কন্‌স্টেব্‌ল!

পদ্ম। না না না, আমি যাব না, আমি যাব না। আমার পাপ।

ধনদা অগ্রসর হইয়া আসিলেন

ধনদা। পদ্ম! অধীর হোস নি।

পদ্ম। এই—এই—জজসাহেব, এই সকল পাপের মূল, এই—এই—

কালী। পদ্ম!

পদ্ম স্তব্ধ হইল

কালী। যা। এখান থেকে যা তুই।

কন্‌স্টেব্‌ল তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল

কালী। তুমিও এসেছ বড়বাবু? (ধনদা মাথা নত করিলেন) বড় খোকাবাবুর শোধ দেখতে এসেছ?

জজ। সেট আস প্রোসিড মিঃ বোস। সাক্ষীকে ডেকে উঠতে বলুন।

ইন্‌স্পেক্টর সাক্ষীর ডকের দরজা খুলিয়া দিল

উকিল। অন্না বাগদিনী, তুমি যাও, ওখানে গিয়ে দাঁড়াও।

কালী। না। তুমি যেও না বউমা। হুজুর—

অন্না। রাক্ষস! খুনে! অতবড় পেট তোর ছেলেকে খেয়েও ভরে নি, এখনও তোর বাঁচতে সাধ?

কালী। হুজুর, আমি নিজেই সব কবুল যাচ্ছি। ছেলেকে আমি খুন করেছি, সে কথা তো আমি গরকবুল যাই নি। তবু তোমরা আমাকে ফাঁসি দেবে না। সব কথা না শুনে—। একটু জল, একটু জল পাব হুজুর?

জজ। ইন্‌স্পেক্টর! (ইন্‌স্পেক্টর দ্রুত চলিয়া গেল)

কালী। ধর্মাবতার!

জজ। অপেক্ষা কর, জল নিয়ে আসছে।

কালী। আর আমি চুপ ক'রে থাকতে পারছি না হুজুর। ঠোঁটার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, তবু আর চুপ ক'রে থাকতে পারছি না।

ইন্‌স্পেক্টর জল লইয়া আসিল, কালী দুই হাত বাড়াইয়া জলের গ্লাস লইয়া নিঃশেষে পান করিল

কালী। হুজুর, মনে করেছিলাম, বংশের কলঙ্কের কথা মরণ পর্যন্ত বলব না। কিন্তু সে না শুনে তোমরা যখন ফাঁসি দেবে না, তখন বলি। হুজুর, বউমা বলেছে, আমার অভর পেট। হ্যাঁ, আমার পেট অভরই বটে। শুধু আমার কেন, আমার বাবার, আমার মায়ের, আমার ঠাকুরদাদার—সবারই পেট অভর। পেটের দায়ে, হুজুর, রায়বাবুদের জন্যে দাঙ্গাবাজি ঘর-জ্বালানো ছিল আমাদের পেশা। বাবুদের চাকরান জমি আমরা ভোগ করতাম। আমার ছেলে তারাচরণের পেট শুধু অভর ছিল না হুজুর, পেটের দায়ে সে লাঠিয়ালি করে নি। সে ছিল কবিয়াল। সে বলত, 'যে বাঁশেতে লাঠি হয় মন, সেই বাঁশে হয় মোহন বাঁশী।' সে লাঠিয়ালি করে নি, তাই রায়বাবু আমাদের চাকরান জমি বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়েছিল। আমি তখন জেলে। ফিরে এসে রায়বাবুর কাছে গেলাম জমির জন্যে, হুজুর, এই অভর পেটের জন্যে। কেন গিয়েছিলাম, আঃ, আমি কেন গিয়েছিলাম! (সে স্তব্ধ হইয়া কাঠগড়ার রেলিঙে মাথা রাখিল)

সরকারী উকিল। কালীচরণ!

কালী। বলতে পারছি না হুজুর, বলতে আমি পারব না।

সরকারী উকিল। আমি জিজ্ঞাসা করছি তোমাকে। তুমি সেখানে গিয়ে দেখলে তোমার বিধবা বোন পদ্মকে? রায়বাবু তাকে ভৈরবী ক'রে নিজের বাগান-বাড়িতে রেখেছিল?

কালী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল

উকিল। দেখে তোমার ইজ্জতে আঘাত লাগল?

কালী। ইজ্জৎ? (হাসিল) ছোটলোকের ইজ্জৎ? হুজুর, গরিবের

ছোটজাতের ঘরে সুন্দরী মেয়ে হ'লে দেবতার নৈবিদ্যির মত বড়-লোকের—উঁচুজাতের নৈবিদ্যি হয়। সে কথা নয়।

জজ। তবে ?

কালী। সে কথা আমি বলতে পারব না। না, আমি বলব না।

ধনদাপ্রসাদ এতক্ষণ স্থির মূর্ত্তির মত বসিয়া ছিলেন, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন

ধনদা। ধর্ম্মাধিকরণের যদি অনুমতি হয়, তবে আমি সে কথা বলব

জজ। তুমি ?

ধনদা। উপস্থিত আমি সন্ন্যাসী। সংসার-জীবনে আমার নাম ছিল ধনদাপ্রসাদ রায়। আমিই ছিলাম সেই জমিদার—রায়বাবু।

সরকারী উকিল জজসাহেবকে কি বলিলেন

জজ। বলুন, আপনি কি বলতে চান বলুন ?

ধনদাপ্রসাদ সাক্ষীর কাঠগড়ায় প্রবেশ করিলেন

ধনদা। মহামান্য বিচারক, আমি সন্ন্যাসী, সত্যই আমার একমাত্র দেবতা। আমি মিথ্যা বলব না। যে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সত্যকে কালীচরণ উচ্চারণ করতে পারছে না, সেই সত্যকে আমি স্বীকার করব। কালীচরণই আমাকে এ সত্য জানিয়েছিল। আমি জানতাম না। আমি জানতাম না যে, রূপমোহে ধর্ম্মের ভানে যে পদ্মকে আমি ব্যভিচারসঙ্গিনী করেছিলাম, সে বাগদিনীর গর্ভে আমারই পিতার ব্যভিচার-পাপের ফল ; সে আমার ভগ্নী।

জজ। মাই গড ! (সমস্ত আদালতে একটা অস্ফুট গুঞ্জন উঠিল)

ধনদা। আমি জানতাম না। প্রথমে বিশ্বাসও করি নি। কিন্তু কালীচরণ দেখিয়ে দিলে আমার মুখে এই জরুল, এই তিল ; পদ্মর মুখেও ঠিক এক জায়গায় এমনই জরুল, এমনই তিল ; কালীর মুখেও দেখলাম তাই। মনে পড়ল, আমার বাবার মুখেও ছিল এমনই জরুল, এমনই তিল। আশ্চর্য্যের কথা হুজুর, পদ্মর মুখের ওই তিলের সৌন্দর্য্যই আমাকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করেছিল। (ধনদাচরণ স্তব্ধ হইলেন)

জজ। আর আপনার কিছু বলবার আছে ?

ধনদা। আছে।

জজ। বলুন।

ধনদা। ধর্ম্মাধিকরণের সম্মুখে সত্যকে আংশিকভাবে গোপন করলে, সেও হবে মিথ্যাচরণের সামিল। ধর্ম্মাবতার, আমার পিতার পাপ, আমার পাপ, তখন বংশধর আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তারও পাপদৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল এই পদ্মর ওপর। বংশের পশুত্ব তার মধ্যে চরমতম উন্মত্ততায় আত্মপ্রকাশ করেছিল—উন্মত্ত পশুতে আর তাতে কোন প্রভেদ ছিল না।

কালী। আমি তাকে জানোয়ারের মতই খুন করেছিলাম।

সরকারী উকিল। প্রমদাবাবুকে তুমি খুন করেছ?

কালী। হ্যাঁ। তার আগে দাঙ্গাবাজিতে লোকের মাথা ফাটিয়েছি, লোক মরেছে, কিন্তু সে তো খুন নয়, সে লড়াই। আর এ—ওঃ—ওঃ—! বড়বাবু, সেদিন তুমি আমাকে অভিসম্পাত দিয়েছিলে। তোমার অভিসম্পাতেই—

ধনদা। না কালীচরণ, না।

কালী। তবে? কেন আমি খুন করলাম তারাচরণকে? সে আমায় 'বাবা' ব'লে ডেকেছিল, কেন আমার মনে হ'ল, বড়খোকাবাবু তোমাকে ডাকছে? হুজুর, ওই ভুলেই আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। রাত্রে যখন পথিক খুন করতাম, তখন প্রতিজনকেই মনে হ'ত বড়খোকাবাবু। সেদিনও অন্ধকার রাত্রে পথের ওপর ব'সে ছিলাম, বাদলায় সর্ব্বাঙ্গ ভিজে হিম হয়ে যাচ্ছিল, ঘন ঘন মদের ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছিলাম। চামড়ার মত পুরু অন্ধকার, তারই মধ্যে হঠাৎ দেখলাম, সাদা কাঠির মত কি নড়ছে। মাথার মধ্যে খেলে গেল—বড়খোকাবাবু। লাফিয়ে উঠলাম, মারলাম ফাবড়া। সে পড়ল। চীৎকার ক'রে উঠল, 'বাবা!' আমি ঠিক শুনলাম বড়খোকাবাবুর আওয়াজ। ছুটে গিয়ে—। আঃ—আঃ—আঃ—!
(অধীর হইয়া উঠিল)

সরকারী উকিল। কালীচরণ! কালীচরণ!

কালী। আঃ—হুজুর, আমি বড়খোকাবাবুকে খুন করেছি, কত পথিক খুন করেছি, শেষে আমার নিজের ছেলেকে খুন করেছি; বিচার কর, আমাকে সাজা দাও, আমাকে ফাঁসি দাও।

আদালত স্তব্ধ

কালী। তবে হুজুর, ফাঁসির আগে একদিন আমাকে পেট ভ'রে খেতে দিও হুজুর। ভাল—খুব ভাল খাবার, অভর পেটে পেট ভ'রে আমাকে খেতে দিও।

জজ। মিঃ ঘোস, আপনার কিছু বক্তব্য থাকলে বলুন।

উকিল। ইওর অনার, এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য কিছু নেই।

জজ। (জুরীদের প্রতি) জেন্ট্‌ল্‌মেন, আসামী নিজেই অপরাধ স্বীকার করেছে। আপনাদের মত?

ফোর্‌ম্যান। ইওর অনার, আসামী দোষী।

কালী। জয় হোক, হুজুরদের জয় হোক।

ফোর্‌ম্যান। কিন্তু হুজুর, আসামীর প্রতি ফাঁসির আদেশের পরিবর্ত্তে, আমরা যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন-দণ্ড দিতে ধর্ম্মাধিকরণকে অনুরোধ করি।

কালী। না না, ফাঁসি, ফাঁসি, হুজুর আমাকে ফাঁসি দাও।

ফোর্‌ম্যান। আসামীর যে পাপ, যে অপরাধ, তার যোগ্য শাস্তির বিধান মানুষের দণ্ডবিধিতে নেই ব'লেই সমগ্র বিশ্বের অদৃশ্য বিচারক নিজে তার দণ্ডবিধান করেছেন। এক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড দিলে ঈশ্বরের বিধানকে লঙ্ঘন করা হবে ব'লে আমরা মনে করি।

জজ। আই অ্যাক্‌সেপ্ট ইওর ভার্‌ডিক্ট।

কালী। ভগবান! ঈশ্বর! বলতে পার হুজুর, আবার যদি পালিয়ে গিয়ে আমি মানুষ খুন করি, তবে তোমাদের ভগবান আমাকে আর কোন্ সাজা দেবে? আর তো আমার তারাচরণ নেই?

জজ। Transportation for life—আসামীর প্রতি যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন-দণ্ডের আদেশ দেওয়া হ'ল।

কালীচরণ পাগলের মত হাসিতে লাগিল

ইন্‌স্পেক্টর। চুপ—চুপ—চুপ কর তুমি।

জজ। ওর মনের আবেগ শেষ করতে দাও ইন্‌স্পেক্টর—সেটুকু দয়া দেখাতে কার্পণ্য ক'রো না।

কালী। দয়া! বিচার! ঈশ্বরের দণ্ড! (হাস্য)

ধনদা। কালী! কালী!

কালী। দয়া! বিচার! ঈশ্বরের দণ্ড! (উচ্চহাস্য)

ধনদা অগ্রসর হইয়া আসিলেন

ধনদা। কালীচরণ!

কালী। বড়বাবু?

ধনদা। চুপ কর, স্থির হ।

কালী। বড়বাবু, তুমি আমার মনিব, আমার ভাই। একটা উপকার কর হুজুর। জজসাহেবকে ব'লে আমার ফাঁসির হুকুম করিয়ে দাও। ফাঁসি। ফাঁসি। বলতে পার, কি ক'রে—কি নিয়ে বেঁচে থাকব আমি?

ধনদা। ভগবানের নামকে স্মরণ কর কালী—

কালী। (চীৎকার করিয়া উঠিল) না না না। তার নাম তুমি আমার কাছে ক'রো না। ছোট জাত—পাপী আমি, তার নাম নিয়ে কি করব? কি হবে? সে আমার কি করেছে? কি দিয়েছে?

ধনদা। না না কালী, ও কথা বলিস নি। তাঁর বিধান—

কালী। তার বিধান? ভগবানের বিধান। (উচ্চহাস্য)

ধনদা। কালী!

কালী। মানি না, মানি না। যে ভগবানের বিধানে তোমার বাবা আমার মাকে ভুলিয়েছিল, তাকে আমি মানি না। যে ভগবানের বিধানে তুমি পদ্মকে ভৈরবী করিয়েছিলে—

ধনদা। কালীচরণ, আমাকে ক্ষমা কর। ওরে, আমাকে তুই ক্ষমা কর।

কালী। যে ভগবানের বিধানে আমাদের বাপের সম্পত্তি সব তুমি পাও, তোমার ছেলেরা পায়, আর আমার চাকরান জমি বাজেয়াপ্ত হয়, তাকে আমি মানি না। যে ভগবানের বিধানে তুমি বামুন, আমি বাগদী; যার বিধানে তোমাদের জমিতে এত ধান, মরে

সিন্দুকে এত আসবাব এত ধন, তোমাদের এত সুখ, আর আমার গড়া ক্ষেত চ'লে যায়, ভাঙা ঘরে জল পড়ে, পোষপার্ব্বণের দিনে পেটের জ্বালায় বোন বেরিয়ে চ'লে যায়, তাকে আমি মানি না। বলতে পার বড়বাবু, তার বিধানে কেন তুমি দুধে ভাতে পেট পুরে খাও, ফেলে দাও, পোষা কুকুরকে দাও, তবু তোমার ফুরোয় না, আর আমি কেন একবেলা আধপেটা খেতে পাই না, স্ত্রীপুত্রের মুখে তুলে দিতে পাই না? কেন? কেন? কেন?

ধনদা। অপরাধ, আমার অপরাধ, আমার পিতৃপুরুষের অপরাধ আমি স্বীকার করছি কালীচরণ। এ বিধান ভগবানের নয়। এ বিধান মানুষের গড়া বিধান। এ বিধান থাকবে না, ভেঙে যাবে। আমি বলছি তোকে, ভেঙে যাবে।

কালী। কবে? কবে? কবে?

ইন্‌স্পেক্টর। (ধনদাকে) আপনি আর কথা বলবেন না। আপনি এখান থেকে চ'লে যান।

ধনদা। কালী, পারিস তো আমায় ক্ষমা করিস ভাই। (প্রস্থান)

ইন্‌স্পেক্টর। এস তুমি।

কালী। (জয়ার দিকে চাহিয়া) বউমা!

জয়া ফিরিয়া চাহিল। সেই মুহূর্তেই বাহিরে শব্দ উঠিল 'খুন! খুন!' এবং শব্দকে ছাপাইয়া ভাসিয়া উঠিল পদ্মের হাস্যধ্বনি। বুকে ছুরিকাবিদ্ধ অবস্থায় ধনদাপ্রসাদ পিছনে হটিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন কনস্টেব্‌ল পদ্মকে ধরিয়া লইয়া প্রবেশ করিল। পদ্ম হা-হা করিয়া হাসিতেছিল

কনস্টেব্‌ল। এই খুন করেছে, এই।

পদ্ম। (হাসিতে হাসিতে) তোমার ছুরি, তোমার বুকেই বসিয়ে দিয়েছি।

কালী। পদ্ম!

ধনদা। (যন্ত্রণার মধ্যে) কালী, এইবার আমাকে ক্ষমা কর কালী।

কালী। (ধনদার পাশে বসিল, তারপর উপরের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল) ভগবান, ভগবান, দয়া কর দয়াময়। ক্ষমা কর ঠাকুর।

বড়বাবুকে ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা কর, পদ্মকে ক্ষমা কর। মানুষকে ক্ষমা কর প্রভু। ভগবান, মানুষকে তুমি হিংসে ভুলিয়ে দাও, তাকে পেট ভ'রে খেতে দাও, তাকে তুমি সুখ দাও, তুমি তার চোখের সামনে থাক। তাকে তুমি শান্তি দাও ঠাকুর।

জয়া। (সেও হঠাৎ নতজানু হইয়া বলিল) ঠাকুর, আমার শ্বশুরকে তুমি ক্ষমা কর ঠাকুর। দয়াময়!

যবনিকা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন

সেদিন—
নিবনিব স্বর্ণদীপদান বাঁকা চাঁদ জেগেছে আকাশে
মিনতির মত শাখে ফুল ফুটেছিল গন্ধ ভেসে আসে
বাঁধা নীড়ে ফিরেছিল পাখী আমলকী-শ্যামল-আরামে
প্রেমের সায়াহ্নখানি ধীরে তোমায় আমায় ঘিরে নামে।
মোর পাশে তুমি ছিলে, ছিলে মোর কাছে, মোর মাঝে তুমি,
মোর ভাল তব চূড়া হতে সিন্দুরের বহ্নি নিল চুমি,
ছুঁয়েছিল মোর কর্ণপাশ ভীরু তব কানে-বলা ভাষা
সহসা শুনিল বিশ্বলোপী—অস্ত এক সন্ধ্যাভরা ভাষা।
“অস্তম্লান হোক কৃষ্ণমায়া, নির্ব্বাণীর জ্বলুক মণিকা,
যে আলো দেখিতে চাও চাও, সে আলোক সূর্য্যে নাই শিখা
যে নীড় বাঁধিতে চাও চাও, সে নীড় বাঁধে নি কোনো পাখী”
প্রেমের সায়াহ্নখানি, প্রিয়ে, এ কি বহ্নিগান গেল রাখি?
সেদিন—
সে তুমি ছিলে না সেথা হায় যে আমারে বারবার ডাকে
যে ফুল ফোটাতে চাই: চাই সে ফুল ফোটে না কোনো শাখে।

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

কঞ্চুক

রায় বাহাদুর লোকেন গুপ্ত অকস্মাৎ নিজেকে অসুস্থ বোধ করলেন।

ফাল্গুনের প্রসন্ন প্রভাত। আকাশে বাতাসে বসন্তের উষ্ণ মদিরতার আমেজ দিলেও দেবতা নগাধিরাজের পায়ের তলায় এই ছোট শহরটিতে অবসিত শীতের মৃদু তীক্ষ্ণতা এখনও জড়িয়ে আছে। শালখানাকে একেবারে পায়ের পাতা পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে রায় বাহাদুর সভোপ্রাপ্ত খবরের কাগজখানা খুলে ব'সে ছিলেন।—রাশিয়ান ফ্রন্ট, টিউনিসিয়া, প্রশান্ত মহাসাগর, বোমাহত কলকাতা।

ডেক-চেয়ারের হাতলে ধূমায়িত কোকোর পেয়ালা ছড়াচ্ছে মিষ্টি চকোলেটের গন্ধ; সম্মুখের লনটা শিশিরে ভেজা নানা জাতের বিলিতী ফুলে একাকার হয়ে আছে—ডালিয়া, ক্যালেণ্ডুলা, লার্কস্পার্ক, ক্রিসান্থিমাম। রঙের অপরূপ সমারোহ। লনের বাইরে কালো পিচের পথ পেরিয়েই ঘোড়দৌড়ের মাঠ, তার ওপারে মরা তিস্তার ধূ ধূ বালু-বিস্তার সকালের কুয়াশায় অস্পষ্ট। সূর্য্যের প্রথম আলোয় সে কুয়াশা যেন অধীর হয়ে গ'লে পড়ছিল।

হঠাৎ তিস্তার দিক থেকে এল একটা কনকনে তীব্র বাতাস। লম্বা-ডাঁটাওলা ফ্লক্স আর লার্কস্পার্কগুলো লুইয়ে পড়ল মাটিতে, থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল ডালিয়ার ভীত পাপড়িগুলি। লোকেন গুপ্তের শুভ্র চুলের মধ্যে খেয়ালীর মত আঙুল বুলিয়ে দিলে, পায়ের কাছে শালের প্রান্তটিকে দুলিয়ে দিলে; কয়েকবার শিথিল হাতের ভেতর দিয়ে খবরের কাগজটা খ'সে পড়ল বুকের ওপর। অর্দ্ধনিমীলিত দুটি চোখে কে যেন দুটি সিল্কের পর্দা নামিয়ে দিলে, বাঁ হাতের আংটিতে গোমেদ পাথরটা ঝিকমিক ক'রে উঠল চকিত জিজ্ঞাসার মত। আর ডেক-চেয়ারের হাতলে মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে ছড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এল সোনালী ফুলকাটা কোকোর পেয়ালাটা।

চুরুট দিতে এসে ব্যাপারটা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করলে মেজ বউ উমা। বললে, চুপ ক'রে কি ভাবছেন বাবা, কোকোটা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। রায় বাহাদুর উত্তর দিলেন না।

ডাক্তারেরা বললেন, অ্যাপোপ্লেক্সি। আর যাওয়ার আগে এই ভেবে আক্ষেপ ক'রে গেলেন যে, শহরের বড়লোকেরা যদি চিকিৎসাপক্ষ করবার কোন সুযোগ না দিয়ে বিনা আড়ম্বরে এই রকম অভদ্রের মত মরতে শুরু করেন, তা হ'লে তাঁদের ব্যবসা তুলে দিতে হবে।

লোকেন গুপ্ত মারা গেলেন। এক্ষেত্রে ঠিক মারা গেলেন বললে আভিধানিক সংজ্ঞাটা খাটো হয়ে যাবে, এই ছোট শহরটির পক্ষে ঘটনাটা ইন্দ্রপতনের মতই গুরুতর এবং শোকাবহ, বিদ্যুৎবেগে খবরটা শুধু শহরময় ছড়িয়ে পড়ল তাই নয়, আধ ঘণ্টার মধ্যে বিদ্যুৎদূত ছুটোছুটি করতে লাগল কাশ্মীর থেকে কুমারিকা পর্যন্ত— ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে।

বাড়ির সামনে মোটরের একটা ছোটখাটো শোভাযাত্রা। চা-বাগানের সেক্রেটারিরা থেকে শুরু ক'রে জেলার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট অবধি সকলে সহানুভূতি জানিয়ে গেলেন। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অকস্মাৎ অজাতশত্রু হয়ে উঠেছেন লোকেন গুপ্ত। সরকারের খয়ের খাঁ ব'লে এতদিন যারা তাঁর নিন্দাবাদ করত, কিংবা গত জেলা-বোর্ডের নির্বাচনে যারা তাঁর নামে অকথ্য রটনা করেছিল, এই মুহূর্তে তাদের শোকোচ্ছ্বাস দেখলে লোকান্তরিত লোকটি কৃতার্থ বোধ করতেন নিশ্চয়ই।

রুমালে চোখ মুছতে মুছতে বড় ছেলে বীরেন গুপ্ত খালি পায়ে বেরিয়ে এলেন। বললেন, আপনাদের অনুমতি নিয়ে তা হ'লে শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করা যাক।

শহরের প্রধান উকিল মোহিনীবাবু দার্শনিকতার সুর টেনে বললেন, হাঁ, যখন চ'লেই গেছেন, তখন নশ্বর দেহটাকে আটকে মুক্তপুরুষকে আর বাধা দেওয়া কেন?

শোকগম্ভীর কণ্ঠে বীরেন বললেন, চ'লে গেছেন, অবশ্য যাওয়ার জন্যে তিনি তৈরি হয়েই ছিলেন। কিন্তু আমরা—

গীতার শ্লোক আবৃত্তি ক'রে মোহিনীবাবু বললেন, পুণ্যাত্মা লোক! আক্ষেপ ক'রে আর কি করবেন বলুন?

আক্ষেপ ক'রে অবশ্য কোনও লাভ নেই, কিন্তু লোকেন গুপ্ত সত্যি সত্যিই যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে ছিলেন না।

চল্লিশ বছর আগে যখন তিনি প্রথম এখানে আসেন, তখনও এই শহরটির ভাল ক'রে পত্তন হয় নি। জঙ্গল আর খানাখন্দ—বর্ষার সময় ঢল-নামা তিস্তার প্রমত্ত আক্ষেপ। তারপর দেখতে দেখতে ছায়াচিত্রের মত অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে বদলে গেল এই শহরের শ্রীছন্দ। বাণিজ্যলক্ষ্মী ডুয়ার্সের চা-বাগানে আঁচল ঝেড়ে দিয়ে গেলেন, তিতিক্ষেত্রের বনিয়াদে মাথা তুলে দাঁড়াল এই পরিপাটি সমৃদ্ধ শহরটি আর সেই সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রায় বাহাদুরও ফেঁপে উঠতে লাগলেন, ওকালতির উপসর্গটা নগণ্য রইল মাত্র।

চল্লিশ বছর কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে। বিদেশ থেকে এসে ভাগ্যকে জয় করবার পথে যে সমস্ত অন্তরায়, তাদের প্রত্যেকটির সঙ্গে অসংকোচে মুখোমুখী হয়েছেন তিনি। তারপর এতকাল সুদীর্ঘ পরিশ্রমের শেষে এই বিশ্রাম, এই পুরস্কার।

তিনটি ছেলে, অযোগ্য অপদার্থ কেউ নয়। বড় ছেলে বীরেন গুপ্ত উকিল, চা-বাগানের কল্যাণে রোজগারের চাড় না থাকলেও তাঁর পসার দিনের পর দিন উঠছে ফলাও হয়ে। মেজ ছেলে হীরেন গুপ্ত এম. বি. ডাক্তার, তা ছাড়া তিন-চারটে চা-বাগানের ডিরেক্টার। ছোট ছেলে নীরেন গুপ্ত কেমিষ্ট্রিতে প্রথম হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছিল, বোমার বিশৃঙ্খলায় কিছুদিনের জন্যে এখানে এসেছে আশ্রয় নিতে।

তিনটি বউ, ছেলেদের পাশে বেমানান নয়। বড় বউ সুলতাই গৃহিণী, দুটি সন্তানের মা হয়েও কিশোরীর মত লঘু ও মনোরম তাঁর স্বাস্থ্য। মেজ বউ উমার ছেলেপুলে নেই, কিন্তু চেহারাটি ভারিক্কী আর গম্ভীর, সংসারের কাজকর্ম তারই তত্ত্বাবধানে। ছোট বউ লাবণ্য

গ্র্যাজুয়েট, মাত্র তিন মাস আগে বিয়ে হয়েছে। গানে হাসিতে এবং অকারণ লঘুতায় সে সমস্ত বাড়িটাকে রেখেছে মুখরিত ক'রে।

লোকেন গুপ্ত বিপত্নীক। জীবনের অর্দ্ধপথে মিসেস গুপ্ত তাঁকে ছেড়ে গেছেন। কিন্তু প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত তখন নিশ্ছিদ্র আর জমাট, পাশ থেকে কে খ'সে পড়ল, ফিরে তাকাবার সময় কি তখন ছিল! ১৯১৬—১৭ সাল। চা-বাগানে বুমিং স্পিরুন চলছে, দাউদাউ ক'রে আগুন জলছে শেয়ারের বাজারে, মৃতপ্রায় বাগানগুলো আকস্মিকভাবে সজীব হয়ে ডিভিডেণ্ড দিতে শুরু করেছে।...কিন্তু এল বার্দ্ধক্য, এল বিরাম, চাব্বিশটা বছর হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সাবানের বুদ্বুদের মত। প্রতিযোগিতা, কোলাহল, কোটা আর কোটেশন; ধুলো আর পেট্রোলের গন্ধ পার হয়ে নীল বাল্বের আলোয় স্নিগ্ধ একটি নিভৃত কক্ষে যখন তিনি নিশ্বাস ফেলার সুযোগ পেলেন, তখন প্রবল একটা শূন্যতায় মনটা উঠল হুহু ক'রে। তিনটি পুত্রবধূ এগিয়ে এল সে শূন্যতা পূর্ণ করতে, সেবায় যত্নে লোকেন গুপ্ত সে ক্ষতিটা ভুলে থাকবার অবকাশ পেলেন।

বিশ্রাম—সারা জীবন সংগ্রামের পর স্নিগ্ধ নির্লিপ্ত বিশ্রাম। দলাদলির ঊর্দ্ধে বিক্ষোভের নেপথ্যে। বাইরের বারান্দায় একখানা ডেক-চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে লোকেন গুপ্ত দেখলেন, নীড়যাত্রী চখা-চখীর পাখার সঙ্গে সঙ্গে তিস্তার বালুচরে নামছে নিস্তরঙ্গ মলিন সন্ধ্যা—তাঁর চিন্তাচঞ্চল ক্লান্ত মস্তিষ্কে বৈরাগ্যের একটা প্রগাঢ় শান্তির মত। এই অনাসক্ত নির্লিপ্তের মাঝখানে লোকেন গুপ্ত আরও কয়েকটি দিন বাঁচতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন মধুর আলস্যের আরও কয়েকটি শিথিল মুহূর্ত্ত।

এই তো কাল রাত্রের কথা। সন্ধ্যায় রায় বাহাদুরের অন্তঃপুরে একটা আসর বসেছিল। বিরাট এবং ব্যাপক কিছু নয়, নিতান্তই ঘরোয়া আসর। এই সব ছোটখাটো আনন্দ-চক্রে সমস্ত মন মুক্ত ক'রে দেওয়া লোকেন গুপ্ত অত্যন্ত পছন্দ করেন, সাংসারিক সম্পর্কগুলো এখানে যেন মুক্ততায় অনেকটা সহজ হয়ে আসে। পুত্র বা পুত্রবধূর

সঙ্গে সব সময়ে একটা সম্মানজনক দূরত্ব বাঁচিয়ে চলবার মত রক্ষণশীলতা তাঁর ছিল না।

কিছুদিন থেকেই রায় বাহাদুরের শরীর ভাল নয়। একটা চেঞ্জের কথা চলছিল। ঘরের কাছেই দার্জিলিং জেলায় তিনটে ছোট বড় শহর, কিন্তু ছেঁড়া জুতোর মতই বহুপরিচিত আর বিরক্তিকর। নাইনিতাল, ওয়ালটেয়ার, মসৌরী, দেরাদুন, এমন কি সিমুলতলা পর্যন্ত আলোচনা চলতে লাগল, কিন্তু কোনটাই আমল পেল না।

মেজ ছেলে হীরেনই সমস্ত সমস্যার সমাধান করলেন শেষে। তিনি ডাক্তার মানুষ, তাই তাঁর মতামতে একটা চরম সিদ্ধান্তের ভাব আছে। গম্ভীর স্বরে বললেন, ওসব ফ্যাশানেব্‌ল স্যানাটোরিয়াম মানেই টাকার শ্রাদ্ধ। কাজ কতটা হবে সে তো দেখা চাই। আমার মতে, মেডিক্যাল অ্যাড্‌ভাইসের দিক থেকে, পুরী গেলেই সব-চাইতে ভাল হবে।

সুলতা ইতস্তত ক'রে বললেন, পুরী? বড্ড পুরনো হয়ে গেছে না?

পুরনো! হীরেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, পুরনো ঘিয়ের কদর বোঝ? পুরনো তেঁতুলের অ্যাকটিভিটি জান? সার্জারি হচ্ছে ডাক্তারী বিদ্যের সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন, কিন্তু—

সুলতার মুখে ভীতি প্রকাশ পেল, আমার ঘাট হয়েছে ঠাকুরপো।

রায় বাহাদুর স্মিত হাস্যে বললেন, তা পুরীই ভাল। সমুদ্রস্নান হবে, তা ছাড়া দারু-ব্রহ্মও আছেন। জীবনের দিনগুলো তো কাছিয়ে এসেছে, এই ফাঁকে কিছু পুণ্য অর্জন ক'রে নিলে মন্দ কি?

লাবণ্য রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। এক কোণে অর্গ্যানটা নিয়ে টুংটাং ক'রে কিছু একটা বাজাবার চেষ্টা করছিল, এতক্ষণে উঠে এল। বললে, পুরী! সমুদ্র! কী ভীষণ! গ্র্যাণ্ড! আচ্ছা মেজদি, কীট্‌সের সেই লাইনগুলো তোমার মনে আছে—একটি উন্মুক্ত বাতায়ন, আর তার সামনে উচ্ছ্বসিত ফেনিল সমুদ্র?

এতক্ষণ উমা তার সরল চোখ দুটি বিস্ফারিত ক'রে সমস্ত আলোচনা শুনছিল। গ্রামের এবং গরিবের মেয়ে, লেখাপড়া বিশেষ শেখবার

সুযোগ পায় নি। শুধু রূপের দিক বিচার ক'রেই রায় বাহাদুর তাকে ঘরে এনেছিলেন। লঘু পরিহাসের ভেতর লাবণ্য মাঝে মাঝে এই ভাবে তার নিরক্ষরতাকে কটাক্ষ করে।

জানি না, যাঃ।

জান না? আচ্ছা, উডহাউসের The girl who was too simple পড় নি? ভীষণ! গ্র্যাণ্ড গল্পটা মেজদি, ঠিক তোমার সঙ্গে মিলে যায়।

আবার? তোর 'ভীষণ, গ্র্যাণ্ড' নিয়ে আমাকে তুই এই ভাবে জালাবি নাকি? উমার কণ্ঠস্বর করুণ হয়ে এল, বললে, আপনার বি. এ. পাস বউমাকে আমার সঙ্গে লাগতে বারণ ক'রে দিন বাবা।

রায় বাহাদুর সহাস্যে বললেন, সত্যিই তো, কি অন্যায়!

অন্যায়? তা হ'লে তুমি চ'টে গেছ মেজদি! বাস্তবিক চটলে কি ভীষণ গ্র্যাণ্ড দেখায় তোমাকে! লাবণ্য এগিয়ে এসে দু হাতে উমার গলা জড়িয়ে ধরলে, আমার ওপর রাগ ক'রে তুমি থাকতে পার? পার তুমি?

উমা হেসে ফেলে বললে, এটা একেবারে পাগল।

সুলতা সস্নেহে বললেন, দুটোতে জমেছে ভাল। দিন রাত ঝগড়া আর ভাব।

বীরেন এতক্ষণ গভীর মনোযোগ দিয়ে টাইম-টেব্‌লের সমুদ্রমন্থন করছিলেন। চোখ তুলে বললেন, বেশ, তা হ'লে পুরীতেই যাওয়া যাক। আমার এক ক্লায়েন্ট আছে ওখানে—স্বর্গদ্বারের ওপর, তার মস্ত খালি বাড়ি, সেখানেই টেলিগ্রাম ক'রে দিই, কি বলেন?

রায় বাহাদুর বললেন, দাও।

হীরেন চিন্তিত মুখে বললেন, আমার মনে হয়, মেডিক্যাল স্ট্যাণ্ড পয়েণ্টে—

সুলতা বাধা দিয়ে বললেন, দোহাই ঠাকুরপো, তোমার কি মনে হয়, তা শুনিয়ে আমাদের আর ভয় পাইয়ে দিও না, ওসব তোমার রুগীদের জন্যেও বরং।

পরম ঔদার্য্যভরে অনুকম্পার হাসি হাসলেন হীরেন।

উমা এর মধ্যে কখন নীরেনকে তার পড়বার ঘর থেকে টেনে এনেছে। বড় বড় চুল, চশমার কাচ এক ইঞ্চি পুরু। শামুকের মত ঘরের কোণে নিজেকে সংকুচিত ক'রে রেখে ডি. এস-সি. পাবার অক্লান্ত সাধনা চলছে তার।

আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমার মতলবটা কি, শুনি? অত পড়লে মানুষ যে পাগল হয়ে যায়, জান না বুঝি?

জানি, জানি। কিন্তু নোটটা শেষ করতে দাও বউদি।

বীরেন লঘুভাবে ধমক দিলেন।

একটু বিশ্রাম কর্ তো নীরু। তাতে তোর ডক্টরেট আটকে থাকবে না। দু দিনের জন্যে এসেছিস, কোথায় একটু রিক্রিয়েশন হবে, তা নয়—

এক্জ্যাক্টলি! হীরেন কথাটাকে ধ'রে ফেললেন, ব্রেনকে ওভারট্যাক্স ক'রে শেষে একটা কাণ্ড ঘটাবি তুই। এমনিতেই শরীর যা দেখছি, ক্যাল্সিয়াম তো এক্ষুনি দরকার। আমি বরং কাল থেকে তোকে প্রেস্ক্রিপশন ক'রে দোব একটা।

নীরেন সভয়ে বললে, না, প্রেস্ক্রিপশনের কোনও দরকার হয় নি এখনও।

বীরেন বললেন, সবাই মিলে পুরী যাওয়ার প্রোগ্রাম হয়ে গেল তিন মাসের মত। নেহাৎ মন্দ হবে না বোধ হয়। তোর কোনও আপত্তি নেই তো?

আমার? আমার আবার কি আপত্তি? পুরী, সে বেশ তো। নীরেন যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল।

বাঃ, যাচ্ছ যে? আবার বই মুখে নিয়ে বসবার মতলব, না? উমা ধমকে উঠল, ওসব চলবে না, লুডো খেলতে হবে এখন।

লুডো? শেষ পর্যন্ত লুডো খেলব তোমাদের সঙ্গে! কিন্তু জেতবার দুরাশা এতটুকু আছে নাকি?

কি, জিতব না? চুরি করবে ভেবেছ বুঝি? আচ্ছা এস তো

দেখি। বড়দি, তুমি ব'স ঠাকুরপোর সঙ্গে, আমি আর ছোট এক দলে। বাবা, আপনি দেখবেন কিন্তু, ঠাকুরপো ভীষণ চুরি করে।

রায় বাহাদুর হাসলেন। আনন্দে আর তৃপ্তিতে মনের প্রান্তগুলি উছলে পড়ছে। স্বাচ্ছন্দ্যে, বিশ্বাসে আর ভালবাসায় গড়া একটি আদর্শ সংসার। কোথাও অভিযোগ নেই, অপূর্ণতা নেই কোনখানে। সারা জীবন ধ'রে, তিনি এমনই একটি স্বপ্নমধুর কোমল বিশ্রামেরই প্রত্যাশা করেছিলেন বুঝি। একটি আদর্শ সংসার। রত্নের মত তিনটি ছেলে, লক্ষ্মীর মত তিনটি বউ। সহসা তাঁর মনে প'ড়ে গেল, বয়স বড় বেশি হয়েছে, দেহের শিরাপেশীগুলি বড় বেশি এসেছে শিথিল হয়ে। নীল বাল্‌বের আলোয় ঠাণ্ডা এই ঘরটি, বাইরের বারান্দায় অর্কিডের ওই কম্পিত ছায়াগুলো, খোলা জানলা দিয়ে ভিতার স্নিগ্ধ বাতাস, অন্তঃপুরের এই মধুচক্র, বড় তাড়াতাড়ি, বড় নির্মমভাবে ফুরিয়ে যাবে তারা। এক নিশ্বাসে বুকের মধ্যে অনেকখানি বাতাস টেনে নিলেন লোকেন গুপ্ত। তাঁর বাঁচতে ইচ্ছা করছে, অদ্ভুতভাবে বাঁচতে ইচ্ছা করছে, আজ দীর্ঘ দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, অফুরন্ত কাল ধ'রে অব্যাহতভাবে।

কিন্তু পরের দিন সকালেই লোকেন গুপ্ত মারা গেলেন।

বাইরে লোকের ভিড় বাড়তে শুরু হয়েছে। শহরে এতবড় একটা বিরাট ব্যাপার অনেকদিন ঘটে নি। ইন্দ্রপতন। সামনের লনটা নানা স্তরের লোকে বোঝাই হয়ে গেছে।

চন্দনকাঠ বোধ হয় পাওয়া যাবে না, তবুও তার জন্যে ছুটোছুটির বিরাম নেই। কোথা থেকে এর মধ্যেই সংকীর্তনের দল এসে পড়েছে একটা, ঊর্ধ্ববাহু নৃত্যের সঙ্গে গান চলেছে তাদের—

"অন্তকালে গৌরহরি
শরণ দিও ওই চরণে—"

রায় বাহাদুর লোকেন গুপ্তের মৃত্যু। বিনা আড়ম্বরে এতবড় অনুষ্ঠানটা কোনও মতে ঘটতে পারে না। আজকালকার দিনে তামার

পয়সা দুর্লভ, তবুও পঞ্চাশ টাকার খুচরো যথাসম্ভব ভাঙিয়ে আনা হয়েছে। শবযাত্রার পথে পথে ছড়িয়ে যেতে হবে।

কর্ত্তব্য এখানে প্রবল, অতএব শোকের সময় নয়। তাই হীরেন গুপ্ত এ অবস্থাতেও যতটা সম্ভব, সব দেখাশোনা ক'রে বেড়াচ্ছেন। আর রায় বাহাদুরের পায়ের কাছে মাথা নত ক'রে স্তব্ধ হয়ে ব'সে আছে নীরেন।

টেলিগ্রাম। এর মধ্যেই কণ্ডোলেন্স টেলিগ্রাম আসতে শুরু হয়েছে, সহানুভূতি জানিয়েছেন বাংলার প্রধান মন্ত্রী। লোকেন গুপ্তের জীবনের চাইতে মৃত্যুটাকে কম গৌরবময় বলা ঠিক নয়, হয়তো বা বেশিই।

এরই মধ্যে এক ফাঁকে বীরেন এসে অন্তঃপুরে দেখা দিলেন।

শুনছ?

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুলতা। বললেন, ডাকছিলে? এই যে, গীতা আর নামাবলী বের ক'রে আনলুম। আর কিছু লাগবে কি?

বলছি। সতর্ক চোখে বীরেন চারদিকে তাকালেন একবার। বাইরে কোলাহল বেড়েই চলেছে, রায় বাহাদুরের মৃত্যুটা শহরের পক্ষে ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকবে নিশ্চয়ই। কীর্ত্তনের ধুয়াটা প্রবলভাবে শোনা যাচ্ছে—অন্তকালে শরণ দিও গৌর হে, গৌর হে—

না, কোথাও কেউ নেই। বীরেন চাপা গলায় বললেন, বাবার আয়রন-সেফের চাবিটা তোমার কাছে আছে তো?

সুলতার শোকার্ত্ত মুখে বিস্ময় প্রকাশ পেল।

আছে। কিন্তু এখন চাবি দিয়ে কি হবে?

কাজ আছে।

সুলতা আর প্রশ্ন করলেন না। চাবি খুলে দিতেই রায় বাহাদুরের শোবার ঘরের দিকে নিঃশব্দপদে বীরেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মন্থর গতিতে উমা এসে দর্শন দিলে। আসন্ন বর্ষণের জমাট কালো মেঘের মত থমথম করছে তার গম্ভীর মুখ। লোকে তাকে যতখানি বোকা ভাবে, সত্যি সত্যিই ততখানি বোকা তা হ'লে সে নয়।

তুমি ওঁকে কি খুলে দিলে বড়দি?

সুলতা ভ্রূকুটি করলেন, শুভ্র সুন্দর ললাটে বিরক্তির রেখা। বললেন, কি আর দোব?

উমার কণ্ঠস্বর তিক্ত আর সন্দিগ্ধ শোনাল, বাবার আয়রন-সেফের চাবি, তাই না?

সুলতা বিরক্তি দমনের চেষ্টা করলেন না, বেশ তো, তাতেই বা ক্ষতি কি?

ক্ষতি? না, ক্ষতি কিছুই নেই। উমার সমস্ত মুখ হিংসায় কদাকার হয়ে উঠল, বললে, কিন্তু এভাবে আর দুজনকে কি ফাঁকি দেওয়া উচিত? এতে কি ভাল হবে?

সুলতার দুই চোখে বিদ্যুৎ জ্বলতে লাগল।

শবযাত্রার সমস্ত আয়োজন তৈরি। চন্দনকাঠের ব্যবস্থাও হয়ে গেছে একরকম। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সবাই শবানুগমন করবেন।

ফুল দিয়ে সাজানো হচ্ছে রায় বাহাদুরের দেহ। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দিশী বিলিতী ফুলের আবরণ। প্রশান্ত মুখের ওপর সূর্য্যের আলো ছড়িয়ে আছে, রূপোর মত জ্বলছে শুভ্র চুলগুলি। জীবনের পরিপূর্ণ তৃপ্তির মাঝখানে রায় বাহাদুর ঘুমিয়ে পড়েছেন। সমস্ত কর্ম্মের অবসান, সমস্ত চাঞ্চল্য আজ নির্ব্বাপিত, এমন কি হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বল আলোড়নটি পর্য্যন্ত। মৃত্যু নয়, নির্ব্বাণ।

সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়ায় বাতাস ভ'রে উঠছে। সংকীর্ত্তনের দলটা ভাবের ঝোঁকে যেন মাতামাতি করছে একেবারে। মণ্ডলঘাটের শ্মশানে যেতে হবে, অনেকটা পথ। বেলা বাড়ছে, আর দেরি করা চলে না।

লাবণ্যের তাগিদে নীরেন একবার উঠে এল অন্তঃপুরে। রায় বাহাদুরের এই আকস্মিক মৃত্যুটা এখনও সমস্ত শিরা-স্নায়ুর উপর ক্রিয়া করছে তার। মায়ের কথা তার মনে পড়ে না, শৈশব-বাল্যের স্নেহ-বুভুক্ষু মনটা তার তৃপ্তি পেয়েছে বাপের সাহচর্য্যে। সেই স্নেহ, সেই

ভালবাসার উৎসটা আজ সত্যিই যে রুদ্ধ হয়ে গেল, বৈজ্ঞানিক নীরেন এখনও যেন সেটাকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

এমন অসময়ে কি প্রয়োজন থাকতে পারে লাবণ্যের? ছেলে-মানুষিরও তো একটা সীমা থাকা দরকার!

কিন্তু লাবণ্য ছেলেমানুষ নয়।

ধারালো ক্ষুরের ফলার মত তার কথাগুলো নীরেনের মোহাচ্ছন্ন মনের ওপর এসে পড়ল, ওদিকে আয়রন-সেফের চাবি নিয়ে ভেতরে কি কাণ্ড হচ্ছে জান?

নির্ব্বোধ বিস্ময়ে নীরেন বললে, না।

তুমি তো কিছু জানবেই না। কিন্তু এঁরা যে সব ভাগাভাগি ক'রে নিচ্ছেন, এখনও কি চোখ বুজেই থাকতে হবে?

নীরেনের সমস্ত মুখ কঠিন হয়ে উঠল পাথরের মত। ঘৃণায় সমস্ত মনটা শিউরে উঠছে, যেন একটা ক্লেদাক্ত সরীসৃপ তার গায়ের ওপর দিয়ে চ'লে গেল কিলবিল ক'রে।

এসব কথা ভাববার এইটেই কি উপযুক্ত সময়? তা ছাড়া তুমি শিক্ষিতা মেয়ে লাবণ্য। লাবণ্যের কণ্ঠস্বরে প্রখর উগ্রতা উঠল পরিস্ফুট হয়ে, বললে, শিক্ষিতা ব'লেই কি ইডিয়ট হতে হবে? এ সব নোংরা আবহাওয়া আর কতদিন স্ট্যাণ্ড করা চলে; চোখে ধূলো দিয়ে সব ঠকিয়ে নেবে, কিন্তু মুখ গুঁজে ব'সে থাকব, কথাটি অবধি কইব না, সেণ্ট পলের মত অমন বিরাট উদারতা আমার নেই।

নীরেনের সর্ব্বাঙ্গে যেন ভয়ঙ্কর একটা ঝড় ভেঙে পড়বার উপক্রম করছে; কঠিন তার হাতের মুঠি। কিন্তু নীরেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী ছাত্র, আর লঙ-ম্যারেজের স্ত্রী লাবণ্য। জীবনটাও প্রাগৈতিহাসিক রুচিতে আর স্বীকৃত নয়, তাই স্ত্রীর দিকে একটা জলন্ত দৃষ্টিই কেবল ছুঁড়ে দিয়ে নিরুত্তরে বেরিয়ে গেল নীরেন।

সংকীর্ত্তনের প্রবল কোলাহলে আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রে এগিয়ে চলেছে শবযাত্রীর দল। চন্দনের আর ফুলের মালায় সজ্জিত খাট

বাহাদুরের প্রসন্ন মুখশ্রী নিরুদ্বেগ তৃপ্তিতে যেন ঘুমিয়ে আছে। বুকে গীতার ওপর হাত দুখানা একসঙ্গে জড়ো করা, আংটিতে গেরিমাটি-রঙা গোমেদ পাথরের টুকরোটা জ্ব'লে জ্ব'লে উঠছে বিস্মিত জিজ্ঞাসার মত। ধূপের সুগন্ধি ধোঁয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন।

তিস্তার দিক থেকে উঠে এসেছে শনশনে একটা ঠাণ্ডা বাতাস। ক্রিসান্থিমাম, জিনিয়া আর জিরেনিয়ামে সাত রঙের দোলা। শূন্য ডেক-চেয়ারটার পাশে এতক্ষণের অলক্ষিত খবরের কাগজটা সেই বাতাসে খসখস ক'রে উড়ে যাচ্ছে।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

রবার

রবার দেখেছ, ভুল কাটাকুটি যা ঘষিয়া ফেল তুলে,
সে রবার নয়, নয় তা যা থাকে মোটরে ট্রেনে ও ট্রামে,
এ সেই বস্তু—যত টানো বাড়ে, ফুঁয়ে ফেটে যায় ফুলে
কাটিবার আগে কেহ নাহি জানে কখন বৃদ্ধি থামে।
দেখ নাই ? তবে দেখ আমাদের, রবার-বন্দী মোরা,
যত টানিতেছ তত বাড়িতেছি, কাণ্ড এ অদ্ভুত,
পাঁচ টাকা চাল চল্লিশ হ'ল ধুতি বারো টাকা জোড়া,
যত বাড়ে টান তত সহি, কভি একটু বা খুঁত খুঁত।
চালে ও আটায় তেলে কয়লায় খাদ্যে ও পরিধেয়ে
টানে টানে মোরা বেলুনের মত ফুলিয়া হয়েছি ঢোল,
সুতার বাঁধন কেউ যদি কাটে ফেলিব আকাশ ছেয়ে—
তারপর চিরগঙ্গাপ্রাপ্তি, বল হরি হরিবোল।
অতএব রবার, মোদের সবার আমরাই গাহি জয়,
ফুলিবার মত ফুলেছি—ঘটুক কণ্টক-পরিচয়।

প্রাচীন পারসীক হইতে

১

সেদিন দাঁড়ালে তুমি দর্পণের পাশে,
মুকুরে পড়িল ছায়া, সে এক বিস্ময় !
ধূর্জটির স্বপ্নে-গড়া মানসেতে ভাসে
পদ্ম যেন সহস্রদলের । মৃন্ময়
চরাচরে উদ্ভাসিল যেন অকস্মাৎ
সদ্যস্ফুট বিশ্বশতদল । বিধাতার
চিত্তে যেন উন্মেষিল আদি-ব্যাকুলতা
সৃষ্টির প্রয়াসে । যেন লাবণ্য তোমার
তোমা হতে ভিন্ন হয়ে করে দৃষ্টিপাত
মুখে তব । কি বিস্ময়, পরম মত্ততা !

উত্তর সমুদ্রে কোন্ মেরুর তপন
চেয়ে থাকে আপনার মুগ্ধ ছায়াপানে
সেখানে নাহিক ভেদ বাস্তব, স্বপন,
ছায়া যেথা সত্যান্তর কবিরা তা জানে ।

২

তোমার চুম্বন, সখী, পরশমাণিক
লাগায়েছে চক্ষে মোর ; তাই দশদিক
বিকাশে প্রণয়-স্বপ্ন কুঙ্কুম-বিন্দুর
বনান্তের পাড়-টানা শুভ্র দিগ্বধূর
অম্লান ললাটে ; মাটির ধরিত্রী এই
অনায়াস কৌতূহলে হ'ল মুহূর্তেই
স্বর্ণমৃগ ; অকস্মাৎ গোধূলির চেলি
শর্বরীর স্বয়ম্বরে কে দিল রে মেলি ?

পরশ-মাণিক স্পর্শে এ কি হ'ল আজ !
আকাশে ছড়ায় কেন নক্ষত্রের লাজ ?
উদয়-সীমান্তে চলে অপ্সরীর দল
মেঘে মেঘে নিঙাড়িয়া সিক্ত চেলাঞ্চল
মানস-সায়র-জলে । পরশমাণিক
স্পর্শিয়া করেছে মোরে তোমার মাণিক ।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

"শনিবারের চিঠি" সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

"পঁচিশে বৈশাখ" নানা জায়গায় রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব হয়ে গেল। ঠিকই হয়েছে। মহাপুরুষেরা মরণ-সাগরপারেও অমর; তাঁদের আবির্ভাবের দিনটিই স্মরণীয়; আমাদের দেশের প্রথাও তাই। কিন্তু দুঃখ এই যে, রবীন্দ্র-জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানগুলির অধিকাংশই শ্রদ্ধাবুদ্ধির অভাবে সংযম-শালীনতা-বঞ্চিত; রবীন্দ্রনাথের নামের অজুহাতে অনুষ্ঠাতাদের আপন বা প্রতিষ্ঠানের নামটাকেই বড় ক'রে তোলবার চেষ্টামাত্র। দৃষ্টান্ত দিই।

বেশীর ভাগ উৎসবের বিবরণ খবরের কাগজে যা বেরিয়েছে, তা প'ড়ে দেখা গেল, আমাদের সভাসমিতিতে নূতন একটি পদের সৃষ্টি হয়েছে; সে পদধারীর নাম "প্রধান অতিথি"। রবীন্দ্র-জন্মতিথিতে আবার 'অতিথি' কি? সেই পুণ্যতিথিই তো অতিথি,—অতিথি তো সেদিন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর কোলে। আর রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে তিনি ছাড়া আবার "প্রধান"ই বা কে? বাকী যাঁরা, তাঁর কাছে তাঁরা সবাই তো সমান। আর সবাই সমান যেখানে, সেখানে কোন ব্যক্তিকে বিশেষ পদ-মর্যাদাদানের অর্থই বা কি, সার্থকতাই বা কি? মীরাবাঈ বৃন্দাবনে জীবগোস্বামীর দর্শনপ্রার্থিনী হ'লে গোঁসাইজী বলেন যে, তিনি তো 'প্রকৃতি'র মুখ দেখতে পারেন না। মীরাবাঈয়ের কানে সে কথা গেলে তিনি ব'লে পাঠান, বৃন্দাবনে সবই তো 'প্রকৃতি', 'পুরুষ' তো সেখানে একমাত্র তিনি—শ্রীকৃষ্ণ। রবীন্দ্র-জন্মোৎসবেও সেই কথা খাটে; সেখানে "প্রধান" অপ্রধান নেই,—কেন না তাঁর কাছে তো সবাই সমান;—হোন না কেন "প্রধান অতিথি" শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী-মশাই, কি হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ-মশাই কি শ্রীমান সজনীকান্ত দাস! রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে কবিকে ছাড়া আর কাউকে বিশেষ সম্মান দান নিতান্ত অশোভন ও একান্ত বিসদৃশ এ-কথাটাও কি ব'লে দিতে হবে? এ উৎসব কি একটা ভোজের ব্যাপার যে, একজন "Chief Guest" থাকবেন? আমরা যা কিছু করি তারই মধ্যে বিলাতী কায়দা একটু না ঢোকাতে পারলে সুখ পাই না। রবীন্দ্র-জন্মোৎসবেও কি শেষে তাই হবে?

এবার কবির জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানে সাত-আট জায়গা থেকে নিমন্ত্রণ-পত্র এসেছে। তার মধ্যে অনেকগুলির ন্যাকামির গন্ধে-মেশা আধ-আধ ভাষা বিরবিরা জাগায়। কিন্তু তার চাইতেও বেশী পীড়া দেয়—সব কিছু ছাড়িয়ে, সব কিছু ছাপিয়ে অনুষ্ঠাতাদের আত্মঘোষণা। একটি দৃষ্টান্ত দিই। প্রতিষ্ঠানটির নাম ও স্থান বাদ দিয়ে নিমন্ত্রণ-পত্রটির অবিকল নকল নীচে ক'রে দিলাম। আমন্ত্রণলিপির—

১ম পৃষ্ঠায়—প্রতিষ্ঠানের নাম। তার নীচে অজ্ঞাতনামা একজনের হস্তাক্ষরে লাইন-ব্লকে ছাপা দু'লাইন কবিতা :—

"রৌদ্র চেয়ে তারকিনী অমানিশা বেশি দীপ্তিমতী
নিঃশব্দ শুভ্রতা চেয়ে কালো লেখা ভাস্বর, শাশ্বতী।"

অবশ্য ব'লে দিতে হবে না কাউকে যে এ কবিতা রবীন্দ্রনাথের নয়। দেখা যাচ্ছে অনুষ্ঠাতারা আর যাই করুন, গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজায় বিশ্বাস করেন না।

২য় পৃষ্ঠায়—কালো মোটা বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছে এই নামগুলি—

সভাপতি—শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত

অনুষ্ঠানে মাঙ্গলিক পাঠ—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

উদ্বোধক—শ্রীশিশির ভাদুড়ী

প্রধান অতিথি—শ্রীসজনীকান্ত দাস।

সভায় উপস্থিত থাকবেন—

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
শ্রীবুদ্ধদেব বসু
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীপরিমল দাশ
শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য
শ্রীবাণী রায়
শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রাক্তন সচিব শ্রীনিকেতন।
মিস্ লায়লা খান্
শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ সোম

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীপ্রতিভা বসু
শ্রীপ্রবোধ সান্যাল
শ্রীনীরদরঞ্জন দাসগুপ্ত
শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
কবি গোলাম মোস্তাফা
মিঃ কে, রায়, আই-সি-এস্।

সঙ্গীতাংশে—
অধ্যাপক—শ্রীসমরেশ চৌধুরী
শ্রীরবীন্দ্রমোহন বসু
গীতশ্রী—শ্রাবণী চট্টোপাধ্যায়।

৩য় পৃষ্ঠায়—উপরের নামাবলী যে-হরফে ছাপা হয়েছে, তার চাইতে অনেক ছোট হরফে ছাপা রয়েছে—

১৪ • • • রোড

সুধী,

'চিরনূতনের দিল ডাক

পঁচিশে বৈশাখ'

—ঐদিন সংগোষ্ঠী যোগদান ক'রে উৎসবকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলুন—এই কামনা করি।

সাহিত্যচক্রের পক্ষে
• • • মুখোপাধ্যায়,
সভাপতি

স্থান—• • •, সিনেমাগৃহ

কাল—সকাল ৯টা (৯ই মে রবিবার)

রূপ—পঁচিশে বোশেখ উৎসব

সভাপতির নামটি ও স্থানটি মোটা কালো হরফে ছাপা হয়েছে, বাকী সব ছোট টাইপে।

সব দেখে শুনে বলতে ইচ্ছে করে, হায় রে! যাঁরা রবীন্দ্রনাথের "পঁচিশে বৈশাখ" (পূরবী) কবিতার দু'লাইন নির্ভুল উদ্ধার করতে পারেন না, তাঁরা করছেন তাঁর জন্মোৎসব!

যাঁদের সভাসৌষ্ঠববর্দ্ধনের জন্য একজন সাহিত্যিক সভাপতিকে দিয়ে কুলোয় না; চাই আবার 'মাঙ্গলিক' পাঠের জন্য একজন সাংবাদিক (যাতে খবরের কাগজে রিপোর্টটা ভাল বের হয়); চাই 'উদ্বোধক' রূপে একজন নট (যাতে থিয়েটার-পাগলা লোকগুলিও জালে ধরা পড়ে), চাই "শনিবারের চিঠি"র সম্পাদককে 'প্রধান অতিথি' রূপে (যাতে দুর্মুখের মুখ বন্ধ হয়),—যাঁদের এত ফন্দি-ফিকির, তাঁদের রবীন্দ্র-জন্মোৎসবকে একটা হুজুগ ছাড়া আর কি বলব?

যাঁদের রবীন্দ্র-জন্মোৎসব-সভায় লোক আকর্ষণের জন্ত কারা কারা সেখানে উপস্থিত থাকবেন, ছাপতে হয় তাঁদেরও নাম—এই এক নতুন কায়দা দেখলাম—তাঁরা করছেন কবির প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন! আর সেই 'লিষ্টি'র মধ্যে নেই কে? একজন জজ-ম্যাজি 'আই-সি-এস' আছেন; "কবিতা"র সম্পাদক আছেন; তাঁর পরম সুহৃৎ "শনিবারের চিঠি"র কর্তা তো 'প্রধান' হয়েই আছেন (তবু কিন্তু বুদ্ধদেব বসু সস্ত্রীক সভা থেকে উঠে আসেন নি!); হিন্দু আছেন, মুসলমান আছেন, এমন কি জেনানাও আছেন। নিমন্ত্রণপত্রে সব কিছুই আছে, কিন্তু যাঁর জন্মতিথি-উৎসব তিনি কোথায় খুঁজে বার করুন তো! তিনি ঐ তৃতীয় পৃষ্ঠার এক কোণে কোন রকমে স্থান পেয়েছেন—আপন কবিতার ছন্দ-পতিত দুর্দশায় নিতান্ত ম্রিয়মাণ অবস্থায়।

সম্পাদক-মশায়, রবীন্দ্র-জন্মোৎসব কি শেষে স্কুল-কলেজের ছেলেদের সরস্বতী-পূজায় সামিল হবে? এবং ভবদীয় "প্রধান-আতিথেয়"?

২৬শে বৈশাখ, ১৩৫০ অমল হোম

[মহামান্ত জুলিয়াস সীজারকে মহামতি ব্রুটাস যখন আঘাত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মুখভঙ্গি কিরূপ হইয়াছিল, কোনও শিল্পী তাহা চিত্রবদ্ধ করেন নাই, শুধু সীজারের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "তুমিও ব্রুটাস" আর্তনাদ আজও স্মরণীয় হইয়া আছে। শ্রীযুক্ত অমল হোম নূতন করিয়া সেই আর্তনাদের প্রযোগ এই পত্রাঘাতের দ্বারা কাহাকেও কাহাকেও দিলেন। আমাদের অপরাধ অজ্ঞানকৃত, অপরের চক্র ও চক্রান্ত প্রসূত, সুতরাং আমরা ক্ষমার্হ। অমলবাবু বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের প্রবাদ-খ্যাত মুখরা নারীদের মত সদাশয়ব্যক্তিদের যে লজ্জা দিতে পারিয়াছেন, ইহাতেই আমরা কৌতুক বোধ করিয়াছি। বৃহতের নামে ক্ষুদ্রের আত্মরতির প্রথম সূচনা হয় বাংলা দেশে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে—রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে, সেই ব্যাপারে হোম-মহাশয়ই কর্ণধার ছিলেন। তাহার পর হইতে আজ পর্যন্ত তাঁহারই পন্থা অনুসরণ করিয়া যাহা ঘটিতেছে, তাহার নিন্দা একমাত্র তিনিই করিতে পারেন।—স. শ. চি.]

মায়া

নিতাই আমাদের ভীষণ ঠকাইয়াছে। শত্রুর মুখে ছাই দিয়া আমরা তার বন্ধুবান্ধব কম ছিলাম না। একদিন হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর হইয়া সকলের সঙ্গই সে ত্যাগ করিল। আমরা নাকি ভয়ানক বাজে কথা বলি আর অকারণ পরচর্চ্চা করি, এই তার অভিযোগ। আমাদের সাহচর্য্যে তার নাকি উন্নতি হইবার কোন আশা নাই।

বুঝিতে কষ্ট হইল না যে সে নারীবন্ধু পাইয়াছে, তাই পুরুষের সান্নিধ্য আর ভাল লাগিতেছে না। নারীঘটিত ব্যাপার আমাদেরও ছিল, তবে তা অভিজাত নয়, এই যা।

তার প্রেমে পড়িবার লক্ষণ আমরা আবিষ্কার করিলাম, যখন কলেজ ষ্ট্রীটে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে একটি কুমারী মেয়ের পশ্চাতে তাহাকে ট্রামে উঠিতে দেখা গেল। এসপ্ল্যানেডে নামিয়া দুজনেই বালিগঞ্জের ট্রাম ধরিল।

আর একবার উদয়শঙ্করের নৃত্যে তার বাঁদিকে যে সুন্দরী মেয়েটি বসিয়াছিল শ্যামল দেখিয়াছে, সে আমাদের দেখা পূর্ব্বের মেয়েটি না হইয়া যায় না, বিবরণ শুনিয়াই বোঝা গেল।

পরে ওয়েলিংটনের প্রদর্শনীতে বেনারসী-পরা যে বধূটিকে তাহারই সঙ্গে সঙ্গে স্টলে ঘুরিতে দেখিল অনাদি, সে যে তাহারই পরিণীতা সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি থাকিতে পারে?

শুনিয়া আমরা প্রত্যেকেই দুঃখিত হইলাম দুইটি কারণে, আমাদের না জানাইয়া বিবাহ করা, এবং নিতাইয়ের বধূ সুন্দরী ও বিদুষী হওয়া।

মেয়েটি যে ধনীর কন্যা এ সংবাদ আনিল সুরজিৎ এক "ইন আউট লেখা প্রাসাদোপম সৌধের ভিতরে তাহাদের মোটর ঢুকিতে দেখিয়া।

নিতাইয়ের স্ত্রীকে আমার দেখিবার প্রবল বাসনা চরিতার্থ হইল চিত্রার এক শো'র পরে অগ্রপশ্চাৎ মানিকজোড়কে দেখিয়া। নিতাই কথা না বলাতে আমি ইনট্রোডিউস্‌ড হইতে পারিলাম না।

এক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও নিতাই আবার বিবাহ করিয়াছে, তা জানিতে

আমাদের দেরি হইল না, একটি পল্লীবাসিনীর সঙ্গে তাহার তারকেশ্বর ভ্রমণের প্রমাণে।

দুই স্ত্রী লইয়া গৃহবিবাদের ইতিহাসও পাইলাম তাহারই এক প্রতিবেশীর কাছ হইতে।

সন্তান না হওয়াতে কার একটি ছেলেকে সে পোষ্য লইয়াছে, বছর আটেক বাদে এ তথ্যও পৌঁছিল।

কিন্তু কাল নিতাইকে সপ্তরথীতে ঘিরিতে সে বলিল, আজও অবিবাহিতই আছে এবং আমরা যা কিছু দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি কিছু অজানা মেয়েদের আকস্মিক সান্নিধ্যবশত, কিছু আত্মীয়া-এস্‌কর্টিং-প্রসূত মায়াবাদের ফল।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

হও দীপান্বিতা

অনশনক্লিষ্ট তনু বিবর্ণ পাণ্ডুর,
লাবণ্য মুছিয়া গেছে লোল নিষ্পেষণে,
অবলুপ্ত রক্তিমাভা পক্ক বিম্বাধরে,
সুজলা সুফলা নহ ; শ্যাম-বিনম্রতা
উঠিয়াছে রুক্ষ হয়ে উষর মরুর
রূঢ় স্পর্শে ; অন্ধকার নেমেছে গগনে ;
পান করি তপ্ত রক্ত, এতদিন পরে
হ'লে আজ ছিন্নমস্তা, আঘাত-বিক্ষতা।

একদিন ছিলে তুমি ভুবনমোহিনী,
রূপে নিরুপমা, আজ ভীমা ভয়ঙ্করী ;
আসন্ন প্রলয়ক্ষণে কনক-কিঙ্কিণী
বাজে তব, রুদ্ররণে, প্রকম্পিত করি
দশ দিক ক্ষণে ক্ষণে ; জ্বলিয়াছে চিতা ;
সার্থক আলোকে তুমি হও দীপান্বিতা।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

সংবাদ-সাহিত্য

আমরা আমাদের হিতৈষীমহল কর্তৃক সাহিত্য-বহির্ভূত পলিটিক্স চর্চ্চা না করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। তাঁহাদের অনুরোধই আমাদের নিকট আদেশ। কিন্তু আমরা যুগধর্ম্মকে এড়াইব কি করিয়া, তাহাই ভাবিতেছি। যে যুগে অনধিকার-চর্চ্চাই সর্ব্বজনগ্রাহ্য রীতি, বিপরীত আচরণই যে যুগের ধর্ম্ম, সে যুগের সাহিত্যিকরাই এমন কি অপরাধ করিল? দেশসুদ্ধ রাজা-মহারাজা, এমন কি, ধাঙড় মেথর মুচী মুদ্দাফরাশ যখন সাহিত্যিকের হাঁড়িতে বিনা দ্বিধায় কাঠি দিতে পারে, তখন তাহারাই বা গলা বাড়াইয়া বেড়া ডিঙাইয়া অপরের বাগানের ফুল-ফলের আঘ্রাণ না লইবে কেন? কেহ কেহ বলিবেন, "সাহিত্য আলো-বাতাসের মত, সকলেরই তাহাতে সমান অধিকার; রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র, খোঁয়াড় আলাদা—সেখানে বিচরণ বা প্রবেশ করিতে হইলে বিশিষ্ট অধিকার অর্জ্জন করিতে হয়। জেলে গিয়া, ধর্ম্মঘট ঘটাইয়া, দল বাঁধিয়া ও ফণ্ড মারিয়া ঘাগী এবং ঝানু না হইলে এ দেশে সে অধিকার কাহারও জন্মে না।" যে পলিটিক্সের কথা ইহারা বলেন, আমরা সেই পলিটিক্স কখনও চর্চ্চা করিতে চাহি না। সাধারণ মানুষ হিসাবে এবং দেশের অধিবাসী হিসাবে আমরা এমন কতকগুলি অধিকার চাই, যাহা আমাদের জন্মগত অধিকার বলিয়া আমরা মনে করি। খাইয়া পরিয়া নিরুপদ্রবে বাস করিবার দাবি তাহার মধ্যে প্রধান। সম্প্রতি বাংলা দেশে, আমরা সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছি। কর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমান মহাযুদ্ধকেই ইহার কারণ বলিয়া চালাইতে চাহিতেছেন; ইহা সত্য হইলে আমাদের আপত্তি করিবার কিছু থাকিত না। আমরা দেখিতেছি, ইহা সর্ব্বৈব সত্য নয়। কতকগুলা ক্ষমতাশালী মানুষের অপরিমিত লোভ এবং এক দল দুর্জ্জনের সঙ্ঘবদ্ধ চক্রান্তে দেশের অধিকাংশ লোক প্রত্যহ সাধারণ জীবন-যাত্রার ব্যাপারে

নিগৃহীত হইতেছে। মানুষে অর্থ সামর্থ্য এবং সময় ব্যয় করিয়াও খাইতে পরিতে পারিতেছে না। ইহা এক প্রকারের অরাজকতা। যে রাজার শাসনে এরূপ ঘটে, সে রাজার অপকীর্ত্তি ঘোষিত হইতে বাধ্য। শুধু অতিলোভী ও দুষ্টদের ঘাড়ে দোষ চাপাইলে চলিবে না। দুষ্টের শাসন রাজারই কর্ত্তব্য। শাসনকার্য্য-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অনেকে এই চক্রান্তের মধ্যে আছেন—এইরূপ সন্দেহ কাহারও কাহারও মনে জাগিয়াছে। এইরূপ অবস্থাতে পড়িয়া আমরা নিরুপায় হইয়া অন্য প্রতিকারের পন্থা না দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছি। ইহাই আমাদের পলিটিক্স। যাঁহারা আমাদিগকে শিশুর সামিল করিয়া রাখিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন—শিশুর রোদনই বল। সকল শাসন এবং সকল আইন সত্ত্বেও সেই রোদন আমাদের কণ্ঠ ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে। কাঁদিতে না পাইলে দম বন্ধ হইয়া আমরা মরিয়া যাইব যে!

• • •

চাউলের মণ চল্লিশের ঊর্দ্ধে গিয়াছে, অন্যান্য দ্রব্যমূল্যও অবিশ্বাস্য রকমে বৃদ্ধি পাইয়াছে—এরূপ ব্যাপারের পরিণতি চিন্তা করিতে গিয়া আমরা দেখিতেছি, বাংলা দেশের তথাকথিত মধ্যবিত্ত সমাজের উচ্ছেদ অনিবার্য্য। কলে বা ফ্যাক্টরিতে মুটে ও মজুর রূপে যাহারা কাজ করে, নিজেদের স্বার্থের খাতিরে কল-ফ্যাক্টরির মালিকরাই অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে তাহাদের আহার্য্যের সংস্থান করিতেছেন; ইহারা নিম্নশ্রেণী বা lower class। উচ্চশ্রেণী বা upper class যাঁহারা, তাঁহারা বিত্তশালী; বিত্তের ফাঁদে বিত্ত ধরিবার বহুবিধ সহজ পন্থা বর্ত্তমানে যুদ্ধের দরুন উন্মুক্ত হইতেছে, সুতরাং এই শ্রেণীরও মার নাই। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ সমর্থ ব্যক্তি মাত্রেই উপার্জ্জনক্ষম; কর্তৃপক্ষই তাহাদের আহার্য্য-পরিধেয়ের জন্য চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয় বাড়ে নাই, খরচ দশগুণ বাড়িয়া গিয়াছে; সভ্যতার নানা সংস্কার মানিয়া চলিতে তাহারা বাধ্য বলিয়া ব্যয়সঙ্কোচ করিয়াও আহার্য্য-সংস্থান তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়, প্রেস্টিজের খাতিরে আত্মহত্যা করিতে

ইহারা অজ্ঞাত। তা ছাড়া এই শ্রেণীর প্রত্যেকটি পরিবার মাত্র একজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া চলে—সেই কেন্দ্রস্থানীয় ব্যক্তিরা বর্ত্তমানে সর্ব্বনাশের গহ্বরমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদিগকে বাঁচাইবার কোনও আয়োজনই কোনও দিকে দেখা যাইতেছে না। আমরা চীৎকার করিয়া এই সকল নিপীড়িত মূক ব্যক্তিদেরই সচেতন ও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে ডাকিতেছি। ইহা পলিটিক্স নয়, আত্মরক্ষার প্রয়াস মাত্র; আমরাও যে এই দলে!

* * *

আমরা এই প্রসঙ্গ ইতিপূর্ব্বে আর একবার উত্থাপন করিয়াছিলাম। তখন বলিয়াছিলাম, যতদিন রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা পুনরায় স্বাভাবিক রূপ গ্রহণ না করে, ততদিন এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিম্নশ্রেণীর সহিত এক হইয়া গিয়া কৌশলে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হইবে। একেবারে বিলুপ্ত হইলে দেশেরই ক্ষতি, কারণ ইহারাই জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও রক্ষক, সাহিত্য ও শিল্পের সাহায্যে দেশের প্রবহমান প্রাণধারার পরিপুষ্টি ইহারাই সাধন করিয়া থাকেন, ইহাদের মৃত্যুতে জাতিরই অপমৃত্যু ঘটে। পৃথিবীতে এমন দুর্ঘটনার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সুতরাং আমরা শিক্ষকই হই আর সাহিত্যিকই হই, আত্মশক্তিতে অথবা বুদ্ধিকৌশলে টিকিয়া থাকিবার ব্যবস্থাই আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। ইহা পলিটিক্স কি না জানি না, ইহাই এখন আমাদের ধর্ম্ম। সংস্কৃতি-মূলক যে স্বাতন্ত্র্যবোধের গৌরবে আমরা এতদিন গৌরবান্বিত ছিলাম, তাহা আজ পরিত্যাজ্য। যে দালালি এতদিন আমাদের উপজীবিকা ছিল, বর্ত্তমানে তাহাই শ্রমিক-নিম্নশ্রেণীর অবিশ্বাসের কারণ হইয়া মারাত্মক হইয়া উঠিতেছে—এই দালালির পেশা আমাদিগকে ছাড়িতে হইবে। যাহারা গতর খাটাইয়া খায়, তাহাদের সহিত এক হইয়া তাহাদেরই কল্যাণচিন্তা আমরা করিব, অপর পক্ষ অর্থাৎ ধনিকের দলভুক্ত হইয়া তাহাদের শোষণের সহায়ক হইব না। অর্থাৎ প্রত্যেক মধ্যবিত্ত বাঙালীকে প্রত্যক্ষ পরিশ্রমের দ্বারা আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য কোনও না কোনও বস্তু উৎপাদন করিতে হইবে। কৃষি এবং শিল্পবাণিজ্য—এই

দুইটি মাত্র পথ, যে কোনও একটিকে অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে। ইহাই আমরা প্রচার করিতেছি এবং আরও প্রচার করিব। এই প্রচার পলিটিক্স হইলে আমরা নাচার।

* * *

চাকুরির মায়ায় আমরা ঘোরতররূপে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া আজ আমাদের এই দুর্দশা। চাকুরি সরকারীই হউক, অথবা সওদাগরী আপিসেই হউক, ম্যাজিস্ট্রেটগিরি হউক, অথবা পেয়াদাগিরি হউক, আসলে তাহা দালালি ছাড়া কিছু নয়। এক পক্ষ এই চাকুরিজীবী দালালদের সহায়তায় লাভের লোভে অন্য পক্ষের সহিত কারবার করে। ইহাদের পরিশ্রমে এক পক্ষের মুনাফা মাত্র বৃদ্ধি হয়, কিছু উৎপন্ন হয় না। এই ত্রিশঙ্কুবৃত্তি যতদিন না আমরা জাতিগতভাবে পরিত্যাগ করিব, ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীর দালালির চোটে সমগ্র ভারতবর্ষে ভারতবাসীর অনেক ক্ষতি হইয়াছে। অপর প্রদেশের অধিবাসীরা এই কারণে মধ্যবিত্ত বাঙালীকে ঘৃণা ও সন্দেহের চক্ষে দেখে। এখন বাংলা দেশেরই নিম্নশ্রেণীর মনে এই সন্দেহ জাগিয়াছে। নিজেরা মধ্যবিত্ত বাঙালী হইয়া যদি এই শ্রেণীর মঙ্গলকামনায় আন্দোলন করিতে থাকি তাহা হইলে কর্তব্যপালনই করিতেছি। ইহাকে পলিটিক্স আখ্যা দিয়া শাসন করা সহজ, কিন্তু আমরা জানি, আমরা মৌলিক জীবধর্ম পালন করিতেছি মাত্র।

* * *

নিজেদের পাপচক্রে নিজেরা পড়িয়া আমরা বর্তমান দুর্গতি ভোগ করিতেছি। দুর্ম্ল্যতা যমদূতের মত আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। দোকানের দরজায় শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া ও পরস্পর ঠেলাঠেলি করিয়া কতদিন বাঁচিতে পারিব? কন্ট্রোলের ব্যবস্থা আমাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত ও উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে; রেশনকার্ড প্রবর্তনেও বিশেষ সুবিধা হইবার আশা নাই। কারণ, আমরা দেশকে নিজের দেশ বলিয়া জ্ঞান করিতে এখনও শিখি নাই, আত্মপরায়ণতা শিখিয়াছি। দশের

সেবায় এখানে যাহারাই নিযুক্ত হইতেছেন, তাঁহারাই স্বার্থসিদ্ধির ফিকির খুঁজিতেছেন। এখানে হাসপাতালের দুধে স্তাওলা ভাসিতেছে, কণ্ট্রোলের চালে কাঁকর-বালি অবাধে মিশিতেছে, সাবান-পাথরে* আটা-ময়দা অখাদ্য হইতেছে; সরিষার তেলে সরগুজা, ঘিয়ে চর্ব্বি মিশাইতে আমাদের বিবেকে বাধে না, অথচ আমরা গঙ্গার ঘাটে পুণ্যসঞ্চয় করি, পিঁপড়েকে চিনি খাওয়াই। নিজের কাজ এবং পরের কাজ—এই বোধ আমাদের যথেষ্ট জন্মিয়াছে; কিন্তু সাধারণের কাজ, সকলের কাজ—এই বোধ জাগ্রত হয় নাই। কলে কণ্ট্রোলে বিতরিত হইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট আহার্য্যের এক-পঞ্চমাংশ সদস্যদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া বাকি চারি-পঞ্চমাংশ ব্যক্তি বা দলের ব্যবসায়ে লাগিতেছে। ইহার প্রতিকার কোনও একজনের দ্বারা সম্ভব নহে। পাড়ায় পাড়ায় তরুণদের এবং যুবকদের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য আমরা ডাকিতেছি, যুক্তি বিফল হইলে অন্য পন্থায় ব্যবসায়ীকে ধর্ম্মাচরণে বাধ্য করাইতে তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি; দেশব্যাপী বৃহত্তর বিপ্লব ঠেকাইবার জন্য পল্লীতে পল্লীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠার সময় এখনও বহিয়া যায় নাই। আমাদের পলিটিক্স তরুণদিগকে সচেতন করিবার আহ্বান মাত্র। অবস্থার ফেরে কখনও কখনও বিপ্লব কামনা করিলেও বিপ্লবকে আমরা ভয় করি। আমরা গৃহস্থ চাপোষা লোক—বিপ্লবের অনিশ্চয়তাকে ভয় করি। তাই আমাদের যতটুকু সাধ্য ততটুকুই সাবধানবাণী উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। মন্ত্রীবদল এবং উজিরবদল আমাদের কাছে সামান্য ঘটনা মাত্র; মহামৃত্যুর মুখে তারকব্রহ্ম নামও কি করিতে পাইব না?

—

এই গেল এক দিক, প্রত্যক্ষ জীবন-দুঃখের দিক। অন্য দিকে আমাদের শিক্ষা, জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্য আমাদের বংশধরগণের প্রস্তুতি যে ভাবে হইতেছে, সে বিষয়েও সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের রাজত্বেও এক জাতীয় কণ্ট্রোল চালাইয়া যে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহারা

পাঠ্যপুস্তক লইয়া ঘাঁটাঘাটি করেন, তাঁহারাই তাহা জানেন। এই প্রসঙ্গে জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বাঁকুড়ায় নিখিল-বঙ্গীয়-শিক্ষক-সম্মেলনের একবিংশতম অধিবেশনের সভাপতিরূপে গত ২৪ এপ্রিল যে অভিভাষণ দিয়াছেন, তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অভিভাষণটি জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'র ১৩৯-১৪৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। জিলাপ্রীতিবশত কয়েকটি অতিশয়োক্তি বাদ দিলে এই প্রবন্ধের মূল কথা যাহা দাঁড়ায়, তাহা এই শিক্ষাসমস্যামূলক। যাঁহাদের হাতে ক্ষমতা আছে, তাঁহাদিগকে এখনও এই বিষয়ে অবহিত হইতে বলি। বিদ্যানিধি মহাশয়ের বক্তব্য অংশত উদ্ধৃত করিতেছি—

"...পাঠশালা বলি, বিদ্যালয় বলি, ইস্কুল বলি, কলেজ বলি, সকলই আমাদের বালকবালিকাদের জ্ঞানবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মানুষ এক জীব। প্রাণ-রক্ষা তাহার প্রধান চিন্তা। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অসংখ্য শত্রু তাহার প্রাণ-নাশে উদ্যত। যে জ্ঞান দ্বারা সুস্থ বলিষ্ঠ দেহে সুখে শান্তিতে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারা যায়, সে জ্ঞান দেহজ্ঞান। ইহার নিমিত্ত দেহের নির্মাণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্ম স্বাস্থ্য-রক্ষার বিধি ব্যতীত দেশের জলবায়ু ও মৃত্তিকার প্রকৃতি জানিতে হয়। ঋতুচর্যা, দিনচর্যা, রাত্রিচর্যা পালন করিতে হয়। অতএব জীবন-ধারণের নিমিত্ত দেশজ্ঞান অত্যাবশ্যক। দেশ হইতেই অন্ন পানীয় বস্ত্র গৃহ-নির্মাণের উপকরণ ঔষধ প্রভৃতি পাইয়া থাকি। আমরা একা একা থাকি না। গ্রামে ও নগরে বহু লোকের সহিত বাস করি। তাহাদের আচার মানিয়া চলি। ভাষা শিখিয়া তাহাদের সহিত ব্যবহার করি। প্রচলিত আইন মান্য করি। এ সকলের জ্ঞান দেশজ্ঞান।...

যে উদ্দেশ্যে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল, পৌস্তক জ্ঞান দ্বারা তাহা সম্যক্ সিদ্ধ হইতে পারিত। ক্রমে ক্রমে আমাদের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি আমরা জীবন-যুদ্ধে পশ্চাতে পড়িয়া আছি, আমি যাহা দেশ-জ্ঞান বলিয়াছি তাহার সম্যক্ অনুশীলন ব্যতীত প্রাণ-রক্ষার অন্য উপায় নাই। আরও দেখিতেছি, দেশের ভাগ্য-দোষে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য বিদ্যালয় নাই।...

...ইং ১৯৪০ সাল হইতে নূতন বিধানে প্রবেশিকা পরীক্ষা চলিতেছে। তদবধি তিন বৎসর অতীত হইয়াছে, নূতন বিধানের দোষগুণ লক্ষিত হইয়া

থাকিবে। এই সম্মেলনে অনেক বিজ্ঞ বিদ্বান্ নিপুণ দূরদর্শী কৃতি শিক্ষক ও শিক্ষিকা আছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন, আমি ধৃষ্টতা প্রকাশে শঙ্কিত হইতেছি। আমি ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও প্রবেশিকা-পাশ ছাত্র-ছাত্রীর সহিত মিশিয়া থাকি, পুরাতনে ও নূতনে প্রভেদ দেখিতে পাই না। আপাততঃ মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষা জ্ঞান কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝি, সেটা ফেনার বৃদ্ধি। বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুতপঠনের নিমিত্ত বই নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু দ্রুতপঠন আর দ্রুত রেল-গাড়িতে ভ্রমণ একই প্রকার, রেলের দুই পাশের দ্রব্য-পরিচয় হয় না। আমার বিবেচনায় অল্প বই ভাল করিয়া পড়িলে যে জ্ঞান হয়, গ্রন্থশালার শতাবধি গ্রন্থের পাতা উলটাইলেও তাহা হয় না। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত এমন বই চাই, যাহার ভাষা প্রয়োগ করিতে পারি। ভাষা শিক্ষা, সে মাতৃভাষা হউক, বিদেশী ভাষা হউক, সেটা পৃথক বিদ্যা। শুধু ভাষা কেন, যাহার স্মৃতি দুর্বল, মেধা অল্প, কোন বিদ্যা তাহার অধিগত হয় না। পাঠ্য পুস্তক অধিক হইলে জ্ঞান ভাসা ভাসা হয়, মনেও থাকে না।

ভূগোল-বিবরণ, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের পাঠ্য-তালিকা এত অনিশ্চিত অপরিচ্ছিন্ন যে তাহা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইচ্ছা বুঝিতে পারা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্জীতে দেখিতেছি, ১৮ খানা ভূগোল-বিবরণ, ১৬+১৬ খানা ইতিহাস, ১৮ খানা বিজ্ঞান পুস্তক প্রশংসিত হইয়াছে। আমি দুইখানা ভূগোল-বিবরণ দেখিয়াছি। স্তম্ভিত হইয়াছি। চারি শত পাঁচ শত পৃষ্ঠার বই, যাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় খণ্ড খণ্ড তথ্য পুঞ্জীভূত হইয়াছে! ভাগ্যে ইস্কুলে পড়িবার বয়স অতীত হইয়াছে! দুইখানি ইতিহাসের বই পড়িয়াছি; দুই খানায় আট শত পঞ্চাশ পৃষ্ঠা! একখানি বিজ্ঞানের বই দেখিয়াছি, ছয়টি বিদ্যার বই, চারি শত পৃষ্ঠা। এত বড় বড় বই পড়িয়াও কিন্তু আমাদের বালকবালিকাদের দেশ-জ্ঞান অতি অল্প। দেশের বড় বড় গাছ চিনে না, পাখী চিনে না, পাখীর ডাক শুনিলে নাম বলিতে পারে না। কাপাস গাছ দেখে নাই, বঙ্গে তুলোর চাষ; জানে না ধানের নাম যব, চিনের নাম বাং। একখানি স্বাস্থ্যবিদ্যার বই দেখিয়াছি। আড়াই শত পৃষ্ঠা। কিন্তু স্বাস্থ্য বিদ্যা শিক্ষা প্রবেশিকায় আবশ্যক নহে, ছাত্রের স্বেচ্ছাধীন। গণিতের বই দেখিয়াছি, কোনটা ছোট নহে। বীজ-গণিতের সেজ্জ ভাষা পড়িবার পদ্ধতি খুঁজিয়া পাই নাই। আমি মর্কট-বৃত্তির বিরোধী। বড় বড় বইতে পাঠ্য বিষয় বাছিয়া বাছিয়া পড়ার দোষ আছে। কাজটি সোজাও নয়। আমার মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষা বিচারক

গোষ্ঠী এই সকল বই অবলোকন করেন নাই, করিলে ব্যাকরণ দোষ, শব্দ প্রয়োগ দোষ, অযোগ্যতা দোষ, অর্থবিকৃতি দোষ অগ্রাহ্য করিতেন না, তর্ক বিদ্যার মূল সূত্রের ব্যভিচার উপেক্ষা করিতেন না। বিবৃতি দোষে জানা কথাও অজানা হইয়া পড়ে, রচনা দোষে অপাঠ্য হয়। ইংরেজীর অনুবাদ বুঝিতে পারি, কিন্তু তরজমা বুঝা সোজা নয়। শুধু প্রবেশিকার পাঠ্য পুস্তক নয়, তৃতীয় হইতে অষ্টম শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তকের অল্পসংখ্যক প্রশংসনীয় বলিতে পারা যায়।...

বাঙ্গালা ভাষার দোহাই দিয়া বালকবালিকার কোমল মস্তকে গুরুভার স্থাপিত হইয়াছে, অভিভাবকেরা ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন। তাঁহাদের পরিবেদনা অহেতুকী বলিতে পারি না। ইস্কুলের নবম শ্রেণীর এক ছাত্র তাহার পাঠ্য-পৃষ্ঠা-সংখ্যা দিয়াছে। যথা—

(১) বাংলা গদ্য ১৮৭, পদ্য ৪৮, দ্রুতপাঠ ৩৮২, ব্যাকরণ ৪১৭। মোট ১০৩৪ পৃঃ।

(২) ইংরেজী গদ্য ৯১, পদ্য ৪১, দ্রুতপাঠ ৩৭১, ব্যাকরণ ৫০০। মোট ১০০৩ পৃঃ।

(৩) ভূগোল বিবরণ ৮৫২, ইতিহাস ৮৫২। মোট ১৭০৪ পৃঃ।

(৪) গণিত।

(৫) সংস্কৃত গদ্য ৫২, পদ্য ২১, ব্যাকরণ ৫৮৪। মোট ৬৫৭ পৃঃ।

(৬) বিজ্ঞান ৪০৯ পৃঃ।

একুনে ৪৮০৭ পৃষ্ঠা।

ইহা সম্পূর্ণ তালিকা নয়। তিন ভাষা পুস্তকের অর্থপুস্তক, বাংলা ইংরেজীতে রচনা শিক্ষা, ভাষান্তরকরণ শিক্ষা, পত্রলিখন শিক্ষার বই পড়িতে হয়। এগুলি ধরিলে ২৫০০ পৃষ্ঠার কম হইবে না। দুই বৎসরে ৮০০০ পৃষ্ঠা পড়িবার বুঝিবার ভাবিবার মনে রাখিবার সময় কোথায়? তদুপরি গণিতরূপ নিরাট কঠিন শিলা চূর্ণ করিতে হইবে, যাহার দৃষ্টিমাত্রে বহু ছাত্রের মস্তক ঘূর্ণিত হয়, কলেজে গিয়া প্রকৃতিস্থ হয়। আয়ুর্বিদেরা গুরু ভোজনের তিন কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, মাত্রাগুরু দ্রব্যগুরু সংস্কারগুরু। ভাত লঘু, কিন্তু আকণ্ঠ ভোজনে শ্বাসরোধ হয়। পিষ্টক দ্রব্য গুরু, শীঘ্র জীর্ণ হয় না। আর উভয়েই বেসবারাদি যোগে পক্ক হইলে দুষ্পাচ হয়। ছাত্র-ছাত্রীকে ত্রিবিধ গুরু অন্ন ভোজন করিতে হইতেছে। ফলে দেহের ও মনের পুষ্টিহানি ও অজীর্ণরোগ জন্মিতেছে। এক এক পরীক্ষার সময়

আসে, আধখানা হইয়া যায়। আপনারা জানেন না, শিক্ষিকা মহাশয়ারা আদৌ জানেন না, ছাত্রেরা জানে কলিকাতায় কলেজ ষ্ট্রীট নামে এক রাজমার্গ আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারা যায়। সেখানে সকল বিদ্যার নির্যাস প্রস্তুত হইতেছে। প্রবেশিকার শুভঙ্করী বটিকা বিক্রয় হইতেছে। উদ্বিগ্ন বিবর্ণ ক্লান্ত ছাত্র-ছাত্রী বটিকা সেবন করিয়া আশ্বাসিত হইতেছে, পরীক্ষারণে জয়ী হইতেছে।"

বর্ত্তমান দুর্গতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহা হইল ভবিষ্যৎ আশঙ্কার কথা। এরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা জাতির ভবিষ্যৎ কি ভাবে গঠন করিবে? আমরা তো গিয়াছিই, যাহাদের এখনও আশা আছে, তাহারাও এরূপ শিক্ষার প্রকোপে পড়িয়া আশার অতীতে চলিয়া যাইতেছে। শিক্ষারাজ্যের বিসদৃশ কণ্ট্রোলও নিবারণ করিতে হইবে। উপায় পূর্ব্ববৎ।

—

প্রারম্ভে অনধিকার-চর্চ্চার কথা তুলিয়াছিলাম। তাহারই একটি বিচিত্র দৃষ্টান্ত হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর শাখার সভাপতিত্ব করিতে গিয়া গত ৯ বৈশাখ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই একটি মুদ্রিত কপি পাইয়াছি। এই অভিভাষণে মজুমদার মহাশয়ের আত্মজ্ঞান ও রসজ্ঞানের প্রচুর পরিচয় সত্ত্বেও দেখিতেছি, তিনি শেষ পর্য্যন্ত ভাইস-চ্যান্সেলরীয় অভ্যাসবশে মাত্রাজ্ঞান বজায় রাখিতে পারেন নাই। দৃষ্টান্ত, যথা—

আত্মজ্ঞান :…"মুখ্যতঃ যাহাকে আমরা বঙ্গ-সাহিত্য বলি তাহার আলোচনা করিতে আমি অসমর্থ। কারণ অন্যান্য অনেকের ন্যায় সাধারণভাবে বঙ্গসাহিত্যের সহিত পরিচিত হইলেও এ বিষয়ে আমার কোন বিশিষ্ট জ্ঞান নাই।…"

রসজ্ঞান :…"বিশেষতঃ আমি ভুলিয়া যাই নাই যে আগামী কল্যই শনিবার। বিগত কয়েক বৎসরে শনিবার বঙ্গ-সাহিত্যের লেখকগণের পক্ষে একটি মারাত্মক দিন হইয়া উঠিয়াছে। কোন রচনা বা আলোচনা প্রকাশিত হইলেই লেখকের ত্রাস জন্মে যে 'শনিবারের চিঠি'তে তাহার অভ্যর্থনার আয়োজনটা কিরূপ হইবে। কারণ এই পত্রলেখকগণের বঙ্গ-সাহিত্যের উপর শনিদৃষ্টি না থাকিলেও কোনদৃষ্টি

যে আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কোনরূপ ভুল ত্রুটি বিচ্যুতি হইলেই আর রক্ষা নাই, বিদ্রূপের তীব্র কশাঘাতে তাহার পৃষ্ঠ কর্জরিত হইবেই। ইহা দেশের বা সাহিত্যের পক্ষে শুভ নহে এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে ; আমি কেবল বলিতে চাই যে, আমার মত যাহারা কেবলমাত্র অবসরমত বাঙ্গালা সাহিত্যসেবার সুযোগ ও সুবিধা পান, তাঁহারা ইহাদের ভয়ে মুখ খুলিতে সাহস করেন না।...”

এই পর্য্যন্ত বেশ। ইহার পর মজুমদার মহাশয় সাহিত্যে অধিকারী-ভেদ আছে কি না, ইহা লইয়া নানা তত্ত্বকথার অবতারণা করিতে গিয়া যে মাত্রাজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়াছেন, ইতিহাসের ব্যাপার হইলে তিনি কখনই সেইরূপ অনধিকার চর্চ্চা বরদাস্ত করিতেন না। সে ক্ষেত্রে স্বাধিকার বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাকে মৃত বন্ধুর পুস্তকের ভূমিকা রচনায় তাঁহার চরিত্র-শৈথিল্যের উল্লেখ করিতে দেখিয়াছি, কুলজি লইয়া আলোচনায় মৃত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের অসাধুতার ইঙ্গিত করিতেও তাঁহার বাধে নাই। সাহিত্যের ভালমন্দের ব্যাপারে তাঁহার নিজের যখন মাথাব্যথা নাই, তখন অপেক্ষাকৃত তরুণ পক্ষের 'ব্রীফ' লইয়া তাহাদিগকে 'পেট্রোনাইজ' করিবার লোভ তিনি সম্বরণ করিলেন কেন ? এই প্রসঙ্গে তিনি ইক্ষু, বেত্র, জীবক প্রভৃতি বহু কৌতুককর কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু যাহাদের বেত্রযষ্টির বাহুল্য দেখিয়া হাহাকার করিয়াছেন, তাহাদেরই ইক্ষুক্ষেত্রটির দিকে চাহিয়া দেখেন নাই অথবা দেখিলেও পলিসির খাতিরে সেটিকে উপেক্ষা করিয়াছেন। ঐতিহাসিকের চরিত্রে এই একদেশদর্শিতা-দোষ ভয়াবহ।

জ্যৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষে' শ্রীলতিকা ঘোষের “বিশ্ব-রণ গাজন” পড়িয়া আমরা তারকেশ্বরে আসীন বাবা গিরিজাশঙ্করের জয় ঘোষণা করিয়াছি। একটি মুদ্রাকর প্রমাদে ক্ষুণ্ণ হইয়াছি।

পদ টল্ টল্ হাসে খল্ খল্ সঘনে
আবেশে পাগল গাহে সঙ্গীত স্বননে

'পাগল' স্থলে 'পাগলী' হইবে।

* * *

এই সংখ্যাতেই রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের "কৈশোর স্বপ্ন" অতিশয় করুণ। "ফুটিয়াছে সরোবরে কমলনিকর" স্মরণ করাইয়া দেয়। ছয়টি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।—

তেমন চাঁদিনী রাতি কোথায় কি আছে!
বাতাস মদির গন্ধে মাতাল হয়েছে!
মধুনায় কুহুকুহু কোকিল কুহরে,
অধীরা ললনাকুল পুলকে শিহরে।
রাজত্বের বন্দিশালে আমি অনিবার
উৎসবের উৎস মাঝে দেয় ঠিক মার।

সত্যই তো, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ রাজত্বের বন্দীশাল হইতে এই চিরকিশোরকে কবে মুক্তি দিবেন?

—

পত্রিকার সম্পাদক হইতে হইলে কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন, আমাদের একজন পাঠক এই প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এতদিন জবাব দিতে পারি নাই। সহসা এই বৈশাখ মাসে একটি "সাহিত্য-কলার সচিত্র মাসিক" পত্র হাতে পাইয়া এবং তাহার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ "রবীন্দ্রনাথ ও আমরা" পড়িয়া আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। সম্পাদকীয় যাবতীয় গুণের এমন অপূর্ব্ব সমাবেশ আর দেখি নাই। আমরা উক্ত প্রবন্ধের সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিয়া উক্ত পাঠকের প্রশ্নের জবাব দিতেছি, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বয়ং গুণগুলির তালিকা করিয়া লইবেন।

"আজ রবীন্দ্রনাথকে চিনেছি—তাঁর বিভিন্ন মুখীন প্রতিভার ভিতর দিয়ে, বাংলা সাহিত্যে তিনি যা দিয়েছেন—তাঁর গভীরতার সন্ধান পেয়ে শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে উঠি। কিন্তু তখন, যখন ছিলাম ছোট, কৈশোরের কোলে পা বাড়াতে সামান্য কিছুটা বাকী। প্রতিভা বিচার করবার মত বুদ্ধি পেকে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথের ছোট্ট একটা নাটকই আমায় আকৃষ্ট করে। পাড়ের স্কুলে বর্ষ

শ্রেণীতে পড়ি। দলে আমরা ছিলাম পনের বিশ জন। কেউ পড়তো, কেউ বাপের দোকানে নূনের পুটলী বাঁধতো, কেউ জাল নিয়ে মাছ ধরতে যেতো।...

...আমাদের এই দলের ভিতর যেটুকু অশান্তি ছিল, সে আমার এক ভাই (জ্যাঠতাত) এবং অন্য পাড়ার দুটী ছেলেকে নিয়ে। নারকেল গাছে উঠে নারকেল চুরি, বাগান থেকে ফুল, শশা ইত্যাদি মালিকের অজানাতে নিয়ে চম্পট দেওয়া, এদের তিন জনই যদি থাকতো তার ভিতর, সে যাত্রায় আর রেহাই পাবার উপায় থাকতো না। পরস্পর চোকাচুকি করে বিষয়টা মালিকের কানে তুলে দিত। ফলে দাঁড়াতো, যাদের বাগান আমরা raid করতুম, এরা একজনের থেকে আর একজনের নামে তাদের কাছে বলে আসতো।

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু ও শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কবিতায় প্রথম ভাগ সমাপ্ত করিয়া দ্বিতীয় ভাগ ধরিয়াছেন। আশা করি ইহার পর ইঁহাদের বোধোদয় হইবে। দ্বিতীয়-ভাগপর্যায়ের কিছু নমুনা বর্ত্তমান সংখ্যা 'চতুরঙ্গে' প্রকাশিত হইয়াছে। যথা—

বিতর্ক-বিরক্ত মন 'বর্ণশুভ্র মণীষের মতো
বিভক্ত প্রতিবিম্বে ব্যস্ত করে 'দেশের নিরুক্তি
পরস্পরে হত্যা করে প্রতিদ্বন্দ্বী মুক্তির সেনানী।
আমার আকাঙ্ক্ষা তাই কবিদের অদ্বিতীয়-গ্রন্থ,
সংখ্যাহীন, সংজ্ঞাতীত একাকার আদিম আদ্যন্ত—
স্তব্ধতার নীলিমায় আত্ম-জাত পূর্ণতার বাণী।

—বুদ্ধদেব বসু

তোমারো সহসা আজ এ কি পরিবর্তন,
সতী হয়েছ যেন ছেড়ে রসরঙ্গ।
তুমি কি না বেদিয়া,
শাপকে মেরেছ দিয়া,
ছড়ায়ে দিয়েছ বিষ অনল তরঙ্গ।
তব তরে মনে ছিল কত না প্রশংসা,
শর্ব্বরী ছিলো যেন উড্ডীন হংস।

জলদের ছিলে আলী,
একটি একটি কালি
আনতো শেষের ডালি কামনাবতংস।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

—

বহরমপুর হইতে শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন তালুকদার ও বারাসত হইতে শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার দাস শ্রীযুক্ত শশধর দত্ত প্রণীত সদ্যপ্রকাশিত মোহন সিরিজের ডিটেকটিভ উপন্যাসগুলির সহিত ফণি চট্টোপাধ্যায় লিখিত ও ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'চোর ও ডিটেকটিভ' পুস্তকের বহুবিধ সৌসাদৃশ্য দেখিয়া আমাদিগকে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য পত্র দিয়াছেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, চোর ও ডিটেকটিভ লইয়া আমরা কারবার করি না। তাঁহারা শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দের নিকট অনুসন্ধানের ভার দিলে ফল পাইতে পারেন।

—

গল্প কবিতা আমরা অনেক পাই, কিন্তু প্রবন্ধের অভাবে প্রায়ই অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকি। জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে শ্রীমতী কমলা দেবীর "উপন্যাসে গ্রাম ও গ্রাম-জীবনের আদর্শ" প্রবন্ধটি পড়িয়া অনেক ভরসা পাইলাম। 'মডার্ন রিভিউ'য়ে দেখিলাম প্রবন্ধ-লেখিকা পুরস্কৃত হইয়াছেন, বিচার করিয়াছেন স্বয়ং 'প্রবাসী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। সাত পৃষ্ঠার প্রবন্ধে যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারা' উপন্যাসের কোটেশন তিন পৃষ্ঠা এবং শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী প্রণীত 'অলখ-ঝোরা'র কোটেশন তিন পৃষ্ঠা। 'অলখ-ঝোরা' 'প্রবাসী'তেই বাহির হইয়াছিল, সুতরাং 'প্রবাসী'র পাঠকদের ডবল লাভ হইল। এই প্রবন্ধ পাঠে বাংলা দেশের গ্রাম সম্পর্কে আমাদের অনেক অজ্ঞতা দূর হইল। আমাদের একটি মাত্র আপত্তি এই যে, বাংলা দেশের গ্রামের পরিচয় দিতে গিয়া লেখিকা কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাচার নক্শা' ও শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর 'চার ইয়ারী কথা' হইতে কোটেশন দিলেন না কেন?

—

বিশ্বভারতী কর্তৃক 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ খণ্ড প্রকাশে রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই আনন্দিত হইয়াছেন। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার দরুন বিলম্ব ঘটাতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন; একসঙ্গে দুই খণ্ড প্রকাশ করিয়া বিশ্বভারতী তাঁহাদের সেই ক্ষোভ দূর করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ খণ্ডে 'পূরবী' 'লেখন' 'মুক্তধারা' 'গল্পগুচ্ছ' ও 'শান্তিনিকেতন' ৪-১০ এবং পঞ্চদশ খণ্ডে 'মহুয়া' 'বনবাণী' 'পরিশেষ' 'বসন্ত' 'রক্তকরবী' 'গল্পগুচ্ছ' ও 'শান্তিনিকেতন' ১১-১২ স্থান পাইয়াছে। এই রচনাবলীর সংযোজন ও গ্রন্থপরিচয় অংশ এতই প্রয়োজনীয় হইয়াছে যে, পুস্তকাকারে রবীন্দ্রনাথের সকল পুস্তকের অধিকারীকেও এই রচনাবলী এই কারণেই সংগ্রহ করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে গ্রন্থপরিচয়-লেখকের জ্ঞানের গভীরতা বিস্ময়কর। বিশ্বভারতী কর্তৃক বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-গ্রন্থমালার প্রকাশ এই মাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই গ্রন্থমালার দ্বারা বাংলা-সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব দূর হইবে। গ্রন্থমালার প্রথম পুস্তক রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের স্বরূপ' এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর 'কুটিরশিল্প'। গ্রন্থমালার প্রত্যেকটি গ্রন্থের মূল্য মাত্র ছয় আনা, সকলেই সংগ্রহ করিয়া পড়িবেন এই বিশ্বাসে কোনও পরিচয় দিলাম না। শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' আগ্রহের সহিত আদ্যন্ত পড়িলাম। লেখিকা যে যত্ন করিয়া তাঁহার ডায়েরির পাতায় রবীন্দ্র-জীবনের একটি অধ্যায় ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, এজন্য তিনি সকল বাঙালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। এই জাতীয় পুস্তকে অহং যেটুকু থাকে সেটুকু এই পুস্তকেও আছে, কিন্তু সেই অহং বৃহৎকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া পীড়াদায়ক নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের 'হারামণি' একটি লোকসঙ্গীত-সংগ্রহ পুস্তক। অনেক দিন পূর্ব্বে ক্ষুদ্রাকারে এই সঙ্গীত-সংগ্রহ যখন প্রকাশিত হয়, তখন আমরা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই বৃহৎ গ্রন্থ ভূমিকাদির সমাবেশে অনেক বেশি মূল্যবান হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা দেশে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের মনের চাবিকাঠির সন্ধান যাঁহারা করেন, তাঁহারা এই 'হারামণি'তে তাহার সন্ধান পাইবেন। মিত্র

ও ঘোষ শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন গল্পসংগ্রহ 'প্রতিধ্বনি' প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস-বিরচিত 'হোটেল' নাটকটি যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই মনে উক্ত নাটকের পাত্রপাত্রীদের সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে। 'কিন্তু' ও 'নিরালা' পর পর এই নাটক দুইটি প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছেন। বাংলা দেশে এই ভাবের তিনে-সম্পূর্ণ নাটক আর নাই; গ্রন্থকার এগুলিতে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীশুভেন্দু মিত্রের 'বর্ত্তমান ইউরোপ' বাংলা ভাষায় একটি উল্লেখযোগ্য বই হইয়াছে—ইউরোপের আভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাতের সঠিক খবর ইহাতে মিলিবে। এস. ওয়াজেদ আলি সাহেবের 'ভবিষ্যতের বাঙালী' সম্বন্ধে এক লাইনে কিছু বলা অশোভন হইবে, আমরা ভবিষ্যতে এই পুস্তকের বিষয়বস্তু লইয়া আলোচনা করিব। এম. আকবর আলি সাহেবের 'বিজ্ঞানে মুসলমানের দান' প্রথম খণ্ড পড়িয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি, বাংলা ভাষায় এই ধরনের বই ইতিপূর্ব্বে রচিত হয় নাই। আমাদের আশা এই যে, এই খণ্ডে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত যে ইতিহাসের জের গ্রন্থকার টানিয়াছেন, তিনি তাহা সম্পূর্ণ করিবেন। এই উপন্যাসপ্লাবিত বঙ্গদেশে আলি সাহেব এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগলের 'সাহসীর জয়যাত্রা'র পরিপূরক হিসাবে 'বীরত্বের রাজটীকা' বাহির হইয়াছে, এই পুস্তকে পৃথিবীর বীর নারীদের কাহিনী ছেলে-মেয়েদের উপযোগী করিয়া বলা হইয়াছে। দেশের মেয়েরা যোগেশবাবুর এই দান কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিবে।

'শনিবারের চিঠি'র "সংবাদ-সাহিত্য" বিভাগে কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা কোনও একটি বিজ্ঞাপন সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছিলাম। আমাদের আপত্তি ছিল রবীন্দ্রনাথের নামের সহিত রজঃস্রাব-জাতীয় ব্যাধির সংযোগসাধনে—রবীন্দ্রনাথের মত সন্তান প্রার্থনায় নয়। পরবর্তী মাসে পাঞ্জীজীর মত সন্তান চাই—নামীয় যে বিজ্ঞাপন

'শনিবারের চিঠি'তে বাহির হইয়াছে, তাহাতে আপত্তিকর কিছু নাই, ইহা অতিশয় সাধু ও সুষ্ঠু বিজ্ঞাপন। অনেকে বিজ্ঞাপনের ভাষা না পড়িয়াই এই অনুযোগ করিয়াছেন যে, যে বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে আমরা লিখিয়াছি, শেষ পর্য্যন্ত সেই বিজ্ঞাপনই গিলিয়াছি কেন! আমাদের অনুরোধ এই যে, যাঁহারা এই আপত্তি তুলিয়াছেন তাঁহারা যেন প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি সম্পূর্ণ পড়িয়া দেখেন। আমাদের প্রতিবাদের পর বিজ্ঞাপন-দাতারা পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞাপনের ভাষা অন্ততও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাতেও আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

বর্ত্তমান বৎসরের গোড়াতে 'শনিবারের চিঠি'র গ্রাহক-সংখ্যা (সম্ভবত বাংলা দেশের লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া) এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাঁহাদের নামধাম আর আমরা স্মৃতির আয়ত্তে রাখিতে পারিতেছি না। পাছে গোলযোগ হয়, এই ভয়ে আমরা প্রত্যেকের নামের পাশে একটি করিয়া চিহ্ন-সূচক সংখ্যা যোগ করিতেছি। গ্রাহকেরা অনুগ্রহ করিয়া ভবিষ্যতে কোনও কারণে আমাদিগকে পত্র লিখিলে পরিচয়সূচক এই সংখ্যাটি দিলে আমরা অতি সহজেই তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিব। যাঁহারা নূতন গ্রাহক তাঁহারা "নূতন" কথাটি যোগ করিলে অধিকন্তু হইবে না। আমাদের তাহাতে সুবিধাই হইবে।

স্কুলে যা চল্লিশ হ'ল, চুপসে তা শূন্য হবে জানি,
মনেতে সন্দেহ জাগে, ততদিন টিকিবে কি প্রাণী!

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পরিবর্তিত মূল্য-তালিকা

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত
রক্তের টান (উপন্যাস) — ২৲

শ্রীনরেন্দ্রমোহন সেন
বিক্ষোভ (১ম ও ২য় খণ্ড) (উপন্যাস) — ২৸০ ও ২৸০

শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা
দিবারাগ (কাব্য) — ১৲

শ্রী গোপাল হালদার
একদা (উপন্যাস) — ২।০
সংস্কৃতির রূপান্তর — ২॥০

শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষ
সাগরপারের কথাগুচ্ছ (বিদেশী গল্প) — ২৲

শ্রীযামিনীমোহন কর
চুপকাথ (নাটক) — ।০
শান্তিপুরে অশান্তি (উপন্যাস) — ১।০

শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ
উপসংহার (গল্প) — ১৲
বেণুবা (কবিতা) — ।০

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা সাময়িক-পত্র — ৩।০
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (২য় সং) — ২।০
বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ — ১।০
মোগল যুগে স্ত্রীশিক্ষা — ।৵০
কেল্লাফতে (ছেলেদের গল্প) (২য় সং) — ।৵০
মোগল-বিদুষী (২য় সং) — ৸০
Bengali Stage — ১।০

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় ও শ্রীঅপর্ণা দেবী
কীর্ত্তন-পদাবলী — ৬৲

শ্রীঅনাথগোপাল সেন
বাজে মেয়ে (নাটক) — ১৲

শ্রীআর্য্যকুমার সেন
অভিনেতা (গল্প) — ২।০

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সিংহ
শেষ শ্রাদ্ধ (ব্যঙ্গ উপন্যাস) — ১।০

শ্রীনিখিলরঞ্জন দাসগুপ্ত
ফ্যাসিজম্-এর অ আ ক খ — ।০

শ্রীনবজীবন ঘোষ
আনারস (ছেলেদের কবিতা) — ১৲

শ্রীকপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
মসেটিমলের তাঁবেদারী (গল্প) — ১।০

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু
অতন্দ্র তীর (উপন্যাস) — ২৲
অসি ও মসী (ব্যঙ্গ কবিতা) — ১৲

শ্রীওয়েন ফ্রান্সিস ডাড্লে
ছায়াচ্ছন্ন ধরণী (বিদেশী উপন্যাস) — ১।০

শ্রীশান্তি পাল
সন্তরণ-বিজ্ঞান (সচিত্র) — ১৲

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়
আবর্ত্ত (গল্প) — ১৸০

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ডিটেকটিভ (নাটক) (৩ সং) — ৸০

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা — ২।০

শ্রীমন্মথনাথ দত্তগুপ্ত
পথের কাহিনী (উপন্যাস) — ২৲

কৃষ্ণদাস
খুনে (নাটক) — ১৲
হোটেল (নাটক) — ১৲

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র
মনঃসমীক্ষণ — ২।০

কয়েকখানি নূতন বই

বর্ত্তমান বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তৃণাঙ্কুর ২।০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রতিধ্বনি ২৲

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রের

গল্পরচনা সংগ্রহ

দুর্ঘটনা ২৲

শৈলেন্দ্র মিত্রের

ইউরোপের স্বার্থ-সংঘাতের কারণ ও সম্পূর্ণ ইতিহাস

বর্ত্তমান ইউরোপ ২৲

প্রবোধকুমার সান্যালের

মহাপ্রস্থানের পথে ২৸০

পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ

দেশদেশান্তর (দ্বিতীয় সং) ১৸০

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রের

পৃথিবীর ইতিহাস (তৃতীয় সংস্করণ) ১৷৵০

বিদেশী গল্প-সঞ্চয়ন (প্রথম খণ্ড তৃতীয় সংস্করণ) ১৷০

ঐতিহাসিক গল্প-সঞ্চয়ন (২য় সং) ১৷০

শ্রীসজনীকান্ত দাসের

নূতন কবিতার বই

পঁচিশে বৈশাখ

(পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

"বিরাশি বছর পরে আসিল প্রথম আজ
তুমি-রিক্ত পঁচিশে বৈশাখ,
বাইশে শ্রাবণ আসি খণ্ডিত করিয়া গেল
হর্ষোজ্জ্বল পঁচিশে বৈশাখে।
শুধু এল পঁচিশে বৈশাখ।"

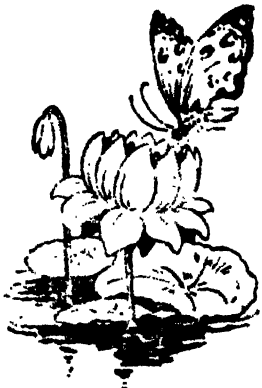
মূল্য দেড় টাকা

'রাজহংসে'র পরবর্ত্তী কাব্য

মানস-সরোবর

মূল্য এক টাকা বারো আনা

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস



বাণী ও সুরের মালিকা

আধুনিক ঃ কাব্য-গীতি

কুমারী যূথিকা রায় ([illegible])

27331 } ধীরে ধীরে বৌ-কথা-কও ডাকে / স্বপ্নে দেখি একটি নূতন ঘর

জগন্ময় মিত্র

N 27310 } সাতটি বছর আগে / সাতটি বছর পরে

শ্রীমতী বীণা চৌধুরী

27832 } প্রিয়তম হে বিদায় / সবারে আজ দাও গো

গীতশ্রী কুমারী নীলা সরকার

N 9919 } মাধবী রাতে মম মনোবিহারে / আলো-ঝলমল্

শ্রীমতী পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়

17050 } যবে তুলসীতলায় প্রিয় / তুমি আর একটি দিন থাক

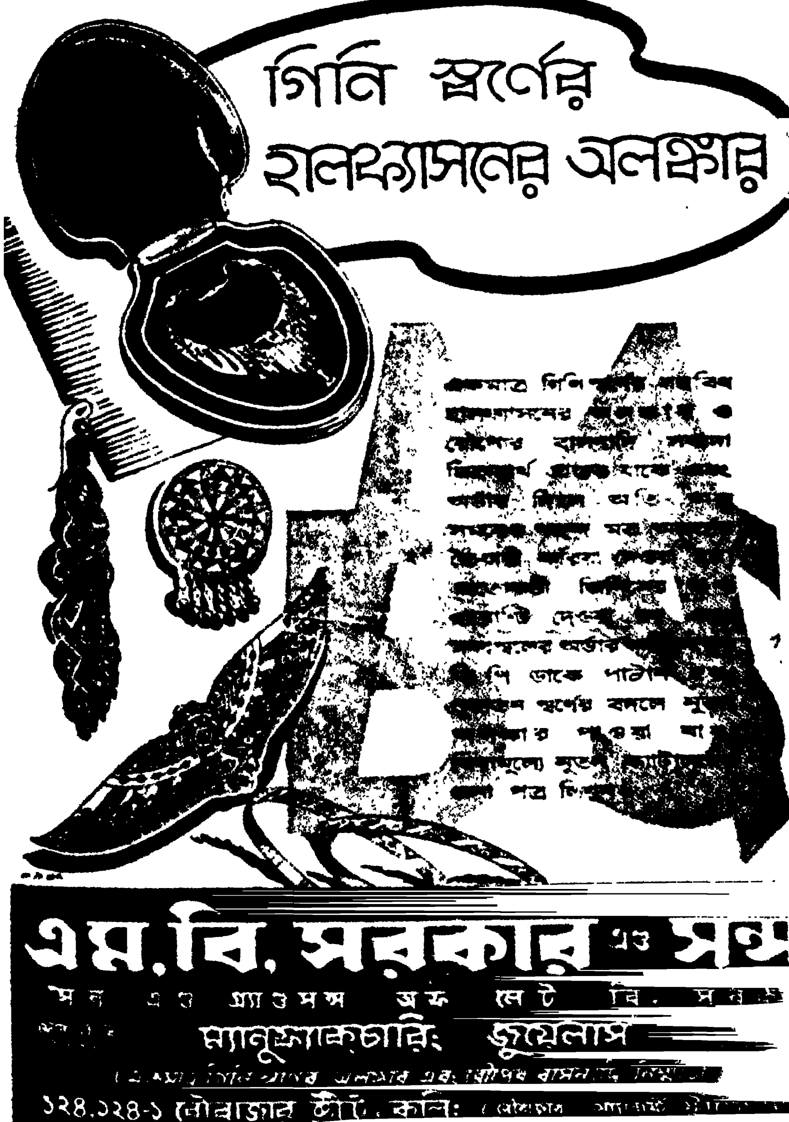
কুমারী অণিমা দাশগুপ্তা

N 27325 } সেদিন মাধবী রাতে / তব গানের ভাষায় সুরে

হিজ মাষ্টারস ভয়েস রেকর্ড



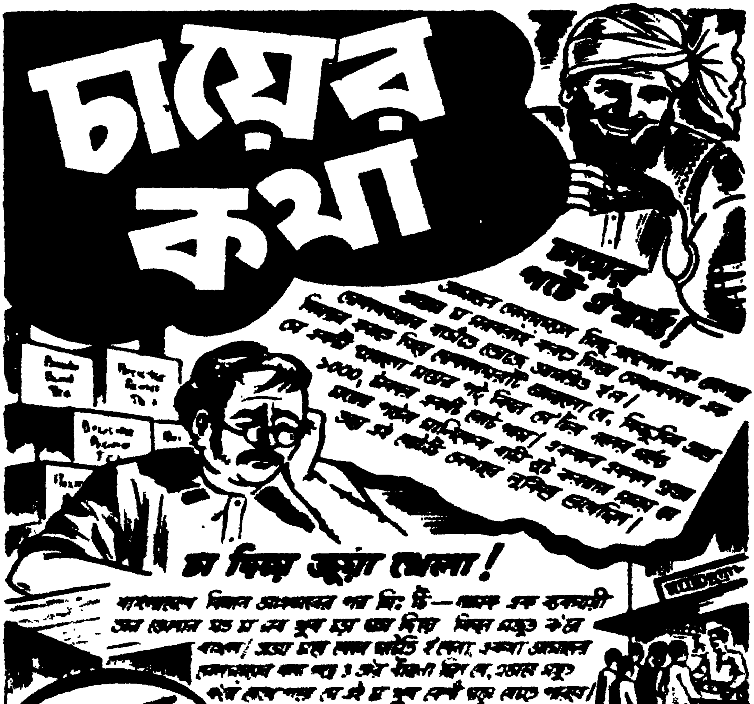
শাড়ী
চলো!
মহালক্ষ্মী
কটন মিলস লিমিটেড
ম্যানেজিং এজেন্টস্: এইচ. দত্ত এণ্ড সন্স, লিঃ
হেড অফিস: ১৫, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা


গিনি স্বর্ণের
হালফ্যাসনের অলঙ্কার
এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
১২৪,১২৪-১ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিঃ


মিনার্ভা প্রোডাক্‌সনের
প্রেম মধুর সামাজিক আলেখ্য
প্রার্থনা
শ্রেষ্ঠাংশে
সবিতাদেবী
মতিলাল
কজ্জন
নির্ম্মলকর
পরিচালক
সর্ব্বোত্তম বাদামী
—পরিবেশক—
এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটার্স
মিনার্ভা
ফোন কলিঃ
প্রত্যহ
পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহে প্রত্যহ প্রদর্শিত হইতেছে


শিশুদের পক্ষে মাতৃস্তন্য অতুলনীয়
সন্দেহ নেই
কিন্তু
মাতৃ-দুগ্ধের অভাব
বা মাতৃদুগ্ধ বিকৃত
হ'লে, তার অভাব
পূরণ করতে পারে
একমাত্র
ভিটা-মিল্ক
ন্যাশনাল নিউট্রিমেন্টস্ লিঃ ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা


ণে-গন্ধে অতুলনীয়
বাথগেটের সুবাসিত
ক্যাষ্টর অয়েল
আপনার
পিতামহ ও পিতামহী
এই কেশ তৈলই
ব্যবহার করিতেন
নকল হইতে সাবধান
Bathgate & Co.
CHEMISTS
CALCUTTA


চায়ের কথা
চা নিয়ে জুয়া খেলা!
ব্রুক বণ্ড



লিপটনের চা খেতে খেতে অসাবধানে কথা বলবেন না

শনিবারের চিঠি
১৫শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫০

ইন্‌ফ্লেশন, না স্বর্ণমৃগ

অর্থশাস্ত্রের একটি প্রধান সূত্র হইল, অর্থের সংখ্যাতত্ত্ব (quantity theory of money)। এই তত্ত্বের মূল কথা হইল—প্রত্যেক জিনিসের মূল্য যেমন উহার যোগান ও চাহিদার আপেক্ষিক পরিমাণের উপর নির্ভর করে, তেমনই টাকার মূল্যও নির্ভর করে তাহার যোগান ও চাহিদার উপর। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাক। আমরা জিনিসের মূল্য সর্ব্বদা নিরূপণ করিয়া থাকি টাকার মাপকাঠির দ্বারা, এবং তাহা করিতে গিয়া জিনিসের মূল্য বাড়িতেছে, কি কমিতেছে, ইহাই শুধু দেখিতে পাই; কিন্তু তখন আমরা এ কথা ভাবি না যে, টাকারও একটা মূল্য আছে; এবং তাহার মূল্য বাড়িতেছে, কি কমিতেছে, তাহার বিচার হয় জিনিসের মাপকাঠির দ্বারা। সুতরাং আমরা যখন বলি, জিনিসের মূল্য বাড়িয়াছে, তাহার অর্থ হইল—টাকার মূল্য বা ক্রয়-শক্তি কমিয়াছে। তেমনই জিনিসের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে বলিলেও টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই যে টাকার মূল্য বা ক্রয়-শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি, ইহা তাহার যোগান ও চাহিদার আপেক্ষিক পরিমাণের উপরে নির্ভর করে। যখন কোন বিশেষ দ্রব্যের যোগান হ্রাস বা চাহিদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাহার মূল্য বৃদ্ধি পায়, কিংবা যোগান বৃদ্ধি বা চাহিদা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া তাহার মূল্য হ্রাস পায়, তখন তাহার দ্বারা কিন্তু টাকার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি সূচিত হয় না—যদিও সেই বিশেষ পণ্যটির খরিদের বেলায় টাকার ক্রয়-শক্তির তারতম্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু যদি একই সময়ে প্রায় সকল জিনিসের বেলায়ই মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস লক্ষিত হইতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—টাকার ক্রয়শক্তির সত্যই হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, অর্থাৎ টাকার

চাহিদা অপেক্ষা যোগান বাড়িয়াছে, অথবা যোগান অপেক্ষা চাহিদা বাড়িয়াছে।

এখানে প্রশ্ন হইবে, টাকার আবার যোগান ও চাহিদা কি? টাকার সংখ্যা কি বাড়ানো ও কমানো যায়? আর যদি চাহিদার কথা বলেন তবে বলিব, আমরা সকলেই তো ইহার উপাসক, সারা জীবন তো ইহারই জন্ত ওত পাতিয়া বসিয়া আছি। সুতরাং ইহার চাহিদার আবার আদি-অন্ত বা সীমা-পরিসীমা কি? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলিব, টাকার সংখ্যা ইচ্ছামত বাড়ানো ও কমানো যায়, প্রধানত দুইটি উপায়ে। একটি উপায় হইতেছে দেশের ব্যাঙ্কে যে সর্ব্বসাধারণের কোটি কোটি টাকা গচ্ছিত থাকে, ব্যাঙ্ক সেই টাকা নানা কাজে অনেক লোককে ধার দেয়। এই ধারের পরিমাণ বাড়ানো ও কমানো ব্যাঙ্কেরই হাতে। যদি ব্যাঙ্ক কোন বিশেষ সময়ে এই ঋণদানের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে সেই অতিরিক্ত টাকা বাজারে উপস্থিত হইয়া প্রাচুর্য্যের সৃষ্টি করিবে। সাধারণত ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাগ্যচক্র যখন ঊর্দ্ধগামী হয়, তখন দেশের ব্যবসায়ী ও কারবারীগণ তাহাদের ব্যবসায় প্রসার ও উন্নতির সুযোগ বুঝিয়া মহাজন বা ব্যাঙ্কের নিকট ধারের জন্ত অধিক সংখ্যায় উপস্থিত হইতে থাকেন এবং তাহারাও সেই সময়ে অনেকটা নিঃশঙ্কচিত্তে উহাদিগকে অধিকতর পরিমাণে দাদন দিয়া থাকে এবং এইভাবে দেনা বা ব্যাঙ্ক-ক্রেডিটের মারফতে বাজারে বহু টাকার আমদানি হইয়া চলতি অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। টাকা বাড়াইবার দ্বিতীয় উপায় হইল—দেশের গবর্ণমেণ্ট বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অধিক পরিমাণে কাগজী নোট ছাপাইয়া বাজারে সেইগুলি চালাইতে শুরু করে। প্রয়োজন হইলে এবং ইচ্ছা করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই আবার বাজার হইতে অতিরিক্ত অর্থ তুলিয়া বা সরাইয়া লইতে পারে। কিন্তু সেই সকল কলাকৌশল এখানে আলোচ্য নহে। বর্ত্তমান সময়ে আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহা হইতেছে এই যে, মহাজন, ধনী ব্যাঙ্ক ও সরকারী ছাপাখানা নিজ নিজ সিংহদ্বার দিলদরিয়া মেজাজে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধের এই মহাযজ্ঞের হোমানলে

একটা কিছু আহুতি দিয়া বরলাভের জন্য সকলের আহ্বান আসিয়াছে। সচল, অচল, খাঁটি, মেকী বলিয়া আজ আর মানুষ বা জিনিসের মধ্যে বিশেষ বাছবিচার নাই। এই একটানা উচ্ছ্বাসের বাজারে বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী পুরুষগণ দুই হাতে টাকা ছড়াইয়া দশ হাতে দশগুণ করিয়া উহা লুঠিয়া লইতেছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর কি পরিমাণ অর্থ অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া এইভাবে বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার নির্ভরযোগ্য হিসাব অবশ্য আমরা দিতে পারিতেছি না, কারণ তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের হিসাব ভিন্ন, অন্য ব্যাঙ্ক ও মহাজনী কারবারের হিসাব পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে, যুদ্ধের প্রারম্ভে বহু টাকা যেমন ভয় পাইয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল, পরবর্ত্তী মরসুমে তদপেক্ষা অধিকতর টাকা তাহাদের বন্দীদশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাজারে আসিয়া পশরা খুলিয়াছে। এই টাকার সঠিক হিসাব পাওয়া না গেলেও যুদ্ধের এই সাড়ে তিন বৎসরে কি পরিমাণ নূতন নোট বাজারে বাহির হইয়াছে, তাহা দেখিলেই অর্থ-স্ফীতির একটা পরিষ্কার ধারণা করিতে পারা যাইবে। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত বাজারে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৯ কোটি টাকা। গত মে মাসে উহা প্রায় ৭০০ কোটিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সুতরাং যুদ্ধের সূচনা হইতে আজ পর্য্যন্ত ৫০০ কোটি টাকার অধিক নূতন নোট সৃষ্টি হইয়াছে।

টাকা যোগানের বহর তো দেখা গেল। এখন টাকার চাহিদা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। টাকার প্রয়োজনই টাকার চাহিদা। সেই প্রয়োজন শুধু 'ইচ্ছা হয়ে মনের মাঝারে' থাকিলেই চলিবে না। ভোগের পণ্যসামগ্রী ক্রয় করিবার জন্যই তাহার প্রয়োজন। দুনিয়ায় যদি টাকাই শুধু থাকিত, আর ভোগের সকল সামগ্রী অন্তর্দ্ধান করিত (বর্ত্তমান যুদ্ধের বাজারে এ দেশে যাহা ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে) তাহা হইলে শুধু অর্থ লইয়া মানুষের কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হইত? কারণ মানুষ তো আর অর্থ নামক পদার্থটিকে চর্ব্বণ করিয়া বা পরিধান করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারিত না। সুতরাং অর্থের প্রকৃত

চাহিদা নির্ভর করে দেশের মোট বিক্রয় বা হস্তান্তর-যোগ্য ভোগ-সামগ্রীর উপর। এই ভোগ-সামগ্রীর মধ্যে মানুষের বুদ্ধি ও শ্রম-সম্পদকে ধরিতে হইবে; কারণ তাহাও অর্থ দ্বারা ক্রয় করিতে হয়। তাহা হইলে টাকার মূল্য তাহার যোগান ও চাহিদার উপর নির্ভর করে বলিলে, ইহাই বুঝিতে হইবে যে, কোন একটা বিশেষ সময়ে বাজারে মোট চলতি টাকা ও মোট বিক্রয় বা হস্তান্তর-যোগ্য পণ্যের সংখ্যার দ্বারা ইহার মূল্য (পক্ষান্তরে পণ্যমূল্য) নিরূপিত হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভোগ-সামগ্রী বলিতে আমরা যদি এখন শুধু চাউলকেই ধরিয়া লই, এবং আজ যদি কলিকাতার বাজারে ২০ লক্ষ মণ চাউল বিক্রয়ের জন্য মজুত থাকে, আর মানুষের হাতে থাকে একুনে এক কোটি টাকা, তাহা হইলে চাউলের দর হইবে মণ-করা ৫৲ টাকা। কিন্তু যদি টাকার সংখ্যা বাড়িয়া ২ কোটি বা কমিয়া ৫০ লক্ষ হয়, অথচ চাউলের পরিমাণ সমানই থাকে, তাহা হইলে চাউলের দর যথাক্রমে ১০৲ ও ২॥০ টাকা হইবে। পক্ষান্তরে, টাকার সংখ্যা যদি এক কোটিই থাকিয়া যায়, অথচ চাউলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২৫ লক্ষ বা হ্রাস পাইয়া ১০ লক্ষ মণ হয়, তাহা হইলে চাউলের দর যথাক্রমে ৪৲ টাকা ও ১০৲ টাকা দাঁড়াইবে। ইহারই নাম টাকার সংখ্যাতত্ত্ব।

তাহা হইলে শেষসিদ্ধান্ত ইহাই দাঁড়াইল যে, জিনিসের মূল্য নির্ভর করে দেশের মোট টাকা ও মোট পণ্য-সম্পদের আপেক্ষিক সংখ্যার উপর। তাই প্রত্যেক দেশের কর্তৃপক্ষের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে, অর্থের ও পণ্যের এই সম্পর্ক স্থির রাখিয়া পণ্যমূল্য যথাসম্ভব ঠিক রাখা; কারণ পণ্যমূল্য যদি অর্থের ক্রয়শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হেতু প্রায়শ পরিবর্ত্তনশীল হয়, তাহা হইলে দেশের উৎপাদক (Producer) ও খাদক (Consumer) উভয়ের অবস্থাই অনিশ্চিত হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় পূর্ব্ব হইতে হিসাব করিয়া কোন কাজকর্ম্ম করা অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং সমগ্র ব্যাপার একটা জুয়াখেলায় পরিণত হয়। অকস্মাৎ পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে পণ্যোৎপাদকের অপ্রত্যাশিত লাভ হইবে সত্য; কিন্তু অন্য দিকে নির্দ্দিষ্ট আয়ের পণ্যভোগীদের ভাগ্যে অকারণ বঞ্চনা

লাভ হইবে। এই অবস্থায় উত্তমর্ণদেরও ক্ষতি হইবে, কিন্তু অধমর্ণদের সুবিধা হইবে। কারণ ধার করিবার সময় টাকার যে মূল্য ছিল, তদপেক্ষা এখন উহার মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় অধমর্ণগণ কম মূল্যের টাকা দিয়া ঋণমুক্ত হইতে পারিবে। দৃষ্টান্ত—এক ব্যক্তি কিছু কাল পূর্ব্বে ৫৲ টাকা ধার করিয়া ১ মণ চাউল ক্রয় করিয়াছিল। কিন্তু চাউলের মূল্য এখন ১০৲ টাকা হওয়ায় সে তাহার মহাজনকে ৫৲ টাকা ফেরত দিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু সে ।৵০ আনা মাত্র দিয়া রেহাই পাইতেছে। এইরূপ অবিচার ও অনাচার বন্ধ করিবার এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-কর্ম্ম, জীবন-যাত্রাকে অনিশ্চিত জুয়ার দান হইতে একটা সুশৃঙ্খল হিসাবের মধ্যে আনিবার জন্যই প্রত্যেক দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। লেন-দেন লইয়া নিজ নিজ দেশের ভিতর পণ্য-সংখ্যার সহিত অর্থ-সংখ্যার হার ঠিক রাখিয়া পণ্যদ্রব্যের ওঠা-নামা যথাসাধ্য নিবারণ করাই ইহাদের প্রধান কাজ। (পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া হ্রাসের সূচনা হইবামাত্র তদনুযায়ী টাকার সংখ্যা বাড়াইয়া দিবার ভার ইহাদেরই উপর, আবার পণ্যোৎপাদন হ্রাস পাইয়া মূল্য চড়িবার লক্ষণ দেখা গেলে বাজার হইতে অতিরিক্ত টাকা তুলিয়া লইবার দায়িত্বও ইহাদেরই।) আর্থিক ব্যাপারে বহু মার খাইয়া অনেক রকমে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, শত শত বৎসর আন্দোলন করিবার পর ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া নামক একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আমাদের ভাগ্যে লাভ হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার চারি বৎসরের মধ্যেই পৃথিবীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া অভাবনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার তাল সামলানো বিদেশী সরকারের আওতায় যুদ্ধনৈতিক অবস্থার চাপে এই ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভবপর হইতেছে না। তাহার প্রমাণ, এই দেশে বর্ত্তমানে যে পরিমাণ পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রামূল্য হ্রাস পাইয়াছে, পরদেশ-মুখাপেক্ষী, জার্ম্মান ব্লিৎস-বিধ্বস্ত, যুদ্ধের অন্যতম প্রধান নটরাজ ইংলণ্ডেও তদনুরূপ কিছুই হয় নাই।

কেন এইরূপ হইল? এই প্রশ্নের উত্তর উল্লিখিত সূত্রের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। এক দিকে পণ্য-সম্পদ হ্রাস, অন্য দিকে স্বর্ণভীতি

(inflation) এই একাভিমুখী দুইটি ধারার যুগপৎ সম্মিলন এই অবস্থার জন্ম দায়ী। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যুদ্ধের দরুন চারিদিকে তো ভয়ানক কর্মব্যস্ততা দেখিতেছি, দিবারাত্রি তো কলকারখানার কাজ চলিতেছে, এ অবস্থায় উৎপাদন হ্রাস পাইবে কি করিয়া? তাহার উত্তর হইতেছে, মানুষের ভোগ-সামগ্রীর উৎপাদনই আমাদের বিবেচ্য, বর্ত্তমানে চারিদিকে অহোরাত্রি যে কীর্ত্তন চলিয়াছে, তাহা সর্ব্বসাধারণের পণ্যসম্পদসৃষ্টির লীলা-কীর্ত্তন নহে, যুদ্ধের গোলা-বারুদ সাজ-সরঞ্জাম তৈয়ারির পালা। আমাদের দেশের কলকারখানায়, ক্ষেতখামারে যাহারা সর্ব্বসাধারণের ভোগের পণ্য নির্ম্মাণ করিত, তাহাদের অধিকাংশ আজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুদ্ধের পালা-কীর্ত্তনে লাগিয়া গিয়াছে। তদুপরি বিদেশ হইতে সাধারণের ব্যবহার্য্য যে সব পণ্যসম্ভার আসিত, তাহাও আজ যুদ্ধের দাবি মিটাইবার জন্যই বন্ধ। সুতরাং এই মহাযজ্ঞে দেশের অসংখ্য বিবাগী ও বেকারের একটা গতি হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ ভোগ-সামগ্রীর হাটে পণ্যের যোগান অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে; কিন্তু চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে কল্পনাতীত; কারণ গবর্মেণ্ট তাহার বিরাট ক্রয়শক্তি লইয়া সেই হাটে সাধারণ খরিদ্দারের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার পণ্যের উপরই তাহার দাবি, এবং সেই দাবির সীমা-পরিসীমা নাই এবং মূল্যেরও দেখাজোখা নাই। এই দাবির অপরিসীম শক্তির পরিমাপ করিতে হইলে ভারত গবর্মেণ্টের যুদ্ধের দরুন ব্যয়ের অঙ্কের দিকে আমাদের একবার দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। এই যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারত গবর্মেণ্টের সামরিক ব্যয়ের বরাদ্দ ছিল বার্ষিক ৬০।৬৫ কোটি টাকা। কিন্তু এই প্রলয়নাচন শুরু হইবার পর প্রতি মাসেই প্রায় এই পরিমাণ টাকা ব্যয় হইতেছে। তাহা হইলে এখন বৎসরে ৬০।৬৫ কোটি টাকার স্থলে ভারত গবর্মেণ্টের ৭০০ কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে; এবং এই টাকা জিনিস ও মানুষ কিনিতেই ব্যয় হইতেছে। এত বড় প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত পাল্লা দিয়া আমাদের আত্মারাম ঠাকুরকে দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখা কি আমাদের মত ভদ্রলোকের সাধ্য—যদি না প্রভুপক্ষ আমাদের উপর একটু কৃপাদৃষ্টি রাখেন?

আমাদের আশঙ্কা হয়, আমরা যেন সেই কৃপাদৃষ্টি হইতে কিঞ্চিৎ বঞ্চিত হইয়াছি। হইবারই কথা। কিছুকাল যাবৎ আমাদের অনেকের আচরণ ও চালচলনের মধ্যে সাবালকোচিত পাকামি বা জ্যাঠামি প্রকাশ পাইতেছিল। যুদ্ধের এইরূপ সঙ্কটকালে এতাদৃশ আচরণ উপেক্ষা করা চলে না। তাই সম্ভবত আমাদিগকে কিঞ্চিৎ সহবৎ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। অন্যথা এ দেশে অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা এতদূর গড়াইতে পারিত বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে যুদ্ধের দাবি যতই সর্বগ্রাসী ও অগ্রগণ্য হউক না কেন, তথাপি সে সব দেশে সাধারণ বেসরকারী লোকের জীবন-ধারণোপযোগী সমস্ত প্রয়োজনকে এভাবে এতটা পরিমাণ উপেক্ষা করিয়া চলা সম্ভবপর হয় নাই। যুদ্ধের এই ভীষণ অবস্থার মধ্যেও ইংলণ্ড বিপদসঙ্কুল সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া বিদেশ হইতে খাদ্য ও বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া, দেশবাসী সকলের অভাব যথাসাধ্য মোচন করিতেছে; আর আমাদের দেশে বিদেশ হইতে পণ্য আমদানি তো বহু দূরের কথা, অর্দ্ধভুক্ত ও অর্দ্ধউলঙ্গ লক্ষ লক্ষ লোকের মুখের গ্রাস ও পরিধানের বস্ত্র কিছুদিন পূর্ব্বেও কর্ত্তৃপক্ষের জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছানুযায়ী বিদেশে চালান দেওয়া হইয়াছে। দেশের ভিতরেও এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস, এমন কি নিজের জমির ধান ও খনির কয়লা আনাইবার আবশ্যক হইলে রেলে তাহাকে কোথাও এতটুকু স্থান পাওয়া পর্য্যন্ত দুঃসাধ্য। গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত কাজের বাহিরে কিছুই হইবার উপায় নাই। সর্ব্বত্রই যুদ্ধের দোহাই! কিন্তু যুদ্ধের এই দোহাই তো যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার জন্য; কিন্তু জয়ের বহু পূর্ব্বেই, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহু দূরে থাকিয়াও, যদি আমাদিগকে এখনই দল বাঁধিয়া গঙ্গাযাত্রা করিতে হয়, তবে এই দোহাই কাহার জন্য বা কিসের জন্য? এ সহজ প্রশ্নটি যে উঠিতে পারে, তাহা আমাদের প্রভুবংশ অবগত নহেন, এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই; কিন্তু অন্যবিধ কারণ ইহা অপেক্ষাও প্রবল। সে বিষয়ে পরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এখন পূর্ব্ব আলোচনায় প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক। যুদ্ধারম্ভের পর ৫০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত নোট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাজারে ছাড়িয়াছেন, ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই ৫০০ কোটি টাকার নোট কোথা হইতে কি ভাবে আসিল? এই নোটের পশ্চাতে কি পৃষ্ঠপোষকরূপে স্বর্ণ কিংবা অন্য কোনরূপ মূল্যবান সম্পদ নাই? ইহা কি শুধুই কাগজের নোট, যাহা গবর্ণমেণ্ট (যুদ্ধের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া) যদৃচ্ছা ছাপাইয়া আমাদের পণ্য ও শ্রম-সম্পদ ক্রয় করিতেছেন? এসব প্রশ্নের উত্তর হইতেছে, এই নোটের পশ্চাতে স্বর্ণ বা রৌপ্য না থাকিলেও বিলাতী মুদ্রা স্টার্লিঙের পৃষ্ঠপোষকতা রহিয়াছে। এই ৫০০ কোটি টাকা মূল্যের স্টার্লিং কোথা হইতে আসিল, এখানে তাহার একটু ইতিবৃত্ত দেওয়া আবশ্যক। যুদ্ধের প্রয়োজনে ইংলণ্ড এ দেশে অসংখ্য পণ্য ও সৈন্য খরিদ করিয়া চলিয়াছে এবং তাহার মূল্য আমাদিগকে টাকায় না দিয়া স্টার্লিং দ্বারা পরিশোধ করিয়া আসিতেছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের অভিভাবক হিসাবে আমাদের হইয়া যে টাকা নিজ দেশ হইতে পূর্ব্বে ধার করিয়াছিল, তন্মধ্যে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস নাগাদ ২১৮ কোটি টাকা এই স্টার্লিং হইতে পরিশোধ করিয়া লইয়াছে। ১৯৪৩ মার্চ অন্তে বাকি বিলাতী দেনা পরিশোধিত হইয়া এবং B. N. W. & R. K. রেলওয়ে খরিদ বাবদ ৩৭ কোটি টাকার স্টার্লিং দিয়াও ভারতবর্ষের অনুকূলে মোট ৫৮৩ কোটি টাকার স্টার্লিং ব্যালান্স দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের আজ কত বড় গৌরবের দিন! ছিল এতকাল অধমর্ণ হইয়া, আজ উত্তমর্ণের পদলাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। এ সবই ঠিক। কিন্তু আবার ইহাও ঠিক, এত টাকার মালিক হইয়াও আমাদের দীন দশা ঘুচিল না, অন্নবারি মুছিল না। ইহাই অর্থশাস্ত্রের মার, টাকার সংখ্যাতত্ত্বের ভেলকিবাজি। অর্থ যে ঐশ্বর্য্য নহে, ইহা ভাল করিয়া বুঝিবার দিন আসিয়াছে। দেশে ঐশ্বর্য্য আছে, অর্থ নাই, এই সমস্যার মীমাংসা সম্ভব; কিন্তু ঐশ্বর্য্য নাই, অর্থ আছে, এই সমস্যা অমীমাংসনীয়। আর যদি প্রচুর অর্থের

সহিত স্বল্প ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ হয়, তাহা হইলে ইহারই নাম ইন্‌ফ্লেশন, যাহার ফলে হয় পণ্যমূল্য চড়কগাছ, ধনী ও সন্ধানীদের মহোল্লাস এবং দরিদ্রের সর্ব্বনাশ। বর্ত্তমানে তাহাই ঘটিয়াছে।

অনেকে মূল সমস্যাটিকে চাপা দিতে চান এই বলিয়া যে, যত কোটি টাকার নোটই চলুক না কেন, এই নোটগুলির পশ্চাতে যখন যথেষ্ট পরিমাণ স্টার্লিং সিকিউরিটি রহিয়াছে, তখন এই অবস্থাকে 'ইন্‌ফ্লেশন' বলা যায় না। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, নোটের পশ্চাতে যথেষ্ট পরিমাণ সিকিউরিটি আছে, কি নাই, এবং স্টার্লিংকে উপযুক্ত সিকিউরিটি মনে করা যাইতে পারে কি না, তাহা এক্ষেত্রে বিচার্য্য নহে (যদিও এ বিষয়েও আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে)। আমাদের বর্ত্তমান বক্তব্য হইতেছে, যুদ্ধের এই ৩½ বৎসরে বাজারে যে অতিরিক্ত ৫০০ কোটি টাকার নোট ছাড়া হইয়াছে তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় যদি যথেষ্ট সিকিউরিটি থাকিয়াও থাকে, তাহা হইলেও ইন্‌ফ্লেশনের বিচারে উহা বড় কথা নহে। বড় কথা হইল, বাজারে যে পরিমাণ ভোগ-সামগ্রী বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই অনুপাতে অতিরিক্ত নোট ছাড়া হইয়াছে কি না? অথবা গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের দরুন যে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাহার প্রত্যেকটি টাকা সর্ব্বসাধারণের উপার্জ্জন বা আয় হইতে গৃহীত হইয়াছে কি না? কিংবা যে পরিমাণে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণে দেশের লোকের ব্যয় হ্রাস পাইয়াছে কি না? যদি এই প্রশ্নগুলির উত্তর সব 'হাঁ' হয়, তাহা হইলে আমরা স্বীকার করিব, 'ইন্‌ফ্লেশন' হয় নাই। কিন্তু এই প্রশ্নগুলির খাঁটি উত্তর চক্ষুমান কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

এখন প্রশ্ন হইবে, গবর্ণমেণ্ট উচ্চতর হারে কর-নির্দ্ধারণ, ও অধিকতর পরিমাণে ঋণ-গ্রহণের পথ অবলম্বন না করিয়া নূতন অর্থ-সৃষ্টির পিচ্ছিল পথে অগ্রসর হইলেন কেন? তাহার উত্তর হইতেছে, যে দেশে শাসক ও শাসিতের মধ্যে মনের মিল ও পারস্পরিক আস্থা নাই, যে দেশে "স্বরাজ" "স্বরাজ" করিয়া একদল লোক মানুষকে বিপথগামী করিয়া তুলিতে চায়, ভোগের সামগ্রী স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যুদ্ধের প্রয়োজনে

ছাড়িয়া দিবার আগ্রহ যেখানে আদৌ নাই, ধার চাহিলে সুদের লোভেও যেখানে ধার পাওয়া কঠিন হয়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর বাড়াইতে গেলে ধনী-নির্ধন সকলে সমস্বরে যেখানে প্রতিবাদ শুরু করে, সেখানে ইনফ্লেশন-রূপ স্বর্ণযুগের সাহায্য ব্যতিরেকে মনুষ্য-হৃদয় জয় করিবার অন্য কি সহজ ও প্রশস্ত পথ থাকিতে পারে?

সরকার বাহাদুরের এই উদ্দেশ্য আশাতীত সফল হইয়াছে। নন্-কো-অপারেশন করিয়া, নিষেধের গণ্ডি টানিয়া, গোসা করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিব, সঙ্কল্প করিয়াছিলাম; কিন্তু স্বর্ণযুগ আমাদের সকলকেই ঘরের বাহির করিয়া ছাড়িয়াছে এবং বহু লোকের ভাগ্য শিকাও ছিঁড়িয়াছে। ঠিকাদার, কনট্রাক্টার, ব্যবসাদার, দোকানদার, প্রডিউসার, ম্যানুফ্যাক্চারার, দালাল, উপদালাল অনেকেই যখন লাখের চতুর্দোলায় লক্ষ্মীকে ঘরে আনিলেন এবং যাঁহারা এতদূর যাইতে পারিলেন না তাঁহারাও খাকি চড়াইয়া, শিখিধ্বজ সাজিয়া মাসান্তে কিঞ্চিৎ রজত-মূল্যের কাগজী দক্ষিণা পকেটে পুরিয়া নগর ও শহরের পথঘাট সরগরম করিয়া তুলিলেন, এবং সরকার বাহাদুরও বুঝিলেন স্বর্ণযুগের নেশা ইহাদিগকে বেশ পাইয়া বসিয়াছে, আর ভয়ের কোন কারণ নাই, এবং আরও দেখিলেন আন্তর্জাতিক যুদ্ধের অবস্থাও অনেকটা আশাপ্রদ, তখনই স্বর্ণযুগ বধের আদেশ প্রচারিত হইল। এখন হইতে আর কেহ সরকার বাহাদুরের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত নূতন যৌথ-কোম্পানি বা কারবার খুলিতে পারিবে না, নূতন করিয়া শেয়ার বিক্রয় করিয়া পুরাতন কারবার বাড়াইতে পারিবে না, যে কোম্পানি বা কারবার চলিতেছে তাহার অতিরিক্ত লাভের শতকরা ৮৩⅓ অংশই সরকার বাহাদুরকে দিতে হইবে, ইত্যাদি। শীঘ্রই আরও অনেক দফা অর্ডিনান্স জারি হইবে—আশা বা আশঙ্কা করা যাইতেছে, যাহার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা খাটাইয়া যুদ্ধের বাজারে টাকা 'লুঠিবার' পথ সম্ভবতঃ আরও ভালরূপে রুদ্ধ করা হইবে এবং গবর্ণমেন্ট ডিফেন্স-লোনে টাকা ধার দেওয়া ভিন্ন তখন গত্যন্তর থাকিবে না; মজুরির হার আর বাড়িতে দেওয়া হইবে না, সকলকেই, এমন কি শ্রমিক ও মজুরদের পর্যন্ত,

ডিফেন্স-লোন ক্রয় করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে বাধ্য করা হইবে; কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীদের উপর নূতন করিয়া কর ধার্য্য হইবে এবং 'বাধ্যতামূলক' অর্থ-বিনিয়োগ সম্পর্কে নূতন ব্যবস্থা করা হইবে।

এই সমস্ত প্রকাশিত অর্ডিনান্স ও অপ্রকাশিত স্পেকুলেশনের উদ্দেশ্য খুবই সুস্পষ্ট। যে অপরিমিত অর্থ আজ ইনফ্লেশনের কল্যাণে ধনী ও প্রভাবশালীদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের ও সরকারের আওতায় যাহার ছিটেফোঁটা লাভ বহু ইতরজনের ভাগ্যেও ঘটিয়াছে, তাহাই সকল মানুষের আয়ের উপর একটা ঊর্দ্ধসীমা-রেখা টানিয়া দিয়া, নূতন ইণ্ডাষ্ট্রি পত্তন ও পুরাতন ইণ্ডাষ্ট্রি প্রসারের পথ রুদ্ধ করিয়া, তুলিয়া লওয়াই হইল সরকার বাহাদুরের নয়া পলিসি। রুই, কাতলা হইতে চুনোপুঁটি অনেকেই ইনফ্লেশনের টোপ গিলিয়া বেশ খানিকটা ছুটাছুটি করিয়া লইয়াছে। ইহাদিগকে খেলাইবার জন্য সুতাও যথেষ্ট ঢাকা হইয়াছিল, এইবার সুতা গুটাইবার পালা। তাই সরকার বাহাদুর এখন তাহার শাসন-যন্ত্রের 'গিয়ার' "রিভার্স" করিয়া দিতেছেন এবার ইনফ্লেশন-পর্ব্বের প্রস্থান এবং ট্যাক্সেশন ও বরোয়িং (ভলাণ্টারী অ্যাণ্ড কম্পালসারী) পর্ব্বের রঙ্গমঞ্চে নব কলেবরে প্রবেশের পালা।

শ্রীঅনাথগোপাল সেন

গণ্ডস্যোপরি-

ফোঁড়ের ওপর বিষফোড়া বলি হয়েই থাকে,
বোঝার ওপর শাকের আঁটি বা মন্দ কি !
'দুত্তোর' বলি ছিঁড়তে কি পার কাগজটাকে,
কান গিছে তার নাই টানিং-বকবকী !
অতএব দাদা, কপালেই বোঝা থাকবে রে,
যতদিন সেই হরির কৃপায় যাই কাশী—
সজ্জা হয়েছি, শাক দিয়ে মাছ ঢাকব রে,
যে বাঁশ মোদের জুলছে পুড়ে তাই বাঁশী !

মাটি

ওগো মাটি, তুমি ক্ষুধিত ধরার মাটি,
চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন,
পবিত্র তব আঁধারে দুয়ার আঁটি
গূঢ় সাধনায় জড়েরে কর চেতন।
চেতন করিয়া আলোকে ঠেলিয়া দাও,
যতনে শিকড় হৃদয়ে ধরিয়া রাখো,
ফুলপাতা মেলি নভে যে হবে উধাও—
তার আশ্রয় তুমি চিরদিন থাকো।
কি বেদনা তব বুকের মাঝারে জানি—
মুক্তিকামীরে চিরবন্ধনে বাঁধা,
সুধাসিঞ্চনে জড়েরে করিয়া প্রাণী,
জড়তার ভারে নিজে চিরদিন কাঁদা!

ওগো মাটি, তুমি ক্ষুধিত ধরার মাটি,
তোমারি বক্ষে সঞ্চিত সব সুধা,
মাঠে মাঠে ধান বাঁধা হয় আঁটি আঁটি,
কাটলে কাটলে মেলিছান তব ক্ষুধা।
অন্নের বীজ হে ক্ষুধিত, কর গ্রাস—
তৃপ্ত হইয়া শতগুণ দাও ফিরে;
মাটির বুকেতে মানুষেরা করে চাষ
মাটি স্নেহভরে দেয় ব'লে বুক চিরে।
তোমারি সলিলে সিক্তি হও তুমি,
মোরা দিন গনি শস্য করিয়া দাবি;
সবুজে সোনায় শোভে শুধু মরুভূমি—
থামারে গোলায় আমরা লাগাই চাবি।

ওগো মাটি, ওগো ক্ষুধিত ধরার মাটি,
শস্যশীর্ষে শিহরে তোমার প্রাণ ;
আমরা সকল সে প্রাণ-ফসল কাটি,
যুগ যুগ ধরি অফুরান তব দান।
তোমারি এ লীলা জানি জানি মৃণ্ময়ী,
বুকের রক্তে রাখিতেছ সংসার ;
মাটি-আশ্রয়ে তৃণেরাও চিরজয়ী ;
জগদ্ধাত্রী, ধর মানুষের ভার।
তোমার করুণা সীমানা কোথায় তার,
চৈতী আউস আমনে হয় না শেষ ;
মোরা ভুলে থাকি, তাই করি হাহাকার—
বৃথা ক্রন্দনে ভরে তুলি সারা দেশ।

ওগো মাটি, ওগো ক্ষুধিত ধরার মাটি,
তুমি আমাদের একান্ত আশ্রয় ;
কোন্ বেদনায় বৈশাখে পড় ফাটি,
আমরা অবোধ না জানি সে পরিচয়।
স্নেহভরা বুক মেলে আছ চিরদিন,
আমরা বিমুখ, তবু ক্ষরে স্নেহধারা,
মানুষ তখনি বুঝিবে মাটির ঋণ,
হবে সে যেদিন মাটি-আশ্রয়-হারা।
সে চরম দিন এসেছে ধরণীতলে,
মানুষের কাছে হে মাটি, হয়েছ মাটি ;
ফসল না যদি ফলে নয়নের জলে
রক্তধারায় ফলিবে তা পরিপাটি।

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

[শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত]

বোলপুর

…আপনি কোন একটি মঙ্গল কর্ম্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। আমার বোধ হয় আপনি যেখানে আছেন সেখানকার বাঙালীর মনে যদি দেশহিতের জন্য উদার উৎসাহ জাগাবার চেষ্টা করেন তাহলেই নিজেকে সার্থক মনে করবেন। যে কয়জন বাঙালী আছেন সকলে সদ্ভাবে মিলে সুখে দুঃখে এক হয়ে পড়াশুনা আমোদ প্রমোদ এবং হিতকর্ম্মে ক্ষুদ্র সমাজটিকে সর্ব্বতোভাবে উজ্জ্বল করে তুলতে পারেন তাহলেই মস্ত কাজ করা হবে। আপনি বলবেন, শক্ত—শক্ত নয় ত কি? বলবেন, বাধা বিস্তর—বাধা তো আছেই। কিন্তু যদি নিজেরই ভিতরকার সমস্ত বাধা কাটিয়া যথার্থভাবে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন ও কিছুতেই হাল ছেড়ে না দেন তাহলে নিশ্চয়ই ফল পাবেন। আমরা যেখানেই থাকি চারদিকেই আমাদের খুব আঁট বাঁধতে হবে—তা না হলে চিরদিন পড়ে মার খাব এতে আর সন্দেহ নেই। সেখানে ছেলেদের শেখান, মেয়েদের শেখান, বুড়োদের কর্ত্তব্যবন্ধনে টেনে আনতে চেষ্টা করুন—সেখানকার হাওয়াটা পরিষ্কার করে ফেলে উচ্চভাবে পরিপূর্ণ করে তুলুন—কোন মতেই দমবেন না—কোন মতেই পিছবেন না—কারো দ্বারা উপহাসিত হয়ে বা বাধা পেয়ে নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করবেন না—নিজের দ্বিধাহীন শক্তিকে সম্পূর্ণ জাগিয়ে তুলে সকলের মাঝখানে মাথা উঠিয়ে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াবেন এর চেয়ে আর কোন কাজ নেই। আমি বিদ্যালয়কে ছুটি দিয়ে কিছুদিনের জন্য এখানে পরিপূর্ণ নির্জ্জনতা ভোগ করতে এসেছি। ছুটির পরে অনেক ছাত্রবৃদ্ধি হবে—১০০ জন ছাড়িয়ে যাবে—তখনকার জন্যে আরো জন তিনেক সদুৎসাহী ইংরেজি বাংলায় অভিজ্ঞ ভাল শিক্ষক খোঁজ করছি।…শুধু শিক্ষক হলে হবে না। মানুষ হওয়া চাই।…ইতি ১লা কার্ত্তিক ১৩১৪।

ও সব কথা আর তুলবেন না—যা প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে তাকে যেতে দিন—জীবনের কত স্তুতি নিন্দা কত সম্মান অপমানের মধ্য দিয়ে আজ প্রায় পঞ্চাশের পারে এসে ঠেকেছি—সম্ভ যেটাকে অত্যন্ত বড় এবং কঠিন ও দুঃসহ বলে মনে হয়েছে সে সমস্তই ছায়ার মত হয়ে গেছে—এমনি করে একদিন সমস্ত বাদ বিবাদের বাইরে ভেসে চলে যাব তার পরে যা সত্য তাই স্থির হয়ে থাকবে তাতে আমার ব্যক্তিগত কোন লাভও থাকবে না কোন লোকসানও থাকবে না। দ্বিজেন্দ্রবাবু[১] আমাকে কিছু বলে নিয়েছেন আমিও তাঁকে কিছু বলে নিয়েছি। তারপরে এইখানেই খেলাটা শেষ হয়ে গেলেই চুকে যায়—অন্তত আমি ত এই-খানেই চুকিয়ে দিলুম—। এতে বৃথা অনেক সময় যায়—আমার ত আর সে সময়ের বাহুল্য নেই। আগুনের উপর কেবলি ইন্ধন চাপিয়ে আর কত দিন এই রকম বৃথা অগ্নিকাণ্ড করে মরব? দূর হোক গে, সমস্ত নিঃশেষে মিটিয়ে দিয়ে প্রাণটাকে জুড়োতে পারলে বাঁচি। ঈশ্বর করুন তাঁর কথা ছাড়া আর কারো কথা যেন এ বয়সে আমাকে টানা-টানি করে না মারে—সব পাপ শান্ত হোক।

পৃথিবীতে আইন বলুন আদালত বলুন সবই ত আধখেঁচড়া—সম্পূর্ণতা কোন্ ব্যবসায়েই আছে? এই সমস্ত জড়তা জটিলতা অস্ফুটতার মধ্যে দিয়েই মানুষ আপনার ইচ্ছাকে সফল করতে চেষ্টা করছে। যে দেশে সকল বিচারকই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সেখানে আইন আদালতের প্রয়োজনই হয় না। চোর জুয়াচোরের যখন অভাব নেই তখন কুবিচারকেরও অভাব থাকতে পারে না—কারণ চোরও ত অবস্থা-ভেদে বিচারকের আসনে স্থান পায়। যে উপকরণে চোরকে গড়ে সেই উপকরণে বিচারককে গড়বে না এমন স্বতন্ত্র কারখানাঘর ত জগতে নেই। জড়িয়ে মিশিয়ে ভালয় মন্দয় সমস্ত তৈরি হয়ে উঠছে অতএব বাস্তব ব্যাপারের কাছে খুব বেশি কিছু দাবি করবেন না—অথচ এই বাস্তবের সমস্ত অপূর্ণতার ভিতর থেকেই পরিপূর্ণের প্রত্যাশা এক মুহূর্তের জন্যও ত্যাগ করবেন না। এই আশ্চর্য্য দ্বন্দ্বই হচ্ছে মানুষের

১ ডি. এল. রায়।

জীবন। সেইজন্যই গীতা বলেন—কাজ করে যান, লড়াই করে যান তারপরে ফল যা হয় তা হবে। বস্তুত উপস্থিত ফলটা কিছুই না—কাজের দ্বারা কাজ থেকে মুক্তি লাভটাই হচ্ছে চরম সিদ্ধি। এই ত আমার ফিলজফি—কিন্তু

"প্রেমদাস সুন্দর সুরথ হ্যায়
কহ না হ্যায়, নেহি কয় না।"

ইতি ৮ই ফাল্গুন ১৩১৪

শান্তিনিকেতন

অসুস্থ শরীর নিয়ে চলে গিয়েছিলুম বোটে, ডাকঘরবিবর্জ্জিত জলপথে।...ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে ফিরে এসেছি স্বভবনের শয্যাতলে।

কিছুকাল থেকে নিজে চিঠিপত্র খুলি নে জবাব যায় পরের হাত দিয়ে। এ যুগে বাণপ্রস্থের সুযোগ নেই সেইজন্যেই ঘরের মধ্যেই নৈষ্কর্ম্যের বেড়া তুলতে হয়—সত্তর বছরের পরে কর্ত্তব্য অপালন করার অধিকার দাবি করা যেতে পারে। কিন্তু, কমলি নেই ছোড়তি—বিছানা থেকে মুক্তি পেলেই উঠতে হবে রেলগাড়িতে—সেটা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলের অপরিহার্য্য তাগিদে। যে দায় ঘাড়ে পড়েছে তাকে বহন করতে হবে যতদিন না শ্মশানপথে আমি শেষ বহনীয় হই। স্টেট্‌স্‌ম্যানে যে সংবাদ পেয়েছেন সেটা আমার স্বাস্থ্যলাভের সংবাদ নয় সেটাতে আমার দুর্গ্রহের তাড়না সূচনা করেছে। কাজ শেষ পর্য্যন্তই করতে হবে—তবু চেষ্টা করি ক্ষীয়মান শক্তি যতটা বাঁচাতে পারি। চিঠি পেলেই উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বাভ্যাস আজও আছে সেইজন্যে চিঠি যাতে না পাই সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে—তাতে নিন্দা পাবার আশঙ্কা আছে—কিন্তু নিন্দাবাক্য লিপিবদ্ধ আকারে যাতে আমার কাছে না এসে পৌঁছয় পরিজনবর্গ সেরকম সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ বেঁচে থেকে মৃত্যুর যতগুলি সুবিধা পাওয়া যেতে পারে তার চেষ্টা করা যাচ্ছে। কিন্তু বেড়ার মধ্যে ফাঁক আছে এত যে সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক মনে আরামকেদারায় চুপচাপ থাকা অসম্ভব। এই কারণে খবরের কাগজে আমার উদ্যমশীলতার যে সকল সংবাদ পাবেন সমযোচিত তার ব্যাখ্যা করে নেবেন।

ইতি ৮ নবেম্বর ১৯৩৩

মহাস্থবির জাতক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ। জন্মের ইতিহাস আমার জানা নেই। শুনেছি, প্রারব্ধ কর্ম্মফলভোগের কিছু বাকি ছিল, তাই আমাকে জন্মাতে হয়েছে, নইলে আমি মুক্তপুরুষ। মৃত্যুর ইতিহাস লেখবার অবকাশ আমার হবে না—কারুরই হয় না। বিবাহের ইতিহাস লিখতে নেই, শাস্ত্রের মানা আছে। অতএব—অতএব অয়ম্ বিস্তারঃ।

বাড়ির পাশেই ব্রাহ্মদের যে মেয়ে-ইস্কুল ছিল, তাতেই আমাকে ভর্ত্তি করিয়ে দেওয়া হ'ল। সহ-শিক্ষা উচিত কি অনুচিত, তাই নিয়ে আজ পর্য্যন্ত দেশে আলোচনারই শেষ হ'ল না, কিন্তু আজ থেকে চল্লিশ বছরেরও আগে আমার জীবনযাত্রা সহ-শিক্ষার সদর রাস্তাতেই শুরু হয়েছিল।

আমাদের ক্লাসে ছিল জন পাঁচ-ছয় ছেলে ও গুটি ত্রিশেক মেয়ে। ছেলেদের বয়েস ছয় থেকে দশ, আর মেয়েদের বয়েস আট থেকে বারোর মধ্যে। এর চেয়ে কম বয়েসের মেয়েও ছিল, তবে তাদের সংখ্যা দু-তিনটির বেশি নয়।

ইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন পুরুষমানুষ, এম. এ. পাস। এম. এ. পাস শুনলে আজকাল যেমন রাস্তার মুটের মনেও কোন সম্ভ্রম জাগে না, তখনকার দিনে তা ছিল না। তখন বি. এ. পাস না ক'রেও অনেকে হেডমাস্টারি করতেন এবং এখনকার দিনের এম. এ.র পরেও আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ী ছাপ লাগানো অনেকের চাইতে সে কালে যশই অর্জ্জন ক'রে গেছেন।

হেডমাস্টার মশায় ছিলেন ব্রাহ্ম। কালো লম্বা চাপদাড়ি, চোখ দুটি লাল টকটকে, পুরুষমানুষের পক্ষে বামন অবতার না হয়ে যতখানি বেঁটে হওয়া সম্ভব তত বেঁটে। দেহ বেশ পুষ্ট ও জোরালো;

ইনি ছাড়া আরও জন তিনেক পুরুষ মাস্টার ছিলেন। বাকি সব মহিলা শিক্ষয়িত্রী।

আমাদের ক্লাসে পাঁচ ঘণ্টায় দুজন মহিলা শিক্ষয়িত্রী পড়াতেন। উচ্চতায় তাঁরা যে কোন সাধারণ বাঙালী পুরুষের চেয়েও উঁচু ছিলেন, শরীরের ব্যাসও যথোপযুক্ত ছিল। হেডমাস্টার তাঁদের সামনে দাঁড়ালে তাঁকে বালকের মতন দেখাত। এখন মধ্যে মধ্যে ভাবি যে, তখনকার দিনে তো এগারো-বারো হাত শাড়ি ছিল না, তাঁরা দশ হাত শাড়িতে লজ্জা নিবারণ করিতেন কি ক'রে! অথচ তাঁদের শাড়ি পরবার ধরন সে সময়ে অনেকে অনুকরণ করতেন। দেখতেও তাঁরা অসুন্দর ছিলেন না, বরং বাঙালী ঘরের মেয়ের পক্ষে সুন্দরীই ছিলেন।

বাংলা দেশের অনেক মহিলা জমিদার এবং দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতির প্রতাপের কথা অনেকেই শুনেছেন, কেউ কেউ দেখেছেনও। আমিও আমার জীবনে অনেক খাণ্ডারবান শাশুড়ী, কোকেন-আড্ডার কর্ত্রী, মহল্লার চৌধুরায়েন প্রভৃতি দেখেছি, কিন্তু মেয়ে-ইস্কুলের কর্তা শিক্ষয়িত্রীর সংস্পর্শে আসবার দুর্ভাগ্য যাঁর হয় নি, নারীর প্রতাপ কতখানি হতে পারে এবং সে প্রতাপ কিরূপ অখণ্ড, সে ধারণা তাঁর হতে পারে না।

সমস্ত ইস্কুলের মধ্যে বোধ হয় শ-দেড়েক ছেলেমেয়ে ছিল। এদের মধ্যে দু-চারজন ছাড়া সকলে একই সমাজের ছেলেমেয়ে। একেবারে ওপরের ক্লাস থেকে আরম্ভ ক'রে একেবারে নিম্নশ্রেণীর ছাত্র ও ছাত্রী প্রত্যেকেই প্রায় প্রত্যেককে চেনে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের প্রত্যেকেই প্রায় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের বাবা-মাকে চেনেন।

এখানকার মতন কাঞ্চনকৌলিন্য আমি আর কোন ইস্কুলেই দেখি নি। সেখানকার সেই শ-দেড়েক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তিনটি স্পষ্ট বিভাগ ছিল। প্রথম যারা, তারা ধনীর ছেলেমেয়ে। দ্বিতীয় যারা, তারা সমাজের মাতব্বরদের সন্তান। এদের মধ্যে ধনীর সন্তানও অনেকে ছিল। তৃতীয় যারা, তারা হচ্ছে আসলে দরিদ্রের ছেলেমেয়ে, ভদ্রতা হিসাবে যাদের এখনও মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেপিলে বলা হয়।

শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের এই রকমে দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক দল শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী, তাঁরা প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের প্রতি অতিশয় মমতাসম্পন্ন ছিলেন। দ্বিতীয় দল দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর প্রতি বিশেষ মমতাসম্পন্ন হ'লেও প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতেন। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীই তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ও ছাত্রীদের বিদ্যানুশীলন ও তাদের আচার-ব্যবহারের প্রতি খুব কড়া নজর রাখতেন। শুধু তাই নয়, তাদের কোনও অপরাধ বা সামান্য ত্রুটি তাঁরা উপেক্ষা করতেন না। বিশেষ ক'রে অপরাধী যদি ছেলে হ'ত এবং ফরিয়াদী পক্ষ যদি তাঁদের অনুগৃহীত কোনও পক্ষের ছেলে অথবা মেয়ে হ'ত।

শিক্ষয়িত্রীদের নামের সঙ্গে 'দিদি' কথাটি যোগ দিয়ে ডাকাই আমাদের রীতি ছিল। অবশ্য প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগের অনেক ছেলেমেয়েই এঁদের কেউ বা 'মাসী' কেউ বা 'পিসী' ব'লে ডাকত। পুরুষ শিক্ষকদের সকল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা 'অমুকবাবু' ব'লে ডাকত। তাঁদের কারুকে কেউ 'খুড়ো', 'মামা' বা 'মেসোমশায়' বলত না।

আমি অভাগা ছিলুম এই তৃতীয় বিভাগের লোক। আমার বাবা ধনী তো ছিলেনই না; তাদের অনেকেরই সম্বন্ধে তাঁর ঘৃণা অতি মাত্রায় প্রকাশমান ছিল। তিনি ছিলেন বদরাগী ও দুনিয়াকে গ্রাহ্য না করার জন্য কুখ্যাতই ছিলেন। এই সব অমার্জনীয় অপরাধের ওপর আবার আমি ছিলুম পুরুষ শিশু। কি হিংস্রভাবে আমার ওপর অত্যাচার চলত, সে কথা স্মরণ করলে আজও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সান্ত্বনা এই যে, এ জীবনে আর কখনও মেয়ে-ইস্কুলে পড়তে হবে না। আর যদি বা পড়তে হয়, তা হ'লেও বাঁচোয়া এই যে, যাঁদের হাতে ইস্কুলে আমার বিদ্যারম্ভ হয়েছিল, তাঁরা সকলেই ঈশ্বরের কৃপায় আজ পরলোকগত।

অত্যাচার যে কোথা দিয়ে কেমনভাবে আসত, তার হদিসই পেতুম না। দু-একটা নমুনা দেবার প্রলোভন সামলাতে পারছি না।

সে সময় আমাদের প্রতিদিন 'কপাটি' খেলা হ'ত। ইস্কুল

বসবার আগে ও টিফিনের সময় খুব জোর কপাটির প্রতিযোগিতা চলত। এই খেলায় ছোট বড় সব মেয়ে ও ছেলেই থাকত। কপাটি খেলায় কয়েকদিনের মধ্যেই আমি মহা মাতব্বর হয়ে উঠলুম। আমি ধরলে দুই-তিনটি ছেলে ছাড়া আর কেউ পালিয়ে যেতে পারত না। ইস্কুলে গুটিকয়েক বড় মেয়ের গায়ের জোরের ভারি গর্ব্ব ছিল। একদিন এদের দু-তিনজনকে আমি আমাদের কোর্টে এমন ধরলুম যে, তারা আমার হাত ছাড়িয়ে পালাতে পারলে না। আমার মত ছোট ছেলের হাত ছাড়িয়ে পালাতে না পারায় তাদের অভিমানে আঘাত লাগল ও আমার ওপরে চ'টে রইল, যদিও তারা আমার চেয়ে অনেক উঁচু ক্লাসে পড়ত।

একদিন ইস্কুল বসবার আগে ছেলেমেয়েদের মধ্যে গায়ের জোরের কথা হচ্ছে, এমন সময় আমি বীরত্ব ক'রে বললুম, অমুক অমুক ছেলে ছাড়া আর কোনও ছেলে কিংবা মেয়ে আমার সঙ্গে গায়ের জোরে পারে না। আমার সঙ্গে চালাকি করতে এলে মজা টের পাইয়ে দোব।

একজন বড় মেয়ে বললে, তা হ'লে হেডমাস্টার মশায়ও তোর সঙ্গে পারেন না?

আমি বললুম, তা কেন?

তা নয় কেন? তুই বললি, কোনও ছেলে পারে না—হেডমাস্টার মশায় কি ছেলে নন?

তখনই সবাই হৈ-হৈ ক'রে উঠল। দশ মিনিটের মধ্যে সারা ইস্কুলময় রটে গেল—স্থবির বলেছে যে, হেডমাস্টার মশায় তার সঙ্গে গায়ের জোরে পারেন না, তিনি যেন তার সঙ্গে বেশি চালাকি না করেন।

ইস্কুল ব'সে যাবার মিনিট পাঁচেক পরেই লাইব্রেরি-ঘরে আমার ডাক পড়ল, হেডমাস্টার মশায় ডাকছেন।

ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের মৃদু গুঞ্জন কানে গেল। আমি মনে মনে 'দয়াময় দয়াময়' নাম জপতে জপতে লাইব্রেরি-ঘরে গিয়ে ঢুকলুম।

হেডমাস্টার মহাশয় আমারই অপেক্ষা করছিলেন। আমি গিয়ে

তাঁর সামনে দাঁড়াইতেই তিনি সেই লাল চক্ষু তুলে কটমট ক'রে আমার দিকে চাইলেন। অহো, সে কি দৃষ্টি! আমি চিত্রকর নই, তা হ'লে সে কটাক্ষ তুলি দিয়ে লিখে অমর ক'রে রাখবার চেষ্টা করতুম। মহিষের চোখে মানুষী ক্রোধ ফুটিয়ে তোলা যদি সম্ভব হয়, তা হ'লে তার সঙ্গে সে দৃষ্টির তুলনা করা যেতে পারে।

কিছুক্ষণ সেই ভাবে আমার দিকে চেয়ে থেকে ডান হাতে বেশ ক'রে আমার বাঁ কানটি বাগিয়ে ধ'রে রগড়াতে লাগলেন। মিনিট পাঁচেক এই ভাবে 'সাইলেন্ট প্যানটোমাইম' চলবার পর 'টকি' শুরু হ'ল, কেন্ রে? আমার ওপর তোর এত রাগ কেন্ রে? আমাকে তুই কি বুঝেছিস রে? হ্যাঁ, দাঁড়া, কালই তোর বাবাকে গিয়ে বলছি—

কথার সঙ্গে 'অ্যাক্‌শন' অর্থাৎ কর্ণবিমর্দন সমভাবেই চলতে লাগল। এই রকম আধ ঘণ্টা দলনমর্দনের পর কানটা ছেড়ে দিয়ে আমাকে একটা জোর ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দিয়ে বললেন, যা, ক্লাসে যা। তোর বাবার সঙ্গে একবার দেখা হ'লে হয়।

ক্লাসে ঢুকতে না ঢুকতে আমাকে দেখে সমস্ত ছেলেমেয়ে হো-হো ক'রে হেসে উঠল। শিক্ষয়িত্রী তাদের ধমক দিয়ে থামিয়ে কঠিন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে আবার অধ্যাপনায় নিযুক্ত হলেন। অবসর বুঝে আমি পাশের মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলুম, হাসছিলে কেন?

সে বললে, তোমার একটা কান কালশিরে প'ড়ে একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে, আর একটা লাল টকটকে। যা চেহারা হয়েছে! দেখলে হাসি পায়।

সেদিন টিফিনের ছুটির সময় সমস্ত ছেলেমেয়ে আমাকে 'লাল-কালো' ব'লে ডাকতে আরম্ভ ক'রে দিলে। অপমানে লজ্জায় ভয়ে আমি তাদের চোখের আড়ালে থেকে ছুটিটা কাটিয়ে দিলুম।

রাত্রে কানের যন্ত্রণায় ঘুমুতে পারলুম না। সেই থেকে আজ অবধি আমার বাঁ কানটা জখম হয়ে আছে।

বাড়িতে এক অস্থির ছাড়া ব্যাপারটা আর কাউকে জানাই নি। অদৃষ্ট কিছু সুপ্রসন্ন থাকায় কানটা অন্য কেউ তেমন লক্ষ্য করে নি।

পরের দিন বিকেলবেলায় কানের অবস্থা হঠাৎ মার চোখে পড়ায় তিনি একেবারে শিউরে উঠলেন। কি ক'রে কানের এই মুমূর্ষু অবস্থা হ'ল, সে সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন আমাকে না ক'রেই বাবার উদ্দেশে নানা কথা বলতে আরম্ভ ক'রে দিলেন—এই রকম ক'রে ছেলেগুলোকে খুন ক'রে ও কোন্ দিন ফাঁসি যাবে। আমার মরণ হয় না, এত লোকে মরে, ইত্যাদি—

বাবা আপিস থেকে না ফেরা অবধি অত্যন্ত শঙ্কায় সময় কাটতে লাগল। কি জানি ব্যাপারটা এবার কোন্ দিকে গড়াবে।

বাবা আপিস থেকে ফেরা মাত্র মা তাঁকে বকতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। তারপর আমাকে টেনে এনে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে কানটা দেখিয়ে কেঁদে বললেন, এ কি করেছ দেখ তো, এই কচি দেহ—

মা কাঁদতে লাগলেন।

বাবা তো আমার কানের রঙচঙে চেহারা দেখে চমৎকৃত। আমরা তিন ভাই-ই বলতে গেলে সকালে কি সন্ধ্যায় প্রায় নিয়মমত প্রহার সেবন করতুম। তার মধ্যে কোন্ দিনের অপরিমিত সেবনের ফলে যে এই ব্যাপারটা ঘটেছে, তা অনুমান করবার চেষ্টাও তিনি করলেন না। আমাকে ডেকে কাছে বসিয়ে আদর ক'রে বলতে লাগলেন, বাবা স্থবির, তুমি তো আমার ভাল ছেলে, ভাল ক'রে লেখাপড়া করবে, আমাদের কথা শুনবে, তা হ'লে তো আর মারতে হয় না। কথা না শুনলেই আমার রাগ হয়, আর রাগ হ'লে আমার জ্ঞান থাকে না।

একটা পত্তাকী কাড়া কেটে গেল।

এর পরে সেই হেডমাস্টার তিন বছর আমাদের ইস্কুলে ছিলেন। এই তিন বছরের মধ্যে যতদিন যতবার তাঁর চোখের সামনে পড়েছি, ততবার তিনি আমাকে রাম্ভ ভাষায় গালাগালি দিয়েছেন। একদিনের জন্যেও তাঁর মুখে একটা সহানুভূতির কথা শুনি নি।

ইনি এখনও বেঁচে আছেন এবং সাধুচরিত্রের লোক ব'লে সমাজে

রত্নাকর হে! তুমি ধন্য। কি পরাই বাঙলে দিয়ে গিয়েছ গুরু, তোমার শতকোটি নমস্কার! তোমার রামায়ণ যদি কোন দিন জগৎ থেকে লুপ্ত হয়ে যায়, তবুও তোমার স্মৃতি জাগিয়ে রাখবার লোকের অভাব বিশ্বে কোন দিনই হবে না।

বাল্যকাল অতি সুখের কাল! কে বললে, বাল্যকাল অতি সুখের কাল? অধিকাংশ লোকের বাল্যকাল অতি দুঃখেই কাটে। সেই দুঃখের গভীরতা বোঝবার ক্ষমতা বালকের প্রায়ই থাকে না, তাই পরিণত পাটোয়ারী মস্তিষ্কের প্রবীণরা বেপরোয়া ব'লে দেন, বাল্যকাল অতি সুখের কাল।

এ কথা সত্য যে, বাল্যকালে স্ত্রীপুত্রপরিজন প্রতিপালন করবার দায়িত্ব থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে এও সত্য যে, স্ত্রীপুত্রপরিজন থাকার সুখ থেকেও সে বঞ্চিত। যাঁরা বলেন, বাল্যকাল অতি সুখের কাল, তাঁদের বাল্যকাল হয়তো সুখেই কেটেছে, কিংবা তাঁরা বর্ত্তমান জীবনের দুর্দ্দশার তুলনায় অতীতকে সুন্দর দেখেন কিংবা বাল্যকালে তাঁদের সূক্ষ্ম অনুভূতি ছিলই না।

বাল্যকাল মোটেই সুখের কাল নয়। মানুষ পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা প্রভৃতি এই ধরণীতে প্রাণবন্ত যা কিছু আছে, তার সম্যক বিকাশের জন্য চাই স্বাধীনতা। বাল্যকালের প্রতি মুহূর্ত্তেই সেই স্বাধীনতা আহত হয়। ওরে রাস্তায় বেরুস নি, ছাতে উঠিস নি, কেন শিস দিচ্ছিস? ঐ ছেলেটার সঙ্গে আবার কথা বলবি তো হাড় গুঁড়িয়ে দোব। যুক্তাক্ষর বানান কর তো। বেরালছানা, কুকুরছানা, পাখির ছানা—কোথা থেকে আপদ জুটিয়ে নিয়ে এলি? প্রতি পদে বাধা, প্রতি পদে আঘাত।

তারপর বাল্যকালের বিদ্যাভ্যাস!

যাঁদের মতে বাল্যকাল অতি সুখের কাল, তাঁদের হিসাবমত আমার বাল্যকাল পরম সুখে কেটেছে। কিন্তু আমি বলছি, আমার বাল্যকাল অতি দুঃখেই কেটেছে। বালকের মনের কথা অতি অল্প লোকেই

বুঝতে পারে। বালো মানুষের মন অত্যন্ত কোমল ও ভাবপ্রবণ থাকে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে যে দীন বালক কাতরস্বরে ভিক্ষা করে, তারও প্রচণ্ড মান-অপমান জ্ঞান আছে—সব অনুভূতিই তার প্রখর। আর যে বালকের অন্তর সামান্য আঘাতেই উদ্বেল হয়ে ওঠে, চারিদিকের প্রাচুর্য্যের মধ্যে নিজের জীবনের এবং সংসারের দৈন্য নিয়ত যার চিত্তকে আঘাত করে, দারিদ্র্যবিলাস যার অন্তরে কোনও গৌরববোধই জাগিয়ে তুলতে পারে না, অবজ্ঞা অবহেলা ও শারীরিক শাসনে যার সমস্ত সত্তা পীড়িত হয়, সে বাল্যজীবনে সুখ কোথায়?

বাল্যকালে আমাদের ওপরে কড়া হুকুম ছিল, দোতলা থেকে এক-তলায় নামতে পারবে না। দুপুরবেলায় সংসারের কাজকর্ম সারা হয়ে যাবার পর মা ঘুমুতেন। আমি আর অস্থির দুজনে রাস্তার ধারের বারান্দায় গিয়ে চুপ ক'রে রাস্তার দিকে চেয়ে ব'সে থাকতুম। 'কথামালা' আর বিদ্যেসাগর মশায়ের দ্বিতীয় ভাগ খোলা থাকত আমাদের সামনে, কিন্তু আঁখি-পাখি পক্ষ বিস্তার করত তার কল্পলোকে—যেখান দিয়ে ঘোড়ায় ট্রাম টেনে নিয়ে চলেছে, কত রকম-বেরকমের ঘোড়ায় টানা গাড়ি, গরুর গাড়ি চলেছে। কত রকমের মানুষ, ফেরিওয়ালা, ভিখারী চলেছে কত অঙ্গভঙ্গী ক'রে। আমাদের মনও তাদের সঙ্গে সঙ্গে চ'লে যেত—কোথায় তাদের বাড়ি, কেমন তাদের জীবনযাত্রা!

ছোট ছেলেমেয়ে দেখলেই আমরা ডাক দিতুম, কি ভাই, কোথায় যাচ্ছ? অনেকেই মুখ তুলে একবার দেখে চ'লে যেত। যে কথার উত্তর দিত, সে হ'ত আমাদের বন্ধু। বন্ধুকে কিন্তু ওপরে ডাকতে পারতুম না। বাইরের ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে আসার মহা অপরাধে অনর্থ ঘটবে এই আশঙ্কায়।

বাল্যকালে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে এক ভিখারিণী বালিকা ভিক্ষা করতে করতে চ'লে যেত। বেচারীর হাঁটু থেকে পায়ের বাকি অংশটা ছিল বিকৃত। সে দু-হাতে আর দু-হাঁটুতে জুতো প'রে হামাগুড়ি দিয়ে ঘেঁষড়ে ঘেঁষড়ে চলত। তার মুখখানি ছিল করুণ আর ভারী একটা কমনীয়তা ছিল সে মুখে। এমন অদ্ভুত চাহনি ছিল তার

চোখে, যা আজও পর্যন্ত আমি ভুলতে পারি নি। তখন তার বয়ঃসন্ধি। আসন্নযৌবনসমারোহের আগমনী বিচিত্র রাগিণীতে তার দেহে লীলায়িত হতে আরম্ভ করেছে মাত্র। হয়তো তাকে দেখে আমার সুপ্ত মানসলোকে যৌনচেতনা সাড়া দিত কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, আমাকে সে খুব বেশি আকর্ষণ করেছিল। আমার রাস্তায় নামবার হুকুম ছিল না। আমি থাকতুম বারান্দায় দাঁড়িয়ে, আর সে থাকত রাস্তায়। সেইখান থেকে সে মুখ তুলে কাতরস্বরে আমাকে ডেকে বলত, রাজাবাবু, একটা পয়সা দে। আর আমার চোখ ফেটে কান্না বেরিয়ে আসত। আমার সঙ্গে অস্থিরও কাঁদতে থাকত।

ভিখারিণী প্রতিদিন আসত না। কিন্তু যেদিন সে আসত, সেদিন আমার মন একেবারে উদাস হয়ে পড়ত। কোথায় তার বাড়ি, কি খায় সে? তার বাপ মা আছে কি না? তার বাপ তাকে মারে কি না? বাবা হয় অথচ মারে না—এমন অবস্থা আমরা কল্পনা করতে পারতুম না কিনা! সন্ধ্যেবেলা পড়তে ব'সে তার কথা ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে পড়ার ফলে একাধিকবার জীবনসঙ্কট উপস্থিত হয়েছে, তবুও তাকে ভুলতে পারতুম না।

একদিন ভিখারিণী আমাদের বারান্দার সামনে এসে সেই রকম কাতরভাবে অনুনয় করতে লাগল, রাজাবাবু, একটা পয়সা দে। তুই রাজা হবি। তুই রোজ বলিস, কিন্তু পয়সা দিস না। তুই রাজা হবি, দে একটা পয়সা।

রাজপুত্র না হয়েও ভবিষ্যতে রাজত্ব লাভের সম্ভাবনায় মনটা তখনই রাজোচিত দাক্ষিণ্যে ভ'রে উঠল। ঠিক করলুম, আজ মার কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নিয়ে নিশ্চয় তাকে দোব। তক্ষুনি মার সন্ধানে ছুটলুম, কিন্তু সারা বাড়ি ঘুরে মাকে কোথাও খুঁজে পেলুম না, মা তখন কলতলায়। মায়ের পয়সা আলমারির কোন্ তাকে থাকে, তা আমাদের সব ভাইয়েরই জানা ছিল। সেখান থেকে মাকে না ব'লেই একটা পয়সা নিয়ে দৌড়ে রাস্তায় গিয়ে ভিখারিণীর হাতে দিয়েই আবার দরজার দিকে ফিরে দৌড়তে যাব, এমন সময় সামনে দেখি—বাবা!

আর কথা নেই। অমনই তিনি এক হাতে আমার কোমরটা ধ'রে শূন্যে তুলে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এসে উঠনে মারলেন এক আছাড়। আমার সংজ্ঞা লুপ্ত হবার অবস্থা। তখনও কিন্তু ভিখারিণীর জয়স্তুতি আমার কানে মধুবর্ষণ করছিল। মাটিতে লুটিয়ে পড়তে না পড়তে বাবা আমার ঘাড়টা এক হাতে ধ'রে কুকুরের বাচ্চাকে যেমন ক'রে নিয়ে যায়, সেই ভাবে ওপরে অর্থাৎ দোতলায় নিয়ে এলেন।

তার পরের অবস্থাটা আর বর্ণনা ক'রে কাজ নেই। প্রলয়ের শেষে প্রকৃতি একটু সাম্যাবস্থা পাবার পরের দৃশ্য—মা কলঘর থেকে বেরিয়েছেন। প্রদীপ জ্বালা হয়েছে। শতরঞ্চির কোণ ঘেঁষে দাদা ও অস্থির বসেছে, তাদের সামনে বই খোলা রয়েছে আর আমি বাবার সামনে ব'সে।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন রাস্তায় গিয়েছিলে বল?

কোন উত্তর নেই।

সঙ্গে সঙ্গে মাথার কিছু চুল বেহাত অর্থাৎ বাবার হাতে চ'লে গেল।

উত্তর দাও।

কোন উত্তর নেই। উত্তর দিতে গেলে বলতে হবে, মাকে না ব'লে পয়সা বের ক'রে নিয়ে ভিখারিণীকে দিয়েছি। সে অপরাধের সাজা কল্পনা করতেও মূর্চ্ছা আসে, তাই উত্তর নেই।

সঙ্গে সঙ্গে চপেটাঘাত এবং সর্ষপকুসুম দর্শন।

কিছুক্ষণ এই ভাবে চলবার পর অনেক ভেবে-চিন্তে ব'লে ফেলা গেল, একটা ভিখিরী ডেকেছিল ব'লে নীচে নেমেছিলাম।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল। আমার কথা শুনে পাশের ঘর থেকে চুল বাঁধতে বাঁধতে হাউমাউ ক'রে মা বেরিয়ে এসে বলতে লাগলেন, ওমা, আমি কোথায় যাব! এ ছেলেকে নিয়ে আমি কি করব? ভিখিরী ডাকলে আর তুই নীচে নেমে চ'লে গেলি তার কাছে! আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে। ভিখিরীরা এই রকম ক'রে ছেলেদের ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে হাতটা-পাটা ভেঙে দিয়ে ভিক্ষে করায়।

এই রকম বলতে বলতে মা এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করলেন

যে, বাবা পর্যন্ত দস্তুরমতন ভড়কে গেলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হতে লাগল যে, ভিখিরীদের সম্বন্ধে ভবিষ্যতে তিনিও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করবেন—এই রকম একটা সঙ্কল্প মনে মনে আঁটছেন।

ইতিমধ্যে পাড়ার একটি বর্ষীয়সী মহিলা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন আমাদের সেই সান্ধ্য-বৈঠকে। এঁকে বাবা 'দিদি' ব'লে ডাকতেন এবং কি জানি তাঁর কথার ওপরে বাবা কখনও কথা বলতেন না বা তর্ক করতেন না। আমরা তাঁকে পিসীমা ব'লে জানতাম, কিন্তু ডাকতাম 'মা' বলে। আমাদের তিন ভাইকে ইনি নিজের সন্তানের মতন দেখতেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা নিজের ভাইয়ের মতন আমাদের দেখত এবং তারা যে আমাদের আপন পিসতুতো ভাইবোন নয়, বেশ বড় হয়ে তা জানতে পেরেছি। ভিখারীতত্ত্বে মার এই পাণ্ডিত্য দেখে আমাদের এই মারও তাক লেগে গেল। বাবার মুখ দেখে তো আমার ওই অবস্থাতেও হাসি পেতে লাগল।

কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে হকচকিয়ে চেয়ে থেকে হঠাৎ বাবা ক্ষিপ্তের মত গর্জে উঠে দুমদাড় ক'রে আমায় প্রহার করতে শুরু ক'রে দিলেন। ভাগ্যে মা (পিসীমা) ছিলেন, নয়তো সেই দিনই পুত্রহত্যার অপরাধে পিতাজী নিশ্চিত চালান হতেন। মা (পিসীমা) বাবাকে যাচ্ছেতাই অর্থাৎ ব্রাহ্ম ভাষায় যাচ্ছেতাই বকতে লাগলেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, তুমি অত্যন্ত রাগী। ছেলেপুলে শাসন করা ও তাদের মানুষ করার পদ্ধতি এ নয়, ইত্যাদি।

নিরবচ্ছিন্ন খারাপ ব'লে পৃথিবীতে কিছু নেই। বাল্যজীবনের দুখ আমি কিছু অনুভব করলুম বটে, কিন্তু দাদা আর অস্থির সেদিন পড়ার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেল।

অনেক রাত্রে খেতে বসবার সময় দাদা আমাকে বললে, কোন্ ভিখিরীটা তোকে ডেকেছিল আমায় একবার দেখিয়ে দিস তো! ব্যাটা কতবড় ভিখিরী একবার দেখে নোব।

সেদিন শোবার সময় মা আমাকে ডেকে বললেন, স্থবরে, আমার কাছে শুবি আয়।

আমরা মার কাছে শুতে পেতুম না। মা ডাকামাত্র তড়াক ক'রে উঠে মার কাছে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। মা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ভিখারীদের সম্বন্ধে কত কথাই বলতে লাগলেন, আমার কানে তখন কোন কথাই যাচ্ছিল না। প্রাণপণে মাকে আঁকড়ে ধ'রে প'ড়ে রইলুম। তারপরে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম মনে নেই।

ক্রমশ

মহাস্থবির

অমৃত

ছিন্নভিন্ন বসুধার খণ্ডে খণ্ডে যূথবদ্ধ যারা,
হিংস্রক শ্বাপদ পশু, মৃগয়া করিছে পৃথিবীরে,
তাদের শৌর্য্যের ছলে ভুলিও না, হে সর্ব্বহারা
সন্ন্যাসিনী জন্মভূমি। জীবনের মহাসিন্ধুনীরে
পশ্চিমী তরঙ্গাঘাতে ভগ্ননীড় কোটি অকল্যাণ
ফেনিল বিদ্বেষভরে বিকীর্ণ করিছে হলাহল
—কালান্তের পূর্ব্বাভাষ। তুমি জ্ঞান শ্রেয়ের সন্ধান,—
উত্তাল-তরঙ্গতলে মহাসিন্ধু তব অচঞ্চল,
ধ্যান-সমাহিত, শান্ত। যূথবদ্ধ স্বার্থপরতায়
সমাসন্ন নাভিশ্বাস। প্রলয়-পয়োধিজলতলে
মৃত্যুমুখী মানবের অবিনাশী জীবনসুধায়
—ধ্যানের, জ্ঞানের, স্নেহপ্রণয়ের, পূতহোমানলে
ক্ষরণ চলিছে নিত্য। অবলুপ্ত ক্ষত্রিয়-শাসনে,
বিশ্বের কল্যাণে যারা তপশ্চারী কণ্টক-আসনে।

শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

আমরা

জানি জানি আমি এ শুধু ক্ষণিক, তবুও নিত্য ভাবি—
জনসমুদ্রে চলিতে তোমার মুহূর্ত্ত বিশ্রাম,
পথিকের চেয়ে জানি বিচিত্র কঠিন পথের দাবি,
বেহুইন মন তাই বুঝি চায় পথ-চলা অবিরাম।
তবুও যখন আস আরো কাছে শুধাও কুশল-কথা,
মনে হয় যেন তুমিই আমার ছিলে বুঝি চিরদিন,
একটি বৃন্তে যুগল ফুলের মতন মধুব্রতা
অনন্তকাল আমরা দুজন ছিলাম সুদক্ষিণ।
   আচ্ছা বল তো, মিথ্যে ক'রেই এমনি যদিই ভাবি
তোমার কিম্বা অন্য কারও হয় কি কোনও ক্ষতি?
আমি কি জানি নে জগতের কাছে আমার কোনও দাবি
একটু আদর পাবে না কখনো, যতই জানাই নতি?
কৃপণের মত তুমিই তো চাও, চাও না কিছুই দিতে
তাই তো এমন বিকাই নিজেরে মিথ্যার বউনিতে।

দুষ্মন্তের অঙ্গুরীয়ের কথা জান নিশ্চয়,
সেই যার ফলে হ'ল অবশেষে মিলন সংঘটন?
আমাদেরো যেন ঐ জাতীয়ই ছিল কিছু মনে হয়—
হারিয়ে যা আজ ভোগ করি শুধু নিত্যই অনটন।
তাই তো এখনো সহিতে পারি না স্খলন পতন ত্রুটি
বারে বারে ভাবি এ কি সেই নয়, তবে কি করেছি ভুল,
সময় যাহার কেটে যায় শুধু যোগাতে দিনের রুটি
ভাগ্যের ফেরে তারো চাই বুঝি সুরা ও গোলাপফুল।
   অনেক সময় কেটে গেছে আর মিথ্যা কাটানো কাল,
আজ থেকে শুরু হোক আমাদের অঙ্গুরী-সন্ধান,

পাই যদি ভাল, না পেলেও আর বহিব না জঞ্জাল—
এইখানে এই মাটির উপরে রচিব বাসস্থান।
কালের চক্র ঘুরে চ'লে যায়, আমরা পিছনে থাকি
যা পাই না সে তো চাই না কখনো, যা পাই তাতেও ফাঁকি।

আমরা দুজনে নগরেই থাকি নাগরিক-নাগরিকা
গহন মনের অন্ধ অতলে নিজেরে গোপন রাখি,
অতি-বিদগ্ধ নগর-জীবন যতই লাগুক ফিকা
দেখা হ'লে মৃদু হাস্য-আলাপ বিনিময় ক'রে থাকি।
কীটের মতন ব্যথিত বাসনা বিঁধিছে মর্মমূল
তারি বিষাক্ত প্রবাহে নিয়ত দেহমন জর্জর,
দিক-দর্শন-ভ্রান্ত নাবিক পাই নে যখন কূল
বিনিদ্র চোখে নামাই নিশীথে অশান্ত নির্ঝর।
একে অন্যেরে চিনি নে আমরা তবুও ভালই বাসি
অদৃশ্য সেই শক্তির পায়ে জানাই নমস্কার—
জনসমুদ্রে এমন নিকটে কি ক'রে আমরা আসি
কৃতজ্ঞ তাই করি অনুভব বিস্ময় বার বার।
দুঃখের ভাগ দিই নে—যোগের সঞ্চিত বিষপান
প্রভাতবেলায় দেখা হ'লে দিই হাসিটুকু অম্লান।

উমা দেবী

অগ্নি

অনলের মৃত্যু নাই, অগ্নি সে তো চিরবহ্নিমান্‌,
সমিধ্‌ পুড়িয়া মরে, অরণি—ঘর্ষণে মৃত্যু তার;
অগ্নি জ্বলে চিরকাল নিত্য নব আধারে আধারে—
ভস্ম-আবরণ ঠেলি বাহিরায় অগ্নি অনির্বাণ।
প্রাণিত আধারে নব অনল উদ্ভূত হয়ে আছে।

খুড়োর পরলোক-দর্শন

কালাচাঁদ খুড়ো চিরকাল 'লিবারেল' লোক। জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁর আপন, ভিন্নভাব কাকে বলে, জানেন না। রহস্য-প্রিয় স্বভাব। মিশন স্কুলে পড়েছিলেন—যীশুখ্রীষ্টকেও নমস্কার করেন, তুলসীতলাতেও মাথা খোঁড়েন, মসজিদ দেখলেও সেলাম দেন। শোনাও ছিল এবং চাকুরি-শেষে 'রিটায়ার' ক'রেও বুঝেছিলেন, ইংরেজেরা কিরূপ জীবতত্ত্বজ্ঞ—প্রাণনাড়ীর পাকা পণ্ডিত, সূক্ষ্ম হিসাবী। তাই পঞ্চান্নর পরে আদা-জলের ব্যবস্থা ক'রে ছেড়ে দেন। দেহে তখন আর রসকষ থাকে না, মস্তিষ্ক মেধাশূন্য—ঘুনো হয়ে খড়ি মেরে যায়। থাকে কেবল খটখটে শব—পূর্ব্বকথার কূজন। বড় বড় ব্যাঘ্রবধের বাহাদুরি।

নাঃ, আর নয়। বেড়া এগিয়ে জমি বাড়ানো আর কেন? কিন্তু তার পরেও যে ছোবড়া ব'রে বাঁচতে হয়! খুড়োর পরলোকের চিন্তা এসে গেল। 'সেও যে একটা কি আছে!' খুড়ো মুশকিলে পড়লেন। তার জন্যে নাকি দেবতা বাছাই ক'রে একটিকে ধ'রে প'ড়ে থাকতে হয়। মানুষে মানুষ দেখেই জ্ঞানার্জ্জন করে, মানুষই নাকি ভগবানের 'ইমেজ'। নমুনোই সব ঘুলিয়ে দেয় যে, ভীমও আছেন, ভস্মলোচনও আছেন! কিন্তু বিরূপাক্ষই যে বহুত।

আমি তো যীশু থেকে বিশু বা বিশ্বনাথ, সকলকেই সমান ভাবি। এ আবার কি ফ্যাসাদ! যে দেবতারা কথা কন, তাঁদের পরিচয় কিছু কিছু মিলেছে। যাঁরা নির্ব্বাক, তাঁরাই নাকি আসল। বোধ হয়, দেবতার মধ্যে তাঁরা 'অভিজাত' হবেন। কথা না কইলে বুঝব কি ক'রে? শুনেছি, তাঁরা জাগ্রত, তবে বোধ হয় বাজে কথা কন না। হতে পারে কেশবের প্রবল বক্তৃতার বাড়াবাড়ি তাঁদের অবাক ক'রে দিয়েছে। তাই কথা বাড়ান না, কাজ বাড়ান।

নাঃ, দেখতে হয়েছে। খুড়ো তীর্থযাত্রাই স্থির করলেন।

শুনে বাদল বললে, দাদামশাই, ভুল করছেন, আসল দেবতারা ঢের বেশি বুদ্ধি ধরেন, টুঁ শব্দটি করেন না। জানেন, কথা কইলেই বিপদ, এটা চাই, ওটা চাই। এটা সভ্যতার যুগ, আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত, ধারা আর কারাই সারা কাজ করে। ক্ষমা করবেন, ও বড়দের কথা এখন ছাড়াই ভাল, নন্দীভৃঙ্গীসহ কেষ্ট বা পাহাড়ী বাবা। শিষ্যরা সজাগ, এগুতে দেয় না। আপনার কাছেই শিক্ষা, সাধকদের ধ'রে অর্থাৎ ছোট ধ'রে এগুতে হয়। আর একটা গোলমেলে কথাও রয়েছে যে, আপনার কাছেই শুনেছি, ধর্ম ধ'রে জাত নয়, জাত ধ'রেই ধর্ম। তাই আমার জাত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আর আমাকে বোঝাবার জন্যে বলেছিলেন, এই যেমন আমি বাঙালী।

খুড়ো বললেন, সেই সব বুঝি মনে ক'রে রেখেছিস? তখন তোর শিক্ষানবিসির অবস্থা, তোকে লেখাপড়া শেখাচ্ছিলুম, জাতিধর্মাদি বড় বড় কথা আয়ত্ত করবার বয়স তোর সেটা ছিল না, কথাগুলো শুনে রাখবার জন্যে আভাস দিয়ে যেতুম মাত্র। আমার কাছে সব জাতই আমার জাত, সব ধর্মই আমার ধর্ম।

ও কথা আজ কেউ শুনবেন না দাদামশাই। আপনি যে বাঙালী— এ কথা সকলেই জানেন। দাসত্বের সেবা যে অনেকেই পেয়েছেন। আমি আপনাদের অনেক পুঁথি ঘেঁটেছি। পরলোকের চিন্তায় দেবতা খুঁজছেন, আর আপনাদের দেশের দেবতাই তো শ্রীচৈতন্য। বাংলায় চৈতন্য কি লোপ পেলেন?

খুড়ো হাঁ ক'রে অবাক মেরে শুনছিলেন, বললেন, এসব তুই কোথায় পেলি? আমার মাথা খেয়েছিস দেখছি। আমার গোয়াল-ঘরের মাচাই হচ্ছে ধর্মের খাঁচা, ধর্মের ব্রিডিং-হাউস পবিত্র গোবরের সারেই বাড়ে। ওসব তত্ত্ব গুহ্ প্রসন্ন গোয়ালিনী রেখে গিয়েছে। ব'লে গিয়েছে প্রহিবিশনের দিন আসছে, পরিবেশন আর চলবে না, আমার ওই গোয়ালের জীবগুলির মাথায় রইল যুগের প্রতীকার। তুই ইস্ট্ পিত্ত তাদের ডিস্টার্ব করতে গেছিস কেন? দিশী ক্যারাক্তে হবি নাকি? খবরদার, গোয়ালে আর ঢুকিস নি।

বাদল বেজায় অপ্রতিভভাবে বললে, আমি জানতুম না, মাফ করবেন, খান দুই মাত্র দেখেছি। তাতে না আছেন দেবতা, না ধর্ম, কেবল 'আপ্ত' বাক্যের নববিধান, জাত আর ধাত বুঝে তাদের আবশ্যক-মত প্রয়োগ।

সর্ব্বনাশ, সেইখানাই দেখে মরেছ! যাক, ওসব বুঝতে পারবি নি, এইটুকুই বাঁচোয়া। বীরভূমের লোকটিও মারা গিয়েছেন, অ্যানোটেশন বেরুবে না।

তাতে একটা বড় মজার কথা আছে দাদামশাই, সেইটে একটু বুঝিয়ে দিন, আমি আর কথা কইব না, বড় লোভ পড়েছে। চুপটি ক'রে মৌনীবাবা বেয়ে ভাল ছেলে হয়ে প'ড়ে থাকলে দেবতা সকল ঐশ্বর্য্যই দেবেন। সত্যি নাকি দাদামশাই? এটা পারব, অনুমতি করেন তো লেগে যাই। মোটর চড়তে বড়—

খুড়ো একদৃষ্টে বাদলের দিকে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক চেয়ে থেকে শেষ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'রে বললেন, মোটর চড়বি তো দূর হয়ে যা। বেরো; আর নয়—

বাদল কাঁদকাঁদ হয়ে পায়ে ধ'রে বললে, আমি বুঝতে না পেরে, আপনার কাছে কেবল জানতে চাচ্ছিলুম, বীরের মত চুপ থাকলেই সিদ্ধি? সহজ কাজ ব'লেই লোভ হয়েছিল।

খুড়ো বাদলকে পুত্রবৎ পালন করেছেন, 'দূর হয়ে যা' ব'লে ফেলে নিজেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। একটু মিষ্ট হাস্যে বললেন, লোভ মহাপাপ, খবরদার লোভ বাড়াস নি। উচ্চদরের সাধকদের আরও সহজ পথ আছে রে, সেসব ব'লে দেব, যেমন রোগীর সেবা, নিরন্নে অন্নদান, প্রভৃতি অনেক আছে।

আমার ওসব কিছু কাজ নেই দাদামশাই, আপনার সেবাই আমার সাধনা। বড় অদ্ভুত ঠেকেছিল, তাই মনের উত্তেজনায় জিভ পিছলে গিয়েছিল, এই কান মললুম।

নে, তবে প্রস্তুত হ, পুঁটলি বাঁধ। আমি পরলোকের পরিচয় খুঁজতে বেরুব।

পুঁটলি আবার কিসের ?

হুঁকো, কলকে, টিকে, তামাক, দোবড়া, ছেঁড়া ন্যাকড়া, দেশলাই আর একটা হাঁড়ি। বঙ্কিমচন্দ্র তামাক খেতেন, জানিস ? তাঁর 'কমলাকান্ত'খানি নিতে ভুলিস নি।

আর আমার বাঁশের বাঁশিটে ?

আচ্ছা, সেটাও নে। এখন চা খাওয়া দিকি।

বাদল মহানন্দে চা বানাতে ছুটল।

২

কালাচাঁদ যখন রাঁচিতে ওভারসিয়ারি করেন, সেই সময় তাঁর বাদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ। জঙ্গলের মধ্যে সে ঢিল মেরে পাখি মারছিল, খুড়ো ঘোড়ার পিঠে বাসায় ফিরছিলেন। তিনি তাকে দেখে, বোধ হয় তার রং দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, নিজের মতই পাকা শ্রীকৃষ্ণবর্ণ। তার পরিচয় জানবার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। ঘোড়া থামাতেই ছেলেটি তাঁর দিকে চাইলে, মুখেও একটু হাসির রেখা টানলে, ভয় নেই, ভয় নেই। সুউজ্জ্বল টানা চোখ দুটির সঙ্গে সোজা সুন্দর নাক, পৃষ্ঠস্পর্শী কেশ, বয়স আন্দাজ দশ-এগারো হবে।

খুড়ো সস্নেহে প্রশ্ন আরম্ভ করেন, নাম কি ? বাদলা। কোথায় থাকিস ? ঠিক নেই। বাপ মা ? নেই। কি জাত ? জানি না। খেতে দেয় কে, কি খাস ? ডেকে কেউ দিলে খাই, না হয় শিকার করি, পাখি মারি, খরগোশ মারি, না পেলে এই তো জঙ্গলভরা ফল মূল পাতা রয়েছে। কাজ করিস না কেন ? আমি যে বড় নই, কাজ কম হবে, কেউ দেয় না, তাই পাই না। কি কাজ জানিস ? জমি কোপাতে পারি, কাঠ কাটতে পারি, আমার কোদাল কুড়ুল নেই, কোথায় পাব ?—ব'লে একটু হাসলে।

সে কি সুন্দর সরল হাসি! খুড়ো মুগ্ধ হলেন। বললেন, আমার কাছে থাকবি, খেতে পরতে দেব। কেন দিবি, কাজ দিবি না ? এটা আমার দেশ নয়, ক্ষেত-খামার নেই, কি কাজ করবি ? না, তবে যাব

না।—ব'লে মাথা নেড়ে হাসলে। গাছের ডগায় পাখি খুঁজতে মন দিলে।

খুড়োর প্রাণটা কেমন ক'রে উঠল, দ'মে গেল, যেন দুর্লভ কিছু খোয়াচ্ছেন! কাজ না পেলে খাওয়া পরাও চায় না! খুড়ো তাকে ফেলে নড়তে পারলেন না। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে বললেন, কাজ আমার অনেক আছে রে বাদল, আমি একা মানুষ, সব কাজ ক'রে উঠতে পারি না, সময়ও পাই না।

বাদলা গাছের মাথা থেকে চোখ না নামিয়ে বললে, কি কাজ? আমার ঘর বার রোজ সাফ করবি, জল এনে দিবি, উনুন ধরিয়ে দিবি, বাসন মাজবি, ঘোড়ার ঘাস এনে দিবি, গরু চরাবি, আমি বাইরে গেলে বাড়িতে থাকবি, চৌকি দিবি, কাঠ চেলা করবি। এই সব কাজ যতটা পারিস করবি। যা না পারবি, আমি ক'রে নেব।

বাদলা তাঁর দিকে চাইলে, হাসিমুখে বললে, তুই করবি কেন, এ আর কি কাজ! জঙ্গল আছে? আছে। জমি আছে? বাসাবাড়ি— দু-তিন কাঠা মাত্র ফালতু প'ড়ে আছে। কোদাল আছে? আছে। আচ্ছা, তবে চল্। জঙ্গল থেকে নিজের সম্বল বাঁশি আর একখানি লোহার বাঁটের ছুরি তুলে নিয়ে খুড়োর সঙ্গে চলল।

খুড়োর প্রাণমন তার প্রতি এতই আকৃষ্ট হয়েছিল, তিনি যেন স্বর্গ হাতে পেলেন, বাঁচলেন, রাজ্যলাভ ক'রে ফিরলেন।

সেই পর্যন্ত এই অনাথ বালক খুড়োর কাছে তাঁর আপনজনের মত আছে। তিনি তার বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি লক্ষ্য ক'রে ক্রমে তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, বাংলা ও চলনসই ইংরিজী শিখেছে। কিন্তু বাড়ির কাজকর্ম সে ছাড়ে নি, বলে, আমি যে ওই করবার তরে কথা দিয়ে এসেছিলুম; সত্যটা যেন তার জন্মগত, আর ভয় কাকে বলে, সে তা জানে না। খুড়ো তাকে নিজের আপন ব'লেই জানেন, আমার খুড়োকেও সে আপন ব'লে জানে, দাদামশাই বলে। বাদলের বয়স এখন একুশ। খুড়ো অনেক ক'রে তাকে জামা আর জুতো পরিয়েছেন। ওগুলোকে সে 'বাঁধন' বলে, হাসে, বাড়িতে পরে না, অস্বস্তি বোধ করে।

এই আমাদের খুড়োর পালিত বাদলের পরিচয়।

* * *

কালাচাঁদ খুড়ো রিটায়ার ক'রে পূর্ণিয়াতেই র'য়ে যান দুটি কারণে। হোমিওপ্যাথির ওপর তাঁর পরম শ্রদ্ধা থাকায় অসীম অধ্যবসায়ে তার ব্যবহার যথাসম্ভব আয়ত্ত করেছিলেন। নিত্য বহু গরিব-দুঃখীদের ঔষধ দান করতেন, তাদের একপ্রকার বাপ-মাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, তারা সাবু-মিছরিও পেত। শিক্ষা সার্থক করবার এমন ম্যালেরিয়ার মালক আর কোথায় পাবেন? আবার বাদলকে পাবার পর সংসারীর মতই হয়ে পড়ায়, তার ভবিষ্যৎ-চিন্তাও এসেছিল; ঘরবাড়িও বানিয়ে বদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

বললেন, আমার হোমিওপ্যাথির বাক্সটা নিবি।

ধর্ম্ম কি দেবতার সঙ্গে আবার হোমিওপ্যাথি মেশাবেন? আপনি তো বলেন, দু নৌকোয় পা দিতে নেই।

ঠিক বলেছিস, থাক।

গরুগুলো?

তাদের দড়ি খুলে দে, এটা বিরাটের এলাকা, দলে গিয়ে মিশুক, বুদ্ধি খেলিয়ে বেশ থাকবে। কাশীর ষাঁড় দেখিস নি, লোকের গলা থেকে মালা ছিঁড়ে খায়? ওরা আমাদের মহাদেবের বা শিবের বাহন, সুতরাং ধর্ম্মেরও, তাই নমস্কার করি। অহিংস স্বেচ্ছাসেবকও বলা যায়। ধর্ম্ম শিক্ষার সহায়।

কিন্তু শিং আছে যে!

বিধানে তার ব্যবহার নেই, ওটা আত্মরক্ষার্থে নৈতিক শক্তি-পুষ্ট:।

বুঝতে পারলাম না।

ক্রমে বুঝবি, এখন চল।

বাদল না আবার প্রশ্ন ক'রে বসে, তাই মনে মনে 'দুর্গানাম' ক'রে খুড়ো বেরিয়ে পড়লেন।

কোন্ দিকে যাবেন?

সেই কথাই ভাবছি। বৈদ্যনাথের সংবাদ নিয়ে বীরভূম রওনা হব, কি বলিস? সেখানে অনেকেই আছেন।

তাঁরা সব দেবী না? ফুল্লরা, নন্দিনী—

এখন তো তাঁরাই জাগ্রত, কথা কন তো তাঁরাই কবেন, শক্তি তাঁরাই। দেবদেবী আমরাই বলি, ওসব বৈয়াকরণদের বিশুদ্ধ বুলি, আসলে সব এক, সবাই দেবতা রে।

তবে তাই ভাল, আপনার দেবতা মেলা নিয়ে কথা।

৩

মনিহারিঘাটে পৌঁছে মা গঙ্গাকে নমস্কার ক'রে খুড়ো ইষ্টিমারে উঠলেন। নিস্তার নেই, বাদল জিজ্ঞাসা করলে, কাকে নমস্কার করলেন, দেবতা পেলেন নাকি?

নমস্কার তো সকলকেই করা যায় রে, বড় বা মান্য হ'লেই করা যায়, বড়কে সম্মান দিতে হয়। মা গঙ্গাকে নমস্কার করব না, শক্তি দেখছিস? একূল-ওকূল-প্লাবিনী, খলখলহাস্যে কূল ভাঙতে ভাঙতে অসীম বেগে ছুটছেন। নিমেষে ভাসাতেও পারেন, ডোবাতেও পারেন। নমস্কার করব না? তা বড় বড় পণ্ডিতেরা ব'লে গেছেন, ধর্মের জন্মই ভয় থেকে, ভয় থেকেই ভক্তি। ডাকাতদের কাছেও লোক হাতজোড় করে। দেশ যে মাস্তানে ভরা।

আপনার পরলোকের চিন্তাও কি—

হ্যাঁ রে, তাই। তা না তো চিন্তা আসত কোথা থেকে। তাই জগৎকে এত সুন্দর করেছে, মানুষের বুদ্ধি বাড়িয়েছে। শুনছিস না, এক বোমায় একটা গ্রাম ফরসা! কতবড় বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয়, তাই সেই বুদ্ধির গোড়ায়। নে, এইবার পুঁটলি সামলা, সাহেবগঞ্জে এসে গিয়েছি।

কেন বলুন দেখি, কেড়ে নেয় নাকি?

চুপ চুপ, মালিকদের নামের দোহাই দেওয়া আবশ্যা। বড়দের কড়াকড়িতেও তব্যতা থাকে, আট থাকে—হাতীর কদবেল খাওয়া

দেখিস নি? এটা পকেটমারের পরীক্ষার ক্ষেত্র—সিন্ডিকেট। তাদের ধর্মচর্চ্চার ক্ষেত্রও বলা চলে, যাত্রীদের বোঝা কমায়। জানিস তো, গীতা ব'লে রেখেছেন—স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়।

তবে আপনি আবার কোথায় কার কাছে কি খুঁজতে চলেছেন?

এখানে বাক্য বাড়ালে বন্ধ করে, যে রকম ফুঁকো মারছে, হুঁকোটা পেলে বাঁচব না। কেবল জেনে রাখ্, সকল বিষয়েই গুরুর দরকার আছে, এম. এ., বি. এ. পাস করলেই স্বধর্মজ্ঞান হয় না, গুরু সেটা বুঝিয়ে দেন। সে অনেক কথা। এটা ক, এটা খ, তাও একজন ব'লে দিয়েছিলেন, যুগ-যুগান্তর ধ'রে ক-ও ছিলেন খ-ও ছিলেন এবং আছেন, তবু গুরুর দরকার হয়। আবার ক্যালাও ধর্মও আছে, যা কোন একটি দেশের কি জাতের কি লোকের নয়—জীবজন্তুরও। যা গোলামি, সেলামি কি দান হিসেবে জোটে না, কথায় কি লেখাতে মেলে না। শুনেছি তাকে স্বাধীনতা বলে। তিনি সকলের মধ্যে থাকেন, সাধ্যে থাকেন না। নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, সাধনায় তাঁকে পেতে হয়। বুদ্ধ নাকি পেয়েছিলেন।

তবে সে আমাদের ফেলে ক্যালাও হ'ল কি ক'রে? আমরা কি সকল ছাড়া?

তা কেন রে, যেমন পেস্তা না থাকলেও পোলাও হয়। সে ফর্দতে আছে অর্থাৎ মনে ও জানে, কর্মে নেই। কিন্তু ও ধর্মের ভেতর বার দুই না থাকলে সার্থক নয়। যেমন সাপ আছে বিষ নেই, তার কামড়ে কারুর কেয়ারও নেই। থাক, আর নয় রে, সিগ্ন্যাল পড়েছে। পুঁটলি?

আছে। এই যে।

ট্রেন এসে সবেগে প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে ঢুকল। যাত্রীদের বিশৃঙ্খল ছুটোছুটি। বাদল এক স্থানে দাঁড়িয়ে গাড়ির ভেতরের অবস্থা দেখছিল।

খুড়ো বললেন, মাল খালির এই মোক্ষম মওকা, সাবধান।

কে একজন সঙ্গীদের ব'লে উঠল, সব গাড়ি খালি রে, চল। বে

বাদল হাসলে, বললে, দাদামশাই, এক্সপ্রেস এখনও আসে নি, এখানা স্লিপিং সেলুন।

না রে, এক্সপ্রেস, এখনি বুঝতে পারবি। এক্সপ্রেস মানে প্রকাশ করা, জানিস তো? ঐ দেখ্, ওদিকে এক্সপ্রেস আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। যে উঠতে যাচ্ছে ভেতরের লোক তাকে ঠেলে, পিষে, ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দিচ্ছে। পড়ল কি চাকার নীচে গেল, সে দুর্ভাবনা নেই। একে বলে এক্সপ্রেস অর্থাৎ টু প্রেস আউট, ধাক্কা মেরে বার করা। উঃ, ঐ একটি মেয়েকে ঠেলে ফেলে দিল রে!—ব'লেই ছুটলেন।

মেয়েটির বিধবা বর্ষীয়সী মা কাঁদতে কাঁদতে তাকে তুললেন। খুড়োকে ছুটে এসে দাঁড়াতে দেখে, বললেন, কি হবে বাবা? বাঙালীই মেয়েটাকে ঠেলে ফেলে দিলে, তবে আর— আমাদের যে না গেলে নয় বাবা, আমার ননীর যে বড় অসুখ, টেলিগ্রাফ পেয়ে ছুটেছি। আমাদের দয়া ক'রে তুলে দিন বাবা।

এস মা, আমার সঙ্গে এস। সব শুয়ে আছে, কোনও গাড়িতেই স্থান নেই, বোধ হয় দাঁড়িয়ে যেতে হবে—

যেমন ক'রে হোক, এখন যেতে পারলেই যে বাঁচি বাবা।

বাদল এসে পড়েছিল। সব শুনেওছিল। তার চোখ মুখ দেখে খুড়ো বললেন, খবরদার! একবার চট ক'রে দেখে নে, কোথাও এঁদের দুজনের মত স্থান হতে পারে না কি?

দেখেছি, স্থান থাকবে না কেন, চল্লিশ জনের স্থান আছে। প্রত্যেকেই যে এক এক বেঞ্চি দখল ক'রে শুয়ে আছেন, আবার ট্রাঙ্ক, বেডিং দিয়ে দোর ঠেসেছেন। যারা মোট হালকা ক'রে দেয়, তারা আপনার কোথায়?

আহা, রাগ করছিস কেন, সকলেই ভদ্রলোক, স্ত্রীলোক দেখলেই উঠে বসবেন, আমরা দাঁড়িয়ে যেতে পারব।

ভদ্রলোক বটে, এখনই তো দেখলেন, মেয়েটির চাকা-লোকের ব্যবস্থা করেছিল। আপনি তো খুঁজছেন, দেখুন না, বোধ হয় দেবতাই হবেন।

খুড়ো হাসি চেপে বললেন, সকলেই কি সমান হয় রে! আর সময় নেই, এঁদের যাওয়াই চাই। কিন্তু কারুর কোন কথায় কথা ক'স নি, সে ভার আমার রইল।

কার্ট বেশ থামল, বাদল একখানা গাড়ির হাতল ঘুরিয়ে একটি ঠেলা দিতেই দোরের সঙ্গে মণ দুয়েক মাল স'রে গেল, বললে, স্ত্রীলোক দুটিকে তুলে দিন।

তাঁরা উঠে পড়লেন। খুড়োও উঠলেন। বাদল ইতিমধ্যে মোট সরিয়ে বসবার সুবিধামত জায়গা পেলে, বেঞ্চি বানিয়ে মেয়েদের বসতে বললে।

সকলেই বেশ নিস্তব্ধ। কেউ কেউ আগাগোড়া মুড়ি-দেওয়া-লোক দু-তিন ইঞ্চি গুণ্ঠন মুক্ত ক'রে দেখে নিয়েই যোড়বা মুড়ি দিলে। কেবল একজন শাঁসালো-শরীর মডার্ন মূর্তি, ন্যাজা মুড়ো বঞ্চিত গুম্ফে, সপ্রতিভের (চেহারার) মত মুখ খুলে তীব্রকণ্ঠে আওয়াজ দিলেন, এটা কি মগের মুলুক ঠাউরেছেন, পরের জিনিস নিয়ে যা-ইচ্ছে-তাই করা হচ্ছে, মানুষ, না কি!

তা হ'লে এ গাড়িতে উঠব কেন ভাই—মেয়েদের একটু বসবার স্থান করে দেওয়া হচ্ছে—

জানেন ওতে কি আছে?

শুধু হাতে তো হাত দুলিয়ে কেউ বাড়ি ফিরতে পারে না,—শাড়ি, ব্লাউজ-পিস, মখমলের ওপর জরির কাজ-করা পাদুকা এই সবই হবে, আর 'সেবল' বসানো পেটিকোটও থাকতে পারে।

মস্ত বড় জান্ দেখছি?

ওর বেশি আর কি ক'রে জানব ভাই, লোকে আন্দাজেই ভাবে। বলুন না কি আছে? ঝুটো মুক্তোর মালা, কি জাপানী সিল্কের ফুল, যা নষ্ট হতে পারে, সাবধান হই, সরিয়ে রাখি।

ওতে গয়ার শ্বেত পাথরের থালা, রেকাবি, বাটি সেটকে সেট রয়েছে।

বাদল সকল বিষয়েই নির্ভীক, কেবল ভূতের ভয়টা রাখে। সে

ব'লে ফেললে, ওরে বাপ রে, গয়া হতে আগমন! কোনটায় আছে বলুন, সরিয়ে রাখি।

তা এ গাড়িতে মেয়েদের তোলা কেন? ফিমেল কম্পার্টমেণ্ট দরাজ খালি প'ড়ে আছে।

দয়া ক'রে একবার দেখিয়ে দিলে বড় উপকার করা হবে। দিন না, তিনবার উঁকি মেরেছি, বয়স হয়েছে, চক্ষু কাজ দিলে না। তা হ'লে আপনারাও পা মেলে—

জ্বালাতন! ওই—ওইটে, যার ওপর ইংরিজীতে—

হ্যাঁ বুঝেছি, যার ছেঁড়া হাতলটা ঝুলছে।

সরিয়ে রাখতে গিয়ে দেখলেন ** ব্যানার্জি, বি. এ., এ. জি. অফিস—ওঃ ভাই, (মৃদু কণ্ঠে, লাউড থিঙ্কিং) বড় পদস্থ!

সব বেশ নিস্তব্ধ, ব্যানার্জি ফুল লেংথে সটান মুড়ি দিলেন।

এক পাশের আড়াআড়ি বেঞ্চিখানা জোড়া ক'রে একখানা বাসন্তী রঙের ময়লা খদ্দর মুড়ি দিয়ে যে ভদ্রলোক বেজায় নাক ডাকাচ্ছিলেন, পাশের গাড়িতে ট্র্যাভেলিং ক্রু-র আওয়াজ পেয়ে, ধড়মড়িয়ে উঠে 'টিকিটখানা চাকরের কাছেই র'য়ে গেছে' বলতে বলতে তিন লাফে গাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। লম্বায় প্রায় ছ ফিট, বেঁড়ে গোঁফ, চড়ানো গাল, ব্যাকব্রাশ করা লম্বা চুল, যেন পশ্চাতের কশবাড়ির ঘাসছোলা প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছেছে। একজন শুয়ে শুয়েই বললেন, সেই বাপের কুপুত্তুর মিঃ বেণ্টনট বেটার আওয়াজ। বলতে বলতেই সাহেব হাজির। কাকেও ডাকতে হয় নি, সকলেই টিকিট বার ক'রে উঠে বসেছিলেন।

ভেরি ডিজাগ্রেব্‌ল আলি রূপ—এ তু মুড়ি কপি কার?

একজন বললেন, তিনি চাকরের কাছে থেকে টিকিটখানা আনতে গেছেন।

থ্যাঙ্ক্‌স ফর দি ট্রাব্‌ল!—ব'লে নেমে গেলেন।

ওর থ্যাঙ্ক্‌সই সর্বনেশে।

কই, তিনি ফিরলেন না তো? নিশ্চয়ই থার্ড ক্লাসের টিকিট।

আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, এখন তো চারজনের জায়গা খালি, ঐখানে আরাম ক'রে বসুন না।

খুড়ো বললেন, থাক, ভদ্দরলোক এসে শোবেন। আর যে ভাবে গেছেন বিছানায় মানিব্যাগ-ট্যাগ কিছু ফেলে যেতেও পারেন। আরামে আর কাজ নেই ভাই।

তবে শুশুন।—ব'লে তিনি ভাল করে শুলেন।

খুড়ো আর বাদল দাঁড়িয়ে। ট্রেন ছাড়ল। উভয়ে সহাস দৃষ্টি-বিনিময় করলেন। দেখে শুনে স্ত্রীলোক দুটি ভয়ে জড়সড়। বিধবাটি খুড়োকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অস্বস্তি ও লজ্জা বোধ করছিলেন, কিছু বলতেও সাহস পাচ্ছিলেন না।

৪

খুড়ো আর বাদলের মনের অবস্থা অনুচ্চারিত থাকলেও, অনুমানে বোধ হয় তারসাম্যে এক ছিল না। দুটো স্টেশন সনসন পশ্চাতে প'ড়ে গেল। শীতের রাতে মানুষ কতক্ষণ চুপচাপ জেগে শীত ভোগ করতে পারে? বাদল কথা কইলে, পাস কামরায় ওঠা গিয়েছে, সকলেই আমাদের—

চুপ, আস্তে, সাবধান, ব্যাঘাত হবে, অপরাধী হতে হবে।

সাধনা?

হাঁ, বলছি। এ জাতটি প্রকৃতিগত বিষম সেন্টিমেন্টাল—ভাবপ্রবণ। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে বাংলায় কি যুগই এসেছিল!

কলি তো বহুদিন এসেছে, আবার—

খুড়ো বাধা দিয়ে বললেন, শোন্ না, সাধযুগও আছে, যেমন আছে বাইপ্রোডাক্ট, যার নামকরণ হয়েছিল স্বদেশী যুগ—বিদেশের বদ হাওয়া থেকে মুক্তিসাধনার যুগ। পরে বিদেশীবর্জন পর্য্যন্ত আসে। তাতে দেশের মানুষ দেশের জিনিস সব ভাল, সব আপন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পোশাকীপোশাক [illegible] কথাটার পরিবর্তে ভাই ভাই ভেদ

নেই, কানে, শুধু কানেই কেন, বোধ হয় অনেকের প্রাণেও একটু এসেছিল। তাই, বিদেশী মালের আমদানিও কমতে আরম্ভ হয়। ট্রেনে যাতায়াতের তখন কি সুখই ছিল! ছেলেরা থেকে উনপ্রৌঢ়েরা পর্য্যন্ত মেয়ে যাত্রীদের কি বৃদ্ধদের বিপন্ন দেখলে নিজেরা ডেকে তুলে নিতেন, তাঁদের স্থান দিয়ে নিজেরা দাঁড়িয়ে থাকতে গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করতেন। তাতে আমাদের রাজদর্শন পর্য্যন্ত মিলেছিল। সে সব অনেক কথা, থাক।

সেন্টিমেণ্ট জিনিসটার প্রথাই কম, সে এক বস্তুতে বদ্ধ নয়। কখন কোন্‌টা নিয়ে চাপে বা জাগে, তার নিয়ম নেই। ভাব নিয়ে তার খেলা বা কারবার, হাউইয়ের মত সোঁ ক'রে উঠে ফুল কেটেই নিবে যায়। সাধনা শক্ত জিনিস। স্বর্গরাজ বিচলিত হ'লেই বা বেগতিক দেখলেই উর্ব্বশীকে দিয়ে তাদের বা সাধনার ঘরে সিঁদ কাটাতেন। সেই সেন্টিমেণ্টই 'আহা, আর কেন, আর নয়' ব'লে একদিন সব থামিয়ে দিলে। বাংলার রামপ্রসাদের বাণীই সার্থক হ'ল 'যা ছিলি রে তাই হবি তাই নিদানকালে।' সিদ্ধ লোকের কথা। স্বদেশী আবার মোড় ফিরল। ভাব তাকে বিলিতী কুমড়ো খাওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়েছিল, সে আবার টোম্যাটোর প্রেমে পড়ল।

বাবল 'নিন' ব'লে হুঁকোটা খুড়োর হাতে দিয়ে বললে, আপনি পরলোকের ভয়ে ধর্ম্ম না দেবতা একটা কিছু খুঁজতে বেরিয়েছেন। আমি তো দেখছি 'গ্রহ-দেবতা' আপনার সঙ্গেই ছিলেন বা রয়েছেন। তিনি পরলোক দেখিয়ে আপনার চিন্তার কারণ চুকিয়ে বা নাকচ ক'রে দিলেন। পরলোক পেলে কেবল দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বই তো নয়। এখন ফেরাই ভাল, কি বলেন?

রামপুরহাট আর দুটো ষ্টেশন বই তো নয়। সেখানে পৌঁছে বাসে বসতে পাওয়া যাবে।

বাসে আবার কোথায়? কেন, আপনার কাজ তো হয়েই গেছে?

এতদূর এসে, বাবা বৈদ্যনাথকে না দেখে ফিরব?

আবার দেবতা কেন? এক দেবতাই—

একটু কাজ আছে যে,—তিনি ব্যাধি-মুক্তির মহাত্মা। সেখানে বিপন্নেরা হত্যে দেয়। আমি একখানা পিটিশন পেশ ক'রে ফিরব।

চাকরির? দোহাই, আর চাকুরের দল বাড়াবেন না। পিটিশন তো তাঁদেরই পরমার্থ, আপনার তো পরলোক।

রামপুরহাট পৌঁছে বাসে ব'সে বাঁচলাম। পরে বৈদ্যনাথদর্শনান্তে তেরাত্তির কাটিয়ে প্রত্যাবর্তন।

• • •

তামাক যে পুড়ে গেল, অমন অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছেন দাদামশাই?

দেখ বাদল—জাতের গন্ধ জাত্যাভিমান যায় না, বড় লেগেছে রে। বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি ব'লে একটা কথা আছে। এত বড় ইণ্টেলিজেণ্ট জাতটা, মহামান্য গোখলে যাকে কত বড় সম্মান দিয়ে গেছেন, সেই জাতের শিক্ষিতদের মধ্যে এ কি নৈতিক অধঃপতন শুরু হ'ল! আমাদের পায়োনিয়ার বাঁড়ুজ্জে মশাই থেকে বড় বড় দেশ-প্রাণেরা 'ইউনিটি ইউনিটি' ক'রে শেষ কি পরলোক বানালেন! এখন দেখছি, শ্রদ্ধেয় ইউ. এন. মুখার্জি মশাই-ই সত্যদর্শী।

আপনি দু-চারটে লোক দেখে এত বিচলিত হচ্ছেন কেন, তাঁরা তো সর্ব্ব-জাতের মধ্যেই আছেন এবং চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন। সব গাড়িতেই তো বাঙালী ছিলেন না, মাড়োয়ারী ও স্থানীয় সকলকেই তো হরি-শয়ানে সিদ্ধ দেখলুম।

আমি নিজের ভায়েদের কথাই ভাবছি—

বলেছিলেন না—সব জাতই আমার জাত?

তা তো এখনও ভাবি। ঠাকুর বলতেন, নারকোলগাছের বালদো খ'সে গেলেও একটু দাগ থাকে, এটাও বোধ হয় আমার তাই।

তামাক খান, মেজাক ঠাণ্ডা করুন।

সেই ভাল।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপূর্ব-বিজ্ঞান

হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

পাড়ায় আগুন লাগিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ, আমাদের সকলেরই যে খড়ের চাল! সবেগে বাহির হইয়া আসিলাম। বাহির হইয়া বুঝিলাম, ডাকাত পড়িয়াছে। তাহারাই আগুন লাগাইয়াছে। লোকগুলা কোথায় গেল? বাঁশ-কাটার শব্দ ছাড়া আর তো কোন শব্দ নাই। বারান্দা হইতে নামিতেই নাকে প্রচণ্ড একটা ঘুসি খাইয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলাম। নিমেষ মধ্যে কয়েকজন আসিয়া আমার হাত-পা-মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু বাঁচিয়া গেলাম, একজন ডাকাত একটু ঝুঁকিয়া আমার মুখটা দেখিয়া বলিয়া উঠিল, আরে, এ যে ডাক্তারবাবু। এঁকে ছেড়ে দাও। উপকারী ব্যক্তিটি কে চিনিতে পারিলাম না। মুখোশ পরা ছিল। সকলেই মুখোশ পরা। আমাকে খুলিয়া দিয়া তাহারা চলিয়া গেল। তাহাদের নিঃশব্দ ক্ষিপ্রগতিতে বিস্মিত হইলাম। বুঝিলাম, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই হাত-পা-মুখ শক্ত করিয়া বাঁধা, তাই টুঁ শব্দটি নাই।

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কি কর্ত্তব্য ভাবিতে গিয়া হতাশ হইয়া পড়িলাম। এই বিরাট সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে আমি একা কি করিতে পারি! সহসা নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদে চমকাইয়া উঠিলাম। একটু আগাইয়া গিয়া দেখিলাম, শুধু লুণ্ঠন নয়, ধর্ষণও চলিতেছে। মনে হইল, প্রতিবাদ করা উচিত। চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ করিলাম, কেহ আমার কথা শুনিল না। নিকটেই একটা থান ইট পড়িয়া ছিল, উত্তেজনাবশত তাহাই তুলিয়া একটা দস্যুর মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িতে যাইতেছিলাম, এমন সময় পিছন হইতে কে আমার হাত চাপিয়া ধরিল। কি করছেন, আসুন আমার সঙ্গে, ইট ফেলে দিন। ফিরিয়া দেখিলাম, প্রতিবেশী অপূর্ব্ববাবু। প্রাজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি। বরাবর সমীহ করিয়া থাকি। ইট ফেলিয়া দিলাম।

আসুন আমার সঙ্গে।

বাড়ির পিছনে একটি ঘেঁটুবন ছিল। অপূর্ব্ববাবুর নির্দ্দেশ অনুসারে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, আমার এবং অপূর্ব্ববাবুর পরিবারবর্গও ইতিপূর্ব্বে তথায় সমাবিষ্ট হইয়াছেন—সম্ভবত অপূর্ব্ববাবুরই প্রাজ্ঞতার ফলে।

অপূর্ব্ববাবু বলিলেন, মাথা ঠিক রাখুন। আমাদের আসল গলদটা কোথায় বুঝুন। আসল গলদ একতার অভাব। একতা থাকলে কি পাড়ায় ডাকাত পড়তে পারে? খামখা একটা ইট ছুঁড়ে কি করবেন আপনি? মূল সমস্যাটার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এই ধরুন না, রুশদেশে—

অপূর্ব্ববাবু নিম্নকণ্ঠে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান রাজনীতি সমস্তই তাঁহার নখদর্পণে। ঘেঁটুবনে বসিয়া নাকের রক্ত মুছিতে মুছিতে বিজ্ঞ অপূর্ব্ববাবুর নখদর্পণে প্রাণপণে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, আমাদের আসল গলদ কোথায়! লুণ্ঠন চলিতে লাগিল।

"বনফুল"

লুণ্ঠন

চলে লুণ্ঠন দেখো, লুণ্ঠন চলতেই থাকবে,
যত দিন মোরা ধূলি-লুণ্ঠিত মাথা নাহি তুলবে ;
শাদা মেয়ের পানে ভালবেসে কেলো বান্দা তাকাবে,
মুখে যা বলুক—তারা মনে মনে মনে, ছাল তুলবে।
গোবরাটি হাটো থেকে, আধাআধি খোলা থেকে চাবড়া,
খোলা গায়ে খুন-ছিটা লাগে তাই ওঠে মৃদু কান্না,
বনের তীক্ষ্ণ জেল্লা, বর্দ্ধিত পাঞ্জাবী দাবড়া
সকলেই সেবাসেবি তেকুচিতে চড়ে হয় রাজা।
প্রেমের শাসনে মোরা পাকালো হইয়া যদি থাক—
খোসা তুমি যত খুশি লুণ্ঠন করে নিক যে পারে,
শাঁসটা ছুরিয়া জুড়ে থাকে আমাদেরি বলি-বাদ্য,
হাড়ি-কাঠটাই থাক, মোদের চরম বলি এ পারে।

মিসেস মুখার্জি

ব্যাপারটিতে আমার অনুচর হনুমান তেওয়ারীর গোড়া হইতে খানিকটা হাত ছিল; বাকিটা স্বয়ং রামানুচর হনুমানের অনুগ্রহ, কি শুদ্ধ কাকতালীয়, সে বিষয়ে এখনও নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। যাহাই হউক, সোজাসুজি বিবরণটা দিয়া যাই।

নিতান্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; কলিকাতায় একবার যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন, একেবারে অনিবার্যভাবেই, অথচ গত রাজনৈতিক বিক্ষোভের পর ট্রেনের অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, দেখিলেই বুক শুকাইয়া যায়। আর শুধু যে দেখিয়াই খালাস পাইয়াছি এমনও নয়, কাছাকাছি দুই-একটা জায়গায় যাইতে পর্যন্ত হইয়াছে; দুয়ার টপকাইয়া ভিতরে পৌঁছিতে পর্যন্ত পারি নাই। সেকেণ্ড ক্লাসের কথা বলিতেছি।

তবুও না যাইলেই নয়। নিতান্ত প্রয়োজনীয় গোটাকতক জিনিস আর বিছানার খুব একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ একটা হোল্ড-অলের মধ্যে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া, সুট পরিয়া বারান্দায় চিন্তিতভাবে পায়চারি করিতেছি, তেওয়ারী আসিয়া খবর দিল, ফিটন আসিয়া ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়াছে। তেওয়ারী আমার আরদালী (orderly); আগে পুলিসে কাজ করিত, অবসর গ্রহণ করিয়া আমার কাছে আছে।

বলিলাম, তা তো এসেছে, কিন্তু যাই কি ক'রে বল দিকিন তেওয়ারী?

তেওয়ারী মুখটা নীচু করিয়া কি যেন একটু ভাবিল, তাহার পর দুই-তিন বার আমার পানে চাহিল, যেন কিছু বলিতে চায়, অথচ সাহস সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। প্রশ্ন করিলাম, ঠাউরেছিস কিছু উপায়?

তেওয়ারী অল্প একটু হাসিয়া বলিল, উপায় তো মানুষে কোন

করতে পারে না হুজুর, মানুষের বেশে জন্মেছিলেন ব'লে রামচন্দ্রজী পর্য্যন্ত পারেন নি।

সমস্যা আরও ঘোরালোই হইয়া পড়িল, বলিলাম, নে, হোল্ড-অলটা তুলে নে, যে ভাবেই হোক পৌঁছুতেই হবে, গাড়িরও আর বেশি দেরি নেই।

তেওয়ারী হোল্ড-অলটা তুলিয়া লইয়া আর একবার কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিল, বলিল, হুজুর, কিছু ভয় নেই; শুধু একবার যদি—

কুতূহলী হইয়া বলিলাম, কি? ব'লেই ফেল না।

একবারটি যদি মহাবীরজীর মন্দিরে মাথাটা ঠেকিয়ে যান।

হাসি পাইল, রাগও হইল, এবং আরও যা একটা হইল, সেটা যখন গল্পটা আরম্ভই করিয়াছি তখন খুলিয়া না বলিলে চলিবে না। অর্থাৎ একটু ভয়ও হইল, ঠিক যাহাকে বলা যায় খটকা-লাগা, বিপদের সময় আর যাত্রার মুখে সেটা খুব দুর্ভেদ্য মনের দুর্গেও কি করিয়া মাথা গলাইয়াই বসে। তাহা ভিন্ন বিক্ষোভের সময় অত বিপদের মধ্যে যে আমরা অখণ্ড থাকিয়া গিয়াছি, তেওয়ারীর মতে সেটা মহাবীরজীর কৃপাতেই। কথাটা যে ঠিক বিশ্বাস করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না, তবে বিপদের আবহাওয়াটা সম্পূর্ণ কাটিয়া না গেলে স্পষ্টভাবে অবিশ্বাস করিতে সাহস পাইতেছি না। মোটের উপর, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট আর কৃত্তিবাসের রামায়ণের মাঝখানে ভীষণ এক ঘোটালায় পড়িয়া দিনাতিপাত করিতেছি।

কিন্তু মনে যাই থাক, দেবতাকে পশুরূপে পূজা করিতে, তাও আবার স-লাঙ্গুল পশুরূপে পূজা দিতে কোথায় যেন বাধে একটু, বিশেষ করিয়া বাংলায় রামানুচরকে যখন একটা প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। বলিলাম, চল, এগো; আমি মহাবীরজীর প্রভু বরং রামচন্দ্রকে মনে মনে স্মরণ ক'রে নিয়েছি, বিপদ যদি কাটবার তাইতেই কাটবে।

তেওয়ারী হোল্ড-অলটা বাঁ কাঁধে তুলিয়া আবার হাসিয়া বলিল, রামচন্দ্রজী পুরণ-ব্রহ্ম ভগবান বটে হুজুর, কিন্তু নিজের শক্তিতে কিছুই

করতে পারেন না, নররূপী কিনা। আর পূজো তিনি হনুমানজীর মারফৎই নিয়ে থাকেন হুজুর ; এই শহরেই এত মহাবীরস্থান, একটাও রামচন্দ্রের মন্দির দেখেছেন ?

শুনহু বচন এহি লছমন ভ্রাতা।
অঞ্জন-সুত-হৃদি পূজন পাতা ॥

একটু সুরের সঙ্গে প্রমাণটা দিয়া তেওয়ারী হাসিমুখেই আমার পানে চাহিয়া রহিল। যাত্রার সময় একটা দ্বিধা-সঙ্কোচ পড়িয়া মনটা খিঁচড়াইয়া যাইতেছিল, তবু হাসিয়াই বলিলাম, এগো দিকিন তুই, গাড়িতে ভিড় তা মহাবীরজী কি করবেন ?

পা বাড়াইলাম। তেওয়ারীও অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, বজরংবলী সম্বন্ধে অমন কথা বলবেন না হুজুর, গোটাকতক লোক আটকে রাখা তো তাঁর পক্ষে কিছুই নয়, যদি ইচ্ছে করেন তো সমস্ত গাড়িটাকেই কড়ে আঙুলের ঠেলায় কাত ক'রে দিতে পারেন।

ক্রমেই বাড়াইয়া তুলিতেছে। ঠিক করিলাম, ওর এই অন্ধ বিশ্বাসেই ঘা দেওয়া ভাল ; একে লইয়াই যখন কাজ চালাইতে হইবে, তখন যতটা এর মনটা সংস্কারমুক্ত হয়, ততই আমার পক্ষে সুবিধা। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিলাম, তেওয়ারী, মহাবীরজী আসলে গাছের হনুমানও নয়, কিংবা স্বর্গের দেবতাও নয়, উনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন, ওঁকে আমরা শ্রদ্ধা আর সম্মান করতে পারি, কিন্তু তাই ব'লে যে দেবতাজ্ঞানে—

তেওয়ারী মোট লইয়া আগে আগে যাইতেছিল, ঘুরিয়া দাঁড়াইল। আমায় শেষ করিতে না দিয়া সেইরকম ভাবেই অল্প একটু ব্যঙ্গ-হাস্যের সহিত বলিল, হাজার মহাপুরুষ হ'লেও সমুদ্র ডিঙনো কারুর সাধ্যিতে কুলোবে না হুজুর ; পাশেই তো সদরালা সাহেব রয়েছেন—হরীশ্বরবাবু, অত টাকা মাইনে, অত বড় মান, সামনের খানাটা একবার ডিঙিয়ে যেতে বলুন না হুজুর।

আর তর্ক করিতে ইচ্ছা হইল না। নীরবেই গিয়া কিটনে বসিলাম। একটু পরেই বুঝিলাম, নীরব থাকাটা ভুল হইয়াছে, দুই-একটা

মন্তব্য করিয়া আলোচনাটা সাঙ্গ করিয়া ফেলিলেই ভাল ছিল। স্টেশনের রাস্তার ধারেই খানিকটা জায়গা লইয়া মহাবীরস্থান। একটা অশ্বত্থগাছের তলায় একটি ছোট মন্দিরে সিন্দূরচর্চিত হনুমানমূর্তিটির রজনীর পূজা শেষ হইয়া ভজনের আয়োজন হইতেছে, বেশ অনেকগুলি লোক জড় হইয়াছে।

তেওয়ারী কোচবক্সে বসিয়া ছিল, কোচম্যানকে বলিয়া হঠাৎ গাড়িটা থামাইয়া দিল এবং আমি কিছু বলিবার পূর্বেই লাফাইয়া পড়িয়া ভজনমণ্ডলীর মধ্যে চলিয়া গিয়া 'সাহেব দর্শন করনে আয়েঙ্গে' বলিয়া মন্দির পর্যন্ত একটু পথ তৈয়ার করিয়া লইল। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া প্রসন্নবদনে বলিল, এবার চলুন হুজুর।

অবাক হইয়া সারা ব্যাপারটা দেখিয়া গেলাম। বুঝিলাম, কি ভুলটা হইয়াছে, অর্থাৎ চুপ করিয়া যাওয়ায় তেওয়ারী ধরিয়া লইয়াছে যে, আমি ওর কথাটা শেষ পর্যন্ত অকাট্য বলিয়া মানিয়াই লইলাম। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। লোকেরা শুধু যাইবার পথই করিয়া দেয় নাই, একজন শহুরে বাঙালীকে মহাবীরস্থানে আসিতে দেখিয়া বেশ একটু সম্ভ্রমের সহিত দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে। আমি ক্ষণমাত্র বোধ হয় একটু ইতস্তত করিয়া থাকিব, তাহার পর জুতা খুলিয়া নতমস্তকে নামিয়া গেলাম এবং পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া মূর্তির সামনে রাখিয়া ইস্ত্রি-করা প্যান্টালুনের ভাঁজের মায়া ছাড়িয়াই একটি কেতা-দুরস্ত প্রণাম ঠুকিয়া দিলাম। পূজা হইল, কি আত্মমর্যাদা রক্ষা হইল, অতটা ভাবিয়া দেখিবার অবসর ছিল না।

বিস্মিত, শ্রদ্ধান্বিত দর্শকদের দিকে সস্মিত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে তেওয়ারী আবার আমায় গাড়ির সমীপে লইয়া আসিল।

স্টেশনে গিয়া দেখিলাম, গাড়ি আসিয়া গিয়াছে, ভিড়ের চোটে গাড়ি তো দূরের কথা, প্ল্যাটফর্মে পর্যন্ত জায়গা নাই; তাহার উপর ব্ল্যাক-আউট তো আছেই। অত্যন্ত রাগ থরিল গর্দভটার উপর, অযথা কারে ফেলিয়া দুই-দুইটা টাকা খরচ করাইয়া দিল এই দুর্দিনে। অবশ্য আমি

ভদ্রতর কিছুই আশা করি নাই, তবুও একবার ওর মহাবীরকে মুখ টানিয়া একটা ধমক না দিয়া পারা গেল না ; ঘুরিয়া বলিলাম, কি ব্যবস্থা তোর মহাবীর ক'রে রেখেছেন, তা—

কিন্তু মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, কোথায় তেওয়ারী !

ভিড় ঠেলিয়া চরিয়া অস্থিরভাবে এদিক ওদিক করিয়া ফিরিতেছি, এমন সময় তেওয়ারীর আওয়াজ কানে গেল ; দেখি, শেষের দিকে একটা সেকেণ্ড ক্লাসের দোরের কাছে দাঁড়াইয়া 'হুঁই হুজুর, হুঁই হুজুর' করিয়া প্রবলবেগে হাত নাড়িতেছে। চাপ ভিড়ের ভিতর দিয়া সামনে আসিয়া আশ্চর্য হইয়া দেখি, তেওয়ারী জি. আই. পি. আর-এর একখানি সম্পূর্ণ খালি ভবলবার্থ কুপের সামনে দাঁড়াইয়া ; কাগজটা পূর্বেই ভিতরে রাখিয়া দিয়াছে।

প্রথমটা খুবই বিস্মিত হইয়া পড়িলাম, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিতে পারিলাম কামরাটা রিজার্ভ করা। চশমাটা চোখে দিয়া নামটা পড়িতেই আবার বিস্ময়ে ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, কার্ডে নির্ভুলভাবে আমাদের দুইজনের নাম লেখা—মিস্টার এস. এন. মুখার্জি অ্যাণ্ড মিসেস মুখার্জি।

রিজার্ভ আমি করি তো নাই-ই, চেষ্টা করিলেও পারিতাম না ; কেন না এক নিতান্ত প্রথম শ্রেণীর গবর্মেণ্ট কর্মচারী ব্যতীত ও সুযোগ কাহাকেও দেওয়া হইতেছে না আজকাল, তাহাও অল্প আয়াসে নয়। জজেরও নাম জানি, ম্যাজিস্ট্রেটেরও নাম জানি, পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টেরও নাম জানা আছে, কেউ এস. এন. মুখার্জি তো নয়ই, মুখার্জির ধার দিয়াও যায় না।

তেওয়ারীকে প্রশ্ন করিলাম, তুই রিজার্ভ করিয়ে রেখেছিলি ?

তেওয়ারী বলিল, না হুজুর, আমি সমস্ত দিনে বাড়ি থেকে বেরুলাম কখন ? তা ভিন্ন একজন টিকিসবাবু বললেন, এতে মাইজীরও নাম আছে নাকি ; মাইজী তো এখানে নেইও।

যেন এর পরেও আমার মহাবীরজী সম্বন্ধে কি বলিবার আছে শুনিবার জন্য বিজয়োৎফুল্ল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ভাবিয়া দেখিলাম, ঠিকই তো বলিতেছে, মাথাটা এমন গুলাইয়া গিয়াছে যে, এ সামান্য

কথাটুকুও খেয়াল হয় নাই। বলিলাম, সে যাই হোক, তুই হোল্ড-অলটা নামা, দেখ, অন্য কোথাও জায়গা আছে কি না।

যেন অত্যন্ত অদ্ভুত আর অবিবেচকের মত কথা বলিয়াছি, এইভাবে নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত আমার পানে-চাহিয়া প্রশ্ন করিল, কেন হুজুর, এখানে কি হ'ল? যোগেশ্বরনাথ মুকুজ্জি তো স্পষ্ট লেখা রয়েছে। টিকিস-কলেক্টারবাবু বললেন ইস মানে যোগেশ্বর, ইন মানে—

বলিলাম, এ দেখছিস অন্য কারুর জন্যে রিজার্ভ করা, নাম এক ব'লেই আমার হয়ে যাবে? নে, নামা শিগগির, দেখি অন্য কোথাও যদি এখনও পাওয়া যায় একটু জায়গা।

পা বাড়াইলাম।

তেওয়ারী আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল, ব্যাকুল হইয়া পড়িল; ঘুরিয়া আমার সামনে আসিয়া একটু ঝুঁকিয়া হাতজোড় করিয়া প্রবল মিনতির সহিত বলিল, অমন কাজ করবেন না হুজুর, কোনমতেই করবেন না। এ মহাবীরজীর বন্দোবস্ত, রিজিষ্ট ক'রে দিলে ভয়ানক খাপ্পা হয়ে থাকেন। উনি যা মেহেরবানি ক'রে দেন, প্রসন্ন মেজাজে না নিলে অনর্থ ক'রে তোলেন হুজুর, আপনি যাবেন না এ কামরা ছেড়ে, কোনমতেই যাবেন না হুজুর।

মহা ফ্যাসাদে পড়িয়া গেলাম আবার পাগলাকে লইয়া। যাঁহাদের রিজার্ভ করা, তাঁহারা যে কোনও মুহূর্তে আসিয়া পড়িতে পারেন, ওদিকে এক ছটাকও জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনাটা ক্রমেই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে; সবচেয়ে ভয় হইতেছিল কেলেঙ্কারির, লোকগুলার যেরূপ নাকি অপর সম্বন্ধে কৌতূহলী হইবার অবস্থা নয়, তবে একটু স্থির হইলেই যে আমাদের চারিদিকে একটি আলাদা ভিড় জমিয়া যাইবে, সেটা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি।

হতভম্ব দেখিয়া তেওয়ারী আরও জোর লাগাইয়াছে, বলিতেছে, আর আগে-পিছে করবেন না হুজুর, উনি এইতেই বোধ হয় চটে যাচ্ছেন; না বিশ্বাস হয় একটা চৌপাই শোনাই হুজুরকে; একবার

[illegible]—

দক্ষ নিপেখি তব, পবন-তনয় বলী—

অবশ্য ঠিক করিয়া ফেলিলাম, তুলসীদাসের চৌপাই আর দোহার উপর নির্ভরশীল এতবড় ভক্তকে লইয়া আমার কাজ চলিবে না, কিন্তু সে সময় চটিলে ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হইয়া যায় দেখিয়া চৌপাই শেষ করিতে না দিয়া ভালভাবেই একটু নিম্নকণ্ঠে বুঝাইয়া বলিলাম, শোন তেওয়ারী, হনুমানজী রামচন্দ্র আর সীতার সেবা নিয়ে অষ্টপ্রহর ব্যস্ত আছেন, আমার গাড়ি রিজার্ভ করতে আসার তাঁর সময় কোথায়, বল না? আসল কথা, বড় বড় অফিসারদের মধ্যে দেখাশোনা, পরামর্শটি খুব বেড়ে গেছে আজকাল, আমার মনে হয় অন্য কোন জেলা থেকে কলেক্টার বা পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, যেই হোক এখানে এসেছেন, রাত্রে ফিরে যাচ্ছেন। এ. আর. পি.র কোন অফিসারও হতে পারেন, ওরা এই গণ্ডগোলে স্পেশাল ডিউটিতে কাজ করছেন, এমন কি মিলিটারির—

তেওয়ারী সবটা নষ্ট দৃষ্টি হইয়া শুনিল, তাহার পর বলিল, হজুর, আপনি মহাবীরজীকে জানেন না তাই বলছেন, হাজার সেবার মধ্যেও একটা সীট রিজার্ভ করা তাঁহার পক্ষে কিছুই নয় হজুর, রাবণ নিধন ক'রে তাঁহার হাতে সময়েরও অভাব নেই আজকাল এটা তো সবাই জানে। তা ভিন্ন যদি আপনার কথাই ধ'রে নিই হজুর, তো যারা রিজার্ভ করেছে, ঠিক তাদের গাড়িসুদ্ধ আছাড় খাওয়াবেন রাস্তায়। স্টেশনে পৌঁছুতে দেবেন ভেবেছেন? বেশি নয়, তাঁর একটি রোঁয়া দিয়ে একটা ঠেলা দেওয়া—আপনি উঠুন হজুর, ক্রমাগতই লোক এসে দেখে যাচ্ছে।

ভদ্রলোক আসিয়া পড়িলেও যে নিষ্কৃতি নাই!

নিরাশ হইয়া মনে মনে বলিলাম, হে রামানুচর, যতটা বলছে, তার অর্দ্ধেকও যদি সত্য হয় তো তুমি আপাতত তোমার ভক্তের হাত থেকে আমার আগে রক্ষা কর।

তেওয়ারীকে বলিলাম, আচ্ছা, তুই আমার একটা কথার উত্তর দে আগে, তারপর দেখা যাবে, আমার জন্যে না হয় রিজার্ভ করলেন, তোর মাইজীর জায়গা কোথা?

জেওয়ারী বাধা পাইবার ভয়ে বিনা গৌরচন্দ্রিকায়ই আগে আওড়াইয়া দিল—

সীতা দরশন অতি সুখ পাই।
হনুমৎ ফিরি গেল লঙ্কা জলাই॥

হুজুর, সীতার সন্ধান নেওয়াই তাঁর কাজ, সেইটুকু সেরেই চ'লে আসতে পারতেন, লঙ্কা পোড়াতে গেলেন কেন হুজুর ?

কোন উপায়ই নাই ; ভয় হইল, ভক্তির মাত্রা বাড়িতে বাড়িতে বুদ্ধির মাত্রা এর যেমন কমিয়া আসিতেছে, শীঘ্রই একটা বিসদৃশ কিছু করিয়া লোক জড় করিবে। ইতিমধ্যে মনে-মনে একটা মতলবও ঠিক করিয়াছিলাম, অর্থাৎ ওকে সরাইয়া দিই, তারপর না হয় চেষ্টা করিব একবার, জেওয়ারী থাকিতে অসম্ভব।

ঠিক এই সময় আর একটা ব্যাপার হইল, যাহাতে আমিও জানিয়া শুনিয়াই আরও আবদ্ধ হইয়া পড়িলাম। ফিরিয়া দাঁড়াইতেই একটি টিকিট-কলেক্টার দুইজন বেহারী ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া আসিয়া কুপের মধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া—কার্ডে নজর পড়ায় নামিয়া নাম দুইটা পড়িল, তাহার পর আমার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, আপনি মিস্টার মুখার্জি ?

বলিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ ?

তিনজনে একবার চারিদিকে চাহিল, বেহারী ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিল, মিসেস মুখার্জি—

বলিলাম, তিনি আসছেন।

মাফ করবেন।—বলিয়া টিকিট-কলেক্টার তাঁহাদের লইয়া চলিয়া গেল।

জেওয়ারী বোধ হয় হনুমানের নাম জপ করিতেছিল, যেন একটু বিরক্তির সহিতই হাতের একটু ঝাঁকানি দিয়া বলিল, উঠে পড়ুন হুজুর, একটা কাণ্ড না বেধে বসে, একজন 'মাইয়া লোগ' কেউ থাকলে বড় ভাল হ'ত। মহাবীরজী কাজ একটু বাড়তি ক'রে ফ্যাসাদ বাধিয়েছেন।

যতক্ষণ জাগিয়াছিলাম, কি উদ্বেগে যে কাটিল, মহাবীরজী যদি সত্যই থাকেন তো তিনিই বুঝিয়া থাকিবেন। প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করিতেছি, আসল মিস্টার মুখার্জি, সস্ত্রীক আসিয়া পড়িলেন বলিয়া। যতই আসিতেছেন না, উৎকণ্ঠা ততই বাড়িয়া যাইতেছে। একপ্রস্থ ভীষণ লজ্জায় পড়িতে হইবে, যদি সেরকম প্রকৃতির লোক হন তো অপ্রীতিকরও কিছু হইয়া যাওয়া আশ্চর্য নয়, একজন মহিলার সামনে। একজনের নামকে আত্মসাৎ করিবার এই যে দুরভিসন্ধি, এর কি জবাবদিহি আছে আমার কাছে? একটা যে মুখরোচক মিথ্যা বলিব, তাহাও এই মানসিক অবস্থায় মাথায় আসিতেছে না।

বসিয়া একটু পরেই নামিয়া একটু সন্ধান করিতে যাইব, চাকরদের কামরা হইতে তেওয়ারী তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল; প্রশ্ন করিল, কিছু দরকার আছে হুজুরের?

বলিলাম, না, কত দেরি তাই খোঁজ নিচ্ছিলাম।

আপনি উঠে বসুন।—বলিয়া তেওয়ারী স্টেশনের দিকে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই সংবাদ আনিল, আপ লাইনে আবার জোড় খুলিয়া গিয়াছে বলিয়া কলিকাতার গাড়িটা ডাউন লাইন দিয়া আসিতেছে, সেটা আসিয়া পড়িলে এ গাড়িটা ছাড়িবে। আরও প্রায় ঘণ্টাখানেকের কাছাকাছি দেরি হইবে।

কি দুর্দৈব!

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম, এতক্ষণ তেওয়ারী তাহার অটল বিশ্বাসে খুব সপ্রতিভ আর প্রফুল্ল ছিল, এই নূতন খবরটা পাইয়া যেন একটু চিন্তান্বিত। আমি একটু উৎসাহ পাইয়া বলিলাম, তা হ'লে অন্য গাড়িতে দেখিগে চল তেওয়ারী, তাড়াতাড়ি গাড়িটা ছেড়ে গেলে ওদের ফেল করবারও একটা সম্ভাবনা ছিল, এখন দেখছি—

তেওয়ারী উদ্বিগ্নভাবে আগাইয়া আসিল, বলিল, না না হুজুর, আপনি গিয়ে বসুন; মহাবীরজী আরও পাকা বন্দোবস্ত করিয়ে দিবেন। কোনও ভাবনা নেই আপনার।

আগাগোড়া উঠিয়া যাইতে হইল। আর মনও এদিকে অবসন্ন হইয়া

আসিয়াছে। মরিয়া হইয়া একটা প্ল্যানও ঠিক করিয়া ফেলিলাম, তাহার পর যাহা হইবার হইবে। হোল্ড-অলটা খুলিয়া বিছানাটা উপরের বার্থে পাতিয়া ফেলিলাম। সংক্ষিপ্ত ইংরেজী অক্ষরে আমার নাম লেখা একটি অ্যাটাশি-কেস ছিল, যাহাতে সহজেই দৃষ্টি পড়ে এই-ভাবে সেটা শিয়রের দিকে খাড়া করিয়া রাখিয়া দিলাম। তাহার পর উপরে উঠিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, যদি ভদ্রলোক ভালমানুষ হন তো দুঃসময়ের কথা ভাবিয়া না জাগাইতেও পারেন, যদি অ্যাটাশি-কেসটার উপর নজর পড়ে তো ভাবিতে পারেন, একটা ভ্রান্তির বশেই তাঁহাদের একটা বার্থ অধিকার করিয়া বসিয়াছি তাড়াতাড়িতে, ব্ল্যাক-আউটের হিড়িকে।

ঘুমের ভান করিতে করিতে কখন সত্য সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানি না, এক সময় অনুভব করিলাম, বেগ কম করিতে করিতে গাড়িটা দাঁড়াইয়া পড়িল। কে একজন স্টেশনের নামটা হাঁকিয়া চলিয়া গেল, তন্দ্রার ঘোরে ভাল করিয়া শুনিতে না পাওয়ায় কৌতূহলবশে মুখটা একটু নামাইয়া দুয়ার-পথে প্রশ্ন করিব, নীচের বার্থে চক্ষু পড়িয়া বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেলাম। সমস্ত বার্থটা দখল করিয়া কে একজন আমারই মতন লম্বালম্বি হইয়া শুইয়া আছে আপাদমস্তক একটা র‍্যাপার মুড়ি দিয়া। প্রথমটা মাথাটা একটু গুলাইয়া গেল, তাহার পর একে একে সব স্পষ্ট করিয়া মনে করিলাম, মহাবীরস্থান, স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, ব্ল্যাকআউট, ভিড়, রিজার্ভ—না, কোন সন্দেহই নাই যে একলাই ছিলাম আমি, আর কুপেটাও রিজার্ভ করা আমার নামেই। রিজার্ভ করা কামরায় কে মত না লইয়া উঠিল?

হঠাৎ খেয়াল হইল, বোধ হয় মিস্টার মুখার্জি, আসলে যাঁহার নামে রিজার্ভ করা। আমি ঘুমাইয়া পড়িবার পর আসিয়া থাকিবেন। কোএন্সিডেন্স তা হ'লে ভদ্রলোক একলাই আসিয়াছেন।

বিশেষত্ব দেখিয়া একটু বেশ কৌতুক বোধ হইল—এক নামের দুইজনে একই কামরায় উঠিব আজ—দুজনেরই সস্ত্রীক থাকিবার কথা, একজনের একজনই আর একজনের প্রবঞ্চনা নিখুঁত করিবার জন্য,

অথচ দুইজনেই একক। যোগাযোগ মন্দ নয়। যাই হোক, ব্যাপারটা লইয়া আর ঘাঁটাঘাঁটি করা সমীচীন মনে করিলাম না, যদি মিস্টার মুখার্জিই হন তো তাঁহার সহিত আলাপ করিতে যাওয়া নিরাপদ না হইতে পারে, যদি অন্য কেহ হন তো আমার মত না লইয়া প্রবেশ করিবার স্পর্ধাটা মার্জনা করিলেও ক্ষতি নাই।

মুখটা টানিয়া লইতে যাইব, বার্থের অপর দিকটায় নজর পড়ায় আবার এক চোট স্তম্ভিত হইয়া গেলাম, বার্থের পায়াটার কাছে একজোড়া লেডিজ সু। স্পষ্ট একেবারে, হীল-তোলা, স্ট্র্যাপ দেওয়া, হাল ফ্যাশানের একজোড়া লেডিজ সু।

মাথাটা পরিষ্কার হইয়া আসিতেছিল, আবার একচোট গুলাইয়া গেল। স্ত্রীলোক কে আসিয়া শুইল আবার? কোন মেম-সাহেব নয়, গায়ে যে র‍্যাপার ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে সেটা সাহেবী নয়। ওদের পদ্ধতি কি, জানা না থাকিলেও, মেম-সাহেব যে গাড়িতে জুতা খুলিয়া শুইবে, এটাও যেন সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এই সময় সঙ্গিনী ঘুমের মধ্যেই সামান্য একটু পাশ ফিরিতে পায়ের কাছে শাড়ির ফার্ট পাড়ের খানিকটা বাহির হইয়া পড়ায় আমার চিন্তার মোড়টা একেবারে ফিরিয়া গেল। তবে কি মিস্টার মুখার্জি সস্ত্রীকই আসিয়াছিলেন? আমায় না উঠাইয়া স্ত্রীকে নিজের বার্থে জায়গা করিয়া দিয়া অন্য সেকেণ্ড ক্লাস, হয়তো বা ফার্স্ট ক্লাসেই চলিয়া গিয়াছেন? মাথাটাকে বেশ একচোট ঝাঁকানি দিয়া লইলাম—এ রকম একটা অসম্ভব আর হাস্যকর কল্পনা যেখানে উঁকি মারিতেও পারে, সে মস্তিষ্কের জড়তা নিশ্চয় পুরা মাত্রাতেই রহিয়াছে এখনও। একবার মনে হইল, যেই থাক, অধিকারীই হোক বা অনধিকারীই হোক, আমার নিজের জায়গায় পড়িয়া রাতটা কাটাইয়া দিতে পারিলেই হইল। যদি সকাল পর্যন্ত থাকে, কথাটা আপনিই পরিষ্কার হইয়া যাইবে, মাঝে কোথাও নামিয়া যায়, কোন কথাই নাই। কম্বলটা টানিয়া লইয়া চক্ষু বুজিলাম।

কিন্তু অস্বস্তিটা কাটাইয়া উঠা ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিল। গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছিল, একটা স্টেশন পর্যন্ত, অনুমান প্রায় ঘণ্টা খানেক,

কথাটা মনে তোলাপাড়া করিতে মাথাটা উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। বুঝিলাম, সমস্যাটা না মিটাইয়া লইলে রাত্রিটা অনিদ্রাতেই কাটাইতে হইবে।

গাড়িটা পরের স্টেশনে থামিলে মনে হইল, একবার গলা-খাঁকারি দিয়া নিদ্রাগতা রহস্যময়ীকে জাগাই। আবার ভাবিলাম, কাজটা কোনমতেই ভদ্রানুমোদিত হইবে না; একবার এও মনে হইল, বপুটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে যে রকম দশাসই বলিয়া মনে হইতেছে, কোন বড় বাঙালী অফিসারের পরিবার হওয়াই সম্ভব; যদি মিসেস মুখার্জিই হন আশ্চর্য হইবার কিছু নাই—পুরা একখানি বার্থ নিতান্তই দরকার বলিয়া মিস্টার মুখার্জি এইখানেই ছাড়িয়া অন্যত্র মাথা গুঁজিতে গিয়াছেন একটু। অবশ্য মিস্টার মুখার্জিকে খুবই ভাল মানুষ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইল।

চিন্তার মধ্যেই মনে হইল, তেওয়ারী ব্যাপারটা জানিতে পারে। আমি গাড়ি ছাড়িবার পূর্বেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম; কিন্তু তেওয়ারী নিশ্চয় শেষ পর্যন্ত জাগিয়া ছিল, কেন না তাহার একটা সন্দেহ লাগিয়াই ছিল যে, আমি নামিয়া গাড়ি বদল করিয়া ফেলিতে পারি।

আর ইতস্তত না করিয়া খুব সন্তর্পণে বার্থ হইতে নামিলাম। নির্বিঘ্নে কোন বিঘ্ন হইল না। চাকরের কামরাটা পাশেই। প্রথমে হাত বাড়াইয়া কয়েকবার আঘাত করিলাম। কোন উত্তর না পাইয়া নিম্ন কণ্ঠে দুই বার ডাক দিলাম। ঠিক যে উত্তর পাইলাম এমন নয়, তবে জাগরণের একটা গভীর কণ্ঠ-গর্জন আসিয়া কানে লাগিল। ফিরিয়া দেখিলাম, সহযাত্রিণীর কোনও ভ্রূক্ষেপ নাই। আমি প্লাটফর্মের উল্টা দিকে গিয়া ডাকিতেছিলাম, যাতে ওঁর ঘুমে ব্যাঘাতের সম্ভাবনাটা অল্প থাকে। একবার মনে হইল, নামিয়া যাই। কিন্তু বাহিরে তীব্র কনকনে পাহাড়ে হাওয়া যেন সূচের মত বিদ্ধ করিতেছে। ডাকই দিলাম আর একটু জোরে—শীতল হাওয়ায় শুধু আর একটি গলা-খাকরানি ভাসিয়া আসিল। তখন মাথার উপরে টুপিটা ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া বুকের খানিকটা পর্যন্ত জানালার বাহিরে বাহির করিয়া দিয়া প্রায় সাধ্যমত জোরেই চীৎকার করিয়া উঠিলাম—তেওয়ারী! এই তেওয়ারী! জনতা নেহি?

জী হুজুর!—তেওয়ারীর জলদগম্ভীর কণ্ঠে উত্তর আসিল; কিন্তু

আমার পিছনে। চকিতে ফিরিয়া দেখি, ভেণ্ডারী কুচকাওয়াজের কায়দায় দুই পা জোড় করিয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া বার্থের সামনে দাঁড়াইয়া আছে।

গায়ের র‍্যাপারটা খানিকটা খানিকটা খসিয়া গিয়াছে, মালকোঁচার ওপর অদ্ভুতভাবে পরা একখানা শাড়ি। চোখ-মুখ একেই গোঁফ-দাড়িতে সমাচ্ছন্ন, তন্দ্রা আর হঠাৎ-জাগরণের বিস্ময়ে যেন আরও কিম্ভূতকিমাকার হইয়া গেছে। উঠিয়াই অভ্যাসমত বোধ হয় জুতা দুইটায় পা গলাইতে গিয়াছিল—ওলটপালট খাইয়া দুইটা দুই জায়গায় ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমার স্ত্রীর জুতা।

একটু চাহিয়া থাকিয়াই ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া গেল, ঐ যে ঘণ্টা খানেকের কাছাকাছি হাতে সময় পাইয়াছিল, ইহার মধ্যে বাসায় চলিয়া গিয়া এই ব্যবস্থাটি করিয়াছে। সেই ভদ্রলোকটি যে বিদেশে মুশাফির সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিল, সেটা ভেণ্ডারীর ভাল বোধ হয় নাই, জায়গাটা খালি রাখা নিরাপদ মনে করে নাই। আমায় সে বলিয়াছিল, মহাবীরজী পাকা বন্দোবস্ত করিয়া দেবেন, তাহার অর্থটাও এতক্ষণে পরিষ্কার হইল।

আর কথা বাড়াইলাম না, বাড়াইতে গেলেও তো ঐ কথাই বলিবে, অর্থাৎ মহাবীরজীর নিকটই এই মহৎ প্রেরণাটা পাইয়াছে।

মনের সমস্ত রাগ মনেই চাপিয়া বলিলাম, তুই নেমে যা এইখানেই, অনেক স্টেশন হয়ে গেছে, আর ভয় নেই কারুর ওঠবার।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

জিজ্ঞাসা

"তারে লয়ে কি করিব আমি যাতে হব না অমৃত?"
কোথা আছে সে অমৃত, যাজ্ঞবল্ক্য, শুধায় মৈত্রেয়ী;
তোমাদের প্রেমে নাই? গৃহতলে আপনি সঞ্চিত
যে মধু মোদের, এই তপোবনে দুর্লভ তা নেই?

কিবা তাহা—প্রিয়রে যা করিয়াছে প্রিয় ; প্রেয়সীরে
করিছে প্রেয়সী, পুত্রে করিয়াছে স্বর্গ ছু-জনায় ?
সত্তার সমুদ্রে ডুবে এ আত্মার হিমাচল-শিরে
করেছি সন্ধান কত—কোথা সেই অমৃতের সার ?

যাজ্ঞবল্ক্য, এ যুগের জিজ্ঞাসায় জান কি উত্তর ?
আমরাও চাহি যে অমৃত,—মৈত্রেয়ীর পুরাতন
প্রশ্নখানি আজিও নূতন ;—চাই মোরা মহত্তর
অমরতা, আত্মার আকাশে আর নয় অন্বেষণ—
পেয়েছি দেহের ঘটে—স্নেহে প্রেমে নিত্য নবতর
সে অমৃত, আত্মজে অমর সেই বিচিত্র জীবন ।

• • •

"অমৃতের পুত্র মোরা"—পুরাতন কথা, মোরা জানি
অমৃত বিশ্বের পুত্র, নব দেহাশ্রয়ে প্রাণলীলা
চলিয়াছে অনন্তের যাত্রী হেথা, সে অমৃতবাণী
প্রাণের অজস্র ধারে ফুটে উঠে সহস্রদলিলা ।

'বেদনা-আনন্দ-পারে আত্মা দেহহীন রূপহীন
মৃত্যুহীন অবিকল্প—এ অমৃতে স্বাদ নাহি আর ।
কোন রস নহে মিথ্যা প্রেম-অশ্রু-করুণা অধীন,
মিথ্যা নহে দেহে-প্রাণে রচিত যে রহস্য অপার ।

ভোগ-ভাগীরথীধারে এ যুগের মৈত্রেয়ীর ক্ষুধা
মিটিবে কি ?—জানি না তা, শুধু জানি করেছি গ্রহণ
কৌতুকে কথায় হাস্যে জীবনেরে,—অপূর্ব্ব সে সুধা !
জানি সত্য গৃহ সত্য প্রিয়া পুত্র । তবু এ মোহন
সত্যে মোরা দিই ডালি—ক্ষুধাতুর নিখিল বসুধা,
মানবের মন্দাকিনীধারে মোরা মিলাই জীবন ।

শ্রীগোপাল হালদার

প্রসঙ্গ কথা

পিতৃভাষা বনাম মাতৃভাষা

কলেজের অধ্যাপক ও বাংলা সাহিত্য—পরস্পরের সম্বন্ধ লইয়া একটা কথা সম্প্রতি কোন কোন স্থানে একটু বেশ আলোচিত হইতেছে। কথাটা উঠিয়াছিল একটা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে; কিন্তু এখন তাহা ব্যক্তি ছাড়াইয়া একটা সমাজের অঙ্গে লাগিয়াছে। ইংরেজীর অধ্যাপক নামে একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর সৃষ্টি অনেক দিনই আমাদের সমাজে হইয়াছে, ইহারা এতদিন অর্থাৎ একপুরুষ আগে পর্য্যন্ত—বাংলা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ কোন দৃষ্টিদানের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই—এমন কি মুরুব্বিয়ানার ভাবও পোষণ করিতেন না। আর যাই হউক, ইহারা ছিলেন 'অনেস্ট'। ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধি হইতে থাকায়, এবং রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর প্রসাদে বাংলা কাব্য প্রভৃতি 'কুলচুরে'র অঙ্গ হইয়া উঠায়—অনেকেরই ইহার দিকে একটা মার্জ্জারসুলভ লোভদৃষ্টি পড়ে—কেহ কেহ 'পেট্রনাইজ' করিতেও সংকোচ বোধ করিতেন না। তারও পরে বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটু মর্য্যাদা লাভ করিল—উচ্চতর পরীক্ষার বিষয় হইল, এবং তাহার পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্ত আধুনিক আদর্শে নানা গ্রন্থ রচনার আবশ্যকতা ঘটিল। ইহার পর ইংরেজীর অধ্যাপকগণের আর উদাসীন থাকা নানা কারণে দুরূহ হইয়া পড়িল—বিশেষত সেই সকল অধ্যাপকের, যাহারা ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে 'থীসিস' লিখিয়া আচার্য্য পদবী পাইয়াছেন। পূর্ব্বকালের অধ্যাপকগণের এ সৌভাগ্য লাভ হয় নাই—এত থীসিসের ঘটা তখন ছিল না। না থাকাই ভাল ছিল; কারণ, আত্মপ্রবঞ্চনা বা মিথ্যা অভিমানবৃদ্ধির এমন সহজ উপায় না থাকায়, তাঁহারা অধ্যাপনাই করিতেন—অর্থাৎ ইংরেজ গুরুগণকে নমস্কার করিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত পন্থাই যতদূর সম্ভব অনুসরণ করিয়া

ছাত্রগণের জন্ত যথাসাধ্য টীকাভাষ্য প্রস্তুত করিয়া ক্লাসে নোট লিখাইয়া দিতেন। অধ্যাপনা তখন বৃত্তিমাত্রই ছিল; সাহিত্যিক-কীর্তিপ্রসূ হয় নাই। এই সকল অধ্যাপকের আর একটা এই গুণ ছিল যে, তাঁহারা আজীবন তাঁহাদের সেই অধিকারটিতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন—নানাবিধ ফুলচুরী বিদ্যার অনুশীলনও যেমন করিতেন না, তেমনই ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিকেও আকৃষ্ট হইতেন না—ব্যাঙ্কব্যালান্স, মোটর ও বালিগঞ্জের বাগানবাড়ি-রূপ নিঃশ্রেয়সের সাধনায় বারো আনা সময় সমাহিত হইয়া থাকিতেন না। অধ্যাপকের চাকুরিও তখন এমন খাঁটি পলিটিক্সের প্রাইজ হইয়া উঠে নাই—সেই দাসত্বের রাজটীকা লাভের জন্য অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে নিগূঢ় অর্থনীতির চর্চা, নানাপ্রকার আসন করিয়া নানারূপ যোগসাধনা কখনও একক ভাবে, কখনও চক্রে বসিয়া পুরশ্চরণ প্র্যাকটিস করিবার প্রয়োজন ছিল না। আমাদের সেকালের সেই আরাধ্য অধ্যাপকগণ—এমনই নির্বোধ এবং এমনই থীসিস-প্রতিভা-বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু একালের পাণ্ডিত্য এমন বস্তু হইলে, তাহা পাণ্ডিত্যই নয়—বিদ্বজ্জনসমাজ এখন পাটের দালাল, কটন মিলের স্বত্বাধিকারী, ইন্সিওরেন্স কোম্পানির ম্যানেজার ও ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার প্রভৃতির সহিত প্রতিযোগিতায় প্রায় সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। এ হেন পণ্ডিতেরাও নিষ্ঠার সহিত সাহিত্যিক গবেষণা করিয়া থাকেন। বিশেষত যাঁহারা ইংরেজী সাহিত্যের উপরে 'থীসিস' লিখিয়া আচার্য্য পদবী লাভ করিয়াছেন—বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের সস্নেহ দৃষ্টি ক্রমশই ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে। ইঁহাদেরই অধিকার সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলে কি আর রক্ষা আছে? প্রথমত এত বড় পদ ও পদবী যাঁহার, তাঁহাকে মূর্খ বলিলে আততায়ীরা চটিবেন। সমাজ বলিয়া একটা বস্তুও আছে, এবং সেখানে "নীচ যদি উচ্চ ভাষে", তবে সুবুদ্ধি অবশ্য "উড়ায় হেসে", কিন্তু রাজটীকাধারী কুলীন দাসপুত্রেরা তাহা সহ্য করিলে সমাজের ভিত্তিটাই যে শিথিল হইয়া যায়। দ্বিতীয়ত রাজভাষা ও পিতৃভাষা একই—সেই ভাষায় যাঁহারা এতখানি বুৎপন্ন, তাঁহারা

যদি বাণীবরণা মাতৃভাষার প্রতি একটু কৃপাকটাক্ষও করেন, তাহা সৌভাগ্যের কথা—এতদিন পরে যদি বা সেই ভাষার একটু কপাল ফিরিতে চলিয়াছে, অমনই বর্ব্বরের মত এ কি চীৎকার! যাহারা ইংরেজী সাহিত্যের মত মহাসাগরে সন্তরণ করিয়াছে, তাহারা বাংলা সাহিত্যের মত একটা ক্ষুদ্র নালা পার হইতে পারে না, এ কেমন কথা! এই কথা ভাবিয়া ইংরেজী-অধ্যাপক-মহলে রোদগুঞ্জন উঠিবারই কথা। ইউনিভার্সিটিতে বাংলা বিভাগের প্রতি যাঁহাদের অনুকম্পার অবধি নাই, যাঁহারা বাংলায় এম. এ. বলিলে মনের নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই ঘটনায় যে কিরূপ মর্দ্দিতপুচ্ছ হইয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। শুধু কি তাহাই? তাঁহাদের রচিত ইংরেজী 'থীসিস' (বোধ হয় ইংরেজী বুঝে না বলিয়াই) কেহ পড়ে না, অথচ বাংলা লেখায় কি আছে? কিই বা থাকিতে পারে, উহার সবই তো ইংরেজীরই সারবর্জ্জিত নিংড়ানো জল মাত্র! আমরা কি ঐরকম লিখিতে পারি না? বাংলায় তেমন অভ্যাস নাই বলিয়াই তো, নইলে—। নহিলে যে কি করিতেন তাহার নমুনা কিন্তু আদৌ দুর্লভ নয়। বাংলা সাহিত্যের কাব্য উপন্যাস সম্বন্ধে বাঁ হাতেও তাঁহারা যাহা লিখিবেন, তাহাই উৎকৃষ্ট হইতে বাধ্য, কারণ তাঁহারা যে "Wordsworth" "Keats"-এর উপরে লিখিয়া পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম রসবোধের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ইংরেজীর অধ্যাপক না হইয়া শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে তাহা শ্রোতব্যই নয়—কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা বলিবেন, তাহাই শিরোধার্য্য করিতে হইবে।

• • •

এই যে মনোভাব—মাতৃভাষার প্রতি এই যে শ্রদ্ধাহীন মুরুব্বিয়ানার স্পর্দ্ধা—ইহাও নূতন নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কালেও এইরূপ ইংরেজী পাণ্ডিত্য ও পরাণুচীকির্ষার মোহ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। রবীন্দ্রনাথও এই 'কলেজের অধ্যাপকগণ'কে ভয় করিতেন এবং মাস্টারী বিদ্যাকে অতিশয় অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিলেও, ইহাদিগকে বাধ্য হইয়াই সমীহ করিয়া চলিতেন। বাংলা ভাষার প্রতি

ইংরেজীনবিশগণের এই উপেক্ষার ভাব তিনি ভালরূপই জানিতেন এবং একাধিক প্রসঙ্গে তাঁহাকে সদুঃখে সে কথার উল্লেখ করিতেও হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে, বরং সেই উপেক্ষাই ভাল ছিল—এই অধিকার-জ্ঞানই আরও বিপজ্জনক হইয়াছে। এ যেন অনেকটা এইরূপ—দেশের পুরানো পৈতৃক ভিটাখানি ত্যাগ করিয়া এক ধনিক বালিগঞ্জে বিলাতী ধরনের বাড়ি করিয়া বিলাতী ফ্যাশনে বাস করিতেছিল। এদিকে অপর শরিকগণ সেই ভিটাখানিকে বহুক্লেশে বহুযত্নে মেরামত করিয়া ও তাহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়া, তাহাকে এতদিনে ভদ্র ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন। হঠাৎ বালিগঞ্জের সাহেবের সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল—আজকাল পল্লীবাস একটা ফ্যাশন হইয়া উঠিয়াছে, তার উপর বাড়িখানিও বেশ বাসযোগ্য হইয়াছে। অতএব পৈতৃক অধিকারের দাবিতে সাহেব সেই বাড়ি দখল করিয়া ঠাকুর-দালানকে ড্রয়িং-রুম, তুলসীপ্রাঙ্গণকে টেনিসকোর্ট ও পূজার ঘরকে বাবুর্চিখানা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, যে ধরনের বেশবাস, আচারব্যবহার ও বুলি এই ইঙ্গ-বঙ্গ আত্মীয়টি বালিগঞ্জ হইতে আমদানি করিতে উৎসুক, তাহাতেও দেশীয় সমাজে বড়ই লজ্জা পাইবার কথা; তাই পৈতৃক ভিটাখানির উপরে এই অনুরাগপূর্ণ আক্রমণে সেই গ্রামবাসী ভদ্রগৃহস্থ আপত্তি করিতেছে।

ইংরেজী অধ্যাপকদিগের সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার আছে। ইংরেজী সাহিত্য বা ইংরেজী বিদ্যার সার্থক চর্চ্চা যাঁহারা করেন, তাঁহারা অবশ্যই পুণ্যবান, কিন্তু চর্চ্চাটা সার্থক কি না তাহার বিচার এ পর্য্যন্ত এ দেশে কেহ করে নাই। যাঁহারা জ্ঞানের জন্য চর্চ্চা করেন, অথবা যাঁহারা উদারতর ও গভীরতর সাহিত্যরস আস্বাদনের জন্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু এই অধ্যাপক-শ্রেণীর পণ্ডিতেরা সাধারণত কি জন্য তাহা করিয়া থাকেন? উঁহারা ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া নিজের বা জাতির কি উপকার করিয়াছেন? জিজ্ঞাস্য বলিলাম এইজন্য যে, তাঁহারা কি সেই বিদ্যা হইতে সত্যকার কিছু লাভ করিয়াছেন? করিয়া থাকিলে তদ্দ্বারা ছাত্রগণের

চিত্তবিকাশে কতখানি সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন? তাহারাও তো কেবল তোতাবৃত্তিতেই পরিপক্ক হইয়া উঠে। এতকাল ধরিয়া এই যে এত অধ্যাপক ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিলেন, তাহার ফলে তাঁহারা ইংরেজী সাহিত্যেরই বা কতটুকু পুষ্টিসাধন করিয়াছেন? ইংরেজী ভাষায় ইংরেজী সাহিত্যের গবেষণা করিয়া থীসিস লিখিলে ইংরেজ পরীক্ষক তারিফ করিতে পারে, একটু পিঠ চাপড়াইয়া দিতে পারে—কিন্তু সেজন্ত বিশেষ শ্রদ্ধা করিবে না নিশ্চয়, কারণ এই ধরনের সাধনা ও এই মনোবৃত্তির মর্ম ও মূল্য তাহারাও বোঝে। বাংলা-জ্ঞানের অভাবই যাহাদের ইংরেজী-জ্ঞানের একটা বড় প্রমাণ, যাহারা বিদেশী ভাষায় বিদেশী সাহিত্যের গবেষণা করিয়া গর্ব বোধ করে, তাহারা কি সত্যকার জ্ঞান লাভ করিয়াছে? বিলাতী কবি ও কাব্য—বিলাতী সাহিত্যের ইতিহাস, তাহার প্রেরণা এবং ভাবধারার মৌলিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিবেন আমাদের এই শীর্ষপুচ্ছ তোতাপক্ষীরা। ইংরেজী শিখিয়া যাহারা বিদ্যার সবারি(Snobbery)কেই কৌলীন্য বলিয়া মনে করে—এতবড় একটা প্রাচীন জাতির সুদীর্ঘ সাধনা ও সংস্কৃতি, তাহার বিশিষ্ট চিন্তা ও ভাবধারা, তাহার সাহিত্য-দর্শন ও তাহার ভাষা, তাহার অধ্যাত্মজীবনের বিচিত্র গভীর বিকাশ যাহাদের জ্ঞান বা গবেষণার বিষয় হইতে পারে নাই, অর্থাৎ যাহারা আত্মপরিচয়মূলক কোন বিদ্যারই অনুশীলন করে নাই, তাহারা বিজাতির সাহিত্য ও বিজাতির ভাষায় পারদর্শী হইবার জন্য শুধুই লালায়িত নয়, সেই বিলাতী পণ্ডিত-সমাজে তাহাদেরই সাধনা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া নূতন কথা শুনাইতে যায়! এ বিদ্যার যথাবিধি চর্চা করিলে ভাল চাকুরি মিলিতে পারে, মিলিয়াও থাকে, এবং স্বশ্রেণীর পণ্ডিত-সমাজে পরস্পরের পিঠ চুলকাইবার সৌভাগ্যও হয়, ইহার বেশি কি হইতে পারে বা এ পর্যন্ত হইয়াছে, তাহা তো আমাদের জানা নাই। হাতের আয়নাখানা খুব বড় কিংবা সোনা-বাঁধানো হইলেই তো হইবে না—চক্ষু যদি অন্ধ হইয়াই থাকে, তবে সে আয়নার গর্ব করিয়া কি ফল? তাহাতে তো মুখ দেখা যাইবে না। ইংরেজীর অধ্যাপক বলিয়াই আমি সকলকেই অপরাধী করিতেছি

না; আমি জানি এমন অনেকেই আছেন, যাঁহারা বৃত্তিতে অধ্যাপক হইলেও এতদূর মোহগ্রস্ত হন নাই—ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনারূপ যান্ত্রিক বিদ্যানুশীলনে রত থাকিলেও, এমন বহু অধ্যাপক আছেন যাঁহাদের সহজবুদ্ধি বিকৃত হয় নাই। আত্মজ্ঞান অটুট আছে।

আর একটি কথা। সকল অধিকারই অর্জন করিতে হয়, মাতৃভাষা বলিয়াই বাংলা সাহিত্যকে ইচ্ছামাত্রে অধিকার করা যায় না। গত এক শত বৎসরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যাঁহাদের জানা আছে তাঁহারা স্বীকার করিবেন,—সেকালের বাঙালী ইংরেজীবিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেও, এবং মাতৃভাষার সঙ্গে পরিচয় আরও সহজ ও স্বাভু হইলেও, বাংলা ভাষায় সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে কতখানি পরিশ্রম ও প্রতিভার প্রয়োজন হইয়াছিল। তখনও দেশে সংস্কৃতের চর্চা ছিল, এবং মাতৃভাষাও খাঁটি মাতৃভাষাই ছিল, তাই ভাষার সম্বন্ধে যেমন ধর্ম-বোধ ছিল—সাহিত্যকর্ম তেমনই সাধনাসাপেক্ষ ছিল। আজ যাহারা—সংস্কৃত নয়, বাংলাও নয়; বাঙালী-জীবন, বাঙালী-সংস্কারও নয়—সমাজে ও মনে যাযাবরবৃত্তি করিয়া জাতির সর্ব্ব প্রকার ঐতিহ্য ভুলিয়াছে, এবং ইংরেজীর তর্জমা ভিন্ন অন্য কোনরূপে ভাব প্রকাশ করিতে পারে না; তাহারাই যদি বাংলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতি ও আদর্শ বিচার করিতে বসে, তবে যে কি অনর্থ ঘটে তাহার দৃষ্টান্তও ক্রমেই সুলভ হইয়া উঠিতেছে। তথাপি এ সমাজের সম্পর্কে যদি সাহিত্যরসজ্ঞান ও সাহিত্যিক বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে ভাষাজ্ঞানেরও কথা উঠে, তবে আর রক্ষা নাই, তাহা হইলে বড় বিদ্যাটিই যে ধরা পড়িয়া যায়! যাহারা বিদেশী ভাষার চর্চাই করিয়াছে এবং মাতৃভাষাকে ইতরজনের ভাষা বলিয়াই মনে করে, 'ভাষা' বলিয়া কিছুকে তাহারা স্বীকার করিবে না ইহাই স্বাভাবিক, কারণ ও-বস্তুর বোধ তো কোন পিতৃভাষা হইতে জন্মে না; সকল প্রকৃত সাহিত্যকর্মের একটা বড় লক্ষণ তাহার ভাষা; রচনার ভাষা দুর্বোধ্য হইতে পারে, ভাষায় জড়তাও থাকিতে পারে—তাহাতে প্রমাণ হয় লেখক সাহিত্য-জ্ঞানী হইলেও লিখিতে জানেন না—সাহিত্যরসিক হইলেও সাহিত্যরচয়িতা নহেন; তথাপি তাঁহার ভাষাজ্ঞান থাকিবে, না থাকিলে তিনি সাহিত্যরস

আস্বাদন করিবেন কেমন করিয়া? অথবা তাঁহার সেই আস্বাদন যথার্থ হইবেই বা কিরূপে? কিন্তু যাহার ভাষার জ্ঞান এমনই যে, ভাষার বিকৃতিকেই পরমানন্দে উপভোগ করে, এবং নিজেও সেইরূপ ভাষায় সেই আনন্দ প্রকাশ করে, তাহার সাহিত্যজ্ঞান যে কতদূর খাঁটি, সে আলোচনা বিশেষ করিয়া ঐ ইংরেজী অধ্যাপক-সমাজে অগ্রাহ্য। একজন বড় অধ্যাপক বলিলেন ভাষা লইয়া কোন তর্ক চলে না (তিনি style শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন)। কারণ উহা একটি "most intangible thing", এবং এই উক্তির সমর্থনে তিনি যে সকল যুক্তি ও উদাহরণ (অবশ্য ইংরেজী লেখকের) দিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে মৌনাবলম্বন ছাড়া উপায় ছিল না। আর একজন ঐ সমাজেরও কুলীন ব্যক্তি (ইনিও বাঙ্গালী সাহিত্যের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক) বলিয়াছেন, অতিরিক্ত ইংরেজী চর্চার ফলে যদি বাংলাতেও একটু ইংরেজীর গন্ধ লাগিয়া থাকে, তাহা আর এমন কি আশ্চর্যের বিষয়? তাহাতে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায় না। বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের দুর্গতি কখনও ঘুচিল না; একদিন তাহাকে দেবভাষার পণ্ডিতগণ উপেক্ষাই করিয়াছিলেন, মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার অধিকার তাহার ছিল না; আজ পিতৃভাষার রসবিলাসী পণ্ডিতেরা ধমক দিয়া তাহার ধর্মনাশ করিতেছেন; সমাজে যেমন, সাহিত্যেও তেমনই স্বৈরিণীতন্ত্রই মর্য্যাদাযুক্ত হইয়াছে। অতিরিক্ত সংস্কৃত চর্চার ফলে সংস্কৃতের অধ্যাপকেরা যখন অদ্ভুত ইংরেজীতে বিদ্যাপ্রকাশ করেন, তখন কেহ ইংরেজীর জন্য শঙ্কিত হয় না; কিন্তু সেই সংস্কৃত পণ্ডিতেরাই ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে যখন অদ্ভুত মত প্রকাশ করেন, তখন একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের ইংরেজী ভাষাজ্ঞান ও ইংরেজী সাহিত্যের রসগ্রহণ-শক্তি একই সংস্কারের ফল—তাঁহাদের ইংরেজী ভাষাও যে কারণে ইংরেজী নয়, ইংরেজী সাহিত্যের বিচার-পদ্ধতিও সেই একই কারণে যথার্থ হইতে পারে না। বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষা যদি ইংরেজীরই একপ্রকার শৌচাগারে পরিণত হইয়া থাকে, তবে অবশ্য এই তুলনার কোন অর্থ হয় না, আমরাও চুপ করিলাম।

সংবাদ-সাহিত্য

সেদিন কলিকাতার কোনও সাহিত্যিক সভায় "যুদ্ধকালীন সাহিত্য কিরূপ হওয়া উচিত" ইহা লইয়া আলোচনা হইয়াছিল। উপস্থিত সাহিত্যিকেরা একাধিক দলে বিভক্ত হইয়াছিলেন, কোনও নির্দিষ্ট মীমাংসায় পৌঁছানো সম্ভব হয় নাই। কস্তোরা তাঁ'র করিয়া পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত সাহিত্যসৃষ্টি না হইলেও এই ধরনের বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হইয়া সাহিত্যিক-সম্প্রদায় বিচলিত হন, কারণ, তাঁহারাও রক্ত-মাংসের মানুষ; মানসিক শান্তির কথা বাদ দিলেও দৈহিক আহার্য্য ও পরিধেয় বস্তুর যোগাড় তাঁহাদের করিতে হয়। যুদ্ধকালে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ভারসাম্য বারংবার পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার ধাক্কা সমাজভুক্ত সাহিত্যিকের মনেও লাগে। কিন্তু সচরাচর আমরা সাহিত্যের ইতিহাসে দেখিতে পাই, যুদ্ধোত্তর কালেই এই ধাক্কার প্রতিক্রিয়ায় সত্যকার সাহিত্যসৃষ্টি হয়। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, অডিসি প্রভৃতি মহাকাব্য ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। আমাদের মনে হয়, বর্ত্তমান অশান্তির মধ্যে বাংলা দেশের সাহিত্য-মনে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, যুদ্ধসমাপ্তির পর তাহা ফলপ্রসূ হইবে। বর্ত্তমানে সাহিত্যিক-সমাজের কাজ কোনক্রমে টিকিয়া থাকা। যে সকল সাহিত্যিকের উপার্জ্জনের অন্য পথ নাই, এই কালে তাঁহারা "অর্থকরী সাহিত্য"ই সৃষ্টি করিবেন; তাহা কি জাতীয় হইবে, তাঁহারা নিজেরাই স্ব স্ব বুদ্ধি জ্ঞান ও বিবেচনা অনুযায়ী স্থির করিবেন।

• • •

যে সমস্যা এখন আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিচলিত করিতেছে তাহা পণ্যদ্রব্য ও পণ্যমূল্য সংক্রান্ত। যে কারণেই হউক, রাজকীয় ধাতব বা কাগজীয় মুদ্রার পূর্ব্বতন ক্রয়শক্তি নাই। রব উঠিয়াছে যে, ইনফ্লেশন শুরু হইয়াছে। এই বিপর্য্যয়ের ফলে সর্ব্বাপেক্ষা আহত হইতেছি আমরা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়, এবং এই মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়

হইতেই সাহিত্যিক বা অন্যবিধ সৃজনীপ্রতিভার উদ্ভব হইয়া থাকে—অন্তত এখন পর্য্যন্ত হইয়াছে। সুতরাং সাহিত্যক্ষেত্রেও দুর্লক্ষণ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। দেখা দিয়াছেও। এই বিপর্য্যয়ের মূল কারণ এবং স্বরূপ আমরা ঠিকমত বুঝি না। একজন অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিতকে এই কারণে আমরা আহ্বান করিয়াছি আমাদিগকে ওয়াকিবহাল করিয়া দিবার জন্য; মৃত্যু আসিলেও আমরা যেন খোলা চোখে মরিতে পারি। শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন বর্ত্তমান সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে অত্যন্ত সহজভাবে আমাদিগকে বর্ত্তমান যুগের বৃহত্তম সমস্যার কথা বুঝাইয়াছেন; কর্ত্তৃপক্ষের মতলবের ইঙ্গিতও তাঁহার প্রবন্ধে স্পষ্ট। আমরা যেন এই মন্বন্তরের মুখেও সাবধান হইতে পারি।

—

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় বাঙালী-রচিত সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত মৌলিক গদ্যগ্রন্থ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র রচয়িতা রামরাম বসু প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নবনির্ম্মিত "যশহর পুরী"র বর্ণনা-প্রসঙ্গে যখন লিখিয়াছিলেন—

> গোপকন্যেরা কোনদিগে দধি দুগ্ধ বাচক্ষমান হইয়া বেচিতেছে মাক্ষন ও নবনি ঘির ও সর হাথা বোকাবেহ মস্তক। কোনদিগে গোয়ালিনীরা বলিতেছে আমার এ আচ্ছা দধি আসিয়া কিন ইহা।…বহুবিধ তুমি বড় বিকিকিনি হইতেছে…

তখন কি তিনি ঘুণাক্ষরেও ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঐ বইখানি লইয়াই খ্রীষ্টীয় ১৯৪২ সনে বাংলা দেশের সর্ব্বশেষ রাজধানী কলিকাতা শহরে অনুরূপ বিকিকিনি হইবে? ঘোষপুঙ্গব ডক্টর মনোমোহন তাঁহার সদ্যপ্রকাশিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র "উপক্রমণিকা"য় উপরোক্ত গোয়ালিনীদের মত নিজের দধির "আচ্ছাত্ব" প্রতিপন্ন করিবার জন্য ঘোষজনোচিত সারল্যের সঙ্গে লিখিয়াছেন—

> এ বইয়ের সর্ব্বপ্রথম পুনর্মুদ্রণ হয় বাংলা ১৩১০ সালে। স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায় মহাশয় রাজা প্রতাপাদিত্য সম্পর্কীয় যাবতীয় তথ্য সংকলন ক'রে 'প্রতাপাদিত্য' নামে—এক…গ্রন্থ প্রকাশ করেন,…নিখিলবাবুর পুস্তকখানি নিঃশেষে বিক্রীত হয়ে দুর্লভ হওয়ার পরে 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' পুনর্মুদ্রিত হয়েছে বাংলা ১৩৩৩ ও ১৩৩৫ সালে [রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়]—

কিন্তু 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র এ প্রচলিত সংস্করণ নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ব্যবহারের সম্যক উপযোগী নয়। এতে সম্পাদক মহাশয়ের অনবধানতা হেতু রাম বসুর মূল পুস্তকের বানান বহুল পরিমাণে পরিবর্তিতরূপে ছাপা হয়েছে। তার ফলে এ পুস্তকপাঠে বসু মহাশয়ের ভাষা বা ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে পাঠকদের যথোপযুক্ত ধারণার ব্যাঘাত হওয়ার সম্ভাবনা।...মূলত এসকল অভাব দূর করবার জন্যে গ্রন্থখানির অভিনব সংস্করণ তৈরী করা গেল।

• • •

সংস্করণটি যেমন অভিনব, এই ঘোষণাটিও তেমনই "অভিনব ঘোষ"ণা হইয়াছে। এই ঘোষণাপাঠে সচকিত হইয়া আমরা স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডক্টর মনোমোহন ঘোষ এই তিন জনের তিনটি সংস্করণ সংগ্রহ করিয়া মিলাইয়া দেখিলাম। মিলনান্তে আমাদের একটি পুরাতন ঘটনা স্মরণ হইল। আমরা একবার কলিকাতা হইতে যশোহর গিয়াছিলাম। ফিরিবার পথে দত্তপুকুর স্টেশনে একদল দুগ্ধব্যবসায়ী কর্তৃক বড় বড় পিতলের দুগ্ধভাণ্ড ও বাঁক সহ আক্রান্ত হইলাম। আমাদের কামরাটিতে স্থানের অকুলান হওয়াতে সকলেই অল্পবিস্তর বিরক্ত হইয়াছিলাম। সহসা দেখিলাম, পিত্তলভাণ্ডগাত্রে বড় বড় অক্ষরে খোদাই করা আছে "জল-মিশ্রিত দুগ্ধ"। পরিহাস করিয়া সর্দারগোছের একজনকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, বেশ অভিনব পন্থায় মিছা কথা লিখিয়াছেন তো? লোকটি রাগে অধীর হইয়া আমাদের প্রায় মারিতে আসেন আর কি! বলিলেন, মিথ্যা কি রকম, আমরা তো লিখিয়াই দিয়াছি, দুধে জল মিশাইয়া থাকি। বলিলাম, মহাশয়, আসল সত্য তো তাহা নয়! ভদ্রলোক প্রায় ক্ষেপিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, তার মানে? বলিলাম, মানে, আপনারা জলে দুধ মিশাইয়া থাকেন, কিন্তু উল্টা করিয়া লিখিয়াছেন—জলমিশ্রিত দুগ্ধ। ইহাতেই আমাদের আপত্তি। "পরিস্থিতি" শেষ পর্যন্ত থানা পর্যন্ত গড়াইয়াছিল, কিন্তু সে স্বতন্ত্র ইতিহাস।

• • •

ডক্টর ঘোষের "অভিনব ঘোষ"ণাও তদ্রূপ, জলমিশ্রিত-দুগ্ধ-বার্তা—আসলে তিনি জলেই দুধ মিশাইয়াছেন; নিখিলবাবু এবং ব্রজেন্দ্রবাবুকে

সুকৌশলে পাক করিয়া উৎকৃষ্ট গব্য পদার্থের দরে বাজারে ছাড়িয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া মনে হইতেছে, তিনি যেন দ্বিতীয় সম্রাট্ আলমগীর। আওরংজীব যেমন বারাণসীধামস্থিত পুরাতন বিশ্বেশ্বর-মন্দিরটিরই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া পবিত্র মসজিদ খাড়া করিয়াছিলেন, ডক্টর ঘোষও সেইরূপ পুরাতন ভবন মন্দিরের উপরেই অভিনব মসজিদ তুলিয়াছেন। মন্দিরের উপকরণ সকলই অটুট আছে, অথচ মসজিদটিও বিলকুল নয়া! তাজ্জব ব্যাপার সন্দেহ নাই। ডক্টর ঘোষ তাঁহার জীবনে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ অনেক তাজ্জব ঘটাইয়াছেন এবং আরও ঘটাইবেন। তাঁহার "ঘোষ"ণা তাঁহার সহায়কই হইতেছে, কারণ সমগ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি বড় রকমের উত্তর-গোষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

•　　　•　　　•

ডক্টর ঘোষ যখন ব্যবসায়ী, তখন তাঁহার বিজ্ঞাপনে আমরা আপত্তি করিতে পারি না। আমাদের আপত্তি "উপক্রমণিকা"য় তাঁহার বেয়াড়া প্যাকিং-এ। পুরাতন দুধের সহিত নূতন দুধ মিশাইলে দুধ যে কাটিয়া যায়, তিনি অর্থনীতিপর না হইলেও এ জ্ঞান তাঁহার হওয়া উচিত ছিল, এবম্বিধ ব্যবসায়ের ইহাই মূল কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবগতির জন্য এই গোলযোগের কথাটা প্রকাশ করিয়া দিতে আমরাও ন্যায়ত বাধ্য। ডক্টর ঘোষ অপরাধ লইবেন না।

•　　　•　　　•

এই বিসদৃশ গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছে ডক্টর মনোমোহন ঘোষ প্রণীত 'বাংলা গদ্যের চার যুগ' পুস্তকে। শ্রীযুক্ত ঘোষ অস্বাভাবিক বুদ্ধিবশে আত্মজাহির করিবার উপায়স্বরূপ রামমোহন রায় ও তত্ত্ববোধিনী সভার দলকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, কারণ প্রচার-পত্ররূপে 'প্রবাসী' পত্রিকার সাহায্য তাঁহার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। সে সাহায্য তিনি লাভও করিয়াছিলেন। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিই অন্যান্য প্রবন্ধের সহিত যুক্ত হইয়া 'বাংলা গদ্যের চার যুগ' হইয়াছে। একদেশদর্শিতার এমন অপকৃষ্ট উদাহরণ বাংলা ভাষায়

আর দ্বিতীয় নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার সম্পাদিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র সংস্করণে রামরাম বসুর মূল বানান পরিবর্তন করিয়াছেন এই মিথ্যা ওজুহাতে যিনি এই সংস্করণটিকে বাতিল করিতে চান, তাঁহার উপর অনাঞ্জন-শলাকা প্রয়োগ করিয়া কে জানাইবে যে তাঁহার "মনুমেন্টাল" 'বাংলা গদ্যের চার যুগে' ভুলের সংখ্যা অসংখ্য; তিনি 'বঙ্গভাষার লেখকে'র নাম হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে হরিসাধন মুখোপাধ্যায় লেখেন (।৵০), তিনি বাংলা-গদ্যের ইতিহাসে কয়েকটি স্মরণীয় তারিখ দিতে গিয়া হালহেড ও কেরীর ব্যাকরণ, আপ্‌জনের ও ফর্‌স্টারের অভিধানের নামোল্লেখ করিতে ভুল করেন (।৶০), তিনি 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম পর্যন্ত সঠিক অবগত নন (পৃ. ২৯, ৩০, ৩৩ ও ২১১)। তিনি রামকিশোর তর্কচূড়ামণিকে রামকিশোর তর্কালঙ্কার লেখেন (পৃ. ৩৪), তিনি রামমোহনের ওকালতনামা লইয়াও তাঁহার শিষ্য ব্রজমোহনের "তথ্য প্রকাশ" পুস্তকটির নাম বারংবার 'পথ্যপ্রকাশ' লেখেন (পৃ. ৮০, ৮১, ২১৩) এবং উক্ত পুস্তকের সঠিক প্রকাশকালও তিনি অবগত নন (পৃ. ৮০)। অসংখ্য ভুলে ভরা এই পুস্তকখানি শুধু ভুলের জন্য নয়, একদেশদর্শিতার জন্য আলোচনার অযোগ্য।

* * *

এই পুস্তকেই প্রচারিত হয় যে, রামরাম বসু রামমোহন রায়ের শিষ্য এবং তাঁহার সাহায্যেই বাংলা ভাষার সর্ব্বপ্রথম মৌলিক গদ্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহা অপেক্ষা হেয় মিথ্যা আর কিছু হইতে পারে না। রামমোহন যখন অপোগণ্ড বালক মাত্র, রামরাম বসু তখন ফারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন, বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিতেছেন এবং ইংরেজীও কিছু কিছু শিখিয়াছেন। তাঁহার সহিত রামমোহনের কখনও পরিচয় হইয়াছিল, ইহার কোনও প্রমাণ সমসাময়িক কাগজপত্র হইতে পাওয়া যায় না।

বাংলা দেশে সর্ব্বপ্রথম এই অর্ব্বাচীন উক্তি প্রচার করেন স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। নিখিলনাথ রায় মহাশয় যখন 'প্রতাপাদিত্য'

সম্পাদন করেন, তখন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই তাঁহাকে "কেরী পেপার্স" নামে উল্লিখিত কিছু আজগুবি সংবাদ সরবরাহ করিয়া এই "মিসচিফ"টি করেন; এই সকল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন উক্তিকে ভিত্তি করিয়া নিখিলবাবু তাঁহার পুস্তকের ১৮৪-৮৬ পৃষ্ঠায় রামরাম বসু সম্বন্ধে বহুবিধ অদ্ভুত উক্তি করেন। পরে বিদ্যাভূষণ মহাশয় আপন দুষ্কৃতির গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া 'প্রবাসী' পত্রিকায় "শ্যামল বর্ম্মা" নাম লইয়া নিজেরই সরবরাহ-করা সংবাদগুলিকে যুক্তি দ্বারা "চ্যালেঞ্জ" করেন। উদ্ধৃতি দিবার মত স্থান আমাদের নাই, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ সামান্য পরিশ্রমেই এগুলি দেখিতে পাইবেন। "কেরী পেপার্সে"র "থিওরি" দীর্ঘকাল পূর্ব্বে "এক্সপ্লোডেড" হইয়া যায়।

• • •

পরে ব্রজেন্দ্রবাবু 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় সরকারী নথিপত্র ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য উপাদান লইয়া রামরাম বসুর জীবনী প্রকাশ করেন। ইহারও কিছু কাল পরে আমরা স্বয়ং দীর্ঘ ছয় মাসকাল শ্রীরামপুর কলেজের বোর্ড-রুমে রক্ষিত মুদ্রিত-অমুদ্রিত যাবতীয় কাগজপত্র ঘাঁটিয়া রামরাম বসু সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারি, ব্রজেন্দ্রবাবু-সম্পাদিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভূমিকায় তাহা সন্নিবিষ্ট হয়। শ্রীরামপুরে কাজ করিবার সময় নিঃসংশয়ে জানিতে পারি যে, "কেরী পেপার্স" বলিয়া কোনও কাগজপত্র কোন কালেই সেখানে ছিল না, তাঁহার জার্নাল ব্যাপটিস্ট মিশনের পিরিওডিক্যাল অ্যাকাউন্টসে এবং ভ্রাতুষ্পুত্র-রচিত জীবনীতে মুদ্রিত হইয়াছিল। ব্রজেন্দ্রবাবুর যাবতীয় উপকরণ (সরকারী নথিপত্র ছাড়া) এইগুলি হইতেই সংগৃহীত। এই উপকরণগুলি কল্পিত নয়, আজিও জলজ্যান্ত বর্ত্তমান। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, রামরাম বসু রামমোহন অপেক্ষা অন্তত পক্ষে সতরো বৎসরের বড় এবং রামমোহন সাবালক হইবার পূর্ব্বেই তিনি ফার্সী ও বাংলা ভাষায় রচনাদি করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং-নায়েক ব্যক্তি, কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার মত প্রবৃত্তি তাঁহার থাকিতেই পারে না। অন্নদাতা টমাস ও কেরী পর্য্যন্ত তাঁহাকে কাবু করিতে পারেন নাই।

ডক্টর ঘোষ তাঁহার "উপক্রমণিকা"য় উপরোক্ত দুইটি উপকরণের একটি নিষ্ঠার সহিত অবলম্বন করিলে আমাদের আপত্তি থাকিত না। তিনি উভয় উপকরণই বেমালুম আত্মসাৎ করিয়া উভয় ক্ষেত্র হইতে নিজের মতলব ও প্রয়োজন মত মাল বাছিয়া একসঙ্গে জুড়িয়াছেন। তাহাতে এই বিচিত্র "বকচ্ছপ" সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পেটরোগা ছাত্রদের পক্ষে এই মিশ্রণ গুরুপাক। তাঁহারা সাবধান হইবেন।

• • •

প্রসঙ্গ-শেষে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। ঘোষ মহাশয় একটি মিথ্যা ঘোষণা করিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রবাবু-সম্পাদিত পুস্তকগুলির পাঠের নির্ভর-যোগ্যতা বাংলা সাহিত্যিক-সমাজে প্রসিদ্ধ; তাঁহার 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র পাঠও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। পুস্তকের বিভিন্ন স্থলে একই শব্দের বিভিন্ন বানান একই ভাবে ঠিক করিয়া দেওয়া ছাড়া তিনি কোনও পরিবর্ত্তনই করেন নাই; ডক্টর ঘোষ পরিবর্ত্তনের স্বাধীনতা অনেক বেশি গ্রহণ করিয়াছেন। অধিকন্তু ডক্টর ঘোষের সংস্করণের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় সাল-তারিখের ভুল বইখানিকে একেবারে অপাঠ্য করিয়াছে।

আমরা অত্যন্ত বিনীতভাবে এই প্রতিবাদ করিলাম। ডক্টর ঘোষ হয়তো আজ আমাদের প্রতিবাদের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন না, চল্লিশ বৎসর পরে যদি বুঝিতে পারেন, তাহা হইলেও আমাদের শ্রম সার্থক হইবে।

আষাঢ়ের 'প্রবাসী'র মুখপাতে কাচিৎ "প্রোষিতভর্ত্তৃকা"র একটি ত্রিবর্ণ চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ভদ্রমহিলার স্বামী বিদেশে কোথায় অবস্থান করিতেছেন জানি না, সেখান পর্য্যন্ত যদি 'প্রবাসী' পৌঁছায়, তাহা হইলে তিনি আর গৃহে ফিরিবেন না নিশ্চয়ই। চিত্রকর উপকার করিতে গিয়া বিরহিণী মহিলাটির অপকারই করিয়াছেন।

আষাঢ়ের 'ভারতবর্ষে'র ৭২ পৃষ্ঠায় "অভিজ্ঞান জিপোর কার্য্যে

সাহায্য-রত ব্রিটিশ-মহিলাগণে'র ফোটোচিত্র দেখিয়া হতাশ হইয়াছি। ভারতবর্ষে যে এই মুহুর্মুহু অভিযান জারি হইতেছে, তাহার একটা ডিপো কোথাও আছে কল্পনা করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই ডিপোতে যে ব্রিটিশ মহিলারাও সাহায্য করিয়া থাকেন, তাহা ভাবিতে পারি নাই। ভারতবর্ষের কোনই আশা নাই।

বর্ত্তমান কঠিন আহার্য্য-সঙ্কটের দিনে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য যদি "ব্যাঙের জীবন-রহস্য" ('প্রবাসী', আষাঢ়) আলোচনা না করিয়া "ব্যাঙের মাংস-রহস্য" কিছু উদ্‌ঘাটন করিতেন, তাহা হইলে একটা গুরু সমস্যার কিছু সমাধান হইতে পারিত। শেষ পর্য্যন্ত মানুষের মাংস খাইবার জন্য যাহারা প্রস্তুত হইতেছে, ব্যাঙের মাংসে পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের রুচি প্রস্তুত হইলে সকলেরই উপকার হইতে পারে।

গত চৈত্রের 'চতুরঙ্গে' "রেডিও" শিরোনামায় শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসু লিখিয়াছিলেন—

"আর সত্যি বলতে অভিনেতা অভিনেত্রীরা যে সুরে তাঁদের পাঠ বলেন সে সুরটি বর্জ্জন না করলে আর চলছে না। নাটক করবেন বলে সে যে কী এক নাটুকে টোন্ বার করতে থাকেন এঁরা গলা দিয়ে যে আমরা হতভাগ্য শ্রোতারা একটা নিমেষের জন্যেও ভুলতে পারি না যে আমরা নাটক শুনছি।"

শ্রীযুক্তা প্রতিভা দেবী এই প্রতিবাদ লিখিয়া ভালই করিয়াছিলেন; ইহার পর গত ৩০ বৈশাখ, ১৪ মে তারিখে স্বয়ং 'চিরকুমার সভা'য় অভিনয় করিয়া তিনি "কেস"টা কাঁচিয়া দিয়াছেন। মনে হয়, শুক্রবার সন্ধ্যায় রেডিও-স্টেশনের ওই মাইক্রোফোনটা কেমন-একটা জাদু বিস্তার করে, সামনে যে দাঁড়ায় তাহারই কণ্ঠে নাটুকে টোন্ অনর্গল বাহির হইতে থাকে। স্বয়ং প্রতিভা দেবীও সেই জাদু হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। আমাদের দুর্ভাগ্য! রেডিওর কর্ত্তৃপক্ষ সম্ভবত হাসিয়াছেন।

বাড়ির ছেলেদের মাঝে মাঝে "হাইকোর্ট-হাইকোর্ট" খেলিতে দেখি। তাহারা জজ সাজিয়া গম্ভীর মুখে বিচারাসনে বসিয়া থাকে, ব্যারিস্টার হইয়া ভুল ইংরেজীতে অনর্গল বক্তৃতা করে এবং

অ্যাডভোকেট সাজিয়া নানা ভঙ্গীতে অনুনয়-বিনয় করে ; কেহ কেহ আবার ক্লার্ক পেশকার সাজিয়া ঘুষ লইবারও ভান করে। দেখিতে ভালই লাগে। সম্প্রতি সাহিত্য-ক্ষেত্রেও কয়েকজন চ্যাংড়ার অনুরূপ "সাহিত্য-সাহিত্য" খেলা দেখিয়া অনেকে কৌতুকবোধ করিবেন। 'বৈশাখী বার্ষিকী ১৩৫০' নাম দিয়া এই বালসুলভ খেলার একটা রিপোর্ট নজরে পড়িল। দুই-একজন ধাড়ী শিং ভাঙিয়া এই চ্যাংড়াদের মধ্যে ঢুকিয়াছেন দেখিয়া বিস্ময়ও বোধ করিলাম। কিন্তু মোটের উপর ইহারা খেলাটা জমাইয়াছে ভাল। গুরুগম্ভীর চালে এক-একজনে এক এক বিষয়ের সমালোচক সাজিয়া ফতোয়া জারি করিয়াছে, এমন ভাবেই করিয়াছে যে ইন্দ্রচন্দ্রবরুণের আতঙ্কিত হইবার কথা। সে যাহাই হউক, ইহাদের কার্যকলাপ দেখিয়া একটা ভবিষ্যদ্বাণী নিঃসংশয়ে করিতে পারি যে, ইহারা বাঁচিয়া থাকিলে এবং বখিয়া না গেলে বাংলা সাহিত্যে নাম রাখিবে। ইটনের খেলার মাঠে যেমন ইংলণ্ডীয় বীরেদের সৃষ্টি হয়, এই 'বৈশাখী'র লুডোখেলার মাঠেও তেমনই একদিন বাংলা দেশের কবি ও সাহিত্যিক সৃষ্টি হইবে।

* * *

"আধুনিক বাংলা সাহিত্য" সম্বন্ধে যিনি আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার নাম শ্রীমান নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। শ্রীমানের মুন্সীয়ানা অদ্ভুত, প্রাচীন এবং আধুনিক, প্রবীণ এবং তরুণ সকল সাহিত্য ও সাহিত্যিককে তিনি যেন নস্যের শিশিতে ভরিয়া ফেলিয়াছেন, এক এক টিপ তুলিয়া লইয়া মাঝে মাঝে নাকে দিয়াছেন এবং সিকনি গড়াইলে রুমাল দিয়া চাটিয়া মুছিয়া লইয়াছেন। সে এক অদ্ভুত কেরামতির খেলা। তবে এখনও দুই একটি বিষয়ে শ্রীমান না-লায়েক আছেন। বয়স হইলেই শোধরাইয়া যাইবে। এই শ্রীমানের ধারণা রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ' রঙ্গনাট্য। এটা ভুল। অবশ্য তিনি যে হিসাবে গম্ভীর সমালোচক, সে হিসাবে 'গৃহপ্রবেশ' নিশ্চয়ই রঙ্গনাট্য। সে হিসাবটা সকলে ধরিতে পারিবে না।

* * *

মফস্বলের ছেলে শ্রীমান অশোকবিজয় রাহা এই শহুরেদের দলে

মোটেই বেমানান হন নাই। এই বয়সেই যে তিনি এত সব মুরুব্বিয়ানার বুলি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, তাহাতে মনে হইতেছে, তিনি অনেক-দূর অগ্রসর হইবেন। "কাব্যের শিল্পরূপ" দেখাইতে গিয়া তিনি বিচিত্রতা, উচ্ছ্বাস, কোমলতা, স্তম্ভিত সংঘাত, কাঠিন্য, বিদ্যুৎ, ইঙ্গিত, চমক ইত্যাদি দিয়া কাব্যালোকের জল স্থল আকাশ তোলপাড় করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার brainএ fixation আর একটু কম হইলে তিনি আরও চমকের সৃষ্টি করিতে পারিতেন। তাঁহার সম্বন্ধেও আমাদের অনেক আশা।

* * *

অন্য যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের নাম করিবার মত স্থান আমাদের নাই। শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ইঁহাদের প্রতিভার স্ফুরণ হউক।

জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'র "বিবিধ প্রসঙ্গে" "রবীন্দ্রনাথের দুইখানি নূতন বই" শীর্ষক প্রসঙ্গ পড়িয়া চমৎকৃত হইয়াছি। 'মডার্ন রিভিউ'-এ এই প্রসঙ্গই K. N. সহিতে বাহির হইয়াছে। সুতরাং বুঝিতে পারিতেছি এই চিত্তচমৎকারী আলোচনা স্বয়ং রবীন্দ্র-সাহিত্য-মহাভারতের বেদব্যাস কালিদাস নাগ মহাশয় করিয়াছেন। 'প্রবাসী'তে লিখিত হইয়াছে—

বিশ্বভারতী কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের দুইখানি নূতন বই "আত্মপরিচয়" এবং "সাহিত্যের স্বরূপ" প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমটিতে কবিতার কয়েকটি প্রবন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত ও কবিজীবনের কথা লিখিয়াছেন।...বইখানিতে কবির একটি মূল্যবান লেখা বাদ পড়িয়াছে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে 'আত্মপরিচয়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ তিনি পাঠ করিয়াছিলেন এবং ১৯১২ সালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

বেদব্যাসেরও ভুল হইতে বাধা নাই। নাগ মহাশয় অতিশয় ভদ্র এবং রুচিসম্পন্ন পুরুষ, ল্যাজ পর্য্যন্ত উপরিতলস্থ সকল খবরই রাখেন। তাহার অধিক জানা রুচিবিগর্হিত। আর একটু গভীরে হস্তক্ষেপ করিলে তিনি জানিতে পারিতেন "আত্মপরিচয়"—রবীন্দ্রনাথের জীবনের অথবা কবিজীবনের কথা নয়, ব্রাহ্মরা হিন্দু কি না এই বিষয়ক আলোচনা। নাগ মহাশয় যে 'আত্মপরিচয়' পুস্তকে 'বিশ্বপরিচয়' অথবা

কুন্তলীন তৈলের প্রশংসা-পত্রটি প্রবেশ করাইয়া দিবার দাবি করেন নাই, ইহাতেই তাঁহার সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়।

যাঁহারা আধুনিক যুগের সমাজ ও সাহিত্যের নাড়ীর খবর রাখিতে চান, 'রবিবাসরীয় যুগান্তরে'র শ্রীবৎস লিখিত "নানা প্রসঙ্গ" তাঁহাদের বিশেষ কাজে লাগিবে। লেখকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকার দরুণ এমন অনেক বিষয়ই তিনি সহজেই আলোচনা করিয়া থাকেন, যাহা সাধারণের চক্ষে taboo। এই নির্ভীক স্পষ্টবাদী লেখকের লেখা আমাদের ভাল লাগে—আপাত দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহার ইঙ্গিত পাই এই "নানা প্রসঙ্গে"। গত ১৩ জ্যৈষ্ঠের "নানা প্রসঙ্গ" হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

হালে দেখা যাচ্ছে 'ত্রৈমাসিক' 'ষান্মাসিক' ও 'বার্ষিক'—সিনেমা ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক পত্রিকার আপদলম্বিত বোরখার ফাঁক দিয়ে কাগজের চুলে উঁকি দিচ্ছে। কেউ রুদ্র সন্ন্যাসী, কেউ ধ্যানী বুদ্ধ, কেউ নীরব তপস্বী। অবশ্য 'বার্ষিকে'র আবির্ভাবটাই সর্ববিজ্ঞানসম্মত, মঙ্গলময়ী এবং আড়ম্বরপূর্ণও বটে। বিরাট বিরাট শিল্পী সাহিত্যিক ও সমালোচকরা বৎসরান্তে তাঁদের প্রসবের প্রদর্শনী সাজিয়ে দেন এই 'বার্ষিকে'। প্রদর্শনীতে দেখা যায় নবজাত শিশু কেউ কানা, কেউ খোঁড়া, কেউ নুলো, কেউ কুঁজো, কেউ একেবারে নিছক প্রকৃতির খেয়াল, কিন্তু তাতে কি, শিশু তো, স্বষ্টি তো বটে, তার ওপর শুধু 'রসোত্তীর্ণ' নয়, একেবারে রসে চ্যাটচেটে। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার বার্ষিক ফলাফলের জ্যোতিষিক তালিকার মতো 'বার্ষিকে'র পৃষ্ঠায় বৎসরান্তে দেখা যায় সমসাময়িক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতাবিচার এবং রসের মাপকাঠিতে স্তরবিন্যাস ও স্থিতি। ঘোড়া-মাঠ-বিবিয়াম যার ইচ্ছা তিনিই বিচারক হন।

শ্রীযুক্তা মায়া দেবী খুলনা শ্রীঅরবিন্দ সঙ্ঘের পক্ষ হইতে প্রকাশিত 'বর্তমান যুদ্ধ ও আমাদের কর্তব্য' নামক একটি পুস্তিকা ও তৎসঙ্গে নিম্নলিখিত পত্রটি পাঠাইয়াছেন:

মহাশয় এই পত্র সম্বলিত অমূল্য পুস্তিকা আপনার হস্তগত নাও হইতে পারে। ইহা পাঠ করিবেন। আমরা অবুঝ (পৃ. ২), নিজের ভালমন্দ বুঝি না। এই অমূল্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া যেন আরো বুদ্ধি লোপ হইল।

বর্তমান যুদ্ধের আদর্শ, Cripps-এর মহানুভবতা ও আমাদের মতিভ্রম, ইংরাজ শাসনের মাহাত্ম্য, এই সবের সারগর্ভ বিশ্লেষণ এই পুস্তিকায় পড়িয়া জ্ঞানলাভ করিবেন।

উপরন্ত একদিকে "দলিতপদদণ্ড-বৃদ্ধ" বৃটিশ-সিংহ অপর দিকে রক্তপিপাসু জাপানী ব্যাঘ্র (৬ পৃষ্ঠা) বড়ই ভয়াবহ।

"দুরন্ত বরষাকাল, সাপ চাটেন ব্যাঙের গাল" (৭ পৃষ্ঠা) ব্যাঙরূপী ভারতবাসী কি এবারে ইংরাজের বুটজুতা ভুলিয়া তাহার গাল চাটিবে? সত্যিই কি আমরা ঘোড়ার কথা ভুলিয়াছি (পৃষ্ঠা ৭)? ঘোড়ার গোড় ছাড়িয়া মুখচুম্বন করিব।

বড়ই আস্পর্দ্ধার কথা। প্রভু শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যদের পরামর্শে শেষটায় রাজদ্রোহী হইতে হইবে দেখিতেছি। আপনার সৎপরামর্শ ভিক্ষা করি।

প্রভু বলিয়াছেন বিনা বাক্যব্যয়ে ইংরাজের সঙ্গে সম্বদ্ধ হইতে (পৃ. ৭)। অবিলম্বে Bengal Club ও United Services Club-এর সভ্য হইবার জন্য আবেদন করিব।

ভাবিবার অবসর নাই আমাদের (পৃ. ৮)। দলে দলে সভ্য হইব—আপনাকেও সঙ্গে লইব। যদি আপনাদের সুমতি না হয় (পৃ. ৯), তবে একলা চলিব।

সময় থাকিতে মতিস্থির করুন। ইংরাজের বিপর্য্যয় হইলে তাহারা সমুদ্র পাড়ি দিতে পারিবে—আমাদের ভরা নৌকা ডুবি হইবে (পৃ. ৯), যথাসর্ব্বস্ব হারাইব।

শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন (পৃ. ১০) ধর্ম্মযুদ্ধে ইংরাজকে আমরা হারাইতে পারিব না—তবে কি পুনরায় গুপ্ত ষড়যন্ত্রে যোগদান করিতে হইবে? সব জিনিষটা কেমন ঘোল পাকাইয়া যাইতেছে। আমাদের মানুষী বুদ্ধির (পৃ. ১১) অতীত হইয়া উঠিতেছে।

শুনিতেছি ইংরাজ এই ধর্ম্মযুদ্ধে (পৃ. ১১) পূর্ব্বজন্মের পাপ মোচন করিতেছে। আর্য্যসমাজ তৎপর হউন। শুদ্ধি করিয়া দলে দলে ইংরাজকে এই সুযোগে হিন্দুসমাজভুক্ত করিয়া লউন।

পুস্তিকাকার শেষ কথায় (পৃ. ১২) নূতন জাতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর ভয় নাই! এবার ইংরাজ ভারতবাসী ভাই ভাই—বিভিন্ন জাতি নয়। অর্থাৎ পুস্তিকাকারের যুক্তির "উপর ঠ্যাঙের নাল থাম টানিলে" বুঝা যাইবে যে ভারতবাসীগণ উপজাতিকে গ্রাস করিয়া আসিতেছে আর একটা বৃহত্তর গোষ্ঠী (পৃ. ১২)। উপজাতি সকল খাজা কাটিয়া (পৃ. ১৩) ভবিষ্যতে মানবজাতিরূপ বড় দানা পাকাইবে। লেখক "লম্বালম্বি কেটে কেটে" (পৃ. ১৩) অথবা "আড়াআড়ি ভাবে" (পৃ. ১৪) কাটা ঐক্য পছন্দ করেন না। তবে কি লম্বালম্বি আড়াআড়ি কাটিতে হইবে।

ভারতবর্ষকে জগৎব্যাপী দৃষ্টি দিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে (পৃ. ১৪)। ইংরাজের সহিত হইবে পুনরায় শুভদৃষ্টি। কিন্তু দিব্যদৃষ্টি দিলেন সত্যই গ্রন্থকার্‌ সমস্যা পূরণের অদ্বিতীয় পথ বাতলাইলেন।

এই পুস্তিকা পড়িয়া ও ইহার ছাপা কাগজ দেখিয়া যে সন্দেহ হয়, তাহা প্রকাশ করিয়া না বলাই শ্রেয়।

বিশ্বভারতী সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি', 'চিত্রা', 'নটীর পূজা' ও 'বিসর্জন' এই চারিখানি পুরাতন পুস্তকের যে নূতন সংস্করণ বাহির করিয়াছেন, প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া সেগুলি পূর্ব্বেকার সকল সংস্করণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। নিখুঁত ছাপার সঙ্গে খবর যত বেশি পাওয়া যায়, পাঠকের ততই লাভ। এবারকার 'গীতাঞ্জলি'তে বহু পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া গানগুলির রচনা কাল ও স্থান সন্নিবিষ্ট হওয়াতে অর্থগ্রহণে অনেক সুবিধা হইয়াছে। 'চিত্রা'র "গ্রন্থপরিচয়" 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'তে প্রদত্ত পরিচয় হইতেও সম্পূর্ণতর। 'নটীর পূজা'তে প্রথম অভিনয়ের বিবৃতি ও স্বরলিপির তালিকা দেওয়াতে অভিনয়ের অনেক সাহায্য হইবে। 'বিসর্জনে'র পরিশিষ্টে নাটকান্তর্গত গানগুলির স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে। গতানুগতিকভাবে রবীন্দ্রনাথের বইগুলির পুনর্মুদ্রণ না করিয়া যাঁহারা এ ভাবে এগুলির সৌষ্ঠব সাধন করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদার্হ।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত ও পরিষৎ-কর্তৃক প্রকাশিত "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র ২৪ সংখ্যক বই 'হরিশ্চন্দ্র মিত্র—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার'। 'মিত্র-প্রকাশে'র হরিশ্চন্দ্র ও 'সদ্ভাবশতকে'র কৃষ্ণচন্দ্র আজ প্রায় বিস্মৃত হইলেও যে স্মরণীয়, ব্রজেন্দ্রবাবু তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র খ্যাতনামা মৌমাছি-প্রণীত 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড' দুই ভাগ এ দেশের ছেলেমেয়েদের জ্ঞান-পিপাসাকে যে অনেকখানি নিবৃত্ত করিবে, তাহাতে সংশয় নাই। জাতিগত ভাবে নানা বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা এত বেশি যে, যে কেহই ইহা দূর করিবার জন্য চেষ্টিত হইবেন, তিনিই প্রশংসার দাবি করিতে পারেন। মৌমাছি একেবারে গোড়া হইতে শুরু করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার কাজও কঠিন।

'পরিশেষে' বিজয়কুমার বসুর উপন্যাস। লেখক বাংলা সাহিত্যে নবাগত হইলেও তাঁহার প্রবেশ অনধিকারীর প্রবেশ নয়।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রসকলি

গল্প-সংগ্রহ

রাইকমল

উপন্যাস

শ্রীসজনীকান্ত দাসের

কলিকাল

হাসির গল্প

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

রাণুর প্রথম ভাগ (২য় সং)

রাণুর তৃতীয় ভাগ

গল্প-সংগ্রহ

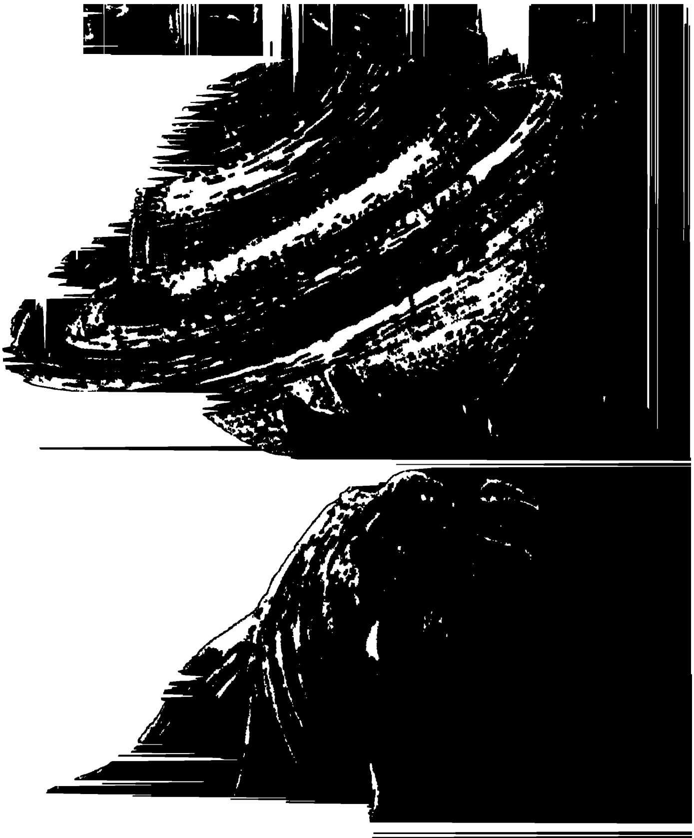
শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরীর

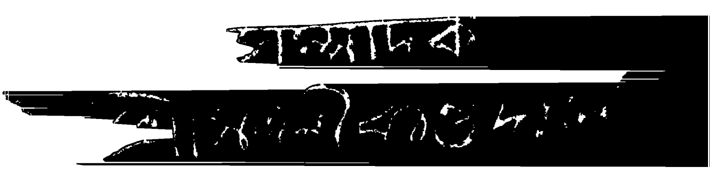
শৃঙ্খল

উপন্যাস

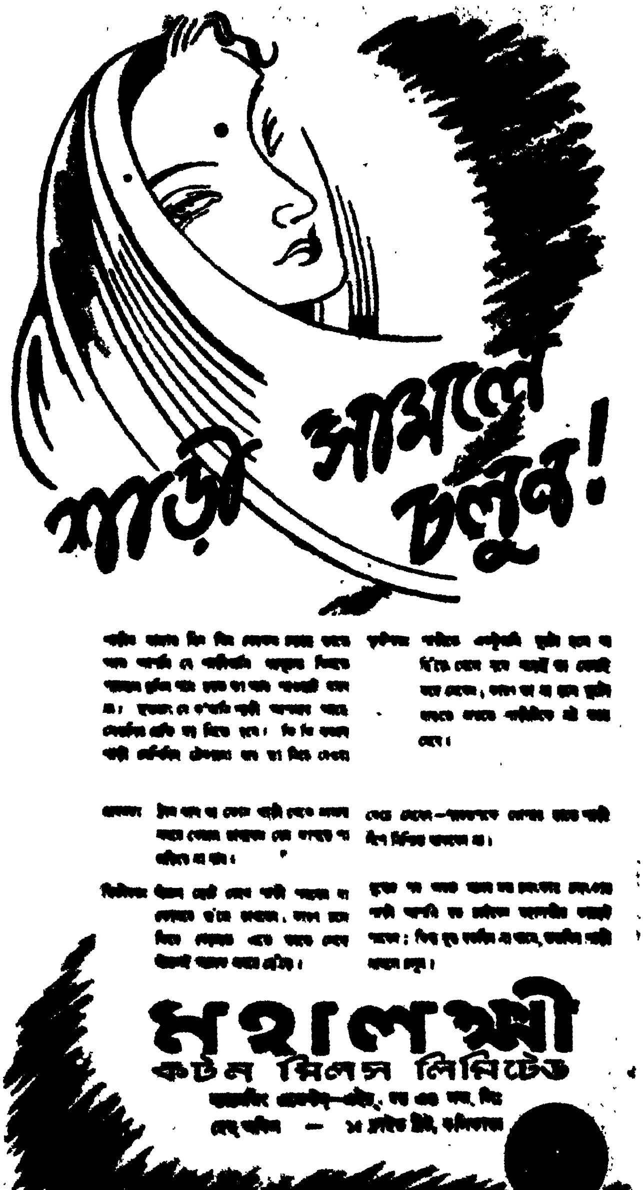
উপরের বইগুলি সম্প্রতি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।
সকল অসুবিধাসত্ত্বেও এগুলির আমরা
পুনর্মুদ্রণ করিতেছি।

রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস
২৫।২, মোহনবাগান রো,
কলিকাতা





শ্রাবণ ১৩৫০, July 1943. Price 5 Annas


শাড়ী সামলে চলুন!
মহালক্ষ্মী
কটন মিলস লিমিটেড

সূচী

শ্রাবণ—১৩৫০


শিশুদের পক্ষে মাতৃস্তন্য অতুলনীয়
সন্দেহ নেই
কিন্তু
মাতৃ-দুগ্ধের অভাব
বা মাতৃদুগ্ধ বিকৃত
হ'লে, তার অভাব
পূরণ করতে পারে
একমাত্র
ভিটো-মিল্ক
ন্যাশনাল নিউট্রিমেন্টস লিঃ ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা



নারীর মর্মবেদনা সহজলভ্য....
কিন্তু প্রেম একান্ত দুর্লভ!
প্রভাতের
ভূমিকায় —
রোজ
জয়রাজ
ব্যানার্জী
পরিবেশক
এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটার্স
মিনার্ভা



গন্ধে
সুবাসিত
ক্যাষ্টর অয়েল
আপনার
পিতামহ ও
এই কেশ
ব্যবহার
নকল হইতে সাবধান
Bathgate &
CHEMISTS
CALCUT


চায়ের কথা
ব্রুক বণ্ড


মাথা ধরা
দাঁতের যন্ত্রণা
সারিডন

রূপবাণীতে ৩০ জুলাই শুক্রবার শুভমুক্তি

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচিত

ঘৃণাবিমিশ্র প্রেমের কাহিনী অবলম্বিত অনুপম বাণীচিত্র

ইষ্টার্ণ টকীজের সশ্রদ্ধ নিবেদন—

নীলাঙ্গুরীয়

পরিচালক : গুণময় বন্দ্যো

সুর-শিল্পী : সুবল দাশগুপ্ত

গীতকার : কবি শৈলেন রায়

প্রধান ভূমিকায় :

ধীরাজ ও যমুনা

অন্যান্য ভূমিকায় :

জহর, ছবি, মলিনা, দেব-বালা, রেণুকা, পূর্ণিমা, লতিকা, ইন্দু, কানু, আশু, শ্যাম লাহা, বিভূতি গাঙ্গুলী, মাণিক





আপনার কর্তব্য—

যাঁহারা দেশে বিদেশীয় সাবান
প্রসাধন দ্রব্য ও ঔষধ প্রভৃতি
সমুদয় ক্রয় করিয়া থাকেন
তাঁহারা স্বদেশীয় কারখানা হইতে
প্রস্তুত উক্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইয়া
দেখিলে বিলাতি সামগ্রী হইতে তাহার
পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন না। এমতস্থলে
এই স্বদেশী প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ দেওয়া
তাঁহাদের পরম কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর


ভারতীয় চায়ের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট
LIPTONS
TEA
লিপটনের
জাকুজা হোয়াইট লেবেল
এবং টি গার্ল চা


চিন্তার
প্রবাহ
সাহিত্যিক ও মনীষীদের চা না হ'লে চলেই না। যাঁরা লেখাপড়ার চর্চা করেন এবং যাঁরা কল্পনাশীল বলে খ্যাত তাঁদের কাছে চা এমন অপরিহার্য কেন জানেন? কারণ চা-ই এঁদের প্রেরণা দেয়—মনকে উদ্বুদ্ধ করে দেবার জন্য এঁরা চায়ের উপরই নির্ভর করে থাকেন। সব রকম পানীয় আছে তার মধ্যে একমাত্র চায়েরই সেই শক্তি আছে যা মন ও কল্পনার উৎস উদ্বুদ্ধ করে দেয়। আপনিও আপনার চিন্তা-শক্তিকে চা খেয়েই প্রবুদ্ধ করে তুলুন।
ভারতীয় চা
সার্বজনিক পানীয়

সত্যম্ অপ্রিয়ম্

১

'শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর' ক্রমেই যেন আগাইয়া আসিতেছে—যুদ্ধের ফলাফল যাহাই হউক, আমরা যে ধ্বংসের দিকে চলিয়াছি, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন উপায় আর নাই। জাতির এই জীবন-মৃত্যু সঙ্কটে কোন্ চিন্তা সবচেয়ে বড় হইয়া উঠা স্বাভাবিক?—অবশ্য যদি চিন্তা করিবার শক্তিটুকুও অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু চারিদিকে যাহা দেখিতেছি তাহাতে মনে হয়, কোন চিন্তাই নাই—বিনাশ অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও আমরা এমন ভাবে দিন যাপন করিতেছি, যেন কোনরূপে যে-কয়টা দিন হউক বাঁচিয়া থাকিতে পারিলেই হইল, তারপর যাহা হইবার হইবে,—সান্ত্বনা এই যে, সকলেই একসঙ্গে মরিব। ইহাকেই বলে ঘোর তামসিক অবস্থা। জীবন যতই দুর্ব্বহ হউক, এখনও আমরা প্রাণের অন্তস্তল হইতে এমন আর্ত্তস্বর শুনিতেছি না—

> শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
> শরমের ডালি,
> নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
> ধূমাঙ্কিত কালি।
> লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ ভাগ,
> কলহ সংশয়,—
> সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি'
> দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়!

প্রাণের কি আর সে চেতনা আছে? বহুকালের বহু অত্যাচারে অসাড় হইয়া পড়িয়াছে; আমরা আর জীবিত মানুষ নই—প্রেত-অবস্থায় আছি; প্রাণের শিকড়গুলা বহুদিন কাটিয়া দিয়াছি, কাজেই আজ আর নূতন

করিয়া প্রাণত্যাগ করিব না। তাই মৃত্যুও আমাদের নিকটে একটা সত্য বস্তু নয়—কেমন যেন একটা ছায়া ; বিভীষিকাও নয়, একটা অস্পষ্ট প্রহেলিকা মাত্র। তাই কোন ভাবনা নাই—সত্তাকার বিনাশ-ভয় নাই। এ যেন একটা ট্রেনের বিভিন্ন কামরায় যাত্রীদল বসিয়া আছি, সম্মুখে কয়েক মাইল দূরে একটা প্রকাণ্ড ব্রিজ ভাঙিয়া গিয়াছে ; বিপদের সিগ্‌ন্যাল সত্ত্বেও গাড়ি থামাইবার উপায় নাই—ইঞ্জিন বেকল হইয়া পড়িয়াছে, অথচ তাহার গতি ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, আর দুই চারি মিনিটের মধ্যে ৩০।৪০ ফুট নীচে সমস্ত গাড়িখানা হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া যাইবে। যাত্রীরা তাহা জানে, তবু ভুলিয়া আছে ; কেহ তাস খেলিতেছে, কেহ বড় সাহেবের মনস্তুষ্টির উপায় চিন্তা করিতেছে ; আগামী সপ্তাহে একটা সুখবর পাইবার আশায় কেহ উৎফুল্ল হইতেছে, কেহ দেনাপাওনার হিসাব করিতেছে, কেহ মনে মনে নূতন চাকুরিলাভ বা পদবৃদ্ধির সুখস্বপ্ন দেখিতেছে ;—চিরদিন যাহা করিয়াছে, এখনও তাহাই করিতেছে, মনের গতির লেশমাত্র পরিবর্তন হয় নাই—অথচ বাহিরে ওই সঙ্গীন অবস্থা ! এ যেন ভগবানেরই একটি নূতন রসিকতা—উদ্ভট আমোদ। বিশ্বাস করিবার মত নয়, তথাপি ইহাই চারিদিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। কখনও বা মনে হয়, যেন একটা বিরাট গো-গৃহে অগণিত গরু খুঁটিতে বাঁধা আছে এবং অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে জাবর কাটিতেছে। বাহিরে আকাশ জুড়িয়া কালবৈশাখীর প্রলয়-মেঘ, চালাখানিও নিতান্ত জীর্ণ, ফাঁক দিয়া ঘন ঘন বিদ্যুৎ-চমক দেখা যাইতেছে। আসন্ন ঝড়ের সঙ্কেতে চারিদিক স্তব্ধ, বাতাসও উঠিয়াছে, কিন্তু হতভাগ্য পশুগণের তাহাতে ভয় নাই—ভিতরের মশা-মাছিও যেমন তাহার স্তিমিত চক্ষুকে কখনও উন্মীলিত করিতে পারে নাই, বাহিরের আকাশজোড়া বিপ্লবের আসন্ন তাণ্ডবও তেমনই তাহাকে বিচলিত করে না। উপমাটি সর্বাংশে না হইলেও কতকাংশে যথার্থ। এরূপ হইতে পারে—ইহা ছাড়া আর কি সম্ভব ? আমরা আর কি করিতে পারি ? এ সকল নিষ্ঠুর কথা এ সময়ে বলিয়া লাভ কি ?

২

লাভ নাই; কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্বের যে নিদারুণ দুর্গতি আজ সমাজের সর্বস্তরে প্রকাশ পাইতে দেখিতেছি, তাহাতে আমিও—তাহাদেরই একজন—আত্মধিক্কারে ভগবানের নাম করিতেও লজ্জাবোধ করিতেছি। এ জাতির অধঃপতন যে কতদূর হইয়াছে—সারা জীবন তাহাই দেখিতে দেখিতে সত্য ও সুন্দরের মন্ত্র বার বার ভুলিয়াছি; আমিও আত্মার অবমাননা করিয়াছি, প্রাণের ঠাকুরকে মনের মত করিয়া পূজা করিতে পারি নাই; দুর্বল আমি অবোধের মত চীৎকারই করিয়াছি—কবিতার ভাবস্বর্গ ত্যাগ করিয়া বিচার-বিতর্কের কণ্টকবনে প্রবেশ করিয়াছি; সত্যের সুন্দর-মূর্তি নির্মাণ না করিয়া সুন্দরকে সত্যের মানদণ্ডে মাপিবার প্রয়াসে, নিরানন্দের কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছি। কোন দুঃখ, কোন আঘাত, কোন ক্ষতিকে গ্রাহ্য করি নাই, কত বান্ধব বিমুখ এবং কত শত্রু উন্মুখ হইয়াছে—তবু সে পথ ত্যাগ করিতে পারি নাই, মন কিছুতেই সুবুদ্ধির বশতাপন্ন হয় নাই। আজও যে হয় নাই, তাহার প্রমাণ—এই প্রসঙ্গের অবতারণা। সুবুদ্ধি বলে—এ মতিভ্রম কেন? অরণ্যে রোদন করিয়া কি হইবে? আমার এক অতিশয় সুবুদ্ধিমান সুহৃদ সেদিনও এই কথাই বলিয়াছেন। সমাজ বুদ্ধিমান ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার পাদপীঠ মাত্র; সে সমাজ যত বেতসধর্মী অর্থাৎ মেরুদণ্ডহীন হয়, ততই তাহাকে কূটবুদ্ধিবলে নিজের সপ্ততলসৌধনির্মাণে উপকরণস্বরূপ ব্যবহার করাই সুবুদ্ধির কাজ। হিতকথা শুনিবারও যোগ্য কেহ নাই, বলিবারও তেমনই কোন প্রয়োজন নাই,—যে বলে সে অতিশয় নির্বোধ। ইহাই বোধ হয় সর্বজ্ঞানের সার। সাহিত্যের সাধনক্ষেত্রে অতিশয় একান্তে বাস করিলেও,—বিদ্যা বা শিক্ষার সহিত সাহিত্যের যেটুকু অবিচ্ছেদ্য যোগ তাহার ফলে—এমন বহু বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও কীর্তিমান সুহৃদ লাভ করিয়াছি; তাঁহারা এমনই কত হিতবাক্য বলিয়াছেন, দুর্ভাগ্যের তাহাতেও চৈতন্য হয় নাই। তাই আজিও এই ঘোর অরণ্যেই রোদন করিতেছি।

কেন করিতেছি? ভগবানে বিশ্বাস হারাই নাই, তাই মৃত্যুকালেও তারকব্রহ্মনাম জপ করিতেছি। সাহিত্যকে কখনও জীবন হইতে পৃথক করিয়া দেখি নাই—জাতির জীবন, ধর্ম ও সমাজ যে সেই একই সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে নিত্য যুক্ত হইয়া আছে, সেই যোগ ছিন্ন হইলে সাহিত্য আর সাহিত্য হয় না, তাহার জীবনীশক্তিও লোপ পায়; বাংলা সাহিত্য বলিতে বাঙালী-জীবনের অন্তরতম সত্যসুন্দরের প্রস্ফুটিত রূপ; একটি ছাড়িয়া আর একটিকে বিকশিত পুষ্পিত হইতে দেখার আশা দুরাশা মাত্র—এই সত্য যেদিন অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, সেই দিন হইতে শান্তি পাই নাই। কারণ, সেই জীবনকেই যে দ্রুত বিবর্ণ হইয়া উঠিতে দেখিয়াছি। তাই আমারই কালে এক অসাধারণ কবিপ্রতিভার নিত্য-নবোন্মেষ—কাব্যসাধনাতেই মুক্তির সাধনা, বাণী-মন্ত্রেই ভূর্ভুবঃস্বর্লোক-জয়ের দৃষ্টান্ত চাক্ষুষ করিয়াও তাহাতে আশ্বস্ত হইতে পারি নাই; বরং একের পক্ষে যাহা মুক্তি, বহুর পক্ষে তাহাই মোহ, এই তত্ত্বই বার বার উপলব্ধি করিয়া এই দুর্বল আত্মভ্রষ্ট জাতির উত্তরোত্তর দ্রুত অধঃপতন দর্শনে নিরতিশয় শঙ্কিত হইয়াছি। যাহার চিত্ত নিরন্তর আলস্যাবেশে ক্লিন্ন ও দুর্বল হইয়া আছে, তাহার পক্ষে "রসচর্চা"র অভিমান যে কতবড় নিষ্ঠুর আত্মপ্রবঞ্চনা—আজ প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া প্রতি পদে তাহার নিদারুণ পরিচয় পাইয়াছি। তথাপি নিরাশ হই নাই, কারণ অজপাজপে বিশ্বাস করি—'জপ-যজ্ঞ'ও নিষ্ফল হইবে না, এমন আশা করিয়াছি। তাই যে মিথ্যা, যে অজ্ঞান ও অনাচার 'অতি-আধুনিক বাংলাসাহিত্য'-নামক বাঙালীর গোষ্ঠী-মানস-চর্চার উন্মুক্ত উদার গোষ্ঠ-প্রাঙ্গণে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল—যেখানে তাহার নাড়ীর স্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করা যায়—সেইখানেই তাহাকে ধরিবার ও ধরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। অন্তত সে বিষয়ে যে ভুল করি নাই, তাহা নির্ভয়ে বলিতে পারি—কারণ ঐ 'রসে'র নাড়ীতেই তাহার সকল রোগের মূল রোগ ধরা পড়িয়াছিল। আর শুধু সাহিত্যের নয়—বিচার মিথ্যা, ভাবের মিথ্যা, কল্পনার মিথ্যাই নয়—তাহার দেহমনপ্রাণের সকল মিথ্যা, তাহার আত্মার শোচনীয় জড়তা, তাহার মনুষ্যত্বহীনতা প্রকাশে ধরা

পড়িয়াছে—পঙ্কমধ্যে কৃমিরাশির মত সে আজ যেমন ঘৃণ্য, তেমনই অন্ধ ও অসহায়।

এ জাতি এক্ষণে কালরাত্রির প্রহর যাপন করিতেছে মাত্র, প্রহরের পর প্রহর ধ্বংস আরও আসন্ন হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু সেই লগ্নেও সে কি ভাবিতেছে, কি করিতেছে? সমষ্টিগতভাবে সে মৃত্যুভয়কে এই বলিয়া লাঘব করিতে চায় যে, মৃত্যু তো একার নয়—সকলেই মরিব, অতএব তাহা কতকটা সহনীয় বটে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সে তাহা মনে করে না—তখন সে একাই বাঁচিতে চায়; সর্ব্বনাশটা সে একসঙ্গে ভোগ করিতেই উৎসুক, কিন্তু উদ্ধারটা সে একাই পাইতে চায়। চারিদিকে মৃত্যুর করাল ছায়া—অনাহারে লক্ষ লক্ষ লোক মরিতে বসিয়াছে, তথাপি সেই লোকক্ষয়কর মহাকালের করাল গ্রাস হইতে আর সকলকে বাঁচাইবার চেষ্টা তো দূরের কথা—ইহাও যেন একটা মহা সুযোগ, লক্ষ লোকের জীবননাশে সে যেন একাই আরও ভাল করিয়া বাঁচিবে; এক দিকে একমুষ্টি অন্নের অভাবে মানুষ দলে দলে মরিয়া যাইবে, আর এক দিকে অন্নের মহার্ঘতার সুযোগেই গৃহকোণে কাঞ্চন-রাশি স্তূপীকৃত হইতেছে! সমগ্র মানবসমাজ যে মন্বন্তরে উন্মূলিত হইয়া ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছে—মহাকালের যে মূর্ত্তি দেখিয়া মানুষের শুধুই হৃৎকম্প নয়—তাহার সুষুপ্তিমগ্ন আত্মাও সচকিত হইয়া উঠে, সে মূর্ত্তি দর্শন করিয়াও এ মানুষের লোভ ঘুচিল না! যেন ইন্দ্রিয়গুলাও বিকল হইয়াছে—তাই মনও জড়তাগ্রস্ত, বুদ্ধিও লুপ্ত হইয়াছে। আছে কেবল অন্ধ লালসা—বুদ্ধিবিরহিত মনের একটিমাত্র প্রবৃত্তি—লোভ। নহিলে এমন দৃশ্য কোথায় কে কবে দেখিয়াছে? প্রলয়-বন্যায় সব ভাঙিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, সেই বন্যার বিপুল তরঙ্গের শিখরে কোনরূপে আরোহণ করিয়া, নিমেষমধ্যে অতল গহ্বরে পড়িবার পূর্ব্বে, রাশি রাশি সংসারবনের বৈভবের আবর্জ্জনা দুই বাহু ভরিয়া বুকে আঁকড়াইয়া ধরিতেছে—সে অবস্থাতেও, কেবলমাত্র লোভের বশে সেই মজ্জমান দেহের উপরে টাকার পাহাড় চাপাইতেছে! এ দৃশ্য বিরল নয়, বরং প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে; যাহারা অক্ষম তাহারাই নিরস্ত হইয়া

আছে। বিত্তহীন, নীতিহীন ও ধনহীন ব্যক্তিরাই হঠাৎ ধনী হইবার লোভে এমন উন্মত্ত হইয়া উঠে নাই—দেশের যাঁহারা মান্য গণ্য, বিদ্বান ও সদ্বংশীয়, এবং যাঁহারা বড় বড় নেতা, তাঁহাদের মধ্যেও এই ব্যাধি সমান সংক্রামক। এই একটা লক্ষণেই এ জাতির ভিতরকার স্বরূপ অতিশয় সুগোচর হইয়া উঠিয়াছে।

এমন মানুষের বাঁচিবার অধিকারই যে নাই! পশুরও বাঁচিবার যে অধিকার আছে, তাহার সে অধিকারও নাই; কারণ মানুষকে সংসারে ও সমাজে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মনুষ্যত্বের একটা কোন সংস্কার রক্ষা করিতে হয়। তাহা যে কিছুমাত্র নাই, আজ তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি—আমাদের আকৃতি এখনও ঠিক আছে, কিন্তু তাহা ভস্মময়, একটি ফুৎকারেই উড়িয়া যাইবে।

৩

অধিকারের কথায় আজ অনেক কথাই মনে হইতেছে। আমরা কিছুকাল যাবৎ—শেষের প্রায় ২০।২৫ বৎসর—প্রত্যেকেই স্বাধিকার সম্বন্ধে বড়ই সচেতন হইয়াছি; স্বরাজকেই যেমন স্বরাজ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছি, তেমনই স্ব স্ব অধিকারকে এমনই একটা স্বৈরাচার-নীতির উপরে স্থাপন করিয়া সর্ব্বপ্রকার সুখকর মিথ্যাকে কথায় ও কাজে ন্যায়যুক্ত করিতে চাহিয়াছি, যাহাতে 'অনধিকার' বলিয়া কোন তত্ত্বকে মানিবার প্রয়োজন আর না হয়। কৌশলে ভোট সংগ্রহ করিয়া পোলিটিক্যাল পদমর্য্যাদা লাভ এবং সেই পদমর্য্যাদার বলে নানাবিধ স্বার্থসাধন করিবার জন্যই দেশনেতা হইবার অধিকার আমাদের আছে; চাতুরির দ্বারা অর্থশালী হইবার জন্যই যে নীতি ও দাস-মনোবৃত্তি একান্ত আবশ্যক, অতিশয় নিষ্ঠার সহিত তাহাই পালন করিয়া শিক্ষা-বিভাগে উন্নতিলাভ করিবার অধিকার আমাদের আছে; ভিতরে অমেধ্যলোভী চণ্ডাল হইয়াও বাহিরে বালক ও যুবকগণের শিক্ষক বা আচার্য্য হইতে বাধে না—সে অধিকার আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন

করি। কলেজের—এমন কি স্কুলের—ছাত্রগণেরও না পড়িয়া পাস করিবার অধিকার আছে; গুরুজনকে অমান্য করিবার—সকল নিয়ম-শাসন লঙ্ঘন করিবার অধিকার তাহাদের আছে, কারণ, তাহারাও যে "অমৃতস্য পুত্রাঃ"। স্কুলের হেডমাস্টার যদি তাহাদিগকে শাসন করে, পরীক্ষায় তাহারা যদি শতকরা ৯৯ হারে পাস করিতে না পায়, তবে দেশের সংবাদপত্রগুলিও তাহাদের সেই অধিকার খর্ব্ব করার বিরুদ্ধে—ধর্ম্মসংস্থাপনের পুণ্যচেষ্টায়—তপ্ত তৈলকটাহের মত টগবগ করিতে থাকে। বিবাহিত স্ত্রীকে কুলের বাহির করিবার অধিকার—স্বাধীন প্রেমের অধিকার—আমরা একরূপে মানিয়া লইয়াছি। সম্প্রতি এমনই একজন স্বাধিকারপ্রমত্ত পুরুষপুঙ্গবকে একজন পরম নীতিবিদ্ ধর্ম্মাচার্য্য-সদৃশ মহাত্মাও যে ভাবে সম্মান করিয়াছেন তাহাতে প্রমাণ হয়, আমরা একরূপে সমাজধর্ম্মের তৃতীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। ঘরের মেয়েরা এতকাল কৌমারধর্ম্মকে সঙ্কুচিত করিয়া বয়সোচিত রূপরাগ-চর্চ্চার অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাদের যৌবনোন্মুখ হৃদয়কবাট ভাল করিয়া খুলিয়া দিবার জন্য নৃত্যকলা ও গীতবাদ্যবিষয়ক যে নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতির বিধান দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহা যেরূপ সর্ব্বমান্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এযুগের রঘুনন্দন যে একজন বড় বিধানদাতা এবং অধিকারবাদের সমর্থনে তাঁহার দিব্যদৃষ্টি যে কত উদার, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। নৃত্যগীতকুশলা কন্যকাগণ কোন্ স্বর্গে গৃহিণীপদ অধিকার করিবার জন্য দলে দলে অভিযান করিতেছেন তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি—কিন্তু তাহাতে কি? বিবাহের ভাবনায় ক্লিষ্ট হওয়া অপেক্ষা অভিভাবকগণ একটি নূতনতর ভাবের প্রেরণায় হৃষ্ট হইতেছেন; অনূঢ়া কন্যার পিতা হওয়ার যে দায়িত্ব তাহার গণ্ডি ভাঙিয়া দিয়া—কন্যাকে আশু পতিপুত্রবতী দেখিবার যে শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য তাহা না মানিয়া, তাহাকে কলাবতী করিবার যে অধিকার তাঁহারা পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের সামাজিক অধিকার বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপ কত শত অধিকারই না আমরা লাভ করিয়াছি! এই সকল অধিকারের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার জো নাই—যে বলিবে তাহার মত

অহঙ্কার, সঙ্কীর্ণতা, অভদ্র ও কুশিক্ষিত ব্যক্তি আর কে আছে? তাই সাহিত্যেও যে তারুণ্যের বা নবযৌবনের অধিকার দশ বৎসরের বালক হইতে পঞ্চাশ বৎসরের পুরুষ পর্য্যন্ত সমভাবে দাবি করিতেছেন, তাহাতেও সেই অনধিকারবাদ আজ একেবারেই অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। লেখাপড়া কিছুমাত্র না করিয়া, এবং সাহিত্যিক কোন সংস্কার বা সাধনা ব্যতিরেকেও, কাহারও সাহিত্যিক হইতে বাধে না, সকলেরই তাহাতে সমান অধিকার থাকাই বাঞ্ছনীয়; কারণ, সাহিত্য-প্রতিভা বন্য-বনজাত লতাগুল্মের ভেষজ-গুণের মত; উহারা আপনিই গজাইয়া থাকে—এবং এমন গুল্ম বা আগাছা নাই যাহার একটা না একটা মহৎ দ্রব্য-গুণ নাই। শুধু তাহাই নয়, যাহারা সেই আগাছা কাটিতে চায়, তাহারা শুধুই নীচ বা ক্রূরমনা নয়, তাহারা নিরতিশয় কৃপার পাত্রও বটে; কারণ যাহাকে তাহারা গুণহীন মনে করে, তাহাকেই যখন একটু পরিশ্রম করিয়া উচ্ছেদ করিতে চায়, তখন বুঝিতে হইবে তাহারা সেই সকল আগাছাকে শক্তিমান মনে করে। আগাছার বৃদ্ধি যে কিরূপ দুর্দান্ত তাহা না জানে কে? সেই জন্যই 'গো মা' কাব্যের ও বুদ্ধদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ধরনের যুক্তিও একজন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি সম্প্রতি এই অধিকারবাদ প্রসঙ্গে উত্থাপিত করিয়াছেন। সাহিত্যের সম্পর্কেও সাধিকারবাদ এমনই উগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

৯

কিন্তু 'ধান ভানিতে শিবের গীত' দীর্ঘ হইয়া পড়িল। আমি বলিতেছিলাম, এ জাতির এই চরম অধঃপতনের কথা—আসন্ন বিনাশের কালে সেই কথাই না ভাবিয়া পারিতেছি না। বলিয়া লাভ কি—এ প্রশ্নও বার বার মনে জাগিতেছে—তবু কেন যে বলিতেছি সে কথা হয়তো বুঝাইতে পারিব না। যিনি বুঝিবেন তিনি নিজেই বুঝিবেন। ধ্বংসই যদি হই, তথাপি, মানুষ আমরা—কেবল মৃত্যুভয়ে অবসন্ন হইতে চাহি না। সেই মহাভয়ের মধ্যেও, মনের অবস্থা যেমনই হউক, আমার একটা সাধনা চাই। সে সাধনা এই যে, জড়া প্রকৃতির নিয়ম যেমনই

অন্ধ হউক—তাহাতে সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায়ের কোন সম্পর্ক নাই থাকুক, মানুষের পক্ষে একটা আধ্যাত্মিক ন্যায়-অন্যায়ের নীতি আছে—সত্যকে লঙ্ঘন করার শাস্তি আছে। আজ এই মহাকালের মূর্তিতেই ন্যায়বান ঈশ্বরকে দেখিতেছি, মানুষের সংসার যে অরাজক নয় ইহাই অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছি। "He whom God smiteth hath God with him"—ইহাও বড় আশ্বাস নহে। তাই কম্পমান আত্মাও মুহূর্তের জন্য সকল ভয় ভুলিয়া বলিয়া উঠিতেছে—জয় হউক! তোমারই জয় হউক! সকল মিথ্যার উপরে সত্যের—সকল অন্যায়ের উপরে ন্যায়ের জয় হউক! জানি, তোমার উদ্যত ভীষণ দণ্ড এখনই এই মাথার উপরে পড়িবে, তথাপি তোমার ওই মহিমময় মূর্তি ক্ষণেকের জন্যও দেখিয়া লই—সে মূর্তি ভীষণ হইলেও সুন্দর, কারণ তাহার সেই নির্মমতাই সকল কল্যাণ ও সকল সুষমার মূল। তোমার ওই দণ্ড শুধু আক্রোশ নয়—আমার আত্মারও অভিপ্রেত, ওই দণ্ড সেই আত্মারই মান রাখিয়াছে।

আজ আর কোন সান্ত্বনা বা আশ্বাস নাই। আমি আমাদের পাপের কথাই স্মরণ করিয়াছি বটে, তথাপি এ বিশ্বাস করি যে আত্মার যত দুর্গতিই হউক—প্রায়শ্চিত্ত আছে, বিনাশ নাই। মিথ্যার স্তূপই বিরাট বটে, এবং ধ্বংসও সেই অনুপাতে হইবে; কিন্তু যাহা অবশিষ্ট থাকিবে—সত্যের সেই কণাটুকুও শক্তিবীজরূপে দুর্জয়। সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেখানে যে কয়টি ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া আছে তাহা হইতেই নূতন যুগের নূতন যজ্ঞানল প্রজ্বলিত হইবে, এবং হব্যভাগ গ্রহণ করিবার জন্য মানুষের মধ্যেই দেবতার অধিষ্ঠান হইবে।

তথাপি, আজ পাপ-স্বীকারের দিন আসিয়াছে—সত্যকে অন্ততঃ স্মরণ ও মনন করিবার দিন আসিয়াছে। যাহাদের সেটুকু চৈতন্য এখনও লোপ পায় নাই, তাহাদিগকে জাতির এইক্ষণের অবস্থা ধীরভাবে চিন্তা করিতে বলি—সে চিন্তাও কিঞ্চিৎ পরিমাণে পাপক্ষয় করিতে পারে। আমরা যে কতদূর অধঃপতিত হইয়াছি সে কথা স্মরণ করিয়া এখনও আত্মধিক্কার করিব না? এখনও প্রাণপণে মৃত্যু ও মিথ্যার সেবা করিতে

হইবে? এখনও ফাঁকি দিয়া চুরি করিয়া বড় হইতে হইবে—লুঠ করিয়া ধনী হইতে হইবে? এখনও মেকী বিদ্যা, মেকী চরিত্র ও মেকী খ্যাতির সাহায্যে লোক ঠকাইয়া কেবল বলি ভক্তি করিতে হইবে? এখনও চৈতন্য হইবে না? যাহাদের হইবে না তাহারা ধ্বংস হউক, তাহাতে দুঃখ করিবার কি আছে?—পৃথিবী ভারমুক্ত হইবে।

• • •

জানি, এই অপ্রিয় সত্য কাহারও রুচিকর হইবে না—কিন্তু আমি যে সারাজীবন কেবল অপ্রিয় সত্যই সকলকে শুনাইয়াছি—অতিশয় ভদ্র ও সভ্য সমাজে নিরতিশয় অভদ্রের মত ব্যবহার করিয়াছি। পথ ফুরাইয়া আসিতেছে, দিনও আর বেশি নাই, প্রার্থনা করি, যে-বিধাতা আমার ললাটে এই কঠিন সত্যভাষণের অসহ্য রাজটীকা লাগিয়া দিয়াছিলেন তিনি যেন এইবার আমাকেও মুক্তি দেন। যে পথে আমি চলিয়াছিলাম, সে পথে কেহই শেষ পর্যন্ত সঙ্গী হইতে পারে নাই। তাহাদিগের দোষ নাই, সকলেই সংসারে সমাজে থাকিয়া কঠোর সত্যের ভার বহন করিতে পারে না। আমিও পারি নাই—ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, সংসার ও সমাজের কাছে বহু প্রকারে অপরাধী হইয়াছি, এক কর্ত্তব্যের দায়ে বহু কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়াছি। সে দুষ্কৃতির সকল শাস্তি আমি অকাতরে বহন করিলাম, সেজন্য কোন অভিযোগ করিব না। কিন্তু যে জন্য আমি সাহিত্যের সাধনক্ষেত্রেও সুন্দরকে প্রণাম না করিয়া সত্যের আরাধনা করিয়াছি, আমার সেই সত্য যেমনই হউক—তাহার জন্য কায়মনোবাক্যে কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছি; ধনীর প্রসাদ, মানীর আদর, শক্তিমানের শক্রতা, বন্ধুর স্নেহ, ভক্তের উপাসনা সকলই তুচ্ছ করিয়াছি—তাহা বুঝিয়া কেহ আমার অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে দ্বিধাবোধ করে নাই। এখনও উচ্চাসনে বসিয়া আমাকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার লোকের অভাব নাই। ধর্ম্ম যে কি বস্তু, এবং কাহার ধর্ম্ম কি—এ সমাজে সে জিজ্ঞাসারও প্রয়োজন নাই; তথাপি মৌখিক উদারতার দম্ভকে পরাস্ত করিবার জন্য বিপক্ষেরা বুলি

আওড়াইতে কাহারও বাধে না। ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই যেখানে বিশ্বাসযোগ্য নয়, এবং সেই কারণেই কোনরূপ সত্যনিষ্ঠাও কর্ষার যোগ্য নয়—সেই সমাজে দীর্ঘকাল বাস করিয়া, কাহারও নিকটে পাগল, কাহারও নিকটে দুর্জন, কাহারও নিকটে আত্মম্ভরী—প্রভৃতি নানা সুনাম অর্জন করিয়াছি, কিন্তু তাহাতেও বিচলিত হই নাই। কারণ আমি একটা ভাবের ঘোরে—যেন নেশায় আচ্ছন্ন 'ছিলাম; সদ্য-অতীত যে যুগ, সেই যুগের কথা স্মরণ করিয়া এই জাতির ভবিষ্যৎ গৌরবের ধ্যান করিয়াছি, এবং বর্ত্তমানের যাহা কিছু তাহাকে একটা ঘোরতর ব্যাধির লক্ষণ বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছি। তাই এই সমাজের মুখ চাহিয়া আমি যেমন কিছুই করি নাই, তেমনই, তাহার নিন্দা-পুরস্কারে ভ্রূক্ষেপ করি নাই। একদিন এই জাতির মধ্যেই যে শক্তির স্ফুরণ হইয়াছিল—আধুনিক ভারতের ইতিহাসে তাহার কাহিনী অমর হইয়া আছে। এই বাঙালী জাতিই যে সারা ভারতের গুরু হইবে একদিন তাহার সূচনা নিঃসংশয় হইয়া উঠিয়াছিল, এই জাতির মধ্যেই মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই জাতিরাই সন্তান একদা স্বর্গ হইতে অমৃত হরণ করিয়া প্রকাশ্যে তাহা বণ্টন ও পান করিয়াছিল। সে যুগের সে কাহিনী এখন স্বপ্নে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সে স্বপ্নও আর সকলের ভাঙিয়াছে, কেবল আমারই ভাঙে নাই; আমি স্বপ্নচরণ-রোগীর মত সেই স্বপ্ন চক্ষে লইয়া জাগ্রতের ন্যায় বিচরণ করিয়াছি, সেই অতীতের আলোকেই ভবিষ্যতের ধ্যান করিয়াছি। আমার সাহিত্যসাধনার মূলে সেই আশ্বাস ছিল—আমি সেই ভবিষ্যৎবংশীয়গণের জন্যই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদর্শ এবং জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয়টিকে মলিনতামুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম। এই সাধনাই আমার ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধনা হইয়া উঠিয়াছিল, তাই বর্ত্তমানের কোন আঘাতই আমাকে বিচলিত করে নাই, এবং সে সাধনায় দুঃখ পাইতে যেমন কাতর হই নাই, দুঃখ দিতেও কুণ্ঠিত হই নাই। সত্যকে গোপন করিয়া বা মিথ্যার দ্বারা তাহাকে মনোহর করিয়া, কাহারও মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারি না বলিয়াই—যে-সমাজের

সর্ব্ব অঙ্গ মিথ্যার কর্দমলিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই সমাজে সামাজিক ব্যবহার বা সৌজন্য আমি নির্দ্দয় চিত্তে অস্বীকার করিয়াছি। ইহাই আমার অপরাধ। আজ সে অপরাধের হেতুও মিথ্যা মনে হইতেছে। আজ সকলই মিথ্যা—কেবল মহাকালের ঐ ভীষণ ভ্রূকুটিই সত্য। তাই আজ আমি আমার সকল অপ্রিয় সত্যের বোঝা নামাইয়া দিলাম, সেই সঙ্গে যদি পাপের বোঝাও নামাইতে পারিতাম!

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বাইশে শ্রাবণ

বাণীর রঙ্গমঞ্চে আশিটি বছর ধরি যে আছিল রাজ-ভূমিকায়,
নির্দিষ্ট শ্রাবণ-দিন, মৃত্যুর ইঙ্গিতে তব হ'ল তার নেপথ্য-বিদায়,
দিনের রঙ্গমঞ্চে উদ্ভাসিত চক্ষুকে ঝলিত যে সূর্য্য-রশ্মিরাজ
নিশীথের অন্ধকারে তাহারই তারকাদীপ্তি—বাইশে শ্রাবণ, তব দান।
হে উদ্ভ্রান্ত, তুমি আজ তব পঞ্জিকার পাতে অক্ষয়িত একটি দিবস,
কঠিন মৃত্যুর স্পর্শে দিয়ে, জেনেও যত ডেকে আছ বক্ষের পরান,
অনাগত ভবিষ্যতে উৎসব-আবেগ রহিবে চিরন্তনী তোমার স্মরণ—
এ তব দিন স্ব-বীথি হাসি আর কলতানে আজি হবে নিত্যবিকাশ।
যাহারে স্মরণ করি তুমি হবে চিরজীবী, অনাবৃত বাইশে শ্রাবণ,
তাঁহার বিস্তারেখা যতদিন রবে বুকে ততদিন তোমারে দিলাম—
হৃদয়ের চম্পকুলে যে বাণ হানিল তাঁর সে নিখিল অমর-জীবন,
মহৎ-জীবনে এঁকে টানিলে সমাপ্তিরেখা, সাহসী, তোমারে নমস্কার।

মহাস্থবির জাতক

(পূর্বানুবৃত্তি)

আমাদের বাল্যকালে কলকাতার অধিবাসী প্রায় সকল বাঙালীর বাড়িতেই হিন্দুস্থানী চাকর থাকত। এদের সাধারণত 'বেহারা' বলা হ'ত। এরা বেশির ভাগই আসত বিহারের গয়া, ছাপরা, ত্রিহুত প্রভৃতি জায়গা থেকে—তখন বিহার বাংলা দেশেরই অন্তর্গত ছিল। পাঁচ টাকা থেকে আরম্ভ ক'রে আট টাকা ছিল এদের মাইনে। এরা বাঙালীর হেঁসেলে খেত না, কারণ তখনকার দিনে পাঞ্জাব ছাড়া সারা ভারতবর্ষের লোক বাঙালীকে ম্লেচ্ছ জ্ঞান করত। সেই মাইনেতে তারা নিজেরা দু-বেলা রেঁধে খেত, কাপড় পরত আর দেশেও টাকা পাঠাত।

আমাদের ঘরে শাপভ্রষ্ট হয়ে যে মহাপুরুষ এসেছিলেন, তাঁর নাম ছিল দুখিয়া। আমরা তাঁকে 'দুঃখী' ব'লে ডাকতুম। দুঃখের এমন জীবন্ত প্রতিমূর্তি আমি আজও দেখি নি। সে বেচারী ছিল বুড়ো আর রাতকানা। রাত্রিবেলা সে পা ঘেঁসটে ঘেঁসটে চলত। আমরা দূর থেকে বুঝতে পারতুম দুঃখী মহারাজ আসছেন। মার কোনও বকুনি ধমকানির জবাব সে দিত না। তার মাইনে ছিল ছ টাকা। তা থেকে প্রতি মাসে সে তিনটি টাকা দেশে পাঠাত—ছাপরা জেলার কোন এক গ্রামে, যেখানে তার বুড়িয়া 'বহু' আর ছেলেরা থাকে।

একটা সিঁড়ির তলায় সে থাকত। আর থাকত তার একটি পোঁটলা আর সেইখানেই তোলা-উনুনে তার রান্নাবান্না চলত।

রাত্রিবেলা সব কাজকর্ম সারা হয়ে যাবার পর আমি আর অস্থির মাঝে মাঝে সবার অগোচরে এই সিঁড়ির তলায় তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হতুম। আমাদের তিনজনের সেখানে জমাট আসর জমত। অতিমৌন দুখিয়া আমাদের কাছে মুখর হয়ে উঠত। তার দেশের কত রকম গল্প করত।

পেতলের কানা-উঁচু থালায় যেখানে তিষ্ঠুতে পারে না এমনই ভাতের পর্ব্বতের ওপর খানিকটা অড়র-ডাল লেহ ঢেলে দুখিয়া শপশপ আওয়াজ ক'রে খেত আর আমরা দু-ভাই বলাবলি করতুম, বেড়ে ডিনার চলেছে।

দুখিয়ার সেই দুঃখী-ডিনার দেখে আমাদের দুঃখ হ'ত। আমরা বলতুম, দুখিয়া, তুই আমাদের সঙ্গে খাস না কেন?

ও বাবা, জাত যাবে!

জাত যাওয়ার ব্যাপার আমাদের সমাজে চলন ছিল না, কাজেই ও জিনিসটার গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারতুম না। আমরা ভাবতুম, এই বুদ্ধি না হ'লে ও আর চাকর হয়েছে!

যা হোক, তবুও দুখিয়া ছিল আমাদের পরম বন্ধু। কত 'প্রাইভেট' কথা যে তার সঙ্গে হ'ত, তার ঠিকানা নেই।

হঠাৎ একদিন কি কারণে দুখিয়ার চাকরি চ'লে গেল। সেদিনটি আজও আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে।

একদিন ইস্কুল থেকে ফিরে শুনলুম, দুখিয়ার চাকরি গেছে। দুই ভাইয়ে একেবারে খ'মে গেলুম। অনধিকার চর্চা ক'রে বললুম, কেন মা, দুখিয়া তো বেশ লোক।

মা বললেন, না বাবা, ও বুড়ো হয়ে পড়েছে, খাটতে পারে না—আমিও সামলাতে পারি না।

বুড়ো হয়ে খাটতে না পারার অপরাধের গুরুত্ব সেদিনও বুঝি নি, আজও বুঝতে পারি না।

সে রাত্রে আমরা যখন দুখিয়ার ডিনারের সময় তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম, তখন সে সেই পেতলের কানা-উঁচু থালায় ঘরের ছাতু মেখে খাচ্ছিল। দুখিয়া বললে, কাল ভোরে উঠেই সে চ'লে যাবে, তাই আজ আর রান্নার হাঙ্গামা করে নি।

আমরা তাকে অনেক কথা বলতে লাগলুম—দুখিয়া তুই যাস নি, কোথায় যাবি আমাদের ছেড়ে, ইত্যাদি।

ছাতু গিলতে গিলতে সে মাঝে মাঝে আমাদের দিকে চাইতে

লাগল। দেখলুম, ছুখিয়ার রাতকানা চোখ দুটো কথা বলতে বলতে সজল হয়ে উঠছে।

সকালবেলা ছুখিয়া তার ছোট পুঁটলিটা পিঠের সঙ্গে বেঁধে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে গেল। আমি আর অস্থির তার পেছনে পেছনে রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম। দেখতে দেখতে আমাদের চোখের সামনে রাস্তার জনস্রোতে ছুখিয়া ডুবে গেল।

অপস্রিয়মান ক্লান্ত ছুখিয়া-মূর্তি আজও মনের মধ্যে ঝকঝক করছে। তার কথা স্মরণ ক'রে রাত্রে বিছানায় শুয়ে কতদিন কেঁদেছি, তার ঠিকানা নেই। মনের এ বোঝা কারুর কাছে নামাবার উপায় নেই। না বাড়িতে, না ইস্কুলের বন্ধুবান্ধবীদের কাছে। এ দুঃখ অনুভব করবার শক্তি যে অভাগা বালকের আছে, সে ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারবে না। বাল্যকাল সুখের কালই বটে!

যাক, আবার বাল্যকালের ইস্কুল-জীবনে ফিরে যাই। আগেই বলেছি, আমাদের ক্লাসে দুজন শিক্ষয়িত্রী পড়াতেন। একের নম্বর ছিলেন কিছু বেশি কঠিনা। দ্বিতীয়াও কঠিনা কম ছিলেন না, তবে একের নম্বরের তুলনায় কিছু কম। ইস্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় ঘণ্টায় দুই নম্বরের শিক্ষয়িত্রী আমাদের অঙ্ক আর ইংরেজী শেখাতেন। ক্লাস বসলেই সর্বপ্রথম কাজ ইংরেজী হাতের লেখা দেখানো। একদিন তিনি হুকুম দিলেন—কাল থেকে সবাই রুল-টানা এক্সারসাইজ বুক হাতের লেখা লিখে আনবে।

বাড়িতে বাবার কাছে এক্সারসাইজ বুকের কথা বলতেই বাবা বললেন, না না, ওসব বিলাসিতা চলবে না। কেন, বালির কাগজ কি খারাপ? বিদ্যাসাগর মশায়, কি গুরুদাস বাঁড়ুজ্জে লেখাপড়া শেখেন নি! সেই কেরী সাহেবের আমল থেকে এই কাগজে লিখে বাঙালী মানুষ হ'ল আর আজ বাবুর এক্সারসাইজ বুক চাই! ইস্কুলে বলবে, বাবা বলেছেন, এ রকম বিলাসিতা করা ঠিক নয়।

তাঁদের ছেলেবেলা তাঁরা কত কষ্টে কাগজ যোগাড় করতেন, তারও একটা ফিরিস্তি শুনতে হ'ল।

পরের দিন সব ছেলেমেয়েই এক্সারসাইজ বুকে হাতের লেখা লিখে নিয়ে এল। সবার দেখে শিক্ষয়িত্রী হাঁকলেন, কই খুকির, হাতের লেখা দেখালি নি? তোমায় না ডাকলে বুঝি মনে থাকে না?

অগত্যা সেই বালির কাগজের খাতা নিয়েই হাজির হলুম। শিক্ষয়িত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, এক্সারসাইজ বুক কোথায়?

বিলাসিতা সম্বন্ধে পিতৃপ্রদত্ত উপদেশগুলি উদ্গার করব কি না ভাবছি, ইতিমধ্যেই কর্ণে আকর্ষণ অনুভব করলুম। দু-তিনটি মধ্যম রকমের টিপুনি পড়তেই কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হলেন। ব'লে ফেললুম, বাবা বলেছেন, এই খাতাটা শেষ হয়ে গেলে তারপরে এক্সারসাইজ বুক কিনে দেবেন।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই শুনে আসছি—সদা সত্য কথা কহিবে; সত্য বিনা কদাচ মিথ্যা কহিবে না। বাল্যজীবনে সেই সূত্র অনুসরণ ক'রে যদি চলতুম, তা হ'লে বাড়িকো এই সত্য বলবার অবকাশই ঘটত না। কর্ণমর্দনের ফলে টপ ক'রে কিছু বানিয়ে ব'লে ফেলার প্রতিভা সেই দিন থেকে যে আমার খুলে গেল, তারই কৃপায় ভবিষ্যতে অনেক সাংঘাতিক বিপদের হাত থেকে ত্রাণ পেয়েছি। এর জন্যে কার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব? পিতার কাছে? আমার কর্ণ-বিমর্দিনীর কাছে? না সৃষ্টির আদিমতম যুগ থেকে আত্মরক্ষার যে নীতি অপ্রতিহতরূপে ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে, তার কাছে?

মাসখানেক বাদে আবার যেদিন বালির কাগজের নতুন খাতায় হাতের লেখা নিয়ে উপস্থিত হলুম, তখন আমার শিক্ষয়িত্রী ক্ষেপে গিয়ে মহা চীৎকার শুরু ক'রে দিলেন।

একটা বড় মার্বেল পাথরের ঠাকুরদালানে আমাদের ক্লাস বসত; আমাদের পাশেই সেই দালানে আর একটা ক্লাসও বসত। আমার শনি-মহারাজ বোধ হয় সে সময় বক্রগত ছিলেন। কারণ সেই ক্লাসে তখন আমাদের একের নম্বরের শিক্ষয়িত্রী পড়াচ্ছিলেন। দুয়ের নম্বরের চীৎকার ও চটাপট চপেটাঘাত শুনে তিনি সহসা দেহের মতন মন্থর গমনে আমাদের ক্লাসে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে?

ভূতো নবর উত্তর দিলেন, দেখ দিকিন! এ ছেলেকে নিয়ে আমি কি করব? একটা কথা শোনে না! আজ এক মাস ধ'রে একে দিয়ে একখানা এক্সারসাইজ বুক কেনাতে পারলুম না!

একেবারে নবর অগ্রসর হয়ে বললেন, কিসসু হবে না এর, দেখে নিও। আমার হাতে পড়লে দু দিনে সিধে ক'রে দিতুম।

বলা বাহুল্য দৈনিক তিন ঘণ্টা ক'রে তিনি আমায় সিধে করবার চেষ্টা করতেন এবং প্রতি কর্ণমর্দন এবং চপেটাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করতেন—কিসসু হবে না এ ছেলের, আমি ব'লে দিচ্ছি লিখে রাখ তোমরা, কিসসু হবে না এর।

হে অসাধারণ ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টিসম্পন্না দেবি! মর্ত্যপুরুষশিক্ষকরূপে প্রতিরূপী হে অমর্ত্যলোকবাসিনী বিদেহী! আপনার ভবিষ্যবাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। আমার কিসসুই হয় নি। কিসসু হবে কি ক'রে? যে শিশুর জীবনযাত্রা শুরুই হ'ল মেরে-চড় খেতে খেতে, তার ভবিষ্যৎ জীবন যে কেবল চুম্বন ও আলিঙ্গনেই ভ'রে উঠবে না, সে তো জানাই কথা।

এই ব্যাপারের পর প্রায় তিন মাস অর্থাৎ পুজোর ছুটির কিছু আগে পর্যন্ত প্রতিদিন ইস্কুলের প্রথম ঘণ্টায় আমার জন্য রকমারি শাস্তি তোলা থাকত। দ্বিতীয় বার বাবার কাছে এক্সারসাইজ বুক চাইবার সাহস হ'ত না। আবার বাবা যা বলেছেন, তা ইস্কুলে বলবার সাহস হ'ত না। প্রতিদিন অতি ক্ষুণ্ণমনে নিরুৎসাহিত চিত্তে ইস্কুলে গিয়ে শাস্তির জন্য অপেক্ষা করতুম। শাস্তির ঘণ্টা পার হয়ে গেলে (অবশ্য শাস্তি পেয়ে) তবে শান্তি পেতুম।

যে ছেলে প্রতিদিন ইস্কুল বসতে না বসতেই শাস্তি পায়, তার সুনাম থাকে কি ক'রে! এরই মধ্যে একটা দিনের কথা কষ্টিপাথরে সোনার দাগের মতন মনের মধ্যে আজও ঝকঝক করছে।

আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল খ্রীষ্টানদের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি মিশন। এখানে থাকতেন পাদ্রী ব্রাউন সাহেব। অতিশয় মহাজন ছিলেন এই রেভারেণ্ড ই. এফ. ব্রাউন। দুনিয়ার লোকের সঙ্গে ছিল

তাঁর প্রেমভাব। তিনি যখন রাস্তা দিয়ে চলতেন, রাজ্যের ছেলেরা তাঁকে ঘিরে চলতে থাকত। তিনি তাঁর পাদ্রীর জোব্বার দুই পকেট থেকে ছবিওয়ালা কার্ড বের ক'রে ক'রে তাদের বিলোতেন। পথ দিয়ে চলতে চলতে বারান্দার ওপর থেকে কিংবা অন্য ফুটপাথ থেকে কেউ ডাক দিলে, তিনি সেইখানে দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে তাদের সঙ্গে বাংলায় আলাপচারী করতে থাকতেন।' চেনা লোক দেখলেই, সে ছেলেই হোক কি বুড়োই হোক, তাকে জড়িয়ে ধ'রে দু গালে চুমু খেয়ে ভালবাসা জানাতেন। মনে আছে, একদিন খাটা-পায়খানার মেথরকে চুমু খেয়েই আমাদের দুই ভাইকে চুমু খাওয়ামাত্র আমরা বাড়িতে ফিরে আধ ঘণ্টা ধ'রে সাবান দিয়ে মুখ ধুয়েছিলুম।

দাদা, আমি আর অস্থির সাহেবকে 'দাদা' ব'লে ডাকতুম। তিনিই 'দাদা' ব'লে ডাকতে শিখিয়েছিলেন। অন্য লোকের চাইতে সাহেবের সঙ্গে আমাদের পরিবারের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠতর। তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন এবং আমাদের মার সঙ্গেও গল্পগুজব করতে তাঁকে দেখেছি।

আমাদের পরিবারের সঙ্গে ব্রাউন সাহেবের ঘনিষ্ঠতার একটু কারণ ছিল। কারণটা বলি—

আমার জ্ঞান সঞ্চার হবার কিছু পূর্বে সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের ঠিক সামনে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের ওপরেই একটি নারীহত্যা হয়েছিল। মন্দিরের ধারের সরু গলির মধ্যে অনেক ব্রাহ্ম-পরিবার বাস করতেন। এই সব পরিবারের অনেক মেয়ে বেথুন কলেজে অথবা মিস নীলের ইস্কুলে পড়তে যেতেন। হেদোর সামনে যে গির্জা আছে, তারই সংলগ্ন ছিল মিস নীলের ইস্কুল। সে ইস্কুলের প্রকাণ্ড বাড়ি এখন বেথুন কলেজ কিনে নিয়েছে।

মিস নীল ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিয়ে বিলেতে চ'লে যাবেন, সেই উপলক্ষ্যে সেদিন সন্ধ্যেবেলায় ইস্কুলে ছিল জলসা। ব্রাহ্ম-পাড়া থেকে মিস নীলের ছাত্রীরা গিয়েছিলেন সেই উৎসবে যোগ দিতে। রাত্রে ইস্কুলেরই বাস-গাড়িতে তাঁরা বাড়ি ফিরলেন। সমাজ-পাড়ার সামনে

গাড়ি দাঁড়িয়ে—মেয়েরা একে একে নেমে যাচ্ছে, এমন সময় আততায়ীরা এসে একটি মেয়েকে হত্যা করে। মেয়েটি ছিল হিন্দুঘরের বিধবা। 'নব্যভারত'-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর গৃহে আশ্রিতা এবং সেইখানে থেকেই সে লেখাপড়া শিখছিল। কেন এই মেয়েটিকে হত্যা করা হ'ল, হত্যাকারী কারা—সে এক অন্য ইতিহাস।

আমার বাবার সে সময় ছিল চামড়ার কারবার। বেশ সমারোহের সঙ্গে কারবার চলছে। ব্রাহ্মণসন্তান চামড়ার কারবার করেছেন, এই গৌরবে তাঁর সঙ্গে শহরের মধ্যে বেশ প্রতিষ্ঠাও হয়েছে। এমনই সময় এক রাত্রে কাজকর্ম সেরে বাড়িতে ফিরে রাত্রি প্রায় দশটার সময় আহারে বসেছেন, এমন সময় নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে নারীকণ্ঠের করুণ চীৎকার উঠল—বাবা গো, মেরে ফেললে!

বাবা খাওয়া ফেলে এঁটো হাতেই ছুটে রাস্তায় গিয়ে দেখলেন, তিনজন লোক মিলে একটি মেয়েকে রাম-দা দিয়ে কোপাচ্ছে। রাস্তায় অন্য লোকজন, এমন কি একটি পাহারাওয়ালা পর্যন্ত, নেই—দুয়ার বন্ধ ভবনে ভবনে। শুধু বাস-গাড়ির ঘোড়া দুটো অবাক হয়ে মানুষের এই কীর্তি দেখছে।

বাবা এই দৃশ্য দেখে তখুনি তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মেয়েটিকে উদ্ধার করবার জন্যে। বারান্দার ওপর থেকে যাঁরা এই দৃশ্য দেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু-তিনটি মহিলার কাছে আমরা শুনেছি যে, চোর-চোর খেলার মতন দুই ফুটপাথে সেই মেয়েটিকে নিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'রে দৌড়োদৌড়ি হতে লাগল। কখনও বা তাদের কাছ থেকে মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিয়ে বাবা বাড়ির দিকে দৌড় দেন, কখনও বা তারা তিনজনে তাঁর কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নেয়। রাস্তায় রক্তস্রোত বইছে, এমন সময় একটা লোক এসে বাবার মাথায় মারলে এক রাম-দা'র কোপ। হাতের কাছে পেয়ে তিনি তখুনি তাকে তুলে মারলেন এক আছাড়। লোকটা আঘাত পেয়ে সেইখানেই অর্ধমূর্ছিত হয়ে পড়ে রইল। মাথায় তখনও রাম-দাখানা গেঁথে ব'সে আছে, সেই অবস্থাতেই মেয়েটির দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, এমন সময় আর একটা

লোক এসে তাঁর মাথা থেকে রাম-দাখানা সাঁ ক'রে টেনে নিলে। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে একটি চপেটাঘাত পড়ল, যার ফলে চোখের কতগুলো শিরা তার ছিঁড়ে গেল এবং তারই যন্ত্রণায় হাসপাতালে গিয়ে সেই রাত্রেই সে মারা পড়ে।

আততায়ীরা দুজন রাম-দাখানা নিয়ে পালিয়ে গেল। মেয়েটি ফুটপাথের ওপরে প'ড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল। হতভাগিনীকে দুর্বৃত্তেরা চব্বিশ ঘা কোপ মেরেছিল।

বাবার মাথার মধ্যিখান থেকে ডান চোখের ভুরু অবধি একেবারে দুখানা—বাক্‌শক্তি তাঁর রহিত হয়ে গেছে, ডান চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। মেয়েটিকে মাটি থেকে তুলছেন আর ঘুরে ঘুরে আছাড় খেয়ে পড়ছেন।

কল্পনার চোখে একবার সে দৃশ্য দেখবার চেষ্টা করুন। ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা শহরের কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের ওপরে একটি মৃতকল্প নারীকে একজন মরণাপন্ন আহত যুবকের অস্থির-সাহায্যের সেই বিফল প্রয়াস! এমনই সময় মিস নীল হেদোর ধার থেকে দৌড়তে দৌড়তে এসে সেখানে উপস্থিত হলেন। খুনের ব্যাপার আরম্ভ হতেই সহিস-কচুয়ানেরা গাড়ি ফেলে দৌড় মেরেছিল। তারাই মিস নীলকে গিয়ে খবর দেয়।

মিস নীল মেয়েটিকে বাসে তুলে নিয়ে হাসপাতালে চ'লে গেলেন, আর বাবা চললেন হেঁটে মেডিকেল কলেজের দিকে। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর পাড়ার এক হিন্দুস্থানী খাবারের দোকানের লোকেরা তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে ধ'রে বাড়িতে নিয়ে এল। তার কিছু পরে পাড়ার লোকেরা এসে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

এর পরের অধ্যায়টা তত কল্পনাপ্রদ নয়। চারিদিক থেকে বাবার নামে চিঠি প্রশংসাপত্র ইত্যাদি আসতে শুরু হয়ে গেল। মার নামে চিঠি আসতে লাগল—এমন বীরের পত্নী তিনি, তাঁর মতন ভাগ্যবতী আর কে আছে!

আট দশটা ঘড়ি ও মেডেল তো আমরাই দেখেছি।

বাবার যেমন বড় কারবার, তেমনই বড় লেনদেনও ছিল। পাওনাদারেরা মিলে ব্যবসা, মালপত্র, জমিজমা কেড়ে নিলে। কি ক'রে যে কি হ'ল, মা তা বুঝতেও পারলেন না। তিনি তখন অন্তঃসত্ত্বা, তার ওপরে স্বামী-চিন্তায় তাঁর অন্য কোনও জ্ঞানই ছিল না। প্রায় চল্লিশ দিন পরে বাবা প্রথম চোখ চাইলেন ও প্রায় ছ মাস পরে তিনি বাক্‌শক্তি ফিরে পেলেন।

ইতিমধ্যে প্রশংসাপত্র রোজ আসতে থাকে বিশ-পঞ্চাশখানা—সংসার অচল। দাদাকে ও আমাকে আমাদের অন্ত দা অর্থাৎ দিদিমা নিয়ে গেলেন। আত্মীয় যাঁরা, তাঁরা বাবা ব্রাহ্ম হওয়ার জন্য বিষম বিমুখ। অমিত্রনীরদের ঘনঘটায় 'পথ বিজন অতি ঘোর', এমনই দুর্দিনের এক সকালে মার নামে একখানা চিঠি এল। খাম খুলে দেখা গেল, তার মধ্যে একশো টাকার একখানি নোট আর একখানি ছোট্ট চিঠি—ইংরেজী ভাষায় লেখা। পত্রপ্রেরকের নাম-ধাম কিছুই লেখা নেই।

বাবা সেরে উঠতে অর্থাৎ চ'লে ফিরে বেড়াতে প্রায় দেড় বছর সময় লেগেছিল। এই সময় একদিন ব্রাউন সাহেব বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কথায় কথায় প্রকাশ পেল যে, সেই একশো টাকার নোটখানা তিনিই পাঠিয়েছিলেন। ব্রাউন সাহেবই চেষ্টা ক'রে সরকারী আপিসে বাবার চাকরি ক'রে দিয়েছিলেন। এই চাকরির মেয়াদ শেষ ক'রে পেন্‌শন ভোগ করতে করতে তাঁর ইহলীলা সাঙ্গ হয়েছে। এই ব্রাউন সাহেব অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের পরিবারের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। বাবা, মা ও আমাদের তিন ভাইকে যে তিনি কত স্নেহ করতেন, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারা যায় না।

আমাদের তিন ভাইয়ের বিনা অনুমতিতে দোতলা থেকে একতলায় নামবার হুকুম ছিল না বটে; কিন্তু ব্রাউন সাহেবের বাড়ি গেলে বাবা কিছু বলতেন না। দাদা রোজ সেখানে যেত ফুটবল খেলতে। অক্সফোর্ড মিশনের পেছনে খানিকটা খালি জমি প'ড়ে ছিল, যেখানে এখন অক্সফোর্ড মিশন হস্টেল হয়েছে, এই জমিতে

ছেলেদের খেলা হ'ত। দাদা রোজ সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে ফিরে আমাদের কাছে খেলার নানা কায়দা দেখাত ও বোঝাত। একবার কি একটা অপরাধে দাদার অক্সফোর্ড মিশনে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

মিশনে যাওয়া বন্ধ হ'ল ব'লে খেলা বন্ধ হ'ল না। আমাদের ফুটপাথেই পাশাপাশি কতকগুলো বড় কাঁঠগাছ ছিল (তার একটাও আজ নেই)। তখন বর্ষাকাল। দাদা নিত্য কোন সুযোগে বিকেল-বেলা চট ক'রে একবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে একরাশ কদম নিয়ে আসতে লাগল। এই কদম দিয়ে প্রতিদিন দোতলার ওপরকার নেড়া ছাদে আমাদের তিন ভাইয়ের ফুটবল খেলা শুরু হয়ে গেল। দাদা থাকত একা এক দিকে, আমি আর অমিয় আর এক দিকে।

খেলা খুবই জ'মে উঠতে লাগল। দাদা রোজ আমাদের 'ক্যারি', 'ডজ', ড্রিব্লিং সব নতুন নতুন প্যাঁচ শেখাতে লাগল। শেষকালে একদিন মোক্ষম প্যাঁচ শেখালে—"পুশ"—Push।

পুশটা কিন্তু জমল সবচেয়ে বেশি। দাদা আমায় লাগায় পুশ, আমি দাদাকে লাগাই পুশ—এই রকমে প্রতিযোগিতা বাড়তে বাড়তে দাদা একবার আমায় এমন একটি পুশ লাগালে যে, আমি ঠিকরে প'ড়ে একেবারে আলসে থেকে বেরিয়ে পড়লুম। দাদা তখুনি ছুটে এসে আমার পা দুটো ধ'রে ফেললে। আমার মাথাটা নীচু দিকে, পা দুটো দাদার হাতে, ফুটপাথ থেকে প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচুতে শূন্যে ঝুলতে লাগলুম। দাদার সঙ্গে অমিয়ও এসে যোগ দিলে। দুই ভাই মিলে টানাটানি ক'রে আমাকে ওপরে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তাদের সাধ্য কি! তখন আমায় মধ্যাকর্ষণে টেনেছে—তারা তো তখন বালক,—কতটুকু শক্তি তাদের!

আমার কিন্তু আলসের ধারে পড়ামাত্র প্রায় সংজ্ঞালোপ হয়েছিল। স্বপ্নের মতন বোধ হচ্ছিল, যেন দাদা আর অমিয় আমার পা ধ'রে টানাটানি করছে। কিছুক্ষণ সেই ভাবে ঝুলে থাকবার পর তাদের হাত ফসকে একেবারে রাস্তায় এসে পড়লুম।

রাস্তায় পড়লুম বললে ঠিক বলা হবে না। পড় বলে এক ব্যক্তি

আমার কাছে প্রভূত ঋণ ক'রে স'রে পড়েছিল। সেই আমার জন্মান্তরের খাতক সে সময় আমাদের বাড়ির ধার দিয়ে গুটি গুটি চ'লে যাচ্ছিল—আমি এসে পড়লুম তার পিঠের ওপরে।

আমার যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখলুম, উঠোনে বসিয়ে আমার মাথায় বালতি বালতি জল ঢালা হচ্ছে আর মা ছুটে আসছেন। আমি 'মা' ব'লে চীৎকার করতেই তিনি আমায় কোলে তুলে ওপরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

তারপরে মার কান্না, বাবার চেঁচামেচি, ডাক্তার ডাকাডাকি ইত্যাদি।

আমার সেরে উঠতে বোধ হয় দিন দুয়েক সময় লেগেছিল। ছাত থেকে পড়বার সময় বারান্দার রেলিঙে বাঁ পায়ের হাঁটুটায় চোট লেগেছিল। দিন দুয়েক মালিশ-টালিশ করতেই ভাল হয়ে গেল। ঠিক চার দিনের দিন আবার কালির কাগজের খাতায় হস্তলিপি নিয়ে ইস্কুলে গিয়ে হাজির হলুম।

প্রথম ঘণ্টায় যথারীতি দুই নম্বরের শিক্ষয়িত্রী সবার হাতের লেখা দেখে নাম-সই ক'রে দিলেন। প্রতিদিন কার্য্যারম্ভেই যে হতভাগা তাঁর মেজাজ বিগড়ে দেয়, সে না থাকায় হয়তো মনটা তাঁর খুশিই ছিল। 'রয়েল রিডার খণ্ড নং ১'-এর গোড়ার গল্প খুলে পড়াতে গিয়ে আমার দিকে চোখ পড়তেই তিনি বললেন, কে রে, স্থবির এসেছিস! আয় আয়, এদিকে আয়।

এ যেন একেবারে অন্য কোন লোক! আমি ধীরে ধীরে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে স্নেহার্দ্র স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছিস?

ভাল আছি।

তিনি আমাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে সস্নেহে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলেন, কাল তোর মার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি কত দুঃখ করতে লাগলেন। তোর নাকি আরও দাদা আছে, আর ছাতে উঠিস নি—ইত্যাদি কত কি যে বলতে লাগলেন, বিস্মৃতির

অতল সাগরে সে সব কথা তলিয়ে গেছে। শুধু মনে আছে, তাঁর স্নেহের সেই স্পর্শ, তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে আমার সুখদুঃখের প্রতি গভীর সহানুভূতি আমার মর্মে গিয়ে আঘাত করতো দুই চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনমাসব্যাপী প্রতিদিনের সেই পীড়নের ইতিহাস অশ্রুজলে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। কুকুর যেমন নিঃশব্দে মনিবের আদর গ্রহণ করে, তাঁর স্নেহের পরশ আমি তেমনই ক'রে উপভোগ করতে লাগলুম। কত কথা, কত কৃতজ্ঞতা সেই শিশুমনের মধ্যে গুমরে গুমরে দুলতে লাগল, তা কোন দিন প্রকাশ করবার অবকাশ পাই নি। আজ সময়ের সঙ্গে তাঁর সেই ঋণ স্বীকার করছি।

আমার আরও ফাঁড়া আছে—এ কথাটা যে কেমন ক'রে বাড়ির লোক জানতে পারলে জানি না। রাস্তায় বেরুনো বন্ধ তো ছিলই, এই ঘটনার পর ছাতে ওঠাও আমাদের বন্ধ হয়ে গেল। পূজোর ছুটির সময় পাছে সারাদিন দুরন্তপনা ক'রে বেড়াই, সেই ভয়ে ছুটি হতে না হতে আমাকে মার সঙ্গে চালান ক'রে দেওয়া হ'ল পূর্ববঙ্গের এক গ্রামে। আমার তত্ত্বাবধানের জন্যে বেনীসিং দরওয়ান চলল আমার সঙ্গে।

এই ছ বছর বয়সে বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হ'ল। এর আগে কলকাতার আশেপাশে দু-একটা বাগানবাড়ি দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। পল্লীগ্রামে এসে আমার মনে হ'ল, আমি যেন প্রকাণ্ড একটা বাগানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আহা! আহা! কি মজা! কি মজা! শিশুচিত্তের সে উল্লাস আমি কি ভাষায় বর্ণনা করব! আজকের পল্লীমাতার অঙ্গ দুর্গন্ধে ভ'রে উঠেছে, কিন্তু সেদিন প্রথমেই আমার আকর্ষণ করেছিল পল্লীগ্রামের সেই গন্ধ, যা শহরে দুর্লভ। দিনের বেলায় কত ফুল চারিধারে ফুটে থাকে। কি বিচিত্র রং ও রেখার কারিগরি! তাদের নাম জানি না, কিন্তু দেখামাত্র মনে হয়, কত দিনের পরিচয় যেন তাদের সঙ্গে। কত অদ্ভুত পোকা, কত রং-বেরঙের পাখী! কত বাহারের নামই বা তাদের! রাত্রে হুক্কাহুয়া শেয়ালের ডাক—যে শেয়ালের

গল্প শুনতে শুনতে কতদিন মার কাছে ঘুমিয়েছি ; আর গাছে গাছে জোনাকির ফুলঝুরি—কোথায় লাগে কালীপুজোর ফুলঝুরি তার কাছে ! প্রকৃতির সঙ্গে কত ভাবে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে লাগল। আরও বাকি থাকে—প্রতিদিনই নতুন কিছু দেখি, নতুন কিছু শিখি। প্রকৃতির ভাণ্ডারে কত রত্ন ! পাঁচ ছ মাস ইস্কুলে যাতায়াত ক'রে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, এখানে এসে যেন বেঁচে গেলুম।

দু-দিনেই বন্ধুবান্ধবী জুটে গেল বোধ হয় বিশ-পঁচিশটি। তাদের সঙ্গে যেন কত দিনের পরিচয়। এই আনন্দের মধ্যে অস্থির ও দাদার জন্যে মাঝে মাঝে ভারী কষ্ট বোধ হ'ত। রাত্রে মার পাশে শুয়ে তাঁর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে খোশামোদ করতুম, দাদা আর অস্থিরকে নিয়ে এস না মা।

মা বলতেন, আর দাঁড়াও বাপু ! তোমাকে এখন ভালয় ভালয় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। যা ছেলে হয়েছ তুমি !

একেবারে দ'মে যেতুম।

নিরবচ্ছিন্ন স্ফূর্তির আর একটি বাধা ছিল আমার সেবাসিং। যেখানেই যাই, ছায়ার মতন ব্যাটা সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, আর আধ ঘণ্টা অন্তর আমাকে মন্ত্রপূত শরবত খাওয়ায়—বোধ হয় ফাঁড়া কাটাবার জন্যে। এই দুটি বাধা ছাড়া ওঃ কি ফুর্তি, কি স্ফূর্তি !

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

পথ

কোথায় পথ যে তুমিই জান, কেউ জানে না আর।
কোথায় বাধা, কোথায় ডোবা, কোথায় অন্ধকার।

আমরা ও তাহারা

সম্প্রতি যুদ্ধের বাজারে বন্ধুবর সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে একজন কেষ্টবিষ্টু বসিয়া গিয়াছেন। সেই বিষয়েই বলিতেছিলেন, এই যে দেখ না, বম্বে-মার্কেটে কুইনিন সব সালফেট আর আড়াইশো দরে বিকোচ্ছে, কলকাতায় একশো পঁচাশি। অথচ কালই আমাদের স' ওয়ালেসের পঁচাত্তর পাউণ্ড কুইনিন ছাড়তে হবে কণ্ট্রোলের তেত্রিশ টাকা দরে।

ভাই পাশেই বসিয়া ছিলেন; উভয়ের চোখে চোখে ইশারায় যে বিদ্যুৎ-প্রবাহখানি বহিয়া গেল, বন্ধুবর তাহা জানিলেন না। প্রকাশ্যে বলিলাম, সুরেন, আমায় কিছুটা দাও না ভাই। ছেলেপুলে নিয়ে গ্রামে থাকি। ম্যালেরিয়া তো কপালেরে চোখেই আছেন।

ভাই আবেদনটিকে আরও মর্মস্পর্শী করিয়া বলিলেন, তা ছাড়া পাঁচজন পাড়াপড়শীর দায়-দুর্দশায় কতখানি সাহায্য করা যায়, তাও বল।

বন্ধু ইতস্তত করিতে যাইতেছিলেন, এক কথায় তাহাকে থামাইয়া দিলাম, নজির তুলো না ভাই, ওখানে তুমি একজন কম কেওকেটা নও। বললে বিশ্বাস করব কেন? সাহেব-সুবো তোমার দুয়োরে ঘোরা-ফেরা করছে।

বন্ধু আত্মপ্রসাদে একটুখানি বিনীত হাসি হাসিলেন; বলিলেন, না না, এমন আর কি পারি! তা দেখ সন্ধ্যেবেলা প্রাইভেটলি। বোধ হয় পারব কিছু দিতে।

বন্ধু প্রতিশ্রুতি রাখিয়াছেন। সকালের ট্রেনেই ভাইকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলাম। ভালরকম দর মিলিলে দু পাউণ্ডে নেট দুশো টাকা লাভ।

মনটা ক্রমেই খুশি হইয়া উঠিতেছে।

• • •

সবে চায়ের কাপটি রাখিয়া উঠিয়াছি, গৃহিণী আসিয়া দাঁড়াইলেন।

চা-টা কেমন খেলে আজ?

বলিলাম, খুব খারাপ নয়। তবে ভালই বা কোথায়?

কয়েক দিন ধরিয়াই তিনি চায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতেছেন, সেই কথাটাই মনে করিয়া কথাটাকে সংশোধন করিয়া লইলাম।

গৃহিণী চটিয়া গেলেন, ভাল নয়, না? নিজে যে চা এনেছিলে তা তো ধুলো বই আর কিছুই নয়। ভদ্রলোকের মত রুচি অরুচির কোন বালাই রাখ না তো। হ'ত বিয়ে ঐ রায় ঘোষের মেয়ে শৈলীর সঙ্গে, বুঝতে মজাটা। আমি না খেয়ে, তাই দিনরাত ভাল মন্দ খুঁজে মরি। কার জন্যেই বা করা আর কেনই না করা, তাও ভাবি!

উচ্ছ্বাস-অভিব্যক্তির বালাই আমার কোন দিনই নাই। তাঁহার রান্নায় বা তাঁহার প্রশংসায় যে মুহুর্মুহু পঞ্চমুখ হইয়া উঠিতে পারি না, ইহাই আমার বিরুদ্ধে এবং তাঁহার নিজস্ব ভাগ্যের বিরুদ্ধে তাঁহার চিরকালের অভিযোগ। শৈলীকেও এ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায়ই নামাইয়া আনা হয়। আমার সঙ্গে যে বহুযুগ আগে তাহার বিবাহের কথাবার্তা হইয়াছিল—এই পরম তথ্যটি আবিষ্কার করা অবধি গৃহিণীর আর স্বস্তি নাই। আমাদের যতকিছু গণ্ডগোলের সব মূল কারণ যে ঐ শৈলীর প্রতি আমার প্রথম প্রেম, অনেক বুঝাইয়াও এ বিশ্বাস তাঁহার ঘুচাইতে পারি নাই। কিন্তু চায়ের পেয়ালায় তুফান উঠা যে মিথ্যা প্রবাদ নয়, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সার্থক হইলাম।

কথার মারপ্যাঁচটিকে আমার ভুলাইয়া রাখিয়া রস উপভোগ করা, তাঁহার একটি বিশেষ বিলাস। আজ বোধ হয় কড়ায় তেল চাপাইয়া আসিয়াছিলেন, তাই বিলম্ব না করিয়াই বলিলেন, ঐ অত দামী চা, এক কৌটো চিনের দুধ, এক কৌটো মাখম, গোটা চারেক বাসি ডিম্‌, সব আজ চার গণ্ডা পয়সায় পচার মেয়ের কাছ থেকে নিলাম।

বিস্ময়-অভিনন্দন প্রত্যাশা করিয়া মৃদুহাস্যে তিনি আমার মুখের

দিক চাহিলেন। কথাটা বিস্ময়জনক বটে। পদ্মদের গোলপাতার ভাঙা কুঁড়েটা আমাদের পাড়ার শেষপ্রান্তে। পাড়ার ভিতর ওদেরই বোধ হয় সবচেয়ে হীন অবস্থা। একবেলা যদি খায় তো ফিরেবেলা জোটা কঠিন। পদ্মর স্বামী মহেন্দ্র যথেষ্টই কর্মক্ষম, কিন্তু বাতিকগ্রস্ত। দশ দিন সমানে সাইকেল-রিক্সা টানিয়া বেশ কিছু পয়সা উপায় করে। বাকি দশ দিন চুপচাপ ঘরে বসিয়া হুঁকা টানে। নয়তো বেদেপাড়ায় কাবুরাণীর বাসায় দিনকয়েক মাতামাতি করিয়া কাটাইয়া আসে। পদ্ম কাঁদিয়া কাটিয়া সম্প্রতি হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। পদ্মর মা ঘুঁটে বেচিয়া, কাঠকুটো বেচিয়া, লোকের বাড়ির উঠান লেপিয়া, ধান ভানিয়া চাল আনে, আনাজপাতি চাহিয়া চিন্তিয়া কোনমতে দিন চালায়। পাঁচটি অর্ধনগ্ন ছেলেমেয়ে সারাদিন শুষ্ক ধানের ক্ষেতে ইঁদুরের গর্তে হাত ঢুকাইয়া ধান সংগ্রহ করে। কোন কোন দিন সামনের দাওয়ায় বসিয়া ফ্যান সহযোগে শুধু ভাত খায়, মহেন্দ্র ভ্রূক্ষেপও করে না।

সেই পদ্মর মেয়ে এত দামী জিনিসপত্র কি উপায়ে সংগ্রহ করিল ভাবিয়া আশ্চর্য হইবারই কথা।

গৃহিণী বলিলেন, ওমা, তাও বুঝি জান না? বেদেপাড়ার ঐ মাঠে, নদীর ধারে যে টেলিফোনের ইস্টিশান বসেছে, ওরই গোরাপল্টনগুলো আশেপাশের ছেলেপুলেগুলোকে ডেকে কত কি দেয়। হাত ভ'রে ভ'রে পয়সা পর্যন্ত দেয়।

পরে সখেদে বলিলেন, আর এ হতভাগা ছুঁড়ীটাকে বিকেলবেলা এত বলি, যা ঐ মাঠটার দিকে একটু খেলাধূলো কর, তা কি যাবে ওমা! এ মাগ্গিগণ্ডার বাজারে এটা ওটা পেলে সংসারের সুসার হয় যে!

অল্প হাসিয়া বলিলেন, মাগীর আবার ঢঙের বহর শুনেছ? ঐ তোমার মহেশের বউ—পদ্ম ছুঁড়ীটার কথা বলছি গো। বলে না, 'রাজার বেটা সিনান করে তার নেংটী শুকোয় না'? সেই কাণ্ড আর কি। মা ঘরে ঘুঁটে বেচে, মেয়েদের ভাবন দেখে বাঁচি নে। বলে, তোরা কি ভিকিরী নাকি যে ঐসব হাত পেতে নিয়ে এসেছিস। মেয়েটাকে মেরে ধ'রে ফেরত পাঠাচ্ছিল, আমি ব'লে দেখতে পেয়ে,

চার গণ্ডা পয়সা ধ'রে দিয়ে, জিনিসগুলো হাত ক'রে নিলাম। তা কি নিতে চায় পয়সা, বলে, বা হাত গুঁড়ো ক'রে দেবে। অনেক বুঝিয়ে নিয়ে গেল তাই।

• • •

চাকরটাকে দেখি ছয় টাকা মাহিনা আর খোরাকিতে উদয়াস্ত খাটিতেছে। হঠাৎ মনটা কেমন উদার হইয়া উঠিল। তাহাকে ডাকিয়া একটি টাকা দিয়া বলিলাম, দেবেন, টাকাটা রাখ।

দেবেন একটু অবাক হইয়া গেল, বলিল, মাইনে তো গিন্নীমা চুকিয়ে দিয়েছেন বাবু।

এমনিই দিলাম, পাগলীকে মাছ কিনে দিও।

পাগলী দেবেনের পরম আদুরে স্ত্রী, ওরফে চাঁদমণি। পাগলী দেবেনের আদর-সূচক সম্বোধন। কাছেই আট আনা মাসিক মূল্যে একখানি জীর্ণ চালা ভাড়া করিয়া দেবেনের বউ সংসার পাতিয়াছে। নিতান্ত রোগাপটকা, ছোট্ট একটা কাঁথা জড়ানো মেয়ে, আর গোটা পাঁচেক মাটির হাঁড়িকুড়ি, দুটো মলিন কাঁথা বালিশ, তিন-চারটি অর্ধছিন্ন ও অতিছিন্ন পরনের কাপড়—এই লইয়া তাহার জগৎ আপনার চক্রপথে আবর্তিত হইতেছে। দিনের মধ্যে দশবার পাগলীর এ বাড়ি আসা চাই। দেবেনকে বলে, তুমি তো এখানে ভাল ভাল খাবা; আমার ঘ্যাল নাই, নুন নাই, পিয়াজ নাই, আমি খাই কি?

কখনও খবর দিয়া, কখনও হাতে দুই-চারটা পয়সা গুঁজিয়া দিয়া দেবেন তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। আমার স্ত্রীকে মাঝে মাঝে চাল মাপিয়া তাহাকে দিতে দেখিয়াছি। উপরি কিছু পাইলে যে খুশি হয় মানুষ, ইহাই জানিতাম এতদিন। দেবেন কিন্তু আমার পায়ের কাছে টাকাটা রাখিয়া বলিল, উপরি পয়সা আমার সয় না বাবু, মাথার ঘাম পায়ে ফেলাব, সেই পয়সা আমার থাকে, নইলে নয়।

অদ্ভুত এ উক্তিতে তাহার অবাক হইয়া গেলাম। একটু রাগও হইয়াছিল বোধ হয়। বিদ্রূপের সুরে বলিয়াছিলাম, তা হ'লে রাস্তায় চলতে দুটো টাকা কুড়িয়ে পেলে, তুমি নাও না নিশ্চয় দেবেন?

দেবেন আমার বিদ্রূপটা গায়েই মাখিল না। প্রশান্ত সরল মুখে বলিল, মিছে কথা নয় বাবু; সেদিনই হাট ফিরতি কার সওয়া পাঁচ সিকে কুড়িয়ে পেলাম পথে। বাড়ি ফিরে ওকে দিয়ে বললাম, রেখে দে, তবু দু-পাঁচ সের চাল হবে, বাজার চলবে। পরদিনও ঠিক পয়সার জন্যে হাত পেতে দাঁড়াতে বললাম, অতগুলো পয়সা কাল যে দিলাম বিকেলে? আশ্চর্যের কথা শুনুন বাবু, বলে কিনা, সে আমি গাঁয়ে দিয়ে এসেছি। যার পয়সা সে না জানি কত মনস্তাপ পাচ্ছে, হয়তো তার হাট করাই হয় নি, হয়তো মেয়ের ওষুধ কেনাই হয় নি। না বাপু, ও পয়সা নিয়ে শেষে খুকীর অমঙ্গল করতে পারব না।

পরে বিজ্ঞভাবে বলিল, ওর কথাটা কিন্তু ঠিক, তা আমিও দেখেছি বাবু। উপরি পয়সা আমার কখনও কাজে আসে না, বরং উল্টে ক্ষতি হয় কিছু। একটা আঘাত দিবার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিলাম না। বলিলাম, তোমার বউ যে যখন তখন এসে চাল পুঁটলি বেঁধে নিয়ে যায়, সেটা সয় তো?

মুহূর্তের জন্যে দেবেনের দৃষ্টি কি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, না সে আমার বুঝিবার ভুল? পরক্ষণেই শান্তকণ্ঠে বলিল, ওটা ওর পাওনা চাল বাবু। সারা দুপুর গিন্নীমা ওকে দিয়ে ঢেঁকি পাড়ান, চাল এলে নেন।

হাতের ধামাটা তুলিয়া লইয়া দেবেন চলিয়া গেল। টাকাটা পড়িয়াই ছিল, খেয়াল ছিল না। গৃহিণী আসিয়া সেটাকে তুলিয়া আঁচলে বাঁধিলেন।

টাকা দিচ্ছিলে যে, ফেলে গেল কেন?

সংক্ষেপে বলিলাম, ওকে দিয়েছিলাম বকশিশ, নিলে না।

বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া গৃহিণী বলিলেন, এদিকে যে আট আনা মাইনে বাড়িয়ে দেবার জন্যে রোজ কান ঝালাপালা ক'রে তুললে গো! বিষ নেই, কুলোপানা চক্কর! ঘাড় ধ'রে বিদেয় ক'রে দিলেই ওসব দেমাক জল হয়ে যায়; আমি যাই দিই না তাই।

দিলে যে মুশকিলের অংশটা কাহার ভাগে বেশি পড়ে, অবান্তর সে কথাটা গৃহিণী বুদ্ধি করিয়া চাপিয়া গেলেন।

• • •

অচিন্ত্য আমার অনেক কালের বন্ধু। এক গ্রামে পাশাপাশি বাড়িতে থাকিয়া মানুষ হইয়াছি। একসঙ্গে গাঁয়ের স্কুলের পড়া সাঙ্গ করিয়া দুইজনেই ডাক্তারি পাস করিয়া পাশাপাশি বাড়িতে সাইনবোর্ড ঝুলাইয়া বসিয়া আছি। মফস্বলের ক্ষুদ্র অখ্যাত একটি জায়গা। নগদের দিক দিয়া প্রাপ্তি যৎসামান্যই। পৈত্রিক আমলের বাড়িখানা এবং খাঁটি দুধ ফল মাছ আনাজের জোরেই মনটা তুষ্ট থাকে। পুষ্টও যে নেহাৎ মন্দ হইয়াছি, তাহা নয়।

বিকালবেলা; মৃদুমন্দ দখিনা বাতাসে সমুখের রাস্তাটায় পায়চারি করিয়া ফিরিতেছিলাম। নিতান্ত ব্যস্তসমস্ত চেহারা লইয়া এক ভদ্রলোক আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এই পাড়ায় অচিন্ত্য ডাক্তারের বাসাটা কোথায় জানেন? ভারী বিপদে পড়েছি, বাড়িতে বড্ড অসুখ।

বলিলাম, তিনি তো বলে গেছেন; বিদেশ-বিভুঁইয়ের কথা দেখুন, ফিরতে পরশুও হতে পারে।

একটু থামিয়া উদাস নিস্পৃহ কণ্ঠে বলিলাম, জরুরি দরকার থাকলে আমিও যেতে পারি। পরীক্ষায় অচিন্ত্যবাবুর চেয়ে উঁচু নম্বরই পেয়েছিলাম। রেট একই।

তবে আপনিই চলুন, আজ হ'লেই ভাল হয়। অল্পক্ষণ থামিয়া ভাবিয়া বলিল, অচিন্ত্যবাবুর কথাই ব'লে দিয়েছিল। তা থাক, তা যখন হবে না, আপনাকেই নিয়ে যাব।

খেয়াঘাটে নদীর দিকে আগাইয়া ভদ্রলোক মাঝিটি একটা টাবুরের সঙ্গে দর করিতেছিল। দেখিলাম, ওপারের খেয়ার নৌকা হইতে ব্যাগ হাতে অচিন্ত্য নামিতেছে। চোখে চোখ পড়িতেই শুধাইল, কোথায় যাওয়া হচ্ছে? ডাকে তো?

হ্যাঁ ভাই, জরুরি ডাক।

বেশ বেশ, ছ পয়সা এলেই মঙ্গল।

হাসিতে হাসিতে অচিন্ত্য কেরীঘাট রোড ধরিয়া আগাইয়া গেল।

• • •

বাড়ি ফিরিতেই দেখি, প্রিয়তমা দুইটি বোঁচকা কাপড়ওয়ালা সম্মুখীন করিয়া রণরঙ্গিণী মূর্তিতে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া অবলা যেন ভবসমুদ্রে কূল পাইলেন।

দেখ তো, ওর কাছে দর ক'রে সে কাপড় যদি আমি না কিনি, সে আমার ইচ্ছে, আমি ডাকলামই বা ওকে আগে। আমি তোর কাছেই নোব কাপড়। তা ইনি ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির, নিজে দিয়ে যান কাপড়, আর কিছুতেই দেবে না। বলে, ওর কাছে নিন মা, উনার নাকি দেশভাই আছে। আ মরণ, দেশভাই আছে তো কেনা আছে! আমাদের দেশভাই সব বদলে গেছে, না?

বাক্যবর্ষণ থামাইয়া বলিলাম, তা বাপু, ওর কাছে যদি উনি নাই নেন, তোমারও তো আছে ও কাপড়, দিয়ে যাও না।

নেই বাবুজী, মাজী ওকেই আগে ডেকেছিলেন। ওর ব্যবসা আমি কেড়ে নিলে ধরম রোবে না বাবুজী।

দুজনেই কাপড়-চোপড় গুছাইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

গৃহিণী ক্রোধে বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন, দেখলে, নাকের ওপর ছোটলোক বিদ্যের ধম্মের দম্ভটা দেখলে?

দেখিতেছি অনেক কিছুই; জাপানী, ইংরেজ; বোমা, বন্দী, কন্ট্রোল, মেদিনীপুরের ধ্বংসলীলা, মায় মিনিস্ট্রি পরিবর্তন ও চক সাহেবের নিত্য বক্তৃতা অবধি।

কাহাকে কি বলিব? বলিবার যুগ কবে ফুরাইয়া গিয়াছে, এখন শুধু চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকিবার যুগ।

শ্রীমতী দত্ত

প্রসঙ্গ-কথা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্বাদ লইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যাত্রারম্ভ হয়; রমেশচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, উমেশচন্দ্র (বটব্যাল), রজনীকান্ত (গুপ্ত), হরপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর প্রমুখ যাবতীয় বঙ্গ-সাহিত্যসেবীর সাধনায় এবং সমগ্র বাঙালী জাতির সহায়তায় সেদিনের সেই শুভযাত্রা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, আজ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির একান্ত গৌরবের বস্তু, এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যপদই যথেষ্ট সম্মানের পরিচয় বহন করিয়া থাকে।

এখন হইতে ঠিক সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্বে পরিষৎ-প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোগী রবীন্দ্রনাথ তখনকার এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, আজ তাহা স্মরণ করিলে আমরা দেখিতে পাইব, সে স্বপ্ন সফলতার দিকে অগ্রসর হইলেও সম্পূর্ণ সফল হইতে বাকি আছে। তিনি বলিয়াছিলেন—

> আজ আমাদের সাহিত্যপরিষদেরও আশা বাড়িয়া গেছে; এই যে এখানে নানা জেলা হইতে আমরা বাঙালী একত্র হইয়াছি, এখানে শুধু একটা দিনের আনন্দেই এই সম্মিলনকে শেষ করিয়া দিয়া যাইব, এমন আমরা মনে করি না—হয়ত এইখানেই, বট যেমন যথাসময়ে ডাল ছাড়িয়া ঠিকমত মাটিতে পড়ে ও গাছ হইবার পথে যায়, সাহিত্যপরিষদও সেইরূপ নিজেকে বৃহৎ বাংলাদেশের মধ্যে রোপিত করিবার অবসর পাইবে।...আমার নিবেদন এই, সাহিত্যপরিষদের মধ্যে আপনারা সকলে মিলিয়া বাংলাকে সত্য করিয়া তুলুন। বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলা এবং প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক বাঙালী সাহিত্যপরিষদের মধ্যে নিজের ইচ্ছা ও চেষ্টাকে একত্রে জাগ্রত করিয়া আজ যাহা অস্ফুট আছে তাহা স্পষ্ট করুন, যাহা ক্ষুদ্র আছে তাহাকে মহৎ করুন। কোন্খানে এই পরিষদের কি অসম্পূর্ণতা আছে, তাহা লইয়া দুঃখ করিবেন না, ইহাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়া আপনারা গৌরবলাভ করুন।...দেশের ভাষা, পুরাবৃত্ত, সাহিত্য প্রভৃতি সকল দিক দিয়া দেশকে জানিবার জন্য সাহিত্যপরিষৎ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাংলাদেশের সকল জেলাই যদি তাঁহার সঙ্গে সচেষ্টভাবে যোগ দেয়, তবেই তাঁহার

উঠেও সফল হইবে। সফলতা দুই দিক দিয়াই হইবে—এক, যোগের সফলতা, আর এক, সিদ্ধির সফলতা।...দীপশিখা জালিবার দুইটা অবস্থা আছে। তাহার প্রথম অবস্থা চকমকি ঠোকা। সাহিত্যপরিষৎ কাজ আরম্ভ করিয়া এতদিন চকমকি ঠুকিতেছিল, তাহাতে বিচ্ছিন্নভাবে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। দেশে বুঝি তখনো পলিতা পাকান হয় নাই অর্থাৎ দেশের হৃদয়গুলি এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত একসূত্রে পাকাইয়া ওঠে নাই। তার পরে আজই দেখিতেছি, আমাদের দেশে হঠাৎ একটা শুভদিন আসিয়াছে—যেমন করিয়াই হউক, আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে একটা যোগ হইয়াছে—...বাংলাদেশে সমস্ত জেলার কাছে আজ আমাদের নিবেদন এই যে, সাহিত্যপরিষদের চেষ্টাকে আপনারা অবিচ্ছিন্ন করুন—দেশের হৃদয়-পলিতাটির একটা প্রান্ত ধরিয়া উঠিতে দিন, তাহা হইলে একটি ক্ষুদ্র সভার প্রয়াস সমস্ত দেশের আলোকে তাহার স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অমর হইয়া উঠিবে। আমাদের আকাঙ্ক্ষার এই নিবেদন আজ যদি যোগের আনন্দে সিদ্ধিতে পরিণত হয়, তবে যে চিরদিন মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে, সেখানে ভাগীরথীর তীর হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীর পর্যন্ত, সমুদ্রকূল হইতে হিমাচলের পাদদেশ পর্যন্ত বাংলা-দেশের সমস্ত প্রদেশ আপন উদ্দীপিত প্রাণভাণ্ডারের বিচিত্র ঐশ্বর্য বহনপূর্বক এক ক্ষেত্রে মিলিত হইয়া তাহাকে পূর্ণোজ্জ্বল করিয়া তুলিবে।—তাহা একমাত্র কালের আশিস্ হইবে না, তাহা তপস্যার আশ্রম হইয়া উঠিবে—সেখানে আমাদের প্রত্যেকের নিঃস্বার্থ সাধনার দ্বারা সমস্ত দেশের মহাকাল-সঞ্চিত অকৃতকর্তব্যের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইতে থাকিবে।

বাঙালী জাতির যে সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া এই সাহিত্য-পরিষৎ তাহা প্রধানত বাংলা দেশের পল্লীর দান। প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে বাংলার অরণ্যকান্তার-নদীনির্ঝরিণীর পরিবেশের মধ্যে এই দুঃখতপ্ত কবির প্রাণে সর্বপ্রথম অস্ফুট মাতৃভাষায় যে ছন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল, প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে ইংরেজসমাগমের পূর্ব পর্যন্ত আমরা তাহারই বিকাশ এবং বিস্তার দেখিতে পাই। এই সুদীর্ঘ আট শতাব্দীর বিপুল সাহিত্যকীর্তির মর্মস্থলটি বাংলার পল্লী-প্রাঙ্গণেই অবস্থিত। মাঝে মাঝে কোনও কোনও রাজাবাদশাহের পৃষ্ঠপোষকতায় নাগরিক পরিবেশের মধ্যেই দুই-একটি অনুবাদ এবং মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়া থাকিলেও মূলধারা বরাবরই পল্লীর প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের সমাপ্তি-কাল পর্যন্ত এদেশে যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা

যায়—(১) চর্য্যাপদ এবং পদাবলী (২) মঙ্গলকাব্য (৩) অনুবাদকাব্য (৪) চৈতন্যলীলা কাব্য, এবং (৫) যাত্রা, কথকতা, কবিগান, পাঁচালি প্রভৃতি। এগুলি সমস্তই পদ্য-সাহিত্য। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বাংলা গদ্য সাহিত্যপদবাচ্য হয় নাই। কাব্যসাহিত্যের পাঁচটি বিভাগই মূলত নগর হইতে দূরে পল্লীপ্রকৃতির মধ্যে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। সজীব সরস পল্লীমাতার বক্ষ হইতে কবিগণ স্নেহরস আহরণ করিয়াছেন—শহরের পাষাণময় রুক্ষতার সহিত এগুলির কোনই সম্বন্ধ নাই। সুতরাং বাংলা-সাহিত্য ততদিন পর্য্যন্ত পল্লী-সাহিত্যই ছিল। এই সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম নাগরিক সভ্যতার প্রলেপ বুলাইয়াছেন ভারতচন্দ্র রায়। তৎপূর্ব্বে আমরা যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে আবিষ্ট হইয়া আছেন—যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকেই বাংলা কাব্যসাহিত্যে ওতপ্রোত হইয়া থাকিতে দেখি। যে জল স্থল আকাশ বায়ুর চিরন্তন ধাত্রী-ক্রোড়ের মধ্যে আমরা জন্মিয়াছি, তাহারই যথার্থ পরিচয় পাই এই সকল কাব্যের মধ্যে।

যাহা ভাল, যাহা সুন্দর, যাহা কল্যাণকর, সভ্যতাসংহতিকতার আবর্ত্তে তাহারও বিকার অবশ্যম্ভাবী; ভারতচন্দ্রের নাগরিক সংস্পর্শের অব্যবহিতকাল পূর্ব্ব হইতেই বাংলার পল্লী-সাহিত্যে সেই বিকার দেখা গিয়াছিল। ভারতচন্দ্র সরস বুলি এবং নিখুঁত ছন্দের সাহায্যে এই বিকারের প্রতিকার করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফলই ফলিয়াছিল। মুকুন্দরামের বারমাস্যার দুঃখ-দুর্দ্দশার যের অনুকরণের পরিবর্ত্তে নকল বিদ্যাসুন্দরের মুহুর্মুহু আক্রমণে ভারতচন্দ্রের অত্যল্পকালমধ্যেই বাংলা সাহিত্য বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কামিনীকুমার, চন্দ্রকান্ত, হেমলতা-রতিকান্ত, মন্মথকাব্য, প্রেমকাব্য প্রভৃতির আবির্ভাবে বাংলা-সাহিত্যে আদিরসের যেন বান ডাকিয়া গেল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্য্যন্ত এই কদর্য্যতার জের বাংলা দেশে চলিয়াছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতিও সাময়িকভাবে এই আবর্ত্তে পড়িয়াছিলেন।

পদাবলী সাহিত্যও অবিকৃত ছিল না। শেষ পর্যন্ত যাত্রা কথকতা পাঁচালি ও কবিগানের সহিত একাকার হইয়া বৈষ্ণব কবির সরস পদাবলী তরজা পাঁচালি চপ কীর্তন হাফ-আখড়াই ও টপ্পাগানে বিকার লাভ করিয়া সদর হইতে খিড়কিতে আশ্রয় লইয়াছিল। পুরাতন যুগের শেষ কবি এবং আধুনিক যুগের প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সরস নাগরিকতা ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে এই বীভৎসতা কিছু পরিমাণে রোধ করিতে সক্ষম হয়। ততদিনে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীর রুচি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদনের পূর্বে বাংলা কাব্য-সাহিত্য বলিয়া যে কিছু ছিল, সে বোধও তাহারা ধীরে ধীরে হারাইয়া ফেলে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধাক্কায় জড়তাগ্রস্ত বাঙালীর যখন নবজাগরণ ঘটিল, তখন এই পুরাতন সাহিত্য-ঐতিহ্যের অস্তিত্বের কথা সে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে। নানা আঘাত-সংঘাতে তাহার সমাজ-বন্ধন শিথিল। পায়ের নীচের মাটিকেও তাহার আর বিশ্বাস নাই। সে আত্মবিস্মৃত, সুতরাং স্বদেশীয় সব-কিছুর উপর তাহার সুগভীর ধিক্কার। এমন সময় নূতন অরুণোদয়ের মত ইংরেজী-সাহিত্য সুবিপুল সম্ভার লইয়া তাহার দ্বারে উপস্থিত হইল। ইংরেজের জ্ঞানে ঐশ্বর্যে ক্ষমতায় মুগ্ধ বাঙালী সেই সাহিত্যকেই একান্ত নিজস্ব বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিল। বাঙালীরা রাতারাতি ইংরেজ হইয়া উঠিবার স্বপ্ন দেখিল। নূতনের বন্যায় পুরাতন রসাতলে যাইতে বসিল।

কিন্তু বন্যাই অনেক সময় বৃহত্তর মুক্তি আনিয়া দেয়। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মোহ যত বাড়িতে লাগিল, বাঙালীর মনের প্রসারও তত বাড়িয়া চলিল। অন্ধ অনুকরণের দ্বারা যাহা আরম্ভ হইয়াছিল, জ্ঞান ও শিক্ষায় তাহা পরিণতি লাভ করিল, এবং ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীরাই একদিন চকিতে অনুভব করিল যে, দেশের ভাষায় রচিত এবং দেশের মাটির অবলম্বন প্রাপ্ত না হইলে কোনও সাহিত্যই স্থায়ী হয় না। নগর কলিকাতা তখন দেশের শাসনাধিকার-প্রাপ্ত ইংরেজের কর্মকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য-জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত

কলিকাতার "ইয়ং বেঙ্গল"ই তখন এই নগরকে কেন্দ্র করিয়া অভিযানে বাহির হইলেন; যাহাতে সমাজে সাহিত্যে নূতনের জয়ধ্বজা উড়িল। জাতিগত পরাধীনতার বোধ ধীরে ধীরে জাগ্রত হইয়া শিক্ষিত বাঙালীকে পীড়া দিতে লাগিল; পুরাতন সমাজবন্ধন সহস্রবিধ সংস্কারের ধাক্কায় নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতে লাগিল এবং নানা নূতন আদর্শে সাহিত্যও রূপায়িত হইতে লাগিল। নূতনপন্থীরা এক দিকে যাহা করিলেন, পুরাতন প্রথায় শিক্ষিত সে যুগের অধিকাংশ চিন্তানায়কও অন্য দিকে তাহাই করিতে লাগিলেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ ও প্যারীচাঁদ মিত্র, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রামগোপাল ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির সংস্কার-চেষ্টার সহিত রামমোহন, ঈশ্বর গুপ্ত, রাধাকান্ত, রামকমল, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার ও কেশবচন্দ্রের সাধনা মিলিত হইয়া দেখিতে দেখিতে বাংলা দেশে অঘটন ঘটাইল। ১৮১৫ হইতে ১৮৫৫—মাত্র এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে নূতন বাংলা দেশ, নূতন বাঙালী জাতি ও নূতন বাংলা সাহিত্য শুধু গড়িয়া উঠিল তাহা নয়, মহিমান্বিত হইল। কিন্তু এই কালের মধ্যে যাহা ঘটিল তাহা নগর-কেন্দ্রিক, যে নূতন সাহিত্য জন্মলাভ করিল তাহাও নাগরিক। মধুসূদন, কালীপ্রসন্ন, দীনবন্ধু, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ এই নাগরিক সাহিত্যেরই প্রসার এবং পুষ্টি সাধন করিলেন।

আমরা এক নিশ্বাসে নামোচ্চারণ করিলাম। এই গোড়ার-গদ্য-প্রধান নূতন সাহিত্যের ভাষার গঠনে মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন, ভবানীচরণ, অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র, কৃষ্ণমোহন, রাজেন্দ্রলাল, প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্নের দান কতখানি এবং নূতন কাব্য-সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন, বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথেরই বা সাধনার পরিমাণ কি, তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে এইটুকু জানা চাই যে, এই নূতন সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাংলা দেশে শুধু যে জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তারই হইয়াছিল তাহা নয়, বাঙালীর প্রাণে অপূর্ব দেশাত্মবোধও জাগ্রত হইয়াছিল। এই দেশাত্মবোধ ও স্বজাতিপ্রীতির ফলে পুরাতন সাহিত্যিক ঐশ্বর্যের অনুসন্ধানে আবার বাঙালীর উৎসাহ

দেখা দিল। নাগরিক সাহিত্যের ধারার সহিত পল্লীসাহিত্যের ধারা মিলিত হইয়া বাংলার সাহিত্য ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হইয়া উঠিল। পল্লী-সাহিত্যের এই revival বা নবজাগরণের ইতিহাস আমাদের স্মরণীয়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কেরী সাহেব কলেজের আর্থিক সাহায্যে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস হইতে (১৮০২-৪ খ্রীষ্টাব্দ) কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের ভাষা রামায়ণ ও মহাভারত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে এই দুই ভাষা-কবির কাব্য পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের সংশোধনে ও পরিমার্জনে বর্তমান-প্রচলিত রূপ লইয়াছে। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রক বাবুরামের শাগরেদ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র একটি সচিত্র সংস্করণ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই আরও দুই-চারিজন প্রকাশক ব্যবসায়ীও পল্লী-সাহিত্যপ্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। দেশের শিক্ষিতসমাজের সহিত এই সকল প্রচেষ্টার যোগ ছিল না। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সর্বপ্রথম সে যুগের বাঙালীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন এবং তিনিই প্রচার করেন যে, এই পল্লীসাহিত্যের পরিমাণ ও উৎকর্ষ সামান্য নয়। তিনি নিজে অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া পুঁথি সংগ্রহ করেন ও 'সংবাদ প্রভাকরে' কোনও কোনও কবির কবিতা জীবনীসহ প্রকাশ করিতে থাকেন। মূলত তাঁহার চেষ্টাতেই আমরা রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র রায় প্রভৃতি কবির, এবং হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিতে বৈরাগী, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, রাম-নৃসিংহ, ভবানী বেনে প্রভৃতি কবিগান-রচয়িতাদের জীবনী ও কাব্যের সঠিক পরিচয় পাই। তিনি নিজেই এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—

অন্ধকারাবৃত প্রাচীন পদ্যপুঞ্জ এবং তত্তৎ রচক পুরাতন কবিকুলের জীবনচরিত সংগ্রহ পূর্বক সাধারণের মনোহর করণার্থ আমি প্রায় দশ বৎসর পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা পর্বতে পথিক হইয়া এতদ্বিষয়েই উদ্যোগের চালনা করিতেছি। এই বিষয়ের নিমিত্ত বন বন, জীবন পর্যন্ত পণ করিয়াছি,—সাংসারিক সমুদয় সুখ হইতে প্রায় বঞ্চিত হইয়াছি।

নিয়তই আমার নিদ্রা ও আর আর কার্যের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছি। জলপথে ও স্থলপথে ভ্রমণ পূর্ব্বক দাবাদাবি হইয়া নানা লোকের উপাসনা করিতেছি।

গুপ্তকবির পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং 'অন্নদামঙ্গলে'র একটি প্রামাণিক সংস্করণ কৃষ্ণনগর রাজবাটির মূল পুথির সাহায্যে প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রলাল বাংলার পল্লী-সাহিত্যের ঐশ্বর্য তাঁহার 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্য-সন্দর্ভে' নানা যুক্তি-বিচারের দ্বারা প্রকট করেন। ইঁহাদের চেষ্টায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় এবং আমরা দেখিতে পাই সাময়িক-পত্রে আলোচনা ছাড়াও মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে, রামগতি ন্যায়রত্ন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, মহেশচন্দ্র দত্ত ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে, রাজনারায়ণ বসু ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, গঙ্গাচরণ সরকার ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এবং কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাংলার পল্লী-সাহিত্য লইয়া আলোচনা করেন। উক্ত সাহিত্যের প্রকাশের ভার প্রধানতঃ বটতলার প্রকাশকেরা লইয়াছিলেন বলিয়াই আমরা আজিও এই সাহিত্যের দর্শন পাইতেছি। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় মুদ্রাযন্ত্রের নামও উল্লেখযোগ্য।

বাংলার পল্লী-সাহিত্যের ব্যাপক আলোচনা আরম্ভ হয় বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে'র উৎসাহে ও দৃষ্টান্তে। ১২৮০ সালের পৌষের 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—

> বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতীয় কবিতার আধিক্য। অন্যান্য কবির কথা না ধরিলেও, একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্র বিশেষ।

ইহার এক বৎসরের মধ্যেই অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং সারদাচরণ মিত্র "প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ" প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন (১৮৭৩-৭৪)। শৈশবে এই "প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ" পাঠেই রবীন্দ্রনাথের চিত্ত বৈষ্ণব কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, 'জীবন-স্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এই কাব্যসংগ্রহ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা দেশের শিক্ষিত নাগরিক-সমাজে বাংলার পল্লী-সাহিত্য অবাধপ্রবেশাধিকার

লাভ করিল। 'বঙ্গবাসী' ও 'হিতবাদী' কার্যালয় এই সাহিত্যের প্রচারে যত্নবান হইলেন, এবং যুবক রবীন্দ্রনাথ এই সাহিত্যের রসবিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। এই সময়ে সুদূর কুমিল্লায় বসিয়া দীনেশচন্দ্র সেন অমানুষিক অধ্যবসায় ও বিপুল পরিশ্রম সহকারে বাংলার পল্লী-সাহিত্যের পুথি সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরিশ্রমের ফলস্বরূপ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হয়। এই ঘটনার তিন বৎসর পূর্ব্বে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৩এ জুলাই তারিখে 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অব লিটারেচার' নামীয় সভা স্থাপিত হয়। উক্ত সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলার পল্লী-সাহিত্যের প্রচার এবং প্রকাশ। ঐ সভাই ১৩০১ বঙ্গাব্দের ১৭ই বৈশাখ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নামে অভিহিত হয়। ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ তারিখে নূতন পরিষৎ-মন্দিরের গৃহপ্রবেশ-উৎসব সভায় রবীন্দ্রনাথ বলেন—

আমাদের দেশমাতাকে বহুপুত্রবতী হইতে হইবে। এই পুত্রদের কেহবা দেশের জ্ঞানকে, কেহবা দেশের ভাবকে, কেহবা দেশের কর্মকে অন্তর্দৃষ্টি দান করিয়া তাহাকে উত্তরোত্তর পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে। তাহারা নানালোকের ঐশ্বর্যকে একস্থানে আকর্ষণ করিয়া আনিবে, তাহারা নানাকালের চেষ্টাকে একত্রে বাঁধিয়া তুলিবে। তাহারা দেশের চিত্তকে নানাব্যক্তির মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিবে এবং অনাগত কালের মধ্যে বহন করিয়া চলিবে। এমনি করিয়াই দেশের বক্ষ আপনার সার্থকতা খুঁজিয়া পাইবে, সে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে সকল দিকেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

এইরূপ পুত্রের জন্য আকুতির কামনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে—পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎকে আমি দেশমাতার এইরূপ একটি পুত্র বলিয়া অনুভব করিয়া অনেক দিন হইতে আনন্দ পাইতেছি। ইহা একটি বিশেষ দিকে বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নতা ঘুচাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণতা দান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। আজ বাংলাদেশের আত্মপরিচয়চেষ্টাকে এক জেলা হইতে অন্য জেলায় ব্যাপ্ত করিয়া দিবে, এক কাল হইতে অন্য কালে বহন করিয়া চলিবে—তাহার এক বিদ্যুৎসঞ্চারিত স্নায়ুজালের দ্বারা অধুনাতন বাঙালীর চিত্তের সহিত পুরাকালের বাঙালীচিত্তকে মালায় গাঁথিয়া চলিবে—দেশের সঙ্গে দেশের, কালের সঙ্গে কালের, যোগসাধন করিয়া পরিপূর্ণতা বিস্তার করিতে থাকিবে। পুত্র পিতৃবংশকে, পিতৃকীর্তিকে, পিতৃসাধনাকে এইরূপে অবিচ্ছেদে অধিকৃত

অপ্রসার করিয়া কিংবা অতীতের সহিত অনাগতকে এক করিয়া মানুষকে কৃতার্থ করে—দেশপুরুষ দেশের চিত্তকে, দেশের চেষ্টাকে বৃহৎ দেশে বৃহৎ কালে ঐক্য দান করিয়া তাহাকে সত্য করে, তাহাকে চরিতার্থ করে। সাহিত্য-পরিষৎও বাংলাদেশের চিত্তকে ঐরূপ নিত্যতা দান করিয়া তাহাকে মহৎ রূপে সত্য করিয়া তুলিবার আশা বহন করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই আমরা তাঁহার অভ্যুদয়কে বাংলাদেশের পুণ্যফল বলিয়া গণ্য করিতেছি।

সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে প্রথম সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে (১৩১৩ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছিলেন—

> বাঙালীর মনে বাঙালীকে বাঁধিবার জন্য বহুকাল ধরিয়া বঙ্গসাহিত্য অলক্ষ্যে নিশ্চিত ভাবে সূত্রের একটা বিপুল মিলনজাল রচনা করিয়া আসিয়াছে। আজ তাহা আমাদের এত বেশী অগোচর হইয়া আছে যে, তাহা আমাদের শিরা, পেশি প্রভৃতির মত আমাদের চোখেই পড়িতে চায় না।...বৈষ্ণবকবিরাই আমাদের দেশের সাহিত্যকে প্রথম রাজসভার সঙ্কীর্ণ আশ্রয় হইতে বৃহৎভাবে জনসমাজের মধ্যে বাহির করিয়া আনিল। পল্লীদের ভাষা যেন বাঁধন খুলিয়া বাহির হইল। কিন্তু নানা দিক হইতে এমনি ধারা আসিয়া না জুটিলে নদী হয় না। আজ বাংলার গদ্যে-পদ্যে সম্মিলিত সাহিত্য বাঙালী জনসাধারণের প্রবল চিত্তে বিচিত্র ভাবস্রোত, বিবিধ জ্ঞানপ্রবাহ আহরণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই সাহিত্যই বাংলার উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সমস্ত প্রদেশ 'বঙ্গের' আপনাকে মিলিত করিতেছে। নিখিল বাঙালীর এই আত্মপ্রকাশই বাঙালীর সর্বপ্রধান মিলনতীর্থ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আজও যে সমগ্র বাঙালী জাতির মিলনতীর্থ হইয়া আছে, তাহার প্রধান কারণ সাহিত্যের বন্ধনে দেশের জনসাধারণকে একসূত্রে বাঁধিবার মহৎ ব্রত তাহার এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। যে সাহিত্য বহুশতাব্দীকাল ধরিয়া দেশের প্রাণরসকে নানা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিপ্লবের মধ্যেও প্রবহমান রাখিয়াছিল এবং নূতন শিক্ষার মোহে যাহাকে বর্জন করিয়া বাঙালী মরিতে বসিয়াছিল, দেশের চিন্তাশীল মনীষীদের উৎসাহে ও চেষ্টায় সেই সাহিত্য নবজীবন লাভ করিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দীর্ঘকাল ধরিয়া সেই সাহিত্যের প্রচার করিতেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়ে সারদাচরণ মিত্র, নীলরতন মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, আবদুল করিম, ব্যোমকেশ মুস্তফী, নগেন্দ্রনাথ বসু, সতীশচন্দ্র

রায়, যোগেশচন্দ্র রায়, বসন্তরঞ্জন রায় প্রভৃতি যে সকল মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাহার ফলে বাংলা দেশে আবার প্রাণের সঞ্জীবনীধারা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দীনেশচন্দ্র সেন চন্দ্রকুমার দের সহায়তায় পূর্ব্ববঙ্গের এবং প্রধানত মৈমনসিংহের পল্লীগীতিগুলি প্রকাশ করিয়া, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নানা অপ্রকাশিত পুথি মুদ্রিত করিয়া, বহরমপুরের রাধারমণ যন্ত্র, কলিকাতার দেবকীনন্দন প্রেস, 'অমৃতবাজার পত্রিকা' অফিস, চৈতন্যদেবের লীলাসংক্রান্ত বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া এই ধারাকে পুষ্ট করিয়াছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, মহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, মণীন্দ্রমোহন বসু, মনসুরউদ্দীন প্রভৃতির দানও সর্ব্বজনস্বীকার্য্য। পুরাতন যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বটতলা যাহা করিয়াছে, পরে 'বঙ্গবাসী' ও 'হিতবাদী' কার্য্যালয় যাহা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে 'বসুমতী' আপিস তাহা করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ইঁহারা সুলভে প্রচার করিবার দায়িত্ব লইয়াছেন বলিয়াই আজ এই সাহিত্য সাধারণের আয়ত্তে আসিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের 'বেদান্ত-গ্রন্থ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে যে নাগরিক সাহিত্যের পত্তন হয়, এক দিকে বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার-তারাশঙ্কর এবং অন্য দিকে প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন যে সাহিত্যের ভাষার উপাদান প্রস্তুত করিয়া বঙ্কিমের হাতে তুলিয়া দেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' মারফৎ যাহাকে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের বাহন করিয়া রবীন্দ্রনাথের হাতে উত্তরাধিকার দিয়া অবসর গ্রহণ করেন, রবীন্দ্রনাথের পরেও প্রভাতকুমার শরৎচন্দ্রের ধারা ধরিয়া একদল কৃতী আধুনিক সাহিত্যিক উনবিংশ শতাব্দীর সেই নাগরিক গদ্য-সাহিত্যের প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিলেও গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে তাহাতে স্থানে স্থানে বিকার দেখা দিয়াছে। অতি-আধুনিকতা নাম লইয়া এক ধরনের অতি-নাগরিকতা এই সাহিত্যকে বর্ত্তমানে অন্তঃসারশূন্য করিয়া তুলিয়াছে। কোনও দেশের কোনও মানুষের জীবনধারার সহিত এই সাহিত্যের কোনও যোগ নাই।

কোথাও কোথাও ঝরঝরি ফুলের বাহার দেখা দিলেও চোখের তৃপ্তিকে অতিক্রম করিয়া পুষ্টিগত প্রাণকে অস্থির করিয়া তোলে। বাংলা দেশের এতখানি উদ্যম ও প্রচেষ্টাকে বিকৃত প্রভাবে বিফল হইতে দেখিয়া আমাদের মনে এই অনুশোচনা জাগে যে, সত্যকার ধনী হইবার পূর্ব্বেই বিলাসী হইয়া আমরা নিজেদের সাধ্য ও সাধনাকে নষ্ট তো করিয়াছিই, উত্তরাধিকারসূত্রে যাহা লাভ করিয়াছি তাহাও নষ্ট হইতে বসিয়াছে। দেখিতেছি আমাদের স্বাস্থ্য যেমন নষ্ট হইতেছে, অতি-নাগরিকতার ফলে সাহিত্যেও অনুরূপ কোনও দৌর্ব্বল্য সংক্রমিত হইয়া আমাদের মনের স্বাস্থ্যকেও আক্রমণ করিয়াছে। যেমন গদ্যে, তেমনই কাব্যে। নাগরিক মধুসূদন বাংলা-কাব্যে যে নবত্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথে তাহা চরমবিকাশ লাভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে কদর্য বিকৃতিতে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বুদ্ধিভ্রষ্ট অথবা কুমতলবী সমালোচকেরা এই নূতন কাব্য-সাহিত্য লইয়া এমনই বীভৎস মাতামাতি শুরু করিয়াছেন যে, তাঁহাদের প্রভাবে সাধারণের বুদ্ধিভ্রংশ হইতে বিলম্ব নাই। রবীন্দ্রনাথের দেশে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সাহিত্যের এই অবস্থা শোচনীয়। আমাদের মনে হয়, এই দুরবস্থা হইতে আমাদের মুক্তি পল্লী-সাহিত্যের সদ্ব্যবহারে। দেশ, দেশের মানুষ এবং দেশের মাটিকে ভুলিয়া আমরা যে কাল্পনিক আকাশবিহার করিতেছি, তাহা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মনের মুক্তি নয়—মৃত্যু। এই মৃত্যু রোধ করিবে দেশের সাহিত্য। সেই সাহিত্যের সংজ্ঞা এইরূপ :—

"লোকালয়ের পথ দিয়া চলিতে চলিতে যখন দেখিতে পাও, মানুষের অবকাশ নাই; মুদী দোকান চালাইতেছে, কামার লোহা পিটিতেছে, মজুর বোঝা লইয়া চলিয়াছে; বিষয়ী আপনার খাতায়, হিসাব মিলাইতেছে, সেই সঙ্গে আর-একটা জিনিষ চোখে দেখিতে পাইতেছ না, কিন্তু একবার মনে মনে দেখ;—এই রাস্তার দুই ধারে ঘরে-ঘরে দোকানে-বাজারে গলিতে-গলিতে কত শাখায়-প্রশাখায় রসের ধারা কত পথ দিয়া কত মলিনতা, কত সঙ্কীর্ণতা, কত দারিদ্র্যের উপরে

কেবলি আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিতেছে; রামায়ণ, মহাভারত, কথা-কাহিনী, কীর্ত্তন-পাঁচালি বিশ্বমানবের হৃদয়সুধাকে প্রত্যেক মানবের কাছে দিনরাত বাঁটিয়া দিতেছে; নিতান্ত তুচ্ছ লোকের ক্ষুদ্র কাজের পিছনে রামলক্ষ্মণ আসিয়া দাঁড়াইতেছেন; অন্ধকার বাসার মধ্যে পঞ্চবটীর করুণামিশ্রিত হাওয়া বহিতেছে; মানুষের হৃদয়ের সৃষ্টি, হৃদয়ের প্রকাশ মানুষের কর্মক্ষেত্রের কাঠিন্য ও দারিদ্র্যকে তাহার সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলের কঙ্কণ-পরা দুটি হাত দিয়া বেড়িয়া রহিয়াছে। সমস্ত সাহিত্যকে সমস্ত মানুষের চারিদিকে একবার এমনই করিয়া দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে, মানুষ আপনার বাস্তব সত্তাকে ভাবের সত্তায় নিজের চতুর্দ্দিকে আরো অনেক দূর পর্য্যন্ত বাড়াইয়া লইয়া গেছে। তাহার বর্ষার চারিদিকে কত গানের বর্ষা, কাব্যের বর্ষা, কত মেঘদূত, কত বিদ্যাপতি বিস্তীর্ণ হইয়া আছে, তাহার ছোট ঘরটির সুখ দুঃখকে সে কত চন্দ্র সূর্য্যবংশীয় রাজাদের সুখ দুঃখের কাহিনীর মধ্যে বড় করিয়া তুলিয়াছে, তাহার ঘরের মেয়েটিকে ঘিরিয়া গিরিরাজকন্যার করুণা সজল সঞ্চরণ করিতেছে, কৈলাসের দরিদ্রদেবতার মহিমার মধ্যে সে আপনার দারিদ্র্যদুঃখকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে; এইরূপে অনবরত মানুষ আপনার চারিদিকে যে বিকিরণ সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে বাহিরে যেন নিজেকে নিজে ছাড়াইয়া নিজেকে নিজে বাড়াইয়া চলিয়াছে। যে মানুষ অবস্থার দ্বারা সঙ্কীর্ণ, সেই মানুষ নিজের ভাবসৃষ্টি দ্বারা নিজের এই যে বিস্তার রচনা করিতেছে, সংসারের চারিদিকে যাহা একটি দ্বিতীয় সংসার, তাহাই সাহিত্য।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরকাল ধরিয়া এই সাহিত্যেরই সেবা করিয়া আসিয়াছে। এই শ্রাবণ মাসের ৮ই তারিখে এই প্রতিষ্ঠানের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবে। এই দিন সমগ্র বাঙালী জাতির উৎসবের দিন। এই দুর্দ্দিনে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিবার জন্য দীর্ঘকালের সাধনায় বাঙালী যে সকল আশ্রয় প্রস্তুত করিয়াছে এই পরিষৎ তাহার প্রধান। ইহাকে সঞ্জীবিত রাখিবার দায়িত্ব সমস্ত বাঙালী জাতির।

অপূর্ব কৌশল

প্রায় সাত ফুট লম্বা লোকটাকে লইয়া সত্যই সকলে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি।

এই বিদেশী লোকটা প্রথম যখন আসিয়াছিল, তখন—ভদ্রলোক মাত্রেরই যেমন করা উচিত আমরা উহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলাম। লোকটাও প্রথম প্রথম কিছুদিন বেশ সদ্ব্যবহার করিয়া সকলের মনোহরণ করিয়াছিল। গ্রামের ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে খেলনা দিত, কাহারও রোগ হইলে সাগ্রহে সেবা করিত, গ্রামোফোন বাজাইয়া বিলাতী সঙ্গীত শুনাইত, গল্পকথা তত্ত্বকথা অনেক কিছু বলিত। সত্য কথা বলিতে কি আমরা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। লোকটা যাহাতে গ্রামে বসবাস করে, বদ্ধপরিকর হইয়া সে চেষ্টাও করিয়াছিলাম। আমাদেরই আনুকূল্যে বেশ কিছু জমিজমা লইয়া লোকটা গ্রামের মধ্যে জাঁকিয়া বসিয়াছিল। এখন কিন্তু আমরা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। লোকটা নিজমূর্তি ধরিয়াছে। প্রকাশ্য দিবালোকে চুরি করে। চুরি করিবার পদ্ধতিটাও অদ্ভুত। বলিয়া কহিয়া চুরি করিতেছে। অমুক কোথায় নাকি ভয়ানক খাদ্যাভাব—সেখানে খাদ্য পাঠাইতে হইবে, যেমন করিয়া হউক পাঠাইতে হইবে। পাঠাইতেছে। এমন একটা মানবহিতৈষীকে বাধা দিতে অনেকের বিবেকেই বাধিতেছে। লোকটা নিজে লম্বা, কিন্তু ভাব করিয়াছে যত বেঁটের সঙ্গে, বিশেষত দুর্বলমতি বালকেরা খেলনার লোভে উহার পদানত বলিলেই হয়। বেঁটেরা গদগদ।

কোন তরকারি-ওয়ালী হয়তো মাথায় তরকারির ঝাঁকা লইয়া বাজারে যাইতেছে। লোকটা হাঁকিল, এই, দাঁড়াও। দাঁড়াইবামাত্র বেঁটেগুলো তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল, প্রত্যেক বেঁটের হাতেই একটা করিয়া থলি—লম্বা লোকটা লম্বা হাত বাড়াইয়া টপ টপ করিয়া ঝাঁকা হইতে তরকারি তুলিয়া বেঁটেদের থলিতে ফেলিতে লাগিল। দেখিতে

দেখিতে ঝাঁকা খালি এবং থলি ভর্তি হইয়া গেল। বেঁটেরা থলি কাঁধে করিয়া সরিয়া পড়িল। তরকারিওয়ালী যখন দাম চাহিল, তখন লম্বা লোকটা বলিল, দেখ বাপু, মানবের হিতার্থে এই তরকারি লইয়াছি। লাভ করিও না, ন্যায্য মূল্য লও।

এক পয়সা, দুই পয়সা—যা প্রাপ্য চাহিল, দিয়া দিল। কখন বা দিলই না। গরিব বেচারীরা ভয়ে কিছু বলিতেই পারে না। একজন নাকি প্রতিবাদ করিয়াছিল, লম্বা হাতের চড় খাইয়া নিরস্ত হইয়াছে।

লম্বা হওয়াতে লোকটার সুবিধা অনেক। হাত বাড়াইয়া গাছ হইতে ফল পর্যন্ত পাড়িয়া লইতে পারে। সেদিন ধনেশ্বরের চাল হইতে কয়েকটা কুমড়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। যেখানে নাগাল পায় না, সেখানে বেঁটেরা আছে—মর্কটের মত চড়িয়া পাড়িয়া আনে। কিছু বলিবার উপায় নাই। মানবহিতৈষীকে বাধা দিবে কে? তা ছাড়া চড়ের ভয় আছে।

লোকটা এত লম্বা যে, আমাদের মত সাধারণ উচ্চতাবিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাহার সহিত আলাপ করিতে হইলে ঊর্ধ্বমুখে করিতে হয়। একবার আলাপ শুরু করিলে নড়িবারও উপায় থাকে না, এমন মনোরম আলাপ যে মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া শুনিতে হয়। কথা বলিবার ক্ষমতা আছে লোকটার। সেদিন আমরা জন কয়েক উহার পাল্লায় পড়িয়াছিলাম, ঊর্ধ্বমুখে তন্ময়চিত্তে আলাপ শুনিতেছিলাম, বেঁটেগুলা আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বেঁটেগুলা সর্বদাই উহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। আলাপ শেষ করিয়া বেঁটের দল লইয়া লোকটা যখন চলিয়া গেল সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম, আমাদের সকলের পকেট কাটা। আমাদের ঊর্ধ্বমুখ ও মুগ্ধভাবের সুযোগ লইয়া বেঁটেগুলাই আমাদের পকেট মারিয়াছে।

ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল।

যা থাকে কপালে বলিয়া লাঠি সোঁটা যাহার যাহা ছিল লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। হয়তো একটা এস্পার ওস্পার হইয়া যাইত, যদি না অপূর্ববাবুর সহিত দেখা হইত। কিছুদূর গিয়া অপূর্ববাবুর সহিত

দেখা হইয়া গেল। অপূর্ব্ববাবু বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তাঁহাকে আমাদের দলে পাইলে আরও জোর পাইব এই ভরসায় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া তাঁহাকে আমাদের দলে যোগ দিতে অনুরোধ করিলাম।

সমস্ত শুনিয়া কিছুক্ষণ তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, হঠকারিতা করিবেন না। আমার সঙ্গে আসুন—

গেলাম।

নিজের বৈঠকখানায় আমাদের বসাইয়া অপূর্ব্ববাবু আমাদের প্রশ্ন করিলেন, আপনারা এ কথা স্বীকার করেন কি না যে, শূকর এবং শৃগাল মানবজাতির পরম শত্রু—বিশেষ করিয়া কৃষকদের?

নিশ্চয়ই।—সকলে স্বীকার করিলাম।

এ কথা স্বীকার করেন কি না যে, ওই ভদ্রলোক আজকাল বন্দুক দিয়া শূকর এবং শৃগাল মারিতেছেন?

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। লোকটার অনেক জমিজমা আছে, নানাও রকম চাষও করে, নিজের ফসল রক্ষা করিবার নিমিত্তই উহাকে, শূকর শৃগাল কেন, বহুবিধ জন্তু মারিতে হয়।

স্বীকার করিলাম।

প্রায় জ্যামিতিক পদ্ধতিতে অপূর্ব্ববাবু তখন বলিলেন, অতএব স্বীকার করিবেন কি না যে, ওই লোকটি গৌণভাবেও আমাদের উপকার করিতেছেন?

আগে বরাবরই কাঁচা ছিলাম, স্বীকার করাই নিরাপদ বলিয়া মনে হইল।

বিজয়ীর মত অপূর্ব্ববাবু তখন প্রশ্ন করিলেন, উপকারী ব্যক্তিকে কি মারা উচিত?

এতদুত্তরে কি বলিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না।

নীরব থাকা আমাদের মনোভাবকে ভাষা দিল।

কিন্তু লোকটি আমাদের অবস্থা যে শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

সেদিন আমার দোকান হইতে সন্দেশ রসগোল্লা সব লুটিয়া লইয়া গিয়াছে, মায় কড়াসুদ্ধ।

মৃদু হাসিয়া অপূর্ববাবু বলিলেন, সব জানি। তাহার ব্যবস্থাও ভাবিয়া রাখিয়াছি। অত্যুচ্চে পতনায় চ—সংস্কৃত এ কথাটা আপনারা মানেন কি?

মানি বইকি।

ওই সূত্র ধরিয়াই উহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। লোকটাকে ক্রমাগত উঁচু করিয়া দিতে হইবে। আরও জমিজমা আরও ধনসম্পত্তি আরও প্রতাপ-প্রতিপত্তি বাড়াইয়া দিয়া উহাকে খুব বেশি উঁচু করিয়া তুলিলেই উহার পতন অনিবার্য। লোকটার জুতা পরার শখ আছে, লক্ষ্য করিয়াছেন কি?

করিয়াছি।—স্বীকার করিলাম।

উহার এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া আমি ছোটখাট আর একটা ব্যবস্থাও করিয়াছি। আসুন।

ভিতরের একটা ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, সুদৃশ্য কিন্তু প্রায় একফুট উঁচু-হীল-ওয়ালা একজোড়া জুতা একটি টেবিলের উপর শোভা পাইতেছে।

অপূর্ববাবু বলিলেন, লোকটাকে ক্রমাগত উঁচু করাই আমার লক্ষ্য। মতলব করিয়াছি, এই জুতা-জোড়া পরাইয়া তাহার শারীরিক ভারকেন্দ্রেও অসাম্য সৃষ্টি করিব। লোকটা এমনিতেই বেশ লম্বা, তাহার উপর শখের বশবর্তী হইয়া এই জুতা জোড়া পায়ে দিয়া যদি চলিতে চেষ্টা করে, মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অনুসারে আপনিই মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাইবে। লাঠিসোঁটা কিছুরই দরকার হইবে না।

বলিলাম, কিন্তু আপনি যে বলিয়াছিলেন, শূকর শৃগাল দমনের জন্য উহাকে বাঁচাইয়া রাখা দরকার?

আপাতত নিশ্চয়ই দরকার। উহাকে ক্রমাগত উঁচু করিতে চেষ্টা করুন, তাহা হইলে এক ঢিলে দুই পাখীই মরিবে। বেশি বলশালী হইয়া শূকর-শৃগালও মারিবে, এবং অত্যুচ্চে পতনায় চ—এই সূত্র

অনুসারে নিজেও শেষ পর্য্যন্ত মরিবে। রাশিয়ার জারের ইতিহাস জানেন না?

বীরু ময়রা সবিস্ময়ে জুতা-জোড়াটাই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, কোন ভদ্রলোক কি এ রকম জুতা পরিতে রাজি হইবে?

রাজি করাইতেই হইবে। জোর করিয়া, হাত জোড় করিয়া, যেমন করিয়া হউক। প্রয়োজন হইলে পায়ে তুলিসহযোগে তেল মাখাইয়া জেনকেট-যোড়া ভু-চর্ম্মের সাহায্যেও এ জুতা উহাকে পরাইব ঠিক করিয়াছি। দেখুন না, কি করি—

আমরা নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম।

"বনফুল"

অপূর্ব্ব আশ্বাস

আর নয় দেরি, ওই কলোনী
বাজিছে পবন ফিরে,
বীরবল, জাগো জাগো;
হাবড়োলাকের বাবুর বিবাহ
অমলাবতীরে—
কণ্ঠে দেহ "জোর" মাগো!
তোমাদের ঘরে নাই বা থাকিল চাল,
ক্লাব-বাবুদের চক্ষু কি নয় লাল?
সাত সমুদ্র তেরো নদী পার যারা এসে তব আঙিনায় বাস
তাহাদের হাতে সঁপিয়া তোমায়
জনতীর্থ জননীরে
বলাবলি কাছে নাচো—
বীরবল, জাগো জাগো।

কালাশৌচ

শ্রীমতী রাধার বয়স হয়েছে ঢের।
কবিদল বলে, শোধাই তোমায়, যদি বা পেয়েছ টের
চেপে যাও দাদা, ও যেকী ভাঁড়াবে আমরা করিয়া যাই—
আর সব কিছু ঠিক ঠিক আছে বেড়েছে বয়সটাই।
সে কথা ভুলিয়া দেখ মোরা আজো নেশায় বিভোর আঁখি,
ধরিয়া রাধারে বাজারে টানিয়া ধরায়ে দিও না ফাঁকি।
আমি বলি, আমি সত্যের দাস, কোদালে কোদাল, বলি ঘাসে ঘাস
কেন বিলকুল পয়মাল মালে সকলে চালাতে চায়,
বয়স থাকিতে অভাগী রাধারে ডুবালে না দরিয়ায়?
দুই চোখে তার পড়িয়াছে ছানি, শুষ্ক অধর হয়েছে তোবানি
মেঘমালা সম সে চিকুরজাল হয়েছে শনের নুড়ি,
বুকের উপরে ফুটিয়া থাকিত চলিত কমল-কুঁড়ি।
দেহবল্লরী ধনুক বাঁকিয়া ক্ষীণ কটিতট পড়েছে ঝাঁকিয়া
চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি কেড় সে চেঁচাড়ি-পারা,
চকিত বিজলি কাজল-আকাশে কখন হয়েছে হারা।
থাক থাক, যাকে মিথিলার কবি লছমি স্মরণ করি,
বাসলি আদেশে কাঁদে বড়ুকবি রাধীর আঁচল ধরি,
পদ্মাবতীর চরণ-চারণ কবি জয়দেব কাঁদে অকারণ—
অতি অপরূপ মধুর ছন্দে বিনায়ে বিনায়ে কাঁদে,
যেন শ্রীবাসের আঙিনায় ওই ঘুরছিল গোরাচাঁদে।
ব্যাপার দেখিয়া ব্রজধামে গিয়া শুধাই রাধারে চুপে,
ভাবনাকাতরী কেহ কি কখনো ভুলেছিল তব রূপে?
খিকখিক করি কয় রাধা বুড়ী, মনে তো পড়ে না তারে,
বয়সের কালে অনেকে তো ছিল, স্মরণে রাখিব কারে?

শ্রীভাব

প্যানের মৃত্যু

নন্দ চাটুজ্জে মানুষটি একটু বিচিত্র, আর সিন্ধুর সহিত তাহার পরিচয়ও হইল বেশ বিচিত্রভাবে। আলাপ কি আর ছিল না? তা ছিল। এক গ্রামেই বাড়ি, নন্দ সিন্ধুকে চিনিবে না? নন্দ বাল্যকাল হইতেই সিন্ধুকে দেখিয়াছে, কথা কহিয়াছে, কখনও বা কলহ করিয়া গালও দিয়াছে। কিন্তু তাহাকে কি আর পরিচয় বলে?

তাহাদের গ্রামের উত্তরে প্রকাণ্ড মাঠ, আরও খানিকটা ছাড়াইয়া, রেলের উঁচু লাইন পার হইয়া শহরে যাইতে হয়। সেখানে ধানের কলে সিন্ধুর বাবা কাজ করে। চোদ্দ বছরের মেয়ে সিন্ধু, তাহার দশ বছরের ভাই ভুতুকে লইয়া বাপের খাবার পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিল। ফিরিতে মাঠের মাঝে সন্ধ্যা হইয়া গেল। মাঠের মাঝেই শহরের বাবুদের বাগান—কি অন্ধকার! বাগানের পাশ দিয়াই আল-রাস্তা। এক পাশে আবার প্রকাণ্ড সেওড়াগাছ। বাগানটার কাছে আসিয়া ভীত প্রাণী দুইটি দাঁড়াইয়া গেল। নন্দ চাটুজ্জে আপনার স্বভাবমত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সে যখন দেখিল, ভীত প্রাণী দুইটি আর নড়িতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তখন অকস্মাৎ তাহার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি গজাইয়া উঠিল। উহাদের ভয় দেখাইতে হইবে। নন্দ সরিয়া গিয়া সেওড়াগাছটার অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইল। বেশ হইয়াছে, খাসা মজা হইবে। আর ভুতুকে ভয় দেখাইয়া লাভ কি? সঙ্গে সিন্ধু আছে, কিশোরী সিন্ধু। সিন্ধু বেজায় ভয় পাইবে—কি মজা!

সেওড়াগাছটার নীচে কি মশা! ভনভন করিয়া তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিয়াছে। তবু নন্দ একবার হাত তুলিল না, কি নড়িল না। অন্ধকারের মধ্যে সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে ভুতু আর সিন্ধুর দিকে। ভুতু আর সিন্ধু তখন এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভুতু অস্ফুটস্বরে সিন্ধুকে বলিল, দিদি, কাল দিনে বলছিল, এই সেওড়াগাছটায় ব্রহ্মদৈত্যি আছে।

সিন্ধু তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, হ্যাঁ, তোর মাথা আছে।

নন্দ চাটুজ্জে অন্ধকারের মধ্যে হাসিল, সিন্ধুর ধমকের অর্থ সে বোঝে। ভাইয়ের মতই বোনও ভয় পাইয়াছে।

সিন্ধু আর তনু ভুতকণে সেওড়াগাছতলায় আসিয়াছে, অকস্মাৎ চড়বড় করিয়া তাহাদের উপর ব্রহ্মদৈত্য ধুলা ছিটাইয়া দিল। ভাই-বোনে বিকৃতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং প্রাণপণে ছুটিল। কিছুদূর গিয়াই সিন্ধু হোঁচট খাইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। তনু প্রাণপণে ছুটিয়া পলাইয়া ব্রহ্মদৈত্যের হাত হইতে বাঁচিল। নন্দ মজাটা উপভোগ করিতে করিতে সিন্ধুর কাছে ছুটিয়া গেল। কাছে গিয়া সিন্ধুর হাত দুইটি ধরিয়া তুলিয়া দাঁড় করাইল। তারপর তাহাকে যথেষ্ট আশ্বাস দিল। সিন্ধু তখনও কাঁদিতেছে। ভাল করিয়া দেখিয়া নন্দ বুঝিল, তাহার পায়ের আঙুলে লাগিয়াছে, রক্ত পড়িতেছে। নন্দ বলিল, দেখ দিকি, সন্ধ্যেবেলায় এমনই বেড়ায় একা! এতবড় মেয়ে তুই। আমি বাগানে বেড়াচ্ছিলাম, তোর কান্না শুনে ছুটে এলাম। কি হ'ল তোর, হাঁ রে সিন্ধু? ভয় পেয়েছিস নাকি?

সিন্ধু শুধু তাহার দিকে একবার অশ্রুপূর্ণ নেত্র বিস্ফারিত করিয়া চাহিল। নন্দ বুঝিল, সিন্ধু বুঝিয়াছে, তাহার চাতুরি সে বুঝিয়াছে। সেও চালাক লোক, এড়াইয়া গেল। বলিল, চল, ঝরনার কাছে চল, পায়ের রক্তটা ধুয়ে ফেলবি।

সিন্ধু যাইতে চাহে না, হাঁটিতেও সে পারিতেছে না। পা হইতে রক্ত পড়িতেছে বেশ। নন্দ তাহার আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে খানিকটা কোলে করিয়া খানিকটা টানিয়া আনিয়া ঝরনার ধারে পুরু কোমল ঘাসের উপর বসাইয়া দিল। তারপর সিন্ধুর পা-টাকে ঝরনার জলে জোর করিয়া ডুবাইয়া দিল। একে নন্দ অল্পবয়সী পুরুষমানুষ, তায় ব্রাহ্মণ। চাষার মেয়ে, কিশোরী সিন্ধু অনেক আপত্তি করিল; কিন্তু নন্দ মানিল না, তাহার আহত পায়ের উপর ঝরনা হইতে জল তুলিয়া দিতে লাগিল।

চারিদিক নীরব, কেবল চারিপাশের পাকা ধানের ক্ষেতের মধ্যে, পাশের বাগানে অবিশ্রাম ঝিঁঝিঁ ডাকিয়া চলিয়াছে। কাছেই কোন

অজ্ঞাত গহ্বর হইতে একটা চাপা কুলকুল শব্দ উঠিতেছে—ঝরনার জল মাটির তল হইতে উঠিয়া আসিতেছে। সূর্য অস্ত গিয়াছে অনেকক্ষণ, তবুও পশ্চিমের আকাশে দিগন্তব্যাপ্ত গেরুয়া রঙ এখনও মুছিয়া যায় নাই। কাছের বাগানটায় জমাট অন্ধকার। ভিজা ঠাণ্ডা বাতাসের সহিত পাকা ধানের গন্ধ মিশিয়া সমস্ত স্থানটা যেন ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

তাহারা দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অকস্মাৎ আহত পাটা গুটাইয়া লইয়া পিন্টু ছুটিয়া পলাইল। ভূতের ভয়ে সে যত জোরে ছুটিয়াছিল, তাহার চেয়ে অনেক বেশি জোরে। কেন এমন হইল, সে আর নন্দই জানে। ওদিক হইতে তখন তপু ডাকিতেছে, দিদি! দিদি! পিন্টু উত্তর দিল, যাই। তপু কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল রে দিদি? দিদি উত্তর দিল, হবে আবার কি? ভীতু কোথাকার, ফেলে দিয়ে যে পালিয়ে গেলি, মলাম, কি থাকলাম, তা আর দেখলি না! সেওড়াগাছে সত্যিই ভূত আছে ভাই। আর ইদিকে আসা হবে না। চল, বাড়ি চল।

নন্দ চাটুজ্জে কথাগুলা শুনিতে পাইল। সে হাসিল, তারপর বাড়ির পথ ধরিল।

কিছুদিন গেল। ইতিমধ্যে নন্দ পিন্টুকে আর দেখিতে পায় নাই। দেখিবার বহু ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও তাহাকে নন্দ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই, পিন্টু যেন জনতার সমুদ্রে ডুব মারিয়াছে।

তাহাতে নন্দর কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সে বেশ আছে, বেশ থাকাই তাহার স্বভাব।

আর সেটা সম্ভব হইয়াছিল সংসারে তাহার অভাব ছিল না বলিয়া। সংসার বলিতে তো সে একা। মা ছিল, বছর কয়েক আগে মারা গিয়াছে। গ্রামের মধ্যে আর ব্রাহ্মণ নাই। তাহার পিতামহকে এ গ্রামের জমিদার—শহরের তারিণী রায় আনাইয়া বাস করাইয়াছিলেন গ্রামের লোকের যজন-যাজনের জন্য। দরিদ্র ব্রাহ্মণটির তাহাতেই

চলিয়া যাইত। কিন্তু তাহার ছেলে, নন্দর বাবা বাপের যজমান ঠকান কাজের কাছ দিয়া ঘেঁষিল না। যেটুকু নিষ্কর জমি বাপ জমিদারের কাছে পাইয়াছিল এবং যেটুকু নিজের সঞ্চিত অর্থে কিনিয়াছিল, সেইটুকুকেই এক করিয়া চাষে মন দিল। তাহার উপরে সে খানিকটা হাবাগোবের মানুষ ছিল। কিন্তু দুইটা জিনিস সে বড় ভালবাসিত—আপনার সুন্দরী স্ত্রীকে এবং আপন জমিটুকুকে। অপর সকলকেই সে করিত ঈর্ষা। সেই ঈর্ষাটা মানুষের রূপভেদে তাহার ঈর্ষার বিকৃত পারা-মাখানো মনের আয়নায় প্রতিবিম্বিত হইত। অধিকাংশ মানুষের রূপ তাহার কাছে ছিল ঘৃণার্হ। শক্তি ও সম্পদশালী জমিদার তাহারই মাত্র ছিলেন আদর্শ। তাই সাধারণ চাষীর কাছে যে লোক ছিল মহাজন, সেই লোক ছিল জমিদারের একান্ত অনুগত ভৃত্য। জমিদার থাকিলে তাহারই ঘরে জমিদারের পাকশালা বসিত। রাত্রে নাকি সে জমিদারের পদসেবাও করিত। ফলে জমির উপর পরিশ্রমে এবং মানুষের কৃপায় ময়নার আশেপাশে পঞ্চাশ বিঘা জমি সে মৃত্যুর সময় একমাত্র সন্তান নন্দকে দিয়া গেল।

কাজেই নন্দ বেশ আছে। স্কুলে সে প্রথম প্রথম গিয়াছিল, কিন্তু ভাল লাগে নাই বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা। তাহার বাপ শুধু শালগ্রাম ও শিব পূজার মন্ত্র ও পদ্ধতিটা জানিত—নন্দ তাহাও জানে না। জানিবার তাহার আগ্রহও কখনও হয় নাই। সে পড়া ছাড়িয়া, সমবয়সী ছেলেদের সহিত তামাক খাইয়া, বয়স্ক চাষাদের সহিত গল্প করিয়া, মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেশ দিন কাটাইতে লাগিল।

নন্দকে তাহার সমবয়সী অপেক্ষা বয়স্ক চাষাদের সঙ্গেই বেশি দেখা যায়। তাহারা সকলেই নন্দকে বেজায় ভালবাসে ও খাতির করে। নন্দর স্বভাবের জন্যও খানিকটা বটে; কিন্তু আরও একটা বড় কারণ আছে। পঞ্চাশ বিঘা জমির মালিক নন্দ সংসারে একা মানুষ। অত ফসল লইয়া সে কি করিবে? তাহার উপর ময়নার আশেপাশে সমস্ত জমি তাহার। আর সেই জমিই এ অঞ্চলের সর্বোৎকৃষ্ট জমি। কাজেই গ্রামে এমন কোন বয়স্ক চাষী নাই, যাহার সহিত আবাদ ভূমি ও শস্য

সংক্রান্ত যোগাযোগ নন্দর নাই। সে অনেক সময় দান করে ; অনেক সময় ধার দিয়া আর ফেরত লয় না। আবার অনেক সময় ধীরে ধীরে ঋণ আদায় করিবার ব্যবস্থাও করিয়া লয়। এই জমির দুই চারি বিঘা করিয়া গ্রামের অনেককেই সে চাষ করিতে দিয়াছে। কাজেই নন্দর ঋণ তাহারা শোধ করিবে কি করিয়া? তাই নন্দকে তাহারা খুব ভালবাসে।

কিন্তু নন্দর বাবা বাঁচিয়া থাকিতে এ সুবিধা কাহারও হয় নাই। তাই নন্দকে লোকে, বিশেষ করিয়া বয়স্করাই, ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে বিদ্রূপ করিত। বিদ্রূপের কারণ তাহার চেহারা। তাই বলিয়া নন্দ কুৎসিত নয় ; বরং আশেপাশের গ্রামের কয়েক হাজার অধিবাসীর মধ্যে এমন সুরূপের সংখ্যা খুবই অল্প। সে সুন্দর হইবে না? তাহার মা এ গ্রামের সর্বোৎকৃষ্ট সুন্দরী ছিল। তাহার বাবা অবশ্য দেখিতে ছিল নিতান্তই সাধারণ। কিন্তু বিদ্রূপের কারণ সেটা নয়। অতি সুন্দর গড়নের মুখখানির মধ্যে তাহার টিয়াপাখীর মত বাঁকানো, অতি দীর্ঘ নাকটা ছিল বেজায় বেমানান। আর এমন নাক নাকি এ অঞ্চলে এক শহরের জমিদার তারিণী রায় ছাড়া আর কাহারও নাই। কিন্তু তারিণী রায়ের বয়স এখন নব্বই, নন্দর বয়স বড় জোর কুড়ি। কিন্তু লোকে মাঠের সর্বশ্রেষ্ঠ পঞ্চাশ বিঘা জমি ও নন্দর বক্রিম সুদীর্ঘ নাসিকার যোগাযোগে দুইটি আশ্চর্য ঘটনার রহস্যের সমাধান করিত। এখন অবশ্য তাহারা সে কথা মনে রাখা আর প্রয়োজন বোধ করে না. নন্দকে তাহারা বড় ভালবাসে। তাহারা নন্দকে আদর করিয়া বলে—ঠাকুর।

নন্দ কিন্তু সবই বোঝে। এত আদর ও স্নেহের মূলে যে গ্রামের লোকের লাভালাভের প্রশ্ন উহ্য আছে, তাহা সে ভাল করিয়াই বোঝে। কিন্তু তাহাতেই বা তাহার দুঃখ কি? যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার কতটুকুতে তাহার প্রয়োজন? বাকিটায় গ্রামের লোকে খাইয়া বাঁচুক।

আহারের অভাব নন্দর নাই, তাই খাটিবার প্রয়োজনও তাহার নাই। কিন্তু মাঠে তাহার নিত্যনিয়মিত যাওয়া চাই। সেখানে সে নিজে হাতে মাঠের কাজ করে না বটে, কিন্তু সারাক্ষণ বসিয়া থাকিয়া

তীরভূমিতে কাজকর্মের দেখাশুনা করে। চাষীরা পারতপক্ষে কাজে ফাঁকি দেয় না। তাহাদের জমিতে কাজ করা শুধু প্রয়োজনবোধে নয়, তাহাতে তাহারা আনন্দও পায়। এই রকম লোককেই নন্দ বেশি ভালবাসে। লোকে যখন ক্ষেতে নিবিষ্টমনে কাজ করে, তখন নন্দ এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। বেলা বাড়িলে, রৌদ্র প্রখর হইলে, সারা গায়ে ধুলা মাখিয়া ঝরনার জলে আসিয়া পা ডুবাইয়া নীরবে বসিয়া থাকে। পায়ের আন্দোলনে চঞ্চল জল স্থির হইয়া গেলে সে মুখ বাড়াইয়া জলতলে তাকাইয়া আপনার মুখের প্রতিবিম্ব দেখে। কখনও বা জলে ধীরে ধীরে আঘাত করিয়া আপনার ছবিটাকে দোলাইয়া, চঞ্চল করিয়া ভাঙিয়া দেয় এবং সেই দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। কখনও বা কাচের মত জলের মধ্যে ছুটিয়া ছোট ছোট তিনচোখওয়ালা মাছ ধরিবার চেষ্টা করে। কখনও জলের ধার হইতে বড় বড় ঘাসের সরল ডাঁটা ছিঁড়িয়া তাহা হইতে বাঁশী তৈয়ারি করে, আপনমনে কিছুক্ষণ বাজায়, তারপর ফেলিয়া দিয়া অন্য কিছুতে মন দেয়। রৌদ্র বেশি প্রখর হইলে ঝরনার ধার হইতে উঠিয়া গিয়া বাবুদের বাগানের ঘন কালো ছায়ার উপর সর্বাঙ্গ ছড়াইয়া শুইয়া পড়ে। হয় শূন্যদৃষ্টিতে গাছের ফাঁক দিয়া আকাশের দিকে, নয়তো দূরে দিগন্তের দিকে অকারণে চাহিয়া থাকে, নয়তো গভীর আরামে গাছের শীতল ছায়ায় নিদ্রা যায়। তাহার সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করিতেছে একটা সুমধুর আলস্য। তাহার কিছু প্রয়োজন নাই, অভাব নাই। যেটুকু প্রয়োজন তাহার অনেক বেশি তাহার আছে। সে বেশ আরামে আছে। কেবল মাঝে মাঝে তাহার দুষ্টবুদ্ধি জাগিয়া উঠে, কাহাকেও ভয় দেখাইতে বা বিরক্ত করিতে কি সামান্য ক্ষতি করিতে একান্ত ইচ্ছা হয়, এবং ইচ্ছামাত্রেই সেই কাজ সে সম্পন্ন করিয়া ফেলে।

সেদিন অনেকটা বেলা হইয়াছে। নন্দ সবে নদীর ধার হইতে একটা প্রকাণ্ড বড় ঘাসের ডাঁটা লইয়া কাটিতে কাটিতে আসিয়া বাগানের ধারে ঢিবির মাথার উপর বসিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবুজ সতেজ ডাঁটাটা একটা বাঁশিতে রূপান্তরিত হইল।

মাঝে মাঝে নন্দর নানান অদ্ভুত খেয়াল হয়। তাহার জমিগুলা বেশ উঁচু ডাঙার উপরে, তবে ঝরনার অবিরাম জলসিঞ্চনে তাহাদের উর্বরতা অপরিমিত। কিছু দূরেই নদী; ঝরনাটি একটি অতি ক্ষীণ জলধারার দ্বারা নদীর সহিত সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছে। নন্দর খেয়াল হইয়াছিল সেই জলধারার যোগসূত্রের সন্ধান করা। সে কর্ম সমাপ্ত করিয়া এইমাত্র সে ফিরিতেছে। পায়ে খানিকটা কাদা, হাতে নূতন-তৈয়ারি বাঁশী। বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে নন্দ মাঠের দিকে মুগ্ধ কোমল দৃষ্টিতে চাহিল; বেলা বেশি হয় নাই। ঝরনার ধারে ঘাসের গায়ে, পাকা ধানের নুইয়া-পড়া-গোছের সর্বাঙ্গে বিন্দু বিন্দু শিশিরে সূর্যের আলো ধরা পড়িয়াছে, মৃদু বাতাসে সেগুলি কম্পিত হইয়া মুহূর্তে মুহূর্তে বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে সন্ধ্যার প্রথম তারার মত। কতকগুলা কাক, শালিক, চড়াই মাঠে মাঠে কলরব করিয়া ধান খাইয়া বেড়াইতেছে; ঝরনার পাশে ঘাসের উপর দিয়া বাতাস বহিয়া যাইতেছে বিচিত্র হিল্লোলে। নন্দ তাকাইয়া দেখিতেছে এবং বাঁশী বাজাইতেছে। ঘাসের ডাঁটার বাঁশী হইতে একটা অতি করুণ সুর বাহির হইতেছে; সব কিছু মিলিয়া সমস্ত প্রকৃতিটি একটি অখণ্ড সঙ্গীতের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতে লাগিল।

অকস্মাৎ সে সঙ্গীত ছিন্ন হইয়া গেল, সিন্ধু আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গেই শহরের বালকদের বাঁশী তীব্রস্বরে বাজিয়া উঠিল। নন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল। লুকাইতে হইবে, তাহাকে দেখিলে সিন্ধু এ পথে কিছুতেই আসিবে না। নন্দ সরিয়া গিয়া বড় আমগাছের পাশে লুকাইল। সিন্ধু তাহাকে দেখিতে পায় নাই। সিন্ধুর হাতে একটা ঝুড়ি, শুকনা ডাল ও পাতা কুড়াইতে আসিয়াছে। আমগাছটার পাশ দিয়া যেই সিন্ধু চলিয়া যাইতেছে, অমনই তাহার মাথার পিছন হইতে একটা অতি মৃদু আঘাত পড়িল। সে চমকিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিতেই নন্দ তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিল, ঘাসের বাঁশীটা ভাঙিয়া গেল। চমকিয়া বিব্রত সিন্ধু ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। নন্দ মৃদু হাসিতে হাসিতে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে শিবুর কান্না থামিলে তাহার হাত ধরিয়া নন্দ বাগান হইতে বাহির হইল। অকস্মাৎ পিছনে বন্দুকের শব্দ। নন্দ শিবুর হাত ছাড়িতেই শিবু ছুটিয়া পলাইল। নন্দর পিছনে সাহেবী-পোশাক-পরা একটি ভদ্রলোক বন্দুক হাতে দাঁড়াইয়া। পলায়মান শিবুর দিকে একবার চাহিয়া, নন্দর দিকে একবার চাহিয়া ভদ্রলোক বাগান হইতে নামিয়া গেলেন, তারপর মাঠে যাহারা চাষ করিতেছিল তাহাদের সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্তা কহিলেন, তারপর জমিটার নকশাটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। নন্দ বাগান হইতে কিছুক্ষণ তাঁহাকে দেখিল, তারপর গভীর আলস্যভরে ঘাসের উপর শুইয়া পাকড়া ভাঙা বাঁশীটা নাড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর সেটা ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত নিদ্রায় চোখ বন্ধ করিল।

দ্বিপ্রহরের সময় চাষীরা তাহার ঘুম ভাঙাইল। ডাকিল, ঠাকুর, ওঠ, বাড়ি চল, খাবার বেলা হয়েছে।

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। চলিতে চলিতে একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, আজ ওই সাহেবী-পোশাকপরা যে লোকটা এসেছিল, উ কে জান?

না। কে বটে লবাবপুত্তুর?—নন্দর কণ্ঠস্বরে উষ্মা ও ক্ষোভ স্পষ্ট হইয়াই প্রকাশ পাইল।

লবাবপুত্তুরই বটে ঠাকুর। শহরের জাবিদী বাবের ছোট ছেলে রজনী রায়, জমিদার।

তা এসেছিল কেনে? শিকার করতে? তোমাদিগে কি শুধাইছিল?

কি বলে জান? তোমার খোঁজ নিচ্ছিল। এই জমি কার, তাও জেনে নিলে।

এক 'চকে' তোমার সব জমি জেনে আশ্চর্য্যি হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে, এত জমি তোমার হ'ল কি ক'রে?

ওর বাবা দান দিয়েছিল যি আমার বাবাকে।—নন্দ সাবধানেই বলিয়া উঠিল।

তা তো বটেই ঠাকুর। নিজের বেটা ভাইকে না দিয়ে পরের

বেটা তাইকে আর কে সম্পত্তি দেয় বল! আমিও তো তাই বললাম সাহেব-বাবুকে,—বাবু, জমি আর নন্দ ঠাকুরকে দেবে কে? ওর বাবাই ক'রে গিয়েছিল, ছেলেকে দিয়ে গিয়েছে।

হ্যাঁ, তাই বল। জমি আমার জন্যে রেখে গেল আমার বাবা। আবার কে দেবে? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বাবা রোজগার ক'রে সম্পত্তি বাড়িয়ে গিয়েছিল। শহরের তারিণী রায়ও দেয় নাই, কি তার ছেলে রমণী কি রজনীও দেয় নাই।

না ঠাকুর, তোমার বাবা চাষে খাটত বটে, কিন্তু তাতে কি অত হয়? তোমার মা ছিল সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, তার হাতে মেলাই টাকা ছিল। শহরের তারিণী রায়ের বড় ছেলে রমণী রায়, যে সেবার মারা গেল গো, তোমার বাবাকে বেজায় ভালবাসত। তোমার বাবা তো খুব মনখোলা মানুষ ছিল। রমণীবাবুই তোমার মায়ের টাকায় তোমার বাবাকে ঐ জমি কিনে দিয়েছিল।

তা হবে, তা হতে পারে। আমি জানি না। রমণী যত দয়াই দেখাক, বিনা পয়সাতে তো আর কিনে দেয় নাই!

তা তো বটেই ঠাকুর, বিনা পয়সাতে কি জমি কেনা যায়? আচ্ছা ঠাকুর, আজ রজনী রায় কেন তোমার জমির কথা জিজ্ঞাসা করছিল?

কে জানে?—নন্দ প্রশ্নের সমাপ্তি টানিল।

কিন্তু শহরের তারিণী রায়ের ছেলে নন্দর জমির কেন খোঁজ করিতেছিলেন, সেটা টের পাওয়া গেল কয়েকদিনের মধ্যেই। কথাটা সে জানিতে পারিল সিন্ধুর কাছ হইতে।

সিন্ধু এখন প্রতিদিনই নন্দর কাছে আসে। দুপুরবেলা মাঠে তাহার খাবার পৌঁছাইয়া দিয়া আসে, সেই সময় কিছুক্ষণ তাহার কাছে বসিয়া গল্প করে, হাসে, কখনও বা গুনগুন করিয়া গানও গায়। পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া নন্দ আরামে হাত পা ছড়াইয়া ঘাসের উপর শুইয়া পড়ে, এবং সিন্ধুর সঙ্গে গল্প করে। সমস্ত দ্বিপ্রহরটা আনন্দে মধুর ও রঙ্গে মধুর হইয়া উঠে, চমৎকার কাটিয়া যায়। তাহার জীবনে সে আনন্দের ও আরামের চাষ করিয়া সফল হইয়াছে।

বাগানের ছায়ানিবিড় গাছের তলায় সে শুইয়া থাকে। শিঙ্কু কাছে বসিয়া গল্প করে। সে কখনও শিঙ্কুর দিকে, কখনও দূরে, কখনও নিকটে তাকাইয়া থাকে। মাঠে চাষীদের কতক সেওড়াগাছের ছায়ায় ক্লান্তিতে তামাক টানিতেছে, বিশ্রাম করিতেছে। যাহারা কাজ করিতেছে তাহাদের গতিও মৃদু। রৌদ্রে, তাপে সকলই যেন ঝিমাইয়া পড়িতেছে। দূরে বাতাস কাঁপিতে কাঁপিতে উপরে উঠিয়া যাইতেছে। তাহারই কম্পনে পশ্চাতের সব কিছুই কাঁপিতেছে। চারিদিকে একটা একটানা ঝিমঝিম শব্দ—যেন অতি গভীর ক্লান্তিতে কে নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে শুকনা ঝরাপাতা উড়িয়া যায়, গাছের সবুজ পাতা কাঁপে। কাঠবিড়ালি, কাঠঠোকরা আর গিরগিটি-গুলা আহার ও আশ্রয়ের সন্ধানে তাদের তাদের মাটিতে খুঁজিয়া বেড়ায়। নন্দ প্রতিদিন এই আনন্দ উপভোগ করে। সেদিন ঠিক তেমনই কাটিত, কিন্তু শিঙ্কুর কথায় সব গোলমাল হইয়া গেল। শিঙ্কু তাহার বাবার কাছ হইতে জানিয়াছে, তাহার বাবা রজনী বাবুর কলে কাজ করে কিনা! রজনী সদ্য বিলাত হইতে ফিরিয়াছেন, খেয়াল হইয়াছে এখানে চিনির কল করিবেন। কল চালাইবার জন্য আখের জমির প্রয়োজন, তিনি তাই অনেক জমি কাছে-পিঠে কিনিতে চান। সব জমির মধ্যে নন্দর জমিই ভাল। অত উর্বর এবং একসঙ্গে অতটা জমি আর এখানে পাওয়া যাইবে না। জমিটা তাঁহার চাই, অবশ্য উচিত দাম তিনি দিবেন।

নন্দর কাছে শিঙ্কুর সব ও দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম সমস্তটা বিস্বাদ হইয়া উঠিল। সে চুপ করিয়া দূরের দিকে চাহিয়া শুইয়া রহিল। ক্রমে সাদা রৌদ্র হলুদ হইয়া দ্বিপ্রহর অপরাহ্ণে গড়াইল, চাষীরা হাল গুটাইয়া মাঠ খালি করিয়া বাড়ি চলিয়া গেল, দিগন্তের কম্পিত উজ্জ্বল ছবি ধীরে ধীরে স্থির ম্লান হইয়া আসিল, ছায়া নামিল, একটি একটি করিয়া আকাশে তারা ফুটিয়া উঠিল। শিঙ্কু কখন তাহার পাশ হইতে উঠিয়া গেল, সে জানিতেও পারিল না। কতক্ষণ পরে সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যাপারটা সত্যই। কয়েকদিন পর তাহার ডাক পড়িল রজনী রায়ের খাসকামরায়। মাঠে ঘাটে বেড়ানো স্বভাব তাহার, জলের ধারে বসিয়া থাকিয়া, পাকা ফসলের গন্ধ বুক ভরিয়া টানিয়া, পাখী গাছপালা দেখিয়া দেখিয়া তাহার দিন কাটিয়াছে। সে আজীবন কথা কহিয়াছে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরা চাষীদের সঙ্গে—গ্রাম্যভাষায়। জমিদারের ডাকে, পাকা বাড়িতে, সাহেবী-পোশাক-পরা রজনী রায়ের সামনে দাঁড়াইয়া সে ভীত ও বিব্রত হইয়া উঠিল। সে ঝরনার জলে আপনার মুখচ্ছবি দেখিয়াছে, রজনী রায়ের মুখের সহিত তাহার কত মিল। রজনী রায়ের নাকটা ঠিক তাহারই মত বাঁকা এবং দীর্ঘ, চোখগুলা ঠিক তেমনই ছোট। তবু কত তফাত! রায়ের মুখখানা চাঁচাছোলা, ঝকঝকে, দৃষ্টি তাহার মত কৌতুকপূর্ণ নয়—উজ্জ্বল তীব্র; মুখে তাহার মত পাতলা দাড়ি গোঁফ নাই। তিনি গম্ভীরভাবে তাহাকে বলিলেন, শোন নন্দ, তোমাকে কেন ডেকেছি শোন। তোমার ঐ এক চকে পঞ্চাশ বিঘে জমি আমাকে দিতে হবে। অবশ্য আমি উচিত দাম দোব। দাম চাও দাম পাবে, কিংবা ঐ দামে অন্য জায়গায় তোমার একশো বিঘে জমি হবে, তুমি তাই নাও, বুঝলে? আমি চিনির কল করব, ও জমি আমার চাই।

নন্দ বুঝিল কি না কে জানে, সে উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে কি উত্তর দিত কে জানে, অকস্মাৎ পাশের ঘর হইতে রজনী রায়কে নাম ধরিয়া গম্ভীর ডাক পড়িল। কর্তা তারিণী রায়ের কণ্ঠস্বর। নন্দ শুনিল, তারিণী রায় উচ্চকণ্ঠে পুত্রকে বলিতেছেন, তুমি আজ নন্দ চাটুজ্জেকে ডাকতে পাঠিয়েছিলে তার জমি কেনবার জন্যে? খবরদার, ও কাজ ক'রো না, আমি তোমায় নিষেধ করছি। উত্তরে ছেলে কেবল বলিল, নন্দ পাশের ঘরে। ভারী পায়ের শব্দ উঠিল। কে জানে, ছেলের বাবা কি বলিবেন! নন্দ ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। কর্তা ঘরে আসিয়া দেখিলেন, কেহ নাই। যাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, সে চলিয়া গিয়াছে। তিনি একবার আপনার

অতি দীর্ঘ বাঁকা নাকে এবং বকের মত সাদা পুষ্ট গোঁফ জোড়াতে হাত বুলাইলেন—তিনি আর কি করিবেন!

অতি রুষ্ট নন্দ তাহার জমির দিকে চলিল। বার বার ঘাড় নাড়িয়া সে আপন মনেই বলিল, না, না, না। জমি সে দিবে না। কিছুতেই না।

আরও কয় মাস পর।

শেষ পর্যন্ত জমি দিতে হইল। চারিদিক হইতে ব্যাপারটা এমন গোলমেলে হইয়া উঠিল যে, জমি না ছাড়িয়া আর তাহার উপায় রহিল না। কুমারী সিন্ধু সন্তানের জননী হইবে। সিন্ধুর সন্তান হইবে, পিতৃপরিচয়হীন। তাহার পিতা কে?

সমস্ত গ্রামে কোলাহল অস্ফুট হইতে স্ফুটতর, ক্রমে উদ্দাম হইয়া উঠিল। সিন্ধুর বাবা রাগে নীরব হইয়া গেল, এবং অজ্ঞাত রাহুমন্ত্রে সে নীরবই রহিল, গ্রামের কোলাহল অস্ফুট হইয়া গেল।

কিন্তু কৌতুকপ্রবণ, আলস্যপ্রিয়, সংসারচিন্তাহীন নন্দর বুকে বোঝাটা পাথরের মত চাপিয়া বসিল। আর সে পারিল না। নিজেই একদিন গিয়া রজনী রায়কে গোপনে আপনার জমি বিক্রয় করিয়া একগোছা নব কাগজের তাড়া হাতে করিয়া উঠিয়া আসিল এবং সিন্ধুকে গোপনে সন্ধ্যায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। তবুও পশ্চিমে অপর্যাপ্ত রক্তচ্ছটা। কেবল রজনী রায়ের চিনির কলের প্রায়-সমাপ্ত প্রাসাদ আপনার বিরাটকায় কৃষ্ণ দেহ দিয়া যেন সমস্ত পশ্চিমকে আবৃত করিয়া দিতে চাহিতেছে। নন্দ ও সিন্ধু তাহাদের শূন্য ক্ষেত্রের মাঝে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া। কারখানার কোন অন্ধ গহ্বর হইতে তেমনই ঝুনঝুন শব্দ উঠিতেছে।

রুদ্ধকণ্ঠে নন্দ বলিল, আমি চললাম সিন্ধু, নিজের লজ্জা মাথায় নিয়ে আমি চললাম। তোর লজ্জা তুই ঢাকিস। তবে যেন মরিস না, কি ছেলেকে মারিস না। তুই তাকে মানুষ করিস। তাকে যেন আমার

মত চাষ দেখতে দিস না; বুড়ে হয়ে যাবে, অকেজো হবে। ওই বাবুদের কলে দিস—মানুষের মত মানুষ হবে।

নোটের তাড়াটা নব শিশুর হাতে গুঁজিয়া দিয়া চুপ করিয়া গেল। শিশু কাঁদিতেছে। অকস্মাৎ এক ঝলক দমকা বাতাস তাহাদের মাথার উপরের তালগাছের পাতাকে ব্যথিত করিয়া বহিয়া গেল। পরক্ষণেই দূরে দেবতার মন্দিরে আরতির শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সেই গম্ভীর শব্দ ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া প্রথমে দূরের, পরে নিকটের, পরে তাহাদের মাথার উপর তরুশ্রেণীর শীর্ষদেশে শিহরণ তুলিয়া উর্দ্ধলোকে তারাগুলিকে আঘাত করিতে ছুটিয়া গেল। সে স্পর্শে তারায় তারায় শিহরণ জাগিল। তাহাদের এক সঙ্কোচনে মৃত্যু, অপর প্রসারণে জন্মের ইঙ্গিত। আরতির গম্ভীর শব্দে, তারাদের ইঙ্গিতময় স্পন্দনে পুরাতন দেবতার মৃত্যুর গান বাজিতেছে, নূতন দেবতা আসিবে। সন্ধ্যার অপস্রয়মান পিঙ্গলরাগ শিশুর শোকাতুর রক্তাভ চক্ষুতে তাহাদের প্রেমের যে অনির্বাণ চিতা জ্বালিয়াছে, তাহাতেও সেই মৃত্যুর সুর বাজিতেছে। অকস্মাৎ তাহাদের মাথার উপরে শূন্যলোকে সঞ্চরমান পক্ষীযূথের পাখার শব্দ উঠিল। মাথা তুলিয়া তাহারা দেখিল, অস্পষ্ট আলোকে এক দল বালিহাঁস উড়িয়া চলিয়াছে শস্যপূর্ণ নব নব ক্ষেত্রের সন্ধানে। এখানে শস্যের কাল শেষ হইয়াছে; ক্ষেত্র রিক্ত শূন্য। সেই পাখার শব্দে তাহাদের ক্রমক্ষীয়মান বন্ধন সমাপ্তির শেষ বিন্দুতে আসিয়া লয় পাইল। তারপর সেই ব্যথিত, ভীত, কম্পিত দম্পতি নীরব অশ্রুপাত ও দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেই পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া সন্ধ্যার অস্পষ্ট ছায়ালোকের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। সমগ্র বনভূমি, শস্যশূন্যা ধরিত্রী মূক ব্যথায় সে বিচ্ছেদ-দৃশ্য দেখিল, তারপর একবার ব্যথিত মর্ম্মর তুলিল।

শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অবশেষে

হে চিরপথিক, ধরা কি পড়িলে অবশেষে,
পথের ক্লান্তি তন্দ্রার মত আঁখির পাতায় নামিল কি,
প্রান্তরবাহী পথখানি তব ঠিকানা হারায়ে দূরদেশের
গ্রামের প্রান্তে আম্রবনের ছায়ায় আসিয়া থামিল কি।
দূরবিসর্পী পথখানি—
মেঠো কুটীরের লেপা আঙিনায়
চকিতে আসিয়া দিশা কি হারায়;
মায়া অভিনব স্নেহ কি তোমায়
মিটিমিটি দীপের হাতছানি ?
পথে বাহিরিলে সন্ধানে যার এইখানে ধরা দিল ও কি,
বিহ্বল আনত নয়ন-প্রান্তে সেই অধরাই ভালবেসে—
ধরা কি পড়িলে অবশেষে ?

হে শ্রান্ত পথিক, থামিলে এবার কার মোহে ?
পড়িয়াছে বেলা, এই অবেলায় বিশ্রামকামী মন তব,
তন্দ্রা-আবেশে স্বপন দেখিল সেই পুরাতন সমারোহের,
হে বিবাগী, তুমি ডুবিবে কি পুন রসের সাগরে অভিনব !
মুক্তিপিয়াসী যাত্রী হে—
মায়া-অঞ্জন পরিলে আবার,
থামে পথ, নামে নয়নে আঁধার
খোলে যে বন্ধ বাতায়ন-দ্বার
তমোবিদ্ধ রাত্রিরে !
নূতন ফুলেতে খসিল হাতের চিরপুরাতন আমলকী—
দূরের স্বপ্ন যাহা খোঁজে হায় তাও ঘরের কাছে এসে—
ধরা পড়ে গেলে অবশেষে ?

সংবাদ-সাহিত্য

যক্ষরূপী ধর্মের "আশ্চর্য্য কি ?" এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, জীবগণ প্রত্যহ যমালয়ে যাইতেছে ইহা দেখিয়াও মানুষেরা যে নিজেদের অমর ভাবে ইহাই আশ্চর্য্য। মহাভারতের পাঠকেরা জানেন, যুধিষ্ঠির এই উত্তর দিয়া ফুল মার্কস পাইয়াছিলেন। এই আশ্চর্য্যের চরমতম প্রকাশ বর্ত্তমানকালে আমাদের চারিদিকে যেমন দেখিতেছি, তেমনটি আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। গবর্মেন্ট স্বীকার না করিলেও আমরা অনুভব করিতেছি, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ভয়াবহ মূর্ত্তিতে প্রতিদিন আত্মপ্রকাশ করিতেছে; অনাহারজনিত মৃত্যুর সংখ্যা প্রত্যহ বাড়িয়া চলিয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, দেশের অবস্থা যেরূপ হইয়া আসিতেছে, তাহাতে বোধ হয় ১৩৫০--৫১ সালের মন্বন্তর ভয়াবহতায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকেও ছাড়াইয়া যাইবে। আকাশে বাতাসে তাহার আভাস পাইতেছি—মৃত্যুদূতেরা তাহাদের করালদংষ্ট্রা বাহির করিয়া আমাদেরই আশেপাশে ওত পাতিয়া আছে; আমাদেরই অন্তত শতকরা পঁচিশজন যে তাহাদের কবলে পড়িব, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। জেত্তাবনী-কথিত কলিযুগসমাপ্তি এবং সত্যযুগাবির্ভাব লইয়া যতই হাস্যপরিহাস করি না কেন, অপরিমিত মৃত্যুদানের মধ্যে যে একটা যুগশোধন হইতে চলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

• • •

রূঢ় না সত্য যাহাই হউক, যে আশ্চর্য্যের কথা যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন তাহাই এই ভীষণ বিপর্য্যয়ের মধ্যে আমাদিগকে সুস্থ রাখিয়াছে। দীর্ঘদিন রাত্রিজাগরণক্লিষ্ট সেবাপরায়ণা জননী সন্তানের শবদেহের পার্শ্বেই যেমন নিশ্চিন্ত নিদ্রায় সুখস্বপ্নে নিমগ্ন হইতে পারে, আসন্ন মৃত্যুর মুখেও আত্মবিস্মৃত মানুষ তেমনই পৈশাচিক উল্লাসে মত্ত হয়। এই অস্বাস্থ্যকর উল্লাস আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। নন্দনকাননে সুন্দর-নন্দনেরা অমৃতের প্রভাবে মৃত্যুকে যেভাবে উপহাস করিয়া চলে, সরকারী ছাপা-অমৃতের বাহুল্যে আমাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় তেমনই মত্তোন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। যখন সমস্ত দেশ মহা-দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইয়া

আতঙ্কগ্রস্ত, তখনই ইহারা বস্ত্র বস্তমূল্য ও বিনিময়ের অস্বাভাবিক খেলায় মাতিয়া উৎসব জুড়িয়া দিয়াছে। কয়েকজন বিজাতীয় হালদারের বুদ্ধিকৌশলে প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তির সম্মুখে প্রোথিত যূপকাষ্ঠে বলি হইবার জন্য বাধ্য হইয়া সমগ্র দেশের ছাগসমাজ আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে, নিবারণ করিবার কেহ নাই। শ্মশানকালীর পূজা নানা-কারণে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং কর্তাবাহাদুরও চোখ বুজিয়া ভ্যা-ভ্যা রব শুনিয়া ইষ্টনাম জপিতে জপিতে পুলকিত হইয়া উঠিতেছেন। ছাগেদের সান্ত্বনা এইমাত্র যে, যুধিষ্ঠিরপ্রোক্ত জীবধর্মবশে বর্তমানে আজ মৃত্যুকে ভুলিয়া থাকিলেও তাহাদের যূপকাষ্ঠ অন্যত্র প্রস্তুত আছে। এই সত্যটা তাহাদিগকে সম্যক উপলব্ধি করাইতে পারিলে মরিয়াও ছাগেদের সুখ।

—

বাংলা দেশের নিরীহ প্রজাপুঞ্জ বর্তমানে কিরূপ স্বৈরাচারের অধীন, গত ৫ই জুলাই তারিখে বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের অধিবেশনে ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব যে বিবৃতি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতেই প্রকট হইয়াছে। স্বায়ত্তশাসনের দিকে ভারতবর্ষকে অগ্রসর করাইবার জন্য যে শাসনপদ্ধতি ভারতবর্ষের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ প্রবর্তন করিয়াছেন, এবং যে পদ্ধতির শাসন-সৌকর্যের মহিমা বহিঃপৃথিবীতে উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইতেছে, তাহাই এই সুজলা সুফলা বাংলার মাটিতে কি কদর্যরূপ লইয়াছে, হক সাহেব তাহা দেখাইয়াছেন। এই সকল ব্যাপারে তিনিই অভিজ্ঞতম ব্যক্তি, প্রায় স্বয়ং বীজ পুঁতিয়া এই বিষবৃক্ষকে সংবর্দ্ধিত করিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে ইহার ছেদনচেষ্টা শাস্ত্র-বিগর্হিত হইলেও অমানুষিক নহে। মাননীয় গবর্নর বাহাদুর এখন পর্যন্ত এই বিবৃতির কোনও প্রতিবাদ করেন নাই। অর্থাৎ বাংলা দেশ হইতে চাউল রপ্তানি, নৌকা অপসারণ, নোয়াখালি ও মেদিনীপুরে নারীগণের লাঞ্ছনা প্রভৃতি গুরুতর ব্যাপারে যে সন্দেহ আমরা মনে মনে পোষণ করিতাম, এই বিবৃতির ফলে সমগ্র দেশের জনসাধারণের মনে তাহা স্পষ্টতর রূপ লইতেছে। আমাদের দুর্ভাগ্যের পরিমাণ আমরা

বুঝিতে পারিতেছি, এবং আরও হতাশ হইতেছি এই ভাবিয়া যে, এই কঠিনহৃদয় শাসকসম্প্রদায়ের কাছ হইতে আমাদের চরম বিপদে কোনও সাহায্যই মিলিবে না। বাংলা দেশের শেষ মহানুভব নরপতি যে সিরাজদ্দৌলা তাহার প্রমাণ এই যে, তিনি নাকি দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের আর্ত্তনাদ শুনিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, উহারা কি এক বেলাও পোলাও খাইতে পায় না। দেশবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহানুভূতি ছিল। বর্ত্তমান প্রভুরা অতিশয় অভিজ্ঞ, কিন্তু তাঁহাদের সহানুভূতি নাই। সুতরাং শেষ হউক কলিযুগ, সত্যযুগ আসুক—আমরা প্রস্তুত হইয়াই আছি। ১৫ই শ্রাবণ নাগাদ একটা কিছু বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেলে আমরা যে ইনকামট্যাক্স ও অনেক অগ্রিম চাঁদা দেওয়া গ্রাহককে ফাঁকি দিতে পারিব, সেই আনন্দেও তো এই কটা দিন মশগুল থাকিতে পারিব!

• • •

সত্যই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। কণ্ট্রোলের চাল আটা চিনির দুঃখ সহিয়া গিয়াছে, উহা লইয়া আর ভাবি না। কিন্তু এই প্রসঙ্গ লিখিবার কালেই দ্বারে সবৎসা ভিখারিণীরা কাতরকণ্ঠে "মা, মাগো" বলিয়া অবিশ্রান্ত চীৎকার করিতেছে। ছোলাভাজা মিশাইয়া মুড়ি খাইতেছিলাম, তাহাও মুখে রুচিতেছে না। এই দৃশ্য প্রত্যহ ঘরে ঘরে ঘটিতে দেখিতেছি। ক্রন্দন কোনও কোনও স্থলে দাবি হইয়া দেখা দিতেছে। যাহাদের সুখ নাই, তাহাদের সোয়াস্তিও নষ্ট হইতেছে। যাঁহারা সমগ্র দেশের সমর্থনে প্রতিকারের ভার লইয়াছেন, তাঁহারা স্বার্থসিদ্ধির ফিকিরে ঘুরিতেছেন। বিপুল জনতারূপী জগন্নাথের রথের চাকায় টান পড়িতেছে, আমরা মধ্যবিত্ত সমাজ এই রথের সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছি। রথ ভোগের মন্দিরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমরা দলিত পিষ্ট হইয়া মরিব। আমাদের আর্ত্তনাদ সত্যই আতঙ্কগ্রস্তদের আর্ত্তনাদ। দোহাই ঠাকুর, আমাদিগকে রক্ষা কর।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন—

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে আপনারা ঘোষণা করিলেন যে, আপনারা নাকি আপনাদের "হিতৈষী মহল কর্তৃক সাহিত্য-বহির্ভূত পলিটিক্স চর্চা না করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন।" আষাঢ় মাসের 'শনিবারের চিঠি' দৃষ্টে মনে হইল, আপনারা সে অনুরোধ সত্য সত্যই আদেশ হিসাবে শিরোধার্য করিয়া লইয়াছেন। বহুদিনের পুরাতন ও অনুরক্ত পাঠক হিসাবে এই সম্বন্ধে আমার দুই-চারিটা কথা জানাইবার আছে বলিয়া আপনাদের বহুমূল্য সময়ের খানিকটা নষ্ট করিতে দুঃসাহসী হইতেছি।

'শনিবারের চিঠি' সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকা এবং আপনারা সাহিত্যের জঞ্জাল দূর করিবার জন্য সমার্জনী হস্তে সতর্ক প্রহরী—এ কথা সত্য। কিন্তু আমাদের অধঃপতন শুধু সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ নয়, জীবনের সর্ববিষয়ে—কি সাহিত্য, কি ধর্ম, কি সমাজ, যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, এই অধঃপতনের চিহ্ন প্রকট। দেশের কোন সুস্থ এবং কল্যাণকামী ব্যক্তিই ইহাতে বিচলিত না হইয়া পারেন না এবং আপনারাও হইয়াছেন। তাই সাধারণ বিজ্ঞাপনের আপত্তিকর ভাষাও আপনাদের কশাঘাত হইতে অব্যাহতি পায় না। শনিচক্রের এই মতামত আমরা পাঠকেরা সমর্থন করি বলিয়াই 'শনিবারের চিঠি'র এই প্রতিষ্ঠা।

সমগ্র জাতীয় জীবনে আমাদের সমস্যার অন্ত নাই সত্য, কিন্তু আমাদের সমস্ত গ্লানি, কলঙ্ক ও সমস্যার মূল কারণ কি? দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও গুণী যাঁহারা এবং যাঁহারা আমাদের সর্বাপেক্ষা কল্যাণকামী তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, জাতিগত এই বিরাট অধঃপতনের একমাত্র এবং মূল কারণ—আমাদের জাতীয় পরাধীনতা। তাই দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা সমস্ত সমস্যার মূলে আঘাত হানিবার জন্য জীবনপণ করিয়াছেন, আমাদেরই কল্যাণকামনায় প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার—স্বাধীনতা অর্জনের ব্রত গ্রহণ করিয়া যাবতীয় "নিগ্রহ-লাঞ্ছনার মধ্যে জীবনাতিপাত করিতেছেন"। আমাদের পলিটিক্স-চর্চার সত্য রূপ ইহাই। এই পলিটিক্স-চর্চায় প্রত্যেকেরই শুধু যে মাত্র অধিকার আছে তাহা নয়, ইহা প্রত্যেকের ধর্ম বটে, কারণ পরাধীনতা কোনও শ্রেণীবিশেষের নয়, পরন্তু সমগ্র সমাজের অধঃপতন ঘটায়, এবং ছাত্র সাহিত্যিক চাকুরিয়া সকলেই এই সমাজভুক্ত।

এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্য রূপ আমরা দেখিতে পাইতেছি বর্তমান মহাযুদ্ধে। এই যুদ্ধকে স্বাধীনতা-যুদ্ধ বলা চলে কি না, এই বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকা সত্ত্বেও ইহাকে যাবতীয় "গালভরা" নামে অভিহিত করিতে ত্রুটি হয় নাই। আজ শুনিতেছি কৃষক হইতে কোটিপতি, জো লুই হইতে আইনস্টাইন নারীপুরুষনির্বিশেষে সকলেই ফাসিস্টদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। খুব ভাল কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ একই স্বাধীনতা-সংগ্রাম (to protect Home and Hearth নয়, কারণ ঐগুলা আমাদের বহু পূর্বেই

দিয়াছে। ঐগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস বলা যাইতে পারে) যখন আমাদের উপর কালির দোর চরম করিয়া ছাড়িয়াছেন যাঁহারা, তাঁদের বিরুদ্ধে পরিচালনার কথা উঠে, তখন চারিদিকে হিতৈষীমহলের দল তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠেন। প্রত্যেক মানুষের জীবনধারণের পক্ষে আলো ও বাতাসের মতই যাহা প্রয়োজনীয়, সেই স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করিবে নাকি এক বিশেষ সম্প্রদায়—যাহাদের "ক্ষেত্র স্বতন্ত্র, গোঁয়াড় আলাদা"—উহা হইতে ছাত্র, সাহিত্যিক, কবি, কেরানী প্রভৃতির দল শত হস্ত দূরে থাকিবে, এবং মাত্র যাঁহারা "জেলে গিয়া, ধর্মঘট ঘটাইয়া, দল বাঁধিয়া ও দণ্ড মারিয়া দাগী ও দাগু" হইয়াছেন, তাহারাই ঐ বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার যোগ্য—সুন্দর! সম্পাদক মহাশয়, একটি গল্প মনে পড়িল, জনৈক শ্বশুর মহাশয় নিজপুত্রবধূর আপত্তিকর মতিগতি দেখিয়া ধর্মে মতি হইতে পারে—এই আশায় একখানি মহাভারত কিনিয়া পড়িতে দিলেন। কয়েকদিন পর পুত্রবধূর কতটা উন্নতি হইল জানিতে কৌতুহলী হইয়া উঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বউমা, মহাভারত তো পড়িলে, কি শিখিলে বল তো? বউমা উত্তর দিলেন, শিখিলাম দ্রৌপদীর পাঁচজন স্বামী ছিল। বলা বাহুল্য, আপনাদের হিতৈষীমহলও ঐ বউমা-শ্রেণীর। সহস্র সহস্র দেশপ্রেমিকের আত্মোৎসর্গ ইঁহাদের চোখে পড়ে না, পড়ে মুষ্টিমেয় লোকের কুকার্য। ইহাতে স্বভাবতই সন্দেহ হয় এইসব হিতৈষীর দল কাহারা?

আমাদের শোষণ করিয়াই যাহাদের স্ফীতি, তাহারা আমাদের সকল বিষয়েই পঙ্গু ও অন্ধ করিয়া রাখিতে চায়, কারণ আমাদের চোখ ফুটিলে তাহাদের সর্বনাশ। সুতরাং অত্যাচার, অবিচার, জেল, পুলিস, গোয়েন্দা ছাড়াও উঁহাদের অনুগ্রহ-পুষ্ট এক শ্রেণীর জীব আছে, যাহারা ছদ্মবেশে হিতৈষী সাজিয়া আমাদের আশেপাশে বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত "সরকারের অনুচরের দল" আমাদের দুর্নীতির অতল গহ্বরে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে শোষক-সম্প্রদায়কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। কতকগুলি অর্থহীন বুলি ও হিতবাক্য ইত্যাদি উঁহাদের অস্ত্র। উঁহারাই প্রচার করিতে থাকে—"রাজনীতির গোঁয়াড় আলাদা" "সাহিত্যিকের পক্ষে রাজনীতি চর্চা অপরাধ", জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ সঙ্কীর্ণতা, ইত্যাদি। এই শ্রেণীর "কুইস্লিং" জাতীয় লোক প্রত্যেক দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়, পরাধীন দেশের তো কথাই নাই। দুঃখ উহাতে নয়, দুঃখ এই যে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগকেও উঁহারা বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করিতে সক্ষম হয়।

আমরা আশা করি এই সমস্ত ছদ্মবেশী হিতৈষীর দলকে আপনারা অচিরেই ইহা জানাইতে ত্রুটি করিবেন না যে, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকে কখনই কোন দেশেই পলিটিক্স-চর্চা বলে না। পরাধীনতা হইতে মুক্তির চেষ্টা প্রত্যেকেরই কর্তব্য নয়, ধর্ম—তাই জগতের শ্রেষ্ঠ ধার্মিক ব্যক্তি আমাদের এই "পলিটিক্স-চর্চার" পুরোভাগে, এবং তাই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্যিকও এই "সাহিত্যবহির্ভূত পলিটিক্স-চর্চা" কম করেন নাই।

এই পত্রের জবাব আমরা আষাঢ় সংখ্যায় "সংবাদ-সাহিত্যে"ই দিয়াছি। বর্ত্তমানে আমাদের একমাত্র পলিটিক্স ধাত্রীপান্নার পলিটিক্স। গত শতাব্দীকালের সাধনায় স্বাধীনতা অর্জ্জনের যে প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, মন্বন্তর এবং মহামারীর এই দুর্য্যোগ ও বিভ্রান্তির কালে সেটিকে যেমন করিয়াই হউক জিয়াইয়া রাখিতে হইবে। আজ শত্রুরা ঘরের মাসীপিসীর রূপ লইয়াই সে প্রবৃত্তির গলা টিপিয়া মারিতে চাহিতেছে সত্য; কিন্তু আমরা জানি, কারাগারের দ্বার একদিন আপনা হইতেই উন্মুক্ত হইবে। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন এই শিশুকে নন্দালয়ে অথবা কংসকারাগারে বাঁচাইয়া রাখিবার দায়িত্ব দেশের সাহিত্যিক-সম্প্রদায়ের। পৃথিবীর বহু দেশের ইতিহাসে ইহার নজির আছে। ভারতবর্ষের সম্মুখেও আজ মহা পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে। এই অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য আমরা সুকৌশলে পালন করিব। অযথা শক্তি ক্ষয় করিয়া কোনই লাভ নাই।

শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী "বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের বিচিত্র পরিণতি" নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠে পাঠকেরা কৌতুকিত হইবেন। "সংস্কৃতের অনুকরণের স্পৃহা বাংলায় ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান" সত্য, কিন্তু তাহা আদিশূরের আমলে আনীত কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণদের বৈদিক ধর্ম্মের মতই ভেজালাবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এগুলিকে "বিকৃতি" বলিয়া মৃতকে সম্মান ও জীবিতকে অসম্মান করিবার কোনই কারণ নাই। এই প্রবন্ধের নাম "সংস্কৃত ভাষায় বাঙালীয়ানার প্রভাব" দিলে আমরা উৎফুল্লিত হইতাম।

শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে'র গোড়ার ত্রিবর্ণ চিত্রটি (পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত) পুরাতন দমনীবেগম চিত্রের আধুনিক টকি-ভার্সন।

ভার্সন বলিতে দৈনিক 'যুগান্তরে'র কথা স্বতই মনে পড়িল। 'যুগান্তর' যে শুধু যুগান্তরই নয়—ভাষান্তরেও যে তাহার অপরূপ দক্ষতা, তাহার প্রমাণ প্রায়শই পাইতেছি। মূলের উল্লেখ থাকে না বলিয়া

লোকে ভাষান্তরকারীর কেরামতি ধরিতে পারে না। কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রাপ্য সম্মান হইতে বঞ্চিত হন—ইহা আমরা চাহি না; এই কারণেই প্রকাশ করিতেছি যে, গত ১৩ই জুলাই (২৮ আষাঢ়) তারিখের 'যুগান্তরে'র প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধ "বাংলার খাদ্য-সঙ্কটে"র নিম্নলিখিত অংশ—

কংগ্রেসের আভ্যন্তরিক চিন্তাধারাকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—(১) নিয়মতান্ত্রিক দক্ষিণপন্থীরা আইন সভায় ফিরিয়া গিয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য ব্যাকুল এবং যে কোন দলের সহিত যে কোন সর্তে কোয়ালিশন করিতে প্রস্তুত। ইঁহাদের নৈতিক চরিত্রের মেরুদণ্ড বক্র হইয়া গিয়াছে এবং ইঁহারা রাজনীতিক্ষেত্রে মডারেটদের অপেক্ষাও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন, (২) আর একদল আছেন, যাঁহারা রুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ এবং অচল অবস্থাকেই একমাত্র ভরসা বলিয়াই মনে করিতেছেন। ইঁহারা মনে করেন, আমলাতান্ত্রিক কুশাসন ও অকর্মণ্যতায় খাদ্য বস্ত্র সঙ্কট আরও কঠিন হইবে, তখন বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ আবার সংঘর্ষ বাধাইবে। কোয়ালিশনী মন্ত্রিমণ্ডল গঠন ইঁহারা আমলাতন্ত্রের নিকট আত্মসমর্পণ বলিয়াই মনে করেন। অন্ধ বৃটিশবিদ্বেষের দ্বারা চালিত হইয়া ইঁহারা সঙ্কটের দিনের দায়িত্ব, জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় গবর্ণমেণ্টের কথা চিন্তা করিতেও প্রস্তুত নহেন। এই সকল স্বদেশপ্রেমিক নিজেদের অজ্ঞাতসারে পঞ্চমবাহিনীর সহায়তা করিতেছেন। এই দুই-এর মধ্যে, (৩) আর একদল কংগ্রেসপন্থী আছেন, যাঁহারা অচল অবস্থায় বিরক্ত ও বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন এবং ইহার অবসানের জন্য ব্যাকুল। ইঁহারা জাতীয় ঐক্য গড়িয়া দুর্দিনে দেশবাসীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে চাহেন, কিন্তু নেতৃবৃন্দ কারাগারে থাকিতে তাহা কি প্রকারে সম্ভব ঠাহর পাইতেছেন না।

১১ই জুলাই তারিখের *People's War* নামক সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয় "To Thinking Congressmen" প্রবন্ধের নিম্নলিখিত অংশের অতি চমৎকার অনুবাদ।—

Among congressmen there are three trends.

At one end stand the old ministerialists whose slogan is any ministry is better than the advisers' regime: they are even prepared to act on their own and join any coalition. They are so demoralised as to become more Liberals than Congressmen.

At the other end stand the diehards who want to continue the deadlock rather than work to end it. They are for intensifying "struggle," they do not believe in national unity, they think coalition ministry is a surrender to the bureaucrats. They are so blinded by their anti-British hatred that they do not even see that their slogans coincide with those of the fifth column!

In the middle are the mass of Congressmen who are fed up with the deadlock, eager to end it, ready to welcome any steps that will lead to national unity and help the people in their dire distress. But they refuse to act because the leaders are in jail.

সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবেক আর একটু প্রখর হইলে আমরা হয়তো মৌলিক কিছু পাইতাম; ভাবান্তরের এমন অপূর্ব্ব নিদর্শনগুলি মাঠে মারা যাইত।

* * *

'আনন্দবাজারে'রও আনন্দ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। নানাবিধ বাস্তব আনন্দের আধিক্যে তাঁহারা এমনই বিচলিত হইয়া পড়িতেছেন যে, আজ সম্পাদকীয় মন্তব্যে যাহা লেখেন, কালই তাহার বিরোধিতা করেন। দৃষ্টান্ত দেওয়ার প্রয়োজন নাই। সমস্ত বাংলা দেশের বিহ্বল পাঠক-সম্প্রদায় এইরূপ দৃষ্টান্তে প্রাণ দোলনা-চড়ার সুখ পাইতেছেন।

* * *

আমাদের সত্যই কি সৌভাগ্য! দেশের জাতীয়তাবাদী দুইটি বাংলা দৈনিক পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ এমনই দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন যে, স্ব স্ব পরিচালিত সভাবিবৃতির শোভায় তাঁহারা কাগজ দুইটিকে শোভমান করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, অধিকন্তু চৌর্য্যবৃত্তি ও মস্তিষ্ক-বিকৃতির বাহারেও বিচিত্র করিয়া তুলিতেছেন।

বাঙালী জাতি যে দলাদলিপ্রবণ, শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে তাহার আর একটি প্রমাণ পাইলাম। কীটপতঙ্গের ক্ষেত্রেও শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রতিপক্ষ দাঁড়াইয়াছেন শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী; সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশয় জল বা তিম লইয়া পড়িয়াছেন। ভাবিতেছি, ইহার পর তাঁহার কি গতি হইবে!

আষাঢ়ের 'পরিচয়ে' "নিবেদনে" লিখিত হইয়াছে—

গত বৎসরে 'পরিচয়ের' আদর্শ যে যথাযোগ্য রক্ষিত হয় নাই সে বিষয়ে আমরা সচেতন আছি। আশা করি, আগামী বৎসরে 'পরিচয়ের' পূর্ব্বাদর্শ আমরা ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইব...।

আমরা আন্তরিকভাবে ইহাই কামনা করিতেছিলাম; কিন্তু আদর্শ যে ভাবে ভাঙিয়াছে, প্রধান-সম্পাদক মহাশয় কি পুনরায় তাহা জোড়া লাগাইতে পারিবেন? পারিলে আমরাই সর্ব্বাপেক্ষা খুশি হইব। আমাদের পক্ষে এই সংখ্যার 'পরিচয়ে'ই (পৃষ্ঠা ৮৯০) ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত একটি অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

হিন্দু-বিবাহে স্ত্রীর মর্য্যাদা স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ন্যায় হয়। তাহার আর কোন ব্যক্তিত্ব থাকে না।

—

যে সকল নারী সত্যসত্যই আত্মপ্রতিষ্ঠা চাহেন, তাহাদিগকে শ্রাবণের 'ভারতবর্ষে' শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ লিখিত "নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা" পড়িতে অনুরোধ করি। লেখিকা প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছেন যে, পূর্ব্বের দেহশক্তির ও বর্ত্তমানের বুদ্ধির যুগে নারী অপেক্ষাকৃত অপ্রতিষ্ঠিত থাকিলেও ভবিষ্যতে যখন প্রেমের যুগ আসিবে, তখনই নারীর যথার্থ প্রতিষ্ঠা হইবে। আমরা যাহাকে সচরাচর প্রেম মনে করি, সে প্রেম নয়, এমন কি

নারী স্বয়ং যাহাকে প্রেম মনে করিয়া নিজের সর্ব্বস্ব তাহাতে বিলাইয়া বসে, জীবনের সকল বৃহত্তী প্রেরণাকে দূর করিয়া উহারই একাগ্র অনুশীলন করে, তাহাও বিকৃত। তাহাতে শক্তি নাই, গৌরবও নাই। পুরুষের সোহাগের কণা পাইবার জন্ত ব্যাকুল প্রত্যাশায় বসিয়া থাকা, সামান্তমাত্র ব্যতিক্রমে অভিমানে অশ্রুবন্যে উথলিয়া উঠা, স্বামীপুত্রপরিজনের তুচ্ছতম অমঙ্গলের আশঙ্কায় কাঁদিয়া কাটিয়া সারা হওয়া ও পদে পদে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাদের গতি প্রতিহত করা—ইহার নাম প্রেম নয়, অক্ষমতা ও দৈন্যের চরম লক্ষণ, একপ্রকার স্নায়বিক উত্তেজনা।

এই উত্তেজনায় আমরা পুরুষেরাও উত্তেজিত হইয়া আছি, সুতরাং আমাদেরও অবহিত হইতে হইবে।

—

এই সংখ্যায় 'ভারতবর্ষে'র একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "শ্রীজয়দেব কবি"। 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের রচয়িতা জয়দেবের ৩১টি শ্লোক 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' নামক শ্লোকসংগ্রহগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া সুনীতিবাবু তাহার বিচার করিয়াছেন। এই গ্রন্থ

১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে জয়দেবের সমসাময়িক পণ্ডিত, ও কবি বটুদাসের পুত্র শ্রীধর দাস কর্তৃক সংগৃহীত হয়। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর হইতে এই সঙ্কলন-গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। বাংলা দেশে রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় এই গ্রন্থ বহুমূল্য। সুনীতিবাবু সাহিত্যরসিক সমাজের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। এই প্রবন্ধে জয়দেব সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত প্রাপ্ত যাবতীয় উপাদানই স্থান পাওয়াতে আমাদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

—

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মুহুর্মুহু আপ্তবাক্য বলিতে পারেন বলিয়া সমগ্র দেশের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন; সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার খ্যাতিতে ভাগ বসাইলেও অরিজিন্যাল প্রোটোটাইপ অপেক্ষা এখনও শ্রেষ্ঠ আছে। তবে আপ্তবাক্যের অনেক দোষও আছে—মাঝে মাঝে ভুল হইয়া যায়; তখন ঠাকুরের মুখের দিকে একান্তভাবে যাহারা চাহিয়া থাকিতে অভ্যস্ত, তাহাদের বড় কষ্ট হয়। যেমন অনেকের হইয়াছে বৈশাখ সংখ্যা 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র "গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে। গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করিতে গিয়া তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাকে বলিয়াছেন, "অত্যন্ত রূঢ়···মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা"। এটি ভুল। বঙ্কিমচন্দ্রও "গুণগ্রাহী" ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের নিম্নলিখিত পত্রে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে—

"পদরত্নাবলী" পাইয়াছি। কিন্তু সুখ্যাতি কাহার করিব? কবিদিগের না সংগ্রহকারদিগের? যদি কবিদিগের প্রশংসা করিতে বল, বিস্তর প্রশংসা করিতে পারি। আর যদি সংগ্রহকারদিগের প্রশংসা করিতে বল, তবে কি বলিব আমার লিখিবে, আমি সেইরূপ লিখিব। তুমি এবং রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রহকার, তখন সংগ্রহ যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা কেহই সন্দেহ করিবে না এবং আমার সার্টিফিকেট নিষ্প্রয়োজন। তথাপি তোমরা যাহা লিখিতে বলিবে, লিখিব।

আমাদের মনে হয়, গুণগ্রাহিতায় বঙ্কিমচন্দ্র এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকেও হার মানাইয়াছেন।

'প্রবাসী' ব্রাহ্ম হইলেও 'মাসিক মোহাম্মদী'র এঁটো পাত কুড়াইবেন, ইহা আমরা আশা করি নাই। আষাঢ়ের 'মাসিক মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত শামসুন নাহার লিখিত "শিশু সাহিত্য" প্রবন্ধ কি এতই উৎকৃষ্ট যে, শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে তাহা মূল প্রবন্ধ হিসাবে ছাপাইতে হইয়াছে? সম্ভবত "শিশু সাহিত্যে"র লেখিকা শিশুসুলভ সরলতা লইয়া দুই নরগাত্তেই মুরগি জবাই করিয়াছেন।

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের সম্মিলিত সংখ্যা 'মোহাম্মদী' নানা কারণে উল্লেখযোগ্য; এটি "সাহিত্য-সম্মেলন সংখ্যা"; বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সমাজের দান এবং ভবিষ্যৎ আশার কথা যাঁহারা জানিতে চাহেন, এই সংখ্যা হইতেই তাঁহারা অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। পাকিস্তানী উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনার দ্বারা স্থানে স্থানে কণ্টকিত না হইলে এই ইতিহাস আরও নির্ভরযোগ্য হইত।

'শনিবারের চিঠি'তে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ-ক্ষমতার প্রশংসা করিয়া কিছুকাল পূর্বে যে প্রসঙ্গ বাহির হইয়াছিল, ইণ্ডিয়ান পি. ই. এন.-এর সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সোফিয়া ওয়াডিয়ার দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করিয়া সেওড়াফুলির মহামায়া-সাহিত্য-মন্দিরের শ্রীযুক্ত বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার জবাবে শ্রীযুক্তা ওয়াডিয়া লিখিয়াছেন—

I have looked into a recent issue of the 'Sanibarer Chithi'. There the charge against Buddhadev is not that he is a writer of obscene literature, but that he is a plagiarist from Aldous Huxley, Michael Arlen etc. In my opinion both those charges might have some foundation ten years ago when he was an unemployed youngster struggling for his daily bread with the help of his pen. There was then a public demand for hot stuff brewed in foreign lands, but bottled in Bengal.

বাকে মামার বাড়ির সংবাদ দিবার প্রবৃত্তি দেখিতেছি শুধু বাংলা

দেশেরই একচেটিয়া নহে। বুদ্ধদেববাবু কলিকাতার তথাগত অবস্থায় এতখানি বিব্রত হইয়াছিলেন কি না, তিনিই বলিতে পারিবেন।

—

ফ্যাসিস্টবিরোধী একটি সাম্যবাদী পত্রিকা যে সাম্যবাদ বাংলা দেশে প্রচার করিতে চাহেন, শুধু প্রবন্ধের মারফতেই তাহা সম্ভব হয় না বলিয়া গল্প-কবিতাগুলিও তদনুযায়ী "রূপায়িত" করিতেছেন। কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি।—

'যাই বলো বাইরি', সহসা যেন অনেকটা অনুরাগ হয়ে এলো বকফুলি, 'পাগলার বাংলা ছাড়তে পারবী তার বৌ-এর সাথে পিরিতি করে হাত যেন ধরে যায়, না তুই পারি! আর ভালো তোমার ওই ইয়েরি বই, যে যাকে ইচ্ছে পাগলার বেকসুর ছুঁড়ে চলেছে। পাঁচার আড়ালে আর কী হয় কে জানে বাবা।

• • •

কিন্তু পাগলার ওই টাকাই সব ওড়ে বাদি দিয়াছে। বুঝলে যে, তোমার মতো মুরোদই থাক না, ওই পাগলার বড় লোকের ছেলে হবে না জানলে তো পাত্তা সব ব্যাপারেই—

• • •

আর একটি গল্প।

বুধনি একদিন বাজারের বেজো হ'ল।...প্রত্যহ সন্ধ্যায় শহরের মটর এসে দাঁড়ায় বুধনির বাড়ীর গেটে।...ওর দেহের অভ্যন্তরে একটি নতুন জীবের প্রথম সূচনা।...বুধনির মনে বাধ্যের অস্থির প্রতিক্রিয়া। যে সন্তান জঠোরে (?) একটু একটু করে বাড়ছে সেই ওর জীবনে এখন প্রধান সমস্যা। হাঁ, ও ঠিক করেছে এই সন্তানকে বাঁচতে দেবে না। ধনী শহরের প্রতিক্রিয়াশীল রক্তে ওর জন্ম। প্রাচীন রক্তের বনিয়াদে ওর জীবাত্মা পরিস্ফুট। রক্তবীজের ঝাড়ের বংশধর। ওর ধমনীতে বইছে ওদের প্রাচীন পাপ রক্ত। ওকে মরতেই হবে।

একদিন নিশুতি রাতে শিশু ভূমিষ্ঠ হ'ল।...ডাষ্টবিনের মধ্যে পেলো আবার।...শিশুর গলায় পাঁচটি আঙুলের দাগ স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে ফুটে আছে।

• • •

এই পত্রিকাটি কলিকাতার শহরতলী হইতে প্রকাশিত হয়। মফস্বলের একটি সমধর্মী কাগজে ইহার গুণকথা এইরূপ—

তরুণ সাহিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার আগে ভেবে দেখা উচিত যে কি উপাদানে তরুণ-চিত্ত আজ গড়ে উঠেছে। এখনকার সমাজে বাস ক'রে যদি কেউ আমাদের বলেন সাহিত্য-দর্শনের মহাকাব্য লিখতে, আমরা তাঁকে বলবো যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব ফিরিয়ে আনতে। হ'তে পারে মহাকাব্যের চরিত্রদের তুলনায় এখনকার চরিত্রগুলি খুব অল্প পরিসর পরিধির মধ্যে রূপ নিচ্ছে, কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে যন্ত্রযুগ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির দ্বন্দ্ব এ যুগের মানুষকে অনেকখানি খর্ব ক'রে দিয়েছে, অনেকখানি পিষে ফেলেছে তার কল্পনাকে যার ফলে এখনকার সাহিত্য Realist রূপ নিচ্ছে।

আসল কথাটা এই : এ মন-সমুদ্র-গর্ভে প্রাক্‌-প্রলয়ের নেই শ্রেণীভেদ
বিকল তৃষ্ণা-হ্রদে শেষের সঙ্গীত গাহে নির্লিপ্ত-নির্বেদ।

আমরা কোনও মন্তব্য করিতে চাহি না। নূতন মতবাদ সমাজদেহে কি ভাবে অলক্ষিতে প্রবেশ-পথ খুঁজিতেছে, সেই বিষয়েই সকলকে সচেতন করিতে চাই।

সম্প্রতি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে মধুসূদন দত্তকে লইয়া নানাবিধ গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে। হয়তো ছেঁড়া পোশাক সহজলভ্য বলিয়া ইঁহারা মধুসূদনকে যতটা সম্ভব কাতর করিয়াই দেখাইতেছেন। ইহাতে মধুসূদনের আত্মীয়গোষ্ঠীর একজন শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় আমাদের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়া সত্যনির্ণয়ে আমাদিগকে সহায়তা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক মধুসূদনকে সাহায্যদান ব্যাপারেও অনেক অতিশয়োক্তি আছে; মিত্র মহাশয় সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের জীবনীটিই এই সকল প্রচলিত ধারণার মূল; নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় বসু মহাশয়ের অনেক উক্তি খণ্ডন করিয়াছেন। আমরা এ কথা আজ নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, উত্তরপাড়ায় অবস্থানকালে "মধুসূদনের ক্ষুধাতুর শিশু দুইটি…পর্যুষিত অন্নে" কখনই উদরপূর্তি করে নাই অথবা

মধুসূদন বোতল বদলে কখনই পাওনাদারগণকে তাড়াইতে যান নাই। নাটকের প্রয়োজনে মধুসূদনকে এতখানি পরিবর্তন করিবার অধিকার না লইলেই ভাল হইত।

—

সম্প্রতি আমরা কলিকাতার বিড়ি-সিগারেটপায়ীগণ অত্যন্ত বিপন্ন হইতে বসিয়াছি; ট্রামে বাসে নাকি অতঃপর ধূমপান নিষিদ্ধ হইবে। এই ভাবে ধীরে ধীরে যদি আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপহরণ করা হয়, তাহা হইলে জাতিগতভাবে আমরা কখনও স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিব কি; দুইটি পুরুষ-ট্রাম-বাসের পর একটি নারী-ট্রাম-বাস নিযুক্ত করিলেই তো ল্যাঠা চুকিয়া যায়।

—

ক্ষ্যাপা কুকুরে কামড়াইলে হাইড্রো-ফোবিয়া হয়। ক্ষ্যাপা মতবাদ ক্ষ্যাপা কুকুর অপেক্ষাও মারাত্মক; 'শাশ্বত'-ফোবিয়ার অবস্থায় পৌঁছিলে রোগীকে আর বাঁচাইবার কোনও উপায়ই থাকে না। মনস্বী পাস্তুরের আমলে এই রোগটা তেমন প্রকট হয় নাই বলিয়াই আমরা অত্যন্ত বিপন্ন হইতেছি। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে দৃষ্টি দিলে ভাল হয়। শ্রীযুক্ত সমর ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন—

'অমর' বা 'শাশ্বত'র ঠাঁই কম্যুনিজম্‌-এর কোথায় যে আছে—এবং থাকলেও তা কম্যুনিজম্‌ কি না এ প্রশ্ন সোজাসুজিই তাদের করা যায়। অবিশ্যি এ প্রশ্নের উত্তর যে তাদের জানা নেই তা আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি। উত্তরের বদলে তারা নজির উপস্থিত করতেই ব্যস্ত: তারা বলে: 'যেমন সেক্সপীয়র বর্তমানে বৃটেনের চেয়ে সোভিয়েট রুশে বেশী সমাদর লাভ করেছে।' সোভিয়েট রাজ্যে সেক্সপীয়র অভিনীত হয় একথা সত্য। কিন্তু সোভিয়েট-প্রযোজক সেক্সপীয়রের হ্যামলেটকে আগাগোড়া একটি রুগ্ন চরিত্র হিসেবেই রূপদান করে থাকেন জানি। এ ব্যাপারটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। জীবন সম্বন্ধে বলিষ্ঠ ও সুস্থ আদর্শের সন্ধান পেয়েছে সোভিয়েট রাজ্যের লোক—হ্যামলেটের মত একটি নিউরোটিক চরিত্র তাদের কাছে যে হাস্যাস্পদ মনে হবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। যে সভ্যতাকে বাতিল করে দিয়ে সোভিয়েট রাজ্য মানুষের নূতন সভ্যতার পত্তন করতে চায়—সে সভ্যতায় আশ্রিত সাহিত্য সোভিয়েট রাজ্যে সমাদৃত হচ্ছে এ-কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

অতি-আধুনিক মফস্বলীয় কবি "সাড়ী" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

তোমার গোলাপী সাড়ীখানি
দেছে টানি
আমাদের মাঝখানে একখানি
রঙ্গের পরদা।
তুমি যে একদা
ছিলে এক সাধারণ নারী
ওই সাড়ী
বারবার
সে কথাটি করে অস্বীকার।
সাড়ীর এপাশে বসে দেখি শুধু আমি,
ওপাশে এসেছে যেন নামি—
একখানি সোনালী স্বপন;
ওপাশের উদ্বেলিত তোমার যৌবন
মনে হয় যেন এক কিংশুকের উষ্ণ প্রস্রবণ।
এ তীরে বসিয়া মোর মনে হয়, ও
তীরের তুমি
যেন জন্মভূমি
লক্ষ লক্ষ রাঙা গোলাপের—
আমার মনের যত রক্ত প্রলাপের।
প্রভাতে সন্ধ্যায় ও সাড়ীর তুমি
মাঝখান দিয়ে
দিতেছ বিছিয়ে
দূরের নয়নে মোর কামনার আরক্ত অঞ্জন,
গোলাপী রংএর জাল করিছ বয়ন।
ওপারে হাসিছ সাদা হাসি,
এপারে তা আসি
রক্ত হ'য়ে পশে মোর প্রাণে;
ওপারের অশ্রু তব এপারে মিশিছে
মোর গানে।
এইরূপে পাশাপাশি বসে মোরা
আছি চিরকাল,
মাঝখানে-একখানি সাড়ীর আড়াল।

শাড়ির এই প্রশস্তিতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই, কিন্তু শহরবাসী কবিদের সমস্যা শাড়ি নয়, উহা একান্ত কাজিল ব্যাপার, টানিলেই খুলিয়া যায়। শাড়ি ছাড়াও তো বাধার অন্ত নাই। মফস্বলের কবিরা এ বিষয়ে অনেক বেশি সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে। তবে বস্ত্রসমস্যা যেরূপ নিদারুণ হইয়া আসিতেছে তাহাতে মনে হয়, উপরি-উদ্ধৃত কবিতা শহরেও অচিরাৎ প্রযোজ্য হইবে।

—

বহরমপুর হইতে প্রকাশিত বহরমপুর-পূর্ণিমা-সম্মিলনীর ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'পূর্ণিমা'র প্রথম সংখ্যায় অন্যতর সম্পাদক শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের "সে যুগের কথা ও রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে বাংলা দেশের বর্ত্তমান কালের সাহিত্যিকদের জানিবার অনেক খবর আছে। লেখক সূত্রপাতে যে সহজ শ্রদ্ধার কথা অবতারণা করিয়াছেন, তাহার অভাবেই এ যুগের সাহিত্যিকেরা শক্তিহীন হইতে বসিয়াছেন। বাগচী মহাশয়ের প্রবন্ধে আমরা একটা আদর্শ পাইতেছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ২৫ ও ২৬নং গ্রন্থ যথাক্রমে 'বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত' এবং 'শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার, রামচন্দ্র মিত্র।' ঊনবিংশ শতকের বাংলার তিনজন প্রসিদ্ধ কবি ও দুইজন পণ্ডিত ব্যক্তির পরিচয় বিস্মৃতির গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু আমাদের আত্মবিস্মৃতি-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন প্রণীত 'ভারতের সংস্কৃতি'। মাত্র ৭৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার একটি চমৎকার পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। "বনফুলে"র বিরাট উপন্যাস 'জঙ্গমে'র প্রথম অধ্যায় স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। প্রায় আড়াই শত চরিত্র লইয়া এই উপন্যাসটি স্বল্পপ্রাণ বাঙালীর বিস্ময় উৎপাদন করিবে। শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সোনার পদ্ম' নাটকটি 'দীপান্তর' নাম লইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীস্নেহলতা দেবীর 'অঞ্জলি' একটি সুখপাঠ্য কাব্যগ্রন্থ। কবিকে আমরা সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি। 'কলির শেষ' শ্রীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের যুগপরিবর্ত্তন সংক্রান্ত গবেষণা-পুস্তক। ১লা আগস্ট পার না হইলে এ সম্বন্ধে কিছুই বলা চলিবে না। *Rigvedic Culture of the Pre-Historic India*—স্বামী শঙ্করানন্দের নূতন বই। মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতাকে ইনি বৈদিক সভ্যতা বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, পুস্তকখানিতে পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার পরিচয় ছাড়াও অনেক নজির আছে। বিষয়বস্তুবিচারের অধিকারী না হইলেও আমরা বইখানি পড়িয়া অনেক নূতন খবর পাইয়াছি।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বাহির হইল !! বাহির হইল !!

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন নাটক

'সোনার পদ্ম' বা

দ্বীপান্তর ১।০

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্প-সংগ্রহ

রাণুর তৃতীয় ভাগ ২৲

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

শ্রীসজনীকান্ত দাসের—হাসির গল্প

কলিকাল ২।০

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

০ ০

নীচের বইগুলি সম্প্রতি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সকল অসুবিধা-সত্ত্বেও এগুলি পুনর্মুদ্রণ করিতেছি।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রাইকমল (উপন্যাস)

চৈতালী ঘূর্ণি (উপন্যাস)

রসকলি (গল্প-সংগ্রহ)

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

রাণুর প্রথম ভাগ (গল্প-সংগ্রহ)

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরীর

শৃ ঙ্খ ল (উপন্যাস)

রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা



মহালক্ষ্মী

সূচী

আশ্বিন—১৩৫০


-গন্ধে
সুবাসিত
ক্যাষ্টর অয়েল
আপনার
পিতামহ ও পিতামহী
এই কেশ তৈলই
ব্যবহার করিতেন
নকল হইতে সাবধান
Bathgate & Co.
CHEMISTS
CALCUTTA

আন্নাকালীকে খোলা চিঠি

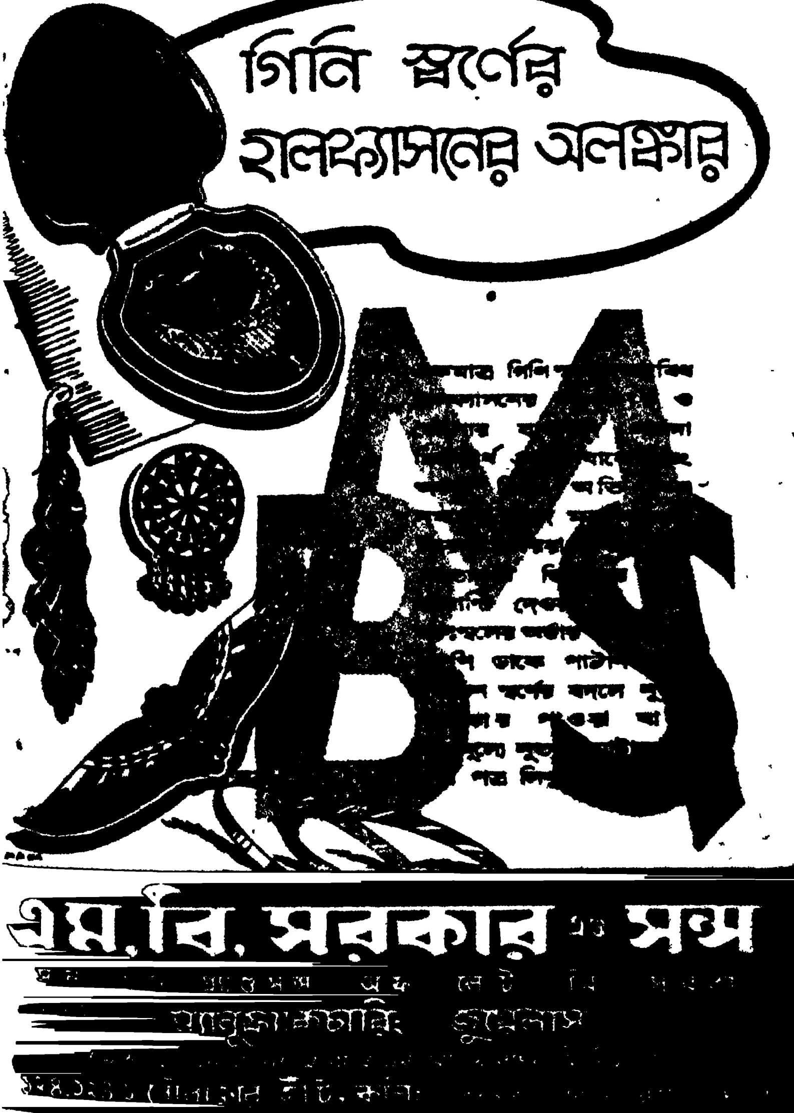
ভাই আন্নু,

যে অবস্থায় আজ তোমাকে দেখে এলাম, তা কেবল আমাদের এই হতভাগা দেশেই সম্ভব। তা যদি না হ'ত, তবে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি শিশু এখানে এসে মরত না, এদেশে মেয়ে হওয়াটা যেন একটা মস্ত অভিশাপ! এ কথার সাক্ষী দিচ্ছে তোমার নাম। ষষ্ঠীর দিনে তোমার মা "আ—র—না" ব'লেই তোমার কপালে টিপ দিয়েছিলেন। আর আজ তোমার নিজের বেলাও সেই "আ—র—না"র পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে! মাসের পর মাস ঠিকই আসে—কিন্তু প্রতি মাসেই গোলযোগ লেগে থাকে। একে তো তোমার শরীরের এই অবস্থা—তার ওপর বাচ্চাবাচ্চাগুলো যে কি জ্বালাতনই না করে তোমায়! এর পর আবার ভোরে উঠে অফিসের ভাত! শরীর বইবে কেমন ক'রে!

আমাদের তুলসীর হাতে ১ শিশি ভাল ওষুধ পাঠাচ্ছি—নাম "লেডিলাক্স্ উইথ্ অশোক" (Ladilux with Ashoke)। আধুনিক বিজ্ঞান আর আয়ুর্বেদ মতে এ তৈরি। আমার মনে হয় ১ শিশিতেই তুমি অনেকটা ভাল হবে। সেরে উঠে "টনিক" হিসেবেও খেতে পার। সংসারের সঙ্গে যুঝবার নিত্য নতুন শক্তি পাবে। ওষুধটা খেয়ে কেমন থাক আমায় জানিয়ো।

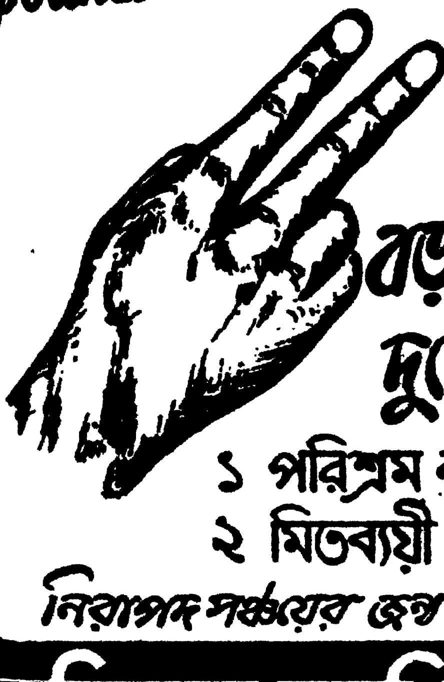
হাঁ, আর একটা কথা। আরও যদি দরকার হয় তবে তোমাদের পাড়ায় ডাক্তারখানা থেকে আনিয়ে নিয়ো। সেখানে না পাওয়া গেলে, ইণ্ডিয়া পিয়োর ড্রাগ কোম্পানি, ১।১।৪ ডি, বেণীনন্দন ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা, এই ঠিকানায় খবর নিয়ো। ইতি—

তোমার সবিতাদি


গিনি স্বর্ণের
হালফ্যাসনের অলঙ্কার
MBS
এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স


শিশুদের পক্ষে মাতৃস্তন্য অতুলনীয়
সন্দেহ নেই
কিন্তু
মাতৃ-দুগ্ধের অভাব
বা মাতৃদুগ্ধ বিকৃত
হ'লে, তার অভাব
'পূরণ করতে পারে
একমাত্র
ভিটো-মিল্ক
ন্যাশনাল নিউট্রিমেন্টস্ লিঃ ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

Take care of the pence and the pounds will take care of themselve



বড়লোক হবার দুটো উপায় —

১ পরিশ্রম করে আয় বাড়ান

২ মিতব্যয়ী হয়ে টাকা জমান

নিরাপদ সঞ্চয়ের জন্য :—

কলিকাতা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লি

একটি প্রগতিশীল লিমিটেড ও সাব্ ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক

হেড অফিস—১৫ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বঙ্গ, বিহার, আসাম এবং ইউ. পি'র সকল বাণিজ্যকেন্দ্রে এই ব্যাঙ্কের শাখা আছে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ. দত্ত



ফাঁক" কথাটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আলিবাবার বিস্ফারিত চোখের সামনে পাহাড়ের খুলে গেল। কম্পিত বক্ষে আলিবাবা সেই গহ্বরে প্রবেশ করে দেখল অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য সমস্ত পরিপূর্ণ। থাল থোকাই মোহর নিয়ে দরিদ্র আলিবাবা অল্পদিনেই মস্ত ধনী হয়ে উঠল। র দিনে মানুষ এমনি ভাবে ধনদৌলত লুকিয়ে রাখাকে মূর্খতাই মনে করে, কেননা এই ব্যাঙ্কিং-এর ানুষের ধনদৌলত ব্যাঙ্কের জিম্মায় শুধু নিরাপদেই থাকে না তার প্রসারও বহুগুণে বেড়ে ওঠে। টাকা আসে শুধু নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কের নিপুণ আর্থিক সুব্যবহারে। আপনি আপনার কাজ র ব্যাঙ্কের সাহায্য করেন তো?

রক: ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে,সি,এস,আই

ম্যানেজিং ডিরেক্টর:—শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

জিঃ অফিস—আখাউড়া (ত্রিপুরা)   চীফ অফিস—আগরতলা

কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।


চায়ের
ব্রুক বন্ড








ভারতীয় চায়ের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট
LIPTONS
TEA
লিপটনের
জাকুজা হোয়াইট লেবেল
এবং টি গার্ল চা
লিপটনের চা খেতে খেতে অসাবধানে কথা বলবেন না





শনিবারের চিঠি
১৫শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫০

বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্র

১

এই যে নূতন জীবন-দর্শন—শতাব্দীর আদিতে যাহার সূচনা, শতাব্দীর শেষভাগে সেই দর্শনের যাহা কিছু সুফল তাহাই আমাদের সাহিত্যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভায়। বঙ্কিমচন্দ্রেরই ভাব ও ভাবনায় অতঃপর যে সৃষ্টিশক্তি যুক্ত হইল তাহারই বলে সেই যুগধর্মের আবেগ একটি পূর্ণমণ্ডল রচনা করিয়া সঞ্জীবনী বাণীরূপে স্থিতিলাভ করিল। কিন্তু সে আলোচনার পূর্ব্বে একটু ভূমিকার প্রয়োজন হইবে।

আমার এই আলোচনা মুখ্যত সাহিত্যিক, নতুবা দেখা যাইত কত রূপে ও কত দিকে এই যুগ-ধর্মের লক্ষণ সেকালে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আন্দোলনেও যেমন, ব্যক্তির জীবনেও তেমনই ইহার প্রভাব অল্প অনুভূত হয় নাই। আমাদের জীবনে যেটুকু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছিল—এখনও আছে, তাহা অধ্যাত্ম জীবনের—মোক্ষমার্গের; এই আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে সমাজের বিধি-বিধানের মূলে—মুখ্যভাবে না হইলেও, গৌণভাবে—যে বেত্রদণ্ড উদ্যত ছিল তাহাতে মানুষের সহজ বিচার-বুদ্ধিও যেমন পথ পাইত না, তেমনই তাহার পৌরুষও পদে পদে খণ্ডিত হইত—ব্যক্তিরই স্বাধীন কর্ম্মে তাহা চরিতার্থ হইতে পারিত না। এই অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া সে-যুগের সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বপ্রধান স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মী কবি যে আদর্শ-সমাজের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি এই যুগপ্রবৃত্তির একটা লক্ষণ অতিশয় সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন—

—যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম্মধারা ধায়

অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি
পৌরুষেরে করে নি শতধা,—

—ইহাই ছিল বিদ্রোহের আত্মসচেতন দিক। সামাজিক কল্যাণকেও ব্যক্তির ব্যক্তিগত আদর্শের অনুগত করিয়া লওয়ার এই যে আকাঙ্ক্ষা, ইহার বীজও সেই যুগপ্রবৃত্তির মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। সমাজ-চেতনার সহিত ব্যক্তিচেতনার এই যে বৈষম্য ইহারই ফলে বিংশ শতাব্দীর সংক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে যে পলিটিক্যাল মুক্তিসংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতেও দেশ-কাল-পাত্রের ভাবনা ছিল না; ব্যক্তির মুক্তি-পিপাসাই জাতীয়তার জবানিতে অসাধ্য-সাধনের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, এবং তাহাতে আমরা অকাল-জাগরিত পুরুষের আত্মাহুতির নিদারুণ পরিণামই লক্ষ্য করিয়াছি। সমাজের সহিত ব্যক্তির একাত্মতা আজিও ঘটে নাই—অতএব আমাদের জীবনে নবযুগের সেই নবধর্ম, সেই মানবত্ব-বোধ পূর্ণ-সঞ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই, বিকারগ্রস্ত হইয়া শেষে বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। সে কথা এখন নয়, তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে সে যুগের এই প্রবৃত্তি ও তাহার প্রচ্ছন্ন ক্রিয়ার ক্রম-পরিণাম বুঝিয়া লইতে হইবে—তাহাতেই দেখা যাইবে, কোন্ সঙ্কট-নিবারণকল্পে তাঁহার সেই প্রতিভার উদ্বোধন হইয়াছিল—জাতির ভবিষ্যৎ পন্থা নির্দ্দেশে তাঁহার সেই বাণী এখনও কি অর্থে কতখানি সত্য হইয়া আছে ও থাকিবে।

২

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি নবযুগের সেই যুগধর্ম্মকে মানবধর্ম্ম নাম দিয়াছি, এবং তাহার অন্তর্গূঢ় আবেগ মধুসূদনের কাব্যচ্ছন্দে কিরূপ পূর্ণ-প্রকাশ হইয়াছে তাহাই দেখাইয়াছি। কিন্তু মধুসূদনের শক্তি ছিল যেন elemental—ঝড়ের মত, সাগরোর্মি-প্রবাহের মত; যেমন দুর্দ্দম, তেমনই সহজ-সরল, ভাবনা-চিন্তার কোন বালাই তাহাতে ছিল না।

পশ্চিমের শিক্ষার প্রভাবেই হউক, বা যুগধর্মের বশেই হউক—পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও এইকালে যে নূতন মানবত্ববোধের উন্মেষ হইয়াছিল কবি মধুসূদনই আমাদের সাহিত্যে তাহাকে সর্ব্বপ্রথম অসংকোচে ও অনবদ্যরূপে প্রকাশিত করিলেন। আমরা দেখিলাম, এতদিনে এ ভাব জাতির প্রাণমূলে পৌঁছিয়াছে—কারণ কবিই যুগ ও জাতির যথার্থ প্রতিনিধি। অতএব আমাদের সাহিত্যে নূতন জীবন-মন্ত্রের ঘোষণা হইয়া গেল—সে নূতনের আবির্ভাব সম্বন্ধে দ্বিধা-সংশয় আর রহিল না। মধুসূদনের কাব্যে সেই নূতনের আবির্ভাবকে বন্দনা করিতে হইলে আর এক কবির ভাষাই যথার্থ—

এবার আস নি তুমি বসন্তের আবেশ হিল্লোলে
পুষ্পদল চুমি
এবার আস নি তুমি মর্ম্মরিত কূজনে গুঞ্জনে
ধন্য ধন্য তুমি
রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ী রাজসম
গর্ব্বিত নির্ভয়
বজ্রমন্ত্রে কি ঘোষিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম
জয় তব জয়।·
হে দুর্দ্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন নিষ্ঠুর নূতন
সহজ প্রবল
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংসভ্রংশ করি চতুর্দ্দিক
বাহিরায় ফল
পুরাতন পর্ণ-পুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ
প্রণমি তোমারে।

—নব্য বাংলা সাহিত্যে নবযুগের বোধন ঠিক এমনই সুরে সম্পন্ন হইয়াছিল, মধুসূদনের কাল পর্য্যন্ত এমনই একটা নূতনের প্রবল প্রেরণা ভাবে কর্ম্মে ও চিন্তায় এ জাতির জীবনীশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তখন একটা নূতন পথে যাত্রার ব্যাকুলতা—অন্তরের অন্তরে কেবল বন্ধন-ছেদনের অধীরতাই প্রবল। ইহার পরে সেই অধীরতা—'ইয়ংবেঙ্গলে'র

সেই উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনা—অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইলেও, প্রতিক্রিয়া-মুখে এক নূতন ব্যাধির লক্ষণ ক্রমেই প্রকাশ পাইতে-লাগিল। ইংরেজী শিক্ষার গূঢ়তর প্রভাবেই মনের মধ্যে একটা বড় দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইল। আমি ইতিপূর্ব্বে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যস্পৃহার উল্লেখ করিয়াছি এইখানেই তাহার অঙ্কুর। এক দিকে সমাজ একটা বিরাট অচলায়তন হইয়া ব্যক্তির শ্বাস রোধ করিতেছে, অপর দিকে একটা অজ্ঞাত অপরিচিত গতি-পথ নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস-দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও যুক্তি-মন্ত্রে আকর্ষণ করিতেছে। এ পথ একরূপ মুক্তিপথই বটে, তখন মুক্তির আশ্বাসই বড় আশ্বাস; অধিক ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ তখন কোথায়? বাঙালীর প্রাণ নিছক চিন্তাবিলাস অথবা ভাবের উন্মাদনায় অতিসহজেই তৃপ্তিলাভ করে, তাই তত্ত্বের সত্য অপেক্ষা তত্ত্বের ভাবাবেগ তাহাকে বিচলিত করিল, এবং জীবনের ক্ষেত্রবিশেষে কর্ম্মের আদর্শ হিসাবেও এই মুক্তিমন্ত্র বরণীয় হইয়া উঠিল। তথাপি সংশয় ঘুচিল না, বরং তাহার সমাধান-চেষ্টা ভিতরে ভিতরে আরও বাড়িয়া উঠিল। রামমোহনে যাহা প্রধানতঃ বিচারের ক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল, বিদ্যাসাগরে যাহা সেবা-ধর্ম্মের আবরণে কতকটা আবৃত ছিল, এবং মধুসূদনে যাহা নিরুপদ্রব রসসৃষ্টিতেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, কোনখানে সমাজকে প্রত্যক্ষভাবে অস্বীকার করে নাই, তাহাই এক্ষণে গুরুতর সমস্যারূপে ব্যক্তির চিত্ত আক্রমণ করিয়াছে; শুধুই মানবধর্ম্ম নয়, ব্যক্তির স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসারূপে এক নূতন প্রেরণা হইয়া উঠিয়াছে। এইবার সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বে, নবযুগের সেই নবধর্ম্মের—মানবধর্ম্মেরই কঠিন পরীক্ষা আরম্ভ হইল। দেশের ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় ঘোরতর সংশয়বাদী হইয়া উঠিলেন, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অর্দ্ধপথেই দ্বিধাগ্রস্ত হইল। মনুষ্য-জীবনের অর্থ কি? মানুষের জ্ঞানে সত্যের ধারণা সম্ভব কি না? লোক-হিতের আদর্শ কি? ধর্ম্ম কাহাকে বলে? সমাজের মুখাপেক্ষিতা ব্যক্তির পক্ষে কতদূর আবশ্যক? ব্যক্তির যে স্বাধীনতা—মানুষের যাহা অপেক্ষা অধিক গৌরব নাই, তাহার সহিত শেষ পর্য্যন্ত সামাজিক জীবনের আপোস আদৌ সম্ভব কি না? নূতন মানব-ধর্ম্মের যে উদার ভাবাবেগ,

মানুষের হৃদয়-মনের শক্তি সম্বন্ধে যে অপরিমিত আশ্বাস—তাহার প্রেরণা ও উল্লাস এমনই নানা চিন্তায় সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; ব্যক্তি-ধর্ম ও সমাজ-ধর্মের মধ্যে যে সঙ্গতির প্রয়োজন তাহার উপায় সন্ধানে সেকালের ভাবুক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। এই সমস্যাই প্রধান সমস্যা হইয়া উঠিবার কারণ—ব্যক্তির স্বাধিকার-বোধের উগ্রতা; এবং ইহারও কারণ, বিদেশী শিক্ষার প্রভাবে স্বদেশীয় সমাজের সেই অবনত অবস্থার প্রতি প্রবল অশ্রদ্ধা ও অসহিষ্ণুতার উদ্রেক। ব্যক্তির মত জাতিও স্বকর্মফলভুক—সমাজের পাপ ও ব্যক্তির পাপ, সে পাপকে অস্বীকার করিয়া নিজে স্বতন্ত্র মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা মিথ্যা বলিয়াই নিষ্ফল হইতে বাধ্য। ইহার একমাত্র ঔষধ ওই মানবধর্মকেই একটা খুব বড় তত্ত্বের উপরে স্থাপন করা—সকল পাপ হজম করিবার মত ধ্যান, জ্ঞান ও হৃদয়-বলের সাধনা। এত বড় প্রতিভার তখনও আবির্ভাব হয় নাই—সাহিত্যেও যে সমস্যা ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছিল, জীবনেও তাহা তেমনই একটা কঠিন দ্বিধা-সঙ্কটরূপে যুগপ্রতিনিধি-স্থানীয় বহু ব্যক্তিকে বিপন্ন করিয়াছিল। কেহ সমাজ-সংস্কার, কেহ ধর্মান্তর-গ্রহণ, কেহ নাস্তিক-মনোভাব, কেহ বা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে কূল না পাইয়া একরূপ ঔদাসীন্য—প্রভৃতি নানা ভাব ও অভাব মূলক নীতির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধেই বাঙালীর নব-জাগরিত ব্যক্তি-মানসে সেই যুগপ্রবৃত্তিই একটা গভীরতর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল; এই চাঞ্চল্যের বহিঃপ্রকাশ যে কত রূপে হইয়াছিল তাহার কিছু পরিচয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুস্তকগুলিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু সেই চাঞ্চল্যের গুরুতর অভিব্যক্তি ও তাহার নিগূঢ় কারণ জানিতে হইলে একটু ভিতরে দৃষ্টি করিতে হইবে।

চাঞ্চল্যের একটা বড় কারণ, নিশ্চয় এই যে, ওই নূতন মানব-ধর্মের প্রেরণা অতিশয় সহজ হইলেও, এ জাতির সাধনায় তাহাকে সত্য করিয়া তুলিতে হইলে—তাহার রক্তগত সংস্কারের অনুকূল হইতে হইবে, এদেশের জল-মাটিতেই তাহাকে রোপণ করিতে হইবে। প্রাণের নির্জীবতা দূর করিবার পক্ষে এমন রসায়ন আর নাই, শুধু রসায়ন নয়,

ইহা স্বর্ণঘটিত সালসাই বটে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, মানবত্বের এই মহিমাবোধই সমগ্র জগতে মানবজাতির নবজাগরণ, মানবেতিহাসে যুগান্তর সূচনা করিয়াছে—ইহার ফলেই মধ্যযুগের অবসান হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য এই যে, তাহার একটা অতি প্রাচীন সাধনা ও সংস্কৃতির ধারা এখনও লুপ্ত হয় নাই, যখনই কোনও নূতন ভাবচিন্তা বা নবধর্ম্মের আঘাতে তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, তখনই সে তাহার সেই চিরন্তন সংস্কৃতি স্মরণ করে, নূতনকে পুরাতনের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া যুগধর্ম্মকেও সনাতনের সঙ্গে মিলাইয়া, তবে সে তাহার সঙ্গে রফা করিয়া থাকে। এবারেও সে যতক্ষণ না এই নূতন মানুষকে ও তাহার নূতনতর মহিমাকে সেই পুরাতন অধ্যাত্ম-তত্ত্বের দ্বারা শোধন করিয়া লইতে পারিয়াছে, ততক্ষণ সে তাহাকে অন্তরের অন্তরে গ্রহণ করে নাই—তাহার পূর্ণ-জাগরণে বাধা ঘটিয়াছে। এই নূতন মানবধর্ম্মের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যে য়ুরোপীয় সংস্কার ক্রমেই উন্মুখ হইয়া উঠিল, তাহা ভারতীয় সংস্কারের বিরোধী; তথাপি এই বিজাতীয় সংস্কার আর সকলের উপরে জয়ী হইবার উপক্রম করিল। আমি অতঃপর তাহার কথাই বলিব।

৩

এই যে মানবত্বের গৌরব-বোধ বা 'মানব-দেব'-বাদ ইহার অতি সহজ ও স্বাভাবিক প্রেরণায় মানুষের যে আত্মস্ফূর্তি বা আত্মপ্রসারের আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তাহাতে তাহার চিত্তের কার্পণ্য-দোষ বা হৃদয়-দৌর্ব্বল্য দূর হয়, আপন প্রাণশক্তির অসীম সাহসে সে পাপ ও মৃত্যু দুইকেই জয় করিতে পারে। ইহারই নাম—মানুষ কর্তৃক স্বমহিমার উপলব্ধি; মধুসূদন ইহারই প্রেরণায়—সেই মুক্তিকল্পনার আবেগে তাঁহার মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ যুগ যে কারণে মহাকাব্যের যুগ নয়, সেই কারণে, এই ধরনের আত্মস্ফূর্তিও এ যুগে সম্ভব নয়। মানুষ যে ক্ষুদ্র নয়—এই বোধ যেমন জাগিয়াছিল, তেমনই নবলব্ধ বিত্তারাজী তাহার মনুষ্যত্বকে পরিবর্দ্ধিত না করিয়া আত্মাভিমান বা অহঙ্কারকেই

পুষ্ট করিতে লাগিল, আত্মপ্রসারের পরিবর্ত্তে আত্মসংকোচের হেতু হইল; প্রাণের শক্তি অপেক্ষা মনের স্পর্দ্ধা বাড়িল, গ্রহণ অপেক্ষা বর্জ্জনই শ্রেয়স্তর হইয়া উঠিল। এক কথায় প্রাণবীর্য্যের উপরে মনোধর্ম্ম—মানবধর্ম্মের উপরে ব্যক্তিধর্ম্ম—জয়ী হইতে চলিল। ইহার ফলে, মনুষ্যজীবন বা মনুষ্যহৃদয় সম্পর্কিত সর্ব্ব বিষয়ে আর সেই বিস্ময়, শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি রহিল না, বরং পাপ-পুণ্য, শুচি-অশুচি, শ্লীল-অশ্লীল, ভব্য-অভব্য প্রভৃতির সম্বন্ধে এক নূতন বিবেক-বুদ্ধি অতিমাত্রায় সজাগ হইয়া উঠিল। এই বিবেক-বুদ্ধি আর কিছুই নয়—ইহাও সেই আত্মাভিমান-প্রসূত এক প্রকার মানস-ব্যাধি। বলা বাহুল্য, এই Morality-সংস্কার জাতীয় সংস্কৃতির বিরোধী, তথাপি সে যুগের প্রায় সকল মনীষী ও কর্ষিত-চিত্ত মানুষ এই সংস্কারের অল্পাধিক বশীভূত হইয়াছিলেন। এক দাসত্বের বদলে আর এক দাসত্ব গৌরবজনক হইয়া উঠিল—যাহারা শাস্ত্রবাক্য বা আপ্তবাক্যের শাসন মানিল না, তাহারাই অতিসংকীর্ণ অহংবুদ্ধির দাসত্ব করিয়া আত্মার মর্য্যাদা রক্ষায় অধীর হইয়া উঠিল। এই যে সংস্কার ইহার জন্য যুগপ্রবৃত্তিই দায়ী নয়, ইহা সেই প্রবৃত্তির একটা বিকার—ইংরেজী শিক্ষার অন্তর্গত খ্রীষ্টানী বা সেমিটিক খিয়লজি, পাপ-বাদ বা দেহ-আত্মার বিরোধবাদ হইতেই ইহা সংক্রামিত হইয়াছিল। সত্য-মিথ্যা, হিতাহিত, নীতি ও দুর্নীতির একটা নূতন মাপকাঠি সহসা কুড়াইয়া পাইয়া—নব্য শিক্ষিত-সম্প্রদায়—সে যুগের নেতৃস্থানীয়গণ—পরমোৎসাহে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন;—সর্ব্ববিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার একটা গোঁয়ারতমি তাঁহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল। সেকালের শিক্ষিত বাঙালী বহু সামাজিক প্রথা ও পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে লজ্জা বোধ করিতে লাগিল—এমনই রুচি-বায়ু ও শুচিবায়ুগ্রস্ত হইল যে মানুষ হিসাবেই—মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা আর রহিল না, তাহার দেহ ও মন দুইই ধোপা-কাচা করিয়া না লইলে, তাহার ভাষার গ্রাম্যতা-দোষ দূর না হইলে, তাহাকে দূর হইতে কৃপার চক্ষে দেখা ভিন্ন আর কিছু করা চলে না। এই কারণে মানবধর্ম্মকেই জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা শোধন করিয়া

লওয়া বড়ই আবশ্যক হইল। সে ধর্ম্মের মুখ্য অভিপ্রায় ওই দেহ-মনের পরিচ্ছন্নতা-সাধন; একজ তাহাতেও, ভগবৎ-সাধনার যে বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক স্পৃহা তাহাকে গৌণ করিয়া ওই morality-ই মুখ্য হইয়া উঠিল। এক বিষয়ে, সে ধর্ম্মও যুগপ্রবৃত্তির অনুকূল, কারণ তাহাতে কোন মিষ্টিক সাধনার স্থান নাই—মানুষেরই স্বার্থ বা বুদ্ধি-নির্দ্ধারিত কল্যাণ একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া বরণীয় হইয়াছিল; ভগবানকেও মানুষের উপাস্য হইতে হইলে, তাহার জ্ঞান-বুদ্ধি ও হিতাহিত ভাবনার দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং নীতি-দুর্নীতি সংস্কারের অধীন হইয়া আবির্ভূত হইতে হইবে। এই আদর্শের ঘোষণা আজিও থামে নাই; কিছুকাল পূর্ব্বেও এক বিজ্ঞানবাদী ধর্ম্মবীর এইরূপ ভাষায় তাঁহার মানব-ধর্ম্মের আদর্শ ঘোষণা করিয়াছিলেন—

No priest can lead us by the nose and make us believe in meaningless practices which profit no one but the professional priest. Free thought will be the watch word of the churches of the future....Religion will not be a theorem a Q. E. D. but a problem, Q. E. F.

—ভাষা ইংরেজী বলিয়া কেমন পৌরুষপূর্ণ হইয়াছে! কথাগুলিতে নূতন কিছুই নাই, তথাপি উদ্ধৃত করিলাম এইজন্য যে, একজন হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ ইংরেজ পণ্ডিত এই কথাগুলিই উদ্ধৃত করিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা মূল্যহীন নয়। তিনি লিখিয়াছেন—"The last sentence is like the rest obscure, but perhaps indicates the workings of the pragmatic bacillus even in the East". আমিও রামমোহনের ধর্ম্মতত্ত্বে এই "pragmatic bacillus" থাকার কথাই পূর্ব্বে ভিন্ন ভাষায় উল্লেখ করিয়াছি।

৪

সে যুগের সেই নবধর্ম্ম-প্রেরণা অবশেষে এমনই একটা বিপথে পড়িয়া তাহার সেই আদি-প্রবৃত্তির উদারতা ও প্রাণময়তা হারাইতে বসিয়াছিল। যে বিদ্রোহ মানব-জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তি-কামনায়, কবির কল্পনা ও কর্ম্মীর সমাজ-সেবায় এমন নিঃসংশয় হইয়া উঠিয়াছিল,

তাহার সে সরল গতি আর রহিল না, মনোধর্ম্মের সহিত হৃদয়ধর্ম্মের বিরোধ বাধিল, তাহার ফলে, মানুষের স্বাধীনতা-গৌরব সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া পড়িল—ব্যক্তির সহিত সমাজের, স্বাতন্ত্র্য-পন্থার সহিত লোক-সংগ্রহের, morality-র সহিত সর্ব্বভূতহিতের সমন্বয়সাধনে বড়ই বাধা উপস্থিত হইল। একটা তত্ত্বের যুক্তিমাত্রকে বন্ধনরজ্জু করিয়া, তাহারই সাহায্যে দল-বাঁধা—সেও যেমন মানুষকেই ছোট করা, তেমনই সমাজের সহিত কোনরূপ সত্য-বিশ্বাসের যোগ না রাখিয়া সকল বিশ্বাস সকল মতবাদ পরিহার করিয়া স্বাতন্ত্র্য-সুখ ভোগ করা—সেও একরূপ আত্মহত্যা। এমনই একটা আধ্যাত্মিক সঙ্কট ক্রমে দেখা দিয়াছিল, নাস্তিকতাই একটা উচ্চাঙ্গের নীতি হইয়া উঠিয়াছিল। ঠিক এই কালেই বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। যুগপ্রবৃত্তির সকল লক্ষণ—তাহার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া—তখন চারিদিকে প্রকাশ পাইয়াছে। পাদ্রী কৃষ্ণমোহনের খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচার; বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নব ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মানবসেবা; অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল, মহেন্দ্রলাল প্রভৃতির জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চ্চা; আচার্য্য কৃষ্ণকমলের নিরীশ্বর জ্ঞানযোগ ও মানবপূজার মন্ত্রজপ—এক দিকে এতগুলি পন্থা, এবং অপর দিকে কবি মধুসূদনের কাব্যচ্ছন্দে মানবগৌরব-গীতির ভেরীরব—বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য আসর যেন সুসজ্জিত হইয়া আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রও এই যুগেরই সন্তান—নব মানব-ধর্ম্মের মন্ত্র তাঁহার পক্ষে নিষ্ফল হওয়া দূরে থাক, সেই মন্ত্রই তাঁহাকে এমন গভীরভাবে বিচলিত করিয়াছিল যে, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না—তিনিই তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভাবলে সেই মন্ত্রকে পূর্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনিই সেই মন্ত্রকে মন্ত্রদ্রষ্টার মত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—বুঝিয়াছিলেন যে, নবযুগের ধর্ম্ম এই মানবধর্ম্মই বটে, পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের উপরেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা নির্ভর করে; জাগরণের মন্ত্র ঠিকই হইয়াছে, কিন্তু মনুষ্য-দেবতায় সেই সুমহান্ মূর্ত্তিকে অতিশয় সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে—অন্যের হস্তী-দর্শন-প্রণালীতে—দেখিবার উদ্যমই যত গোল বাধাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও প্রথমে একটু

অধিক মাত্রায় morality ও মানস-পরিচ্ছন্নতার পক্ষপাতী ছিলেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহার শাসন সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারেন নাই—যদিও এক উদারতর ও গভীরতর নীতির সহিত তাহার সামঞ্জস্য-সাধনও করিয়াছিলেন। কিন্তু আর একটি যে বড় তত্ত্ব তিনি তাঁহার পূর্ব্বগামীগণের পন্থাবিশেষ হইতে লাভ করিয়াছিলেন তাহারই প্রভাব তাঁহার সর্ব্বচিন্তার মূলে চিরদিন বিদ্যমান ছিল, তাহারই অনুচিন্তনে ও একাগ্র ধ্যানে তিনি মানবজীবনের মহত্ত্ব ও সদর্থ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারিয়াছিলেন।

এই তত্ত্বটির নাম—মানব-প্রীতি। কবে কেমন করিয়া ইহার বীজ তাঁহার অন্তরে এমন গভীর-প্রবেশ লাভ করিয়াছিল সে সংবাদ আমাদের জানা নাই; বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য জীবনচরিত আজিও লিখিত হয় নাই—এ কলঙ্ক রাখিবার স্থান নাই। এই মানবপ্রীতি প্রথমে যে রূপে তাঁহার চিত্তে ধরা দিয়াছিল এবং শেষে তাহা যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে পরিণত হইয়াছিল—এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহার সেই ক্রমোন্নয়ের কাহিনীই বঙ্কিম-চন্দ্রের কবিপ্রতিভার বিকাশ-কাহিনীর সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া আছে; এই তত্ত্বকেই শেষে পরমতত্ত্বের অঙ্গীভূত দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সাহিত্য-সাধনার সার্থকতা সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। শোনা যায়, তিনি প্রথম বয়সেই ফরাসী দার্শনিক আগুস্ত কোঁৎ-(Auguste Comte)-এর Positivism বা বিজ্ঞানসম্মত মানব-সেবা-ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার কারণ এই বলিয়া মনে হয় যে, তিনি মনুষ্য-ব্যক্তি অপেক্ষা মনুষ্য-জাতির কল্যাণকে—ব্যষ্টি অপেক্ষা সমষ্টির গৌরবকে উচ্চতর সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এই বিশ্বাসই ছিল তাঁহার জন্মগত (বা জন্মান্তরীণ) সংস্কার—তাঁহার প্রতিভার মতই প্রাক্তন সম্পদ। ইহারই প্রেরণায় তিনি নবযুগের সেই নূতন প্রবৃত্তিকে একটি পূর্ণ ও সার্থক রূপ দিতে পারিয়াছিলেন—ইহারই প্রেরণায় তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে তথা বাঙালীর সংস্কৃতিতে জীবন-সাধনার এক নূতন তন্ত্র—

রসে-রূপে, চিন্তায় ও ভাবের ঐশ্বর্য্যে—দশভূজা মূর্ত্তির মত সাকার করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই তত্ত্বের সজ্ঞান আশ্রয় যে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবেই ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ সেকালের হিন্দু-শিক্ষাদীক্ষায় বা হিন্দু-ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠানে ইহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র যে য়ুরোপীয় শিক্ষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন—অন্তত তাহার একটা বিশেষ গুণের পক্ষপাতী ছিলেন—সে পক্ষে প্রমাণের অভাব নাই। য়ুরোপীয় বিদ্যা ও সেই বিদ্যাজনিত পাণ্ডিত্য সংস্কারের নানা দোষ লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিলেও তিনি তাহার প্রভাব কখনও কাটাইতে পারেন নাই, বোধ হয় চাহেনও নাই; বরং সেই প্রভাবকে বিদ্রূপ করার ছলে তিনি যেন নিজেকেই বিদ্রূপ করিতেন। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মগত সংস্কার যেমনই হউক, তাঁহার সজ্ঞান ভাব-চিন্তায় যাহা কিছু মৌলিকতা তাহার মূলে ছিল নবযুগের নূতন মনোভাব, এবং তাহা যে কতখানি ওই ইংরেজী শিক্ষার ফল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। এই মনোভাবই জাতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির যোগে তাঁহার প্রতিভাকে এমন সৃষ্টিসাফল্যে মণ্ডিত করিয়াছিল।

৫

আমরা দেখিয়াছি, মানবধর্ম্মের এক অভিনব প্রেরণাই এই যুগধর্ম্ম বা আধুনিকতার নিদান। এই যুগে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের সহিত প্রকৃতি-বাদ যুক্ত হইয়া—মানুষকে তাহার শক্তি ও নিয়তি সম্বন্ধে একটা নূতনতর চেতনায় সচেতন করিয়া তুলিল। ইহাও দেখিয়াছি, যাহা প্রথমে প্রাণমনের প্রবল আকূতিরূপেই একটা বিদ্রোহের সূচনা করিয়াছিল—তাহাই শেষে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যস্পৃহাকে প্রবল করিয়া, ভাবচিন্তার ক্ষেত্রে, এবং জীবনেও, নানা বিপর্য্যয় উপস্থিত করিয়াছিল, এবং ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও কর্ম্মজিজ্ঞাসাকে যেমন উন্মুখ করিয়াছিল, তেমনই মনুষ্যত্বের উদার আদর্শকেও ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। শেষে ব্যক্তি ও সমাজের সেই চিরন্তন বিরোধই নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল—মনুষ্যত্বের মহিমা নয়, তাহার তলদেশের পশুরূপ দুর্ব্বলতাই নূতন ছন্দে আত্মপ্রকাশ

করিল। সেকালের হিন্দুসমাজের ঘোরতর অবনতিও ইহার একটি কারণ বটে। সেমিটিক Theology ও খ্রীষ্টিয়ান Ethics তাহাতে বড় সুবিধা পাইল; সেই অনুন্নত বিধর্মের চাপে স্বধর্ম এমনই পীড়িত হইয়া উঠিল যে, মানব-সেবার পরিবর্ত্তে সাম্প্রদায়িক শুচিতা রক্ষাই প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল—জনহিতার্থে আত্মোৎসর্গ অপেক্ষা উন্নত স্বার্থবুদ্ধিই সংযমশীলতা ও চারিত্রের নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইল। আসল কথা—নূতন মানব-ধর্মের বিকৃত রূপ দাঁড়াইল—ব্যক্তির ব্যক্তিত্বসাধন; ওই 'morality'র তত্ত্বই আর সকল তত্ত্বকে গৌণ করিয়া, মনুষ্যজীবনের গভীরতর রহস্যকে মানব-নিয়তির বিরাট মহিমাকে অস্বীকার করিতে চাহিল। মানুষের আত্মার যে অন্তহীন সদ্গতিকে বিশ্বাস করিয়া এক মহামনীষী বলিয়াছিলেন—"The soul may be trusted to the end", আমাদের দেশে সেকালের শিক্ষিত-সমাজে তাহার বিপরীত বিশ্বাসই যেন উৎকৃষ্ট ধর্ম্মজ্ঞানের পরিচায়ক হইয়া উঠিল।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম হইতে এই তত্ত্বের সংকীর্ণতা এবং তত্ত্বহিসাবেও ইহার অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। মানুষের মহিমা তাঁহাকে যেভাবে যতখানি প্রভাবিত করিয়াছিল তেমন বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বে আর কাহাকেও করে নাই। তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্রে' তিনি যে মূর্ত্তি গড়িবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহাও যেমন মানুষেরই মহিমময় মূর্ত্তি, তেমনই, তাঁহার উপন্যাসগুলিতে—বাংলা সাহিত্যের সেই অতুলনীয় কাব্যকীর্ত্তিগুলিতেও—তিনি মানুষের সেই অভাবনীয় নিয়তিকেই, তাহার দেহ-মন-প্রাণ ও আত্মার ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনিই এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবন-রস-রসিক কবিশিল্পী, তাঁহারই প্রতিভাগত কবিদৃষ্টিতে—কাম ও প্রেম, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, চরিত্রনীতি ও প্রাণধর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত—এক বৃহত্তর সত্যের আশ্রয়ে পাশাপাশি স্থানলাভ করিয়াছে। তিনি মানবপ্রীতি ও চরিত্রনীতি এই দুইয়েরই অসম্পূর্ণতা ঘুচাইয়া, যত কিছু ব্যর্থতা ও সংকীর্ণতা সত্ত্বেও, মানুষের মহিমাকে আধুনিক যুগধর্মের

অনুরূপ করিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এক দিকে মধুসূদনের সেই আধ্যাত্মিকতাবর্জ্জিত প্রকৃতিধর্ম্ম—বিশুদ্ধ জীবনবাদের জয়ঘোষণা, এবং অপর দিকে দেহের বিরুদ্ধে মনের আক্রোশ এবং তজ্জনিত চরিত্র-চর্য্যার অন্ধ আগ্রহ—এই দুইয়ের সমন্বয় তাঁহার প্রতিভাতেই সম্ভব হইয়াছিল; এমন কি, ঠিক সেই কালে—মানুষ মাত্রেই পাপী, অনুতাপ-রূপ প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন তাহার উদ্ধারের অন্য উপায় নাই—

পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরি।

—এইরূপ ত্রাণ-মন্ত্রের যে প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল তাহাও স্বীকার করিয়া তিনি মানুষের যে মহত্ত্ব হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাতে কোন তত্ত্বকে তত্ত্বহিসাবেই প্রধান হইতে দেন নাই; কারণ, মানুষের জীবন সকল তত্ত্বের উপরে, তাহারই অসীম রহস্যপুরীর দ্বার-উন্মোচনে যাহার যেটুকু সামর্থ্য সেইটুকুই তাহার সার্থকতা; সকল তত্ত্বই মূলতত্ত্বে আরোহণ করিবার সোপান—বিশাল জীবনরথবর্ত্মের চক্রকুণ্ণ গতিরেখা। তাই জীবনকেই তিনি তত্ত্বের প্রামাণ্য করিয়াছেন, তত্ত্বকে জীবনের প্রামাণ্য করেন নাই।

(আগামী বারে সমাপ্য)
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

সাহিত্যিক পদ ও পদবী

কতকাল হইতে জানি না, বোধ হয় আদিকাল হইতে—আমাদের কবিদিগের একটা না একটা পদবী না হইলে চলে না। 'কবিকঙ্কণ' 'কবিগুণাকর' 'কবিকর্ণপূর' প্রভৃতির দ্বারাই এককালে সে-কাজ চলিত; মধ্যে কিছুদিন—বোধ হয় ইংরেজী পড়িয়া এই পদবী-পিপাসা কিছু কমিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে কবিগণ তাঁহাদের ভক্তসম্প্রদায়ের সেই

দুরন্ত আবেগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। ইহার কারণ, তৎপূর্ব্ববর্ত্তীকালে যে ধরনের কবিতে দেশ ভরিয়া গিয়াছিল, তাঁহাদের বেশভূষা ও চেহারা এমন ছিল যে উপাধির পাগড়ি তাহাতে মানাইত না; উপাধি তো পরের কথা—তাঁহাদের নামগুলি পর্য্যন্ত নানা প্রকারে সংক্ষেপ করিয়া লওয়াই ছিল সেকালের রীতি, যথা—গোপাল উড়ে, হরু ঠাকুর, গোঁজলা গুঁই। কিন্তু পদবৃদ্ধি ও পদপূজার আকাঙ্ক্ষা আমাদের রক্তের ধর্ম,—কাজেই বেশিদিন এরূপ অবস্থা সহ্য করা সম্ভব হইল না, এদিকে স্বরাজ-লাভের স্বপ্নও দিন দিন আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল; তাই অবশেষে সাহিত্যের খোলা মাঠেই আমরা একটা রাজ-দরবার পাতিয়া লইলাম; উপায় কি? সত্যই আমাদের গৌরবের স্থল আর কি আছে? রাজা নাই, রাজ্য নাই, উপাধিও নাই, খেতাবও নাই, অথচ রাজা-উজির না মারিলে আমাদের চলে না। তাই এই ঘোর সাম্যবাদের যুগেও আমরা আমাদের কবি ও সাহিত্যিকগণকে লইয়াই নানা পদ ও পদবীর আশ মিটাইতেছি। সাহিত্য-সম্রাট, কবি-সম্রাজ্ঞী, মহাকবি, জাতীয় মহাকবি প্রভৃতি যে সকল পদবী এখন প্রায় কায়েম হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যায়—আমাদের সাম্রাজ্য, আমাদের মহা-মহিমা ও আমাদের জাতীয়তা-গৌরব সকলই একণে আমাদের সাহিত্যকেই আশ্রয় করিয়াছে। মধ্যে কিছুদিন 'বাংলার শেলী', 'বাংলার বায়রন', 'বাংলার সার্ ওয়াল্টার স্কট' প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রচলন প্রায় স্থায়ী হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ায় সে সুখ সহিল না—কিছুকাল বড় দুঃখে কাটিয়াছিল; তারপর এই 'জাতীয়' 'মহা' এবং 'সম্রাট' ও সর্ব্বশেষে 'বিশ্ব' পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া উপস্থিত একটু শান্তিলাভ করা গিয়াছে, শীঘ্রই বোধ হয় 'ব্রহ্মাণ্ড'কেও এই সাম্রাজ্যভুক্ত করা যাইবে। অধুনা গণ্ড-কবির সংখ্যা অল্প নয়—ইঁহাদেরই কেহ অদূরভবিষ্যতে উক্ত অণ্ড-ঘটিত বিরাট মহিমা লাভ করিবেন এমন আশা দুরাশা নয়।

* * *

আমরা খাঁটি জাতীয়-ভাবাপন্ন, কাজেই আমরা বাঙালীর এই উপাধি-গর্ব্বের বড়ই পক্ষপাতী। কবি বলিয়াছেন—"বাঘের বাচ্চাকে

বাধ না করিনু যদি, কি শিখাবু তারে?" বাঙালী যদি সর্ব্ববিষয়ে বাঙালীই না হইল,.তবে আমরা কোন্ ভরসায় বাঁচিয়া থাকিব? ইংরেজদের এত কবি আছে, তাহাদের এতবড় সাহিত্য রহিয়াছে, কিন্তু এমন সাম্রাজ্য-পিপাসা বা সাহিত্যিক গৌরব-বোধ আছে? বিশ্বকবি তো পরের কথা—একটা সম্রাট বা সম্রাজ্ঞীও তাহারা তাহাদের কবিগণের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না! এমন কি 'পোয়েট' কথাটিও কাহারও নামের পূর্ব্বে সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে তাহারা নারাজ। ইহার তুলনায় আমাদের সহবৎ যে কত উন্নত, তাহা আধুনিক তরুণিয়া ভাষায় অনস্বীকার্য্য। আমরা আমাদের কবিকুলের একটা রীতিমত hierarchy গড়িয়া লইয়াছি—থাকের উপরে থাক, যত ছোটই হউন, প্রত্যেক কবির আসন একটা না একটা থাকে পড়িবেই, অতএব 'পদ'-গণনায় কাহারও 'বি-পদ' হইবার ভয় নাই। বিশ্বকবি, কবিসম্রাট, মহাকবি, কবিবর, কবি ও সুকবি—এ যেন জুতার দোকানের মাপ, পায়ের নম্বর ঠিক করা আছে। ইহা ছাড়া, 'পল্লী-কবি' ও 'শিশু-কবি'ও (শিশুসাহিত্যের কবি) আছে—কাহারও নাম 'ন্যাড়া' থাকিবার জো নাই। সবই ঠিক আছে। কেবল একটা জায়গায় একটু যেন খটকা লাগে। 'কবি' ও 'সুকবি' এই দুইটি খেতাবের কোন্‌টি উচ্চতর? 'কবি'র পূর্ব্বে ওই যে 'সু' উপসর্গটি রহিয়াছে উহার অভিসন্ধি ভাল, না মন্দ? যদি ভাল হয় তবে 'সুকবি'র আসন কবির উপরে হইবার কথা; কিন্তু তাহা যে নয়, ব্যবহারেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'কবি' খেতাবটি খুব ছোট হইলেও উহার একটা বড় গুণ এই যে, উহা ছোট-বড় সকল কবির নামের সহিত যুক্ত হইতে পারে, যথা 'কবি মধুসূদন', 'কবি কিরণধন'। কিন্তু যদি বলি 'সুকবি মধুসূদন' বা 'সুকবি রবীন্দ্রনাথ' তাহা হইলে আপনারা নিশ্চয় আমার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ না করিয়া ছাড়িবেন না। তাই বলিতেছিলাম ওইখানে একটু খটকা আছে।

* * *

তথাপি আমি উপরে 'সুকবি'র যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহা যে ঠিকই হইয়াছে—সে বিষয়ে, আশা করি, আমাদের সাহিত্যিক

সমাজ একমত, কারণ, দেখা যায় পণ্ড-কবি ও অপোগণ্ড কবিদের প্রতি সামাজিক শিষ্টাচার বা সৌজন্য প্রকাশ করিতে-ওই সুন্দর কথাটি তাঁহাদের বড়ই কাজে লাগে। যাঁহারা ছাপার অক্ষরে নিজেদের নাম পড়িবার জন্য মাসিক-পত্রিকাদিতে পদ্য লিখিয়া থাকেন তাঁহারা বন্ধুবান্ধবদিগের নিকটে ওই খেতাবটি পাইলেই খুশি, এজন্য তাঁহাদের জন্যই ওই শ্রুতিরোচক খেতাবটির সৃষ্টি হইয়াছে—উহাই বা কম কি? যাহাকে 'কবি' বলিতে বাধে তাহাকে ওই নামে অভিহিত করিলে দুই দিকই রক্ষা হয়—সত্য কথাও বলা হয়, আবার বন্ধুত্ব বা শিষ্টাচার বজায় থাকে। আমাদের খেতাব-তত্ত্ব যে কত সূক্ষ্ম তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আমি এই যে সমস্যার উত্থাপন ও সমাধান দুই-ই একসঙ্গে করিলাম, তাহাতে আমাদের সাহিত্যিক পদ ও পদবীর গুরুত্ব সম্বন্ধে অতঃপর সকলেই অবহিত হইতে পারিবেন। আমার পক্ষে এই গবেষণার একটু প্রয়োজনও ছিল; বাংলার সাহিত্য-সমাজে আমি যে বহুদিনের সাধ্যসাধনায় এতদিন পরে কায়ক্লেশে একটু স্থান লাভ করিয়াছি, তাহার প্রমাণ একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আমাকে একেবারে একসঙ্গে দুইটি খেতাব—'সুকবি' ও 'সুসাহিত্যিক' দিয়া ফেলিয়াছেন। একেবারে একজোড়া 'সু' লাভ করিয়া প্রথমটা একটু বেসামাল হইয়া পড়িয়াছিলাম, পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বুঝিতে পারিলাম বাংলার সাহিত্যিক-সমাজে কৌলিন্য-মর্য্যাদা বড় যে-সে বস্তু নয়, এখানে বড় সাবধানে মেল-বন্ধন হইয়া থাকে; ওই যে থাকের পর থাক—যেন বাটখারা সাজানো, ওটি বড় সহজ ব্যাপার নয়; উহা ছাড়াই সাহিত্যিক বিচারের চূড়ান্ত হইয়া থাকে; বড় খেতাবগুলিতে তেমন সূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু নীচের দিকে, ওই এক 'সু'-যোগে একটা বড় মুশকিলের আসান হইয়া থাকে। খেতাব বিতরণে একটু হিসাববোধ থাকিলেই সাহিত্যের আদর্শটি যে কত উঁচু করিয়া রাখা যায়, তাহা জানিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি বলিয়াই আমি সকলকে এই খেতাব-তত্ত্ব উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে বলি।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

মহাস্থবির জাতক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একদিন বিকেলে আপিস থেকে ফেরার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরও বাবা এলেন না দেখে মা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। আমাদের খেলা-টেলা বন্ধ হয়ে গেল। মুখ কাঁচুমাচু ক'রে মার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগলুম। মা বলতে লাগলেন, দেখ, আবার কি কাণ্ড ক'রে আসেন! আমার বাপু ভাল লাগছে না।

একটা কিছু হাঙ্গামার সম্ভাবনায় মনের মধ্যে আনন্দও যে হচ্ছিল না, তা নয়। কারণ সন্ধ্যেবেলায় কিছু ঘটলে আর পড়তে বসতে হবে না। এমনই সময়ে ঠিক ভর-সন্ধ্যেবেলা কয়েকজন লোক ধরাধরি ক'রে বাবাকে দোতলায় নিয়ে এল। বাবা তখন অর্দ্ধমূর্চ্ছিত, সামান্য জ্ঞান আছে। দোতলার চওড়া বারান্দায় বিছানা ক'রে তখুনি তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হ'ল। বাবা বুকের দিকে হাত দেখিয়ে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

আমরা এতখানি কল্পনা করি নি। মার চেঁচামেচি শুনে আমরাও কাঁদতে লাগলুম। দাদা গিয়ে পিসীমাকে ডেকে নিয়ে এল। তাঁর ছেলেরা এসে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এল। বাবার কয়েকজন বন্ধুর কাছে খবর পাঠানো হ'ল। দেখতে দেখতে আট-দশজন স্ত্রী পুরুষ বাড়িতে এসে হাজির হলেন। কিছুক্ষণ পরিচর্য্যার ফলে বাবার জ্ঞান ফিরে এল।

বাবাকে যাঁরা ধ'রে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দুজন তাঁর আপিসের বন্ধু। তাঁদের মুখে জানতে পারা গেল যে, রাস্তায় এক জুড়ি-ঘোড়া ক্ষেপে দৌড় মেরেছিল, সামনে একটি ছোট ছেলে প'ড়ে যায় যায়, এমন সময় উনি ফুটপাথ থেকে লাফিয়ে প'ড়ে তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে বুকে ঘোড়ার বোম লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। কোচুয়ানটা খুব সামলে নিয়েছিল, নইলে ওঁর আর কিছু থাকত না।

ওরই মধ্যে বাবা মিনমিন ক'রে বলতে লাগলেন, ছেলেটাও খুব বেঁচে গেছে, তাকে বাড়িতে পৌছে দেওয়া হয়েছে কি?

এই কাহিনী শুনেই মা একেবারে জ্ব'লে উঠলেন। তিনি একাধারে

বাবাকে গালাগাল, নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার, বাবার পরিচর্য্যা ও সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাগতদের আপ্যায়ন—আশ্চর্য্যভাবে এতগুলি কর্ত্তব্য সামলাতে লাগলেন। একটু নমুনা দিই।—বাবা শুয়ে আছেন চিত হয়ে, ডাক্তার বুকে পটি বেঁধে দিয়ে গিয়েছেন। মা মাথায় বরফ দিচ্ছেন আর অনর্গল ব'কে যাচ্ছেন,—আমার যেমন কপাল! এই সেদিন এমন হাঙ্গামা বাধালেন যে, আমাদের প্রাণটুকু শুধু আছে, আর সবই গিয়েছে। এখনও পাঁচ বছর যায় নি—আপনি তো জানেন দিদি। ষ্টীমার থেকে একজন জলে প'ড়ে গেল, উনিও নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন; তারপরে প্রোপেলারের ধাক্কা লেগে—ছ মাস ধ'রে যমে-মানুষে টানাটানি। হে ভগবান! আমাকে নিয়ে যাও, শুধু ছেলেগুলোকে তুমি দেখো—

হঠাৎ তিনি মাটিতে ঠকাঠক মাথা কুটতে আরম্ভ ক'রে দিলেন।

তিন-চারজন মহিলা 'হাঁ হাঁ, করেন কি' বলতে বলতে ছুটে এসে তাঁকে নিরস্ত করলেন।

ইত্যবসরে বাবা আবার মিনমিন ক'রে কি বললেন। মা মুখ নীচু ক'রে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলছ? অ্যাঁ? জল দোব? একটু বরফ দিয়ে দিই, গলাটা তো কাঠ হয়ে উঠেছে।

মা উঠে কুঁজোর দিকে যেতে যেতে একজনকে দেখে বললেন, ধীরুর মা, দাঁড়িয়ে কেন ভাই?

আমি সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলুম। আমাকে বললেন, যাও না, একটা মাদুর নিয়ে এসে মাসীমাকে বসতে দাও না, পোড়ারমুখো, হাঁ ক'রে দেখছ কি?

তারপর সবার দিকে ফিরে বললেন—

আবাগীর তিনটি পুত
দুটি কন্ধকাটা একটি ভূত।

সভাস্থ সকলের মৃদু হাস্য। উচ্চহাস্য আমাদের সমাজের মহিলাদের মধ্যে তখন প্রচলিত ছিল না। তাঁদের সামনে অনেক পুরুষও উচ্চহাস্য করতেন না।

মার মুখের বিরাম নেই। জল গড়াতে গড়াতে সমানে ব'কে

চললেন। বাবা জল খাওয়ার পর গেলাসটা রেখে মা একটু চুপ করতেই একজন প্রস্তাব করলেন, অস্থিরের মা, আসুন, আমরা ঈশ্বরের নাম করি। আপনিই প্রার্থনা করুন।

প্রস্তাব হতে না হতে সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে বসলেন। একটি মহিলা গান গাইলেন। সঙ্গীতান্তে মা প্রার্থনা করলেন।

মার প্রার্থনার মধ্যে ঈশ্বরের স্তুতিস্তব প্রায় থাকতই না। তিনি অত ঘোরপ্যাচের মধ্যে না গিয়ে সোজা ব্যবহারিক প্রার্থনা করতেন। অর্থাৎ—হে ভগবন্! তুমি আমাদের দারিদ্র্য মোচন কর। আমার ছেলেদের স্বাস্থ্যবান কর, তাদের বিদ্যা দাও—তারা যেন সুখে থাকে। আর এসব যদি কিছুই না দাও, তবে দোহাই তোমার, আমার স্বামীকে সুমতি দাও।

এই সময়, বোধ হয় ১৮৯৭ খ্রীষ্টান শতাব্দীতে টালার দাঙ্গা বেধেছিল। দাঙ্গার কারণ তখন যা শোনা গিয়েছিল, তার বিবরণ হচ্ছে—টালায় মহারাজা সার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের এক জমিতে মসজিদ ছিল। সেই মসজিদ তুলে দেওয়া নিয়ে জমিদারে আর মুসলমানদের মধ্যে হাঙ্গামা বাধে। মুসলমানদের ধারণা যে পুলিস জমিদারকে সাহায্য করেছিল।

আজকাল যেমন টালা টালীগঞ্জ সবই কলকাতার হদ্দার মধ্যে এসে গিয়েছে, তখন তা ছিল না। টালা ছিল শহরের বাইরে। তাই নিজ কলকাতাবাসীরা প্রথমটা জানতেই পারে নি যে, সেখানে একটা হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। আসল মারপিট হয়ে যাবার পর শহরবাসীরা জানতে পারলে যে, টালায় একটা বড় রকমের কিছু হয়ে গিয়েছে।

মসজিদ ভেঙে দেওয়ার সহায়তা করার জন্য মুসলমানেরা সরকারের ওপর চ'টে গেল। গবর্মেন্ট বলতে তারা বুঝলে পুলিস। আর পুলিস মানে রাস্তার কনস্টেবল্।

একদিন সকালবেলা দেখলুম, দলে দলে নিম্নশ্রেণীর মুসলমান লাঠি হাতে নিয়ে শহরের উত্তর দিকে ছুটেছে। কনস্টেব্লগুলো তাদের

দেখলেই ভয়ে লুকিয়ে পড়ছে। গুজবসম্রাটদের রাজত্ব চিরদিনই অপ্রতিহত। তখনও যেমন ছিল, আজও তেমনই। আমরা অদ্ভুত ও অসম্ভব সব গুজব বাড়িতে ব'সেই শুনতে লাগলুম। দাদা ইস্কুল থেকে নানা রকমের গুজব সংগ্রহ ক'রে আনতে লাগল। নতুন একটা উত্তেজনা আমার বেশ স্ফূর্তিতেই দিন কাটতে লাগল।

সে সময় দাঙ্গা বাধলে মুসলমানদের সঙ্গে বাঙালী হিন্দুদের কোনও সংঘর্ষই হত না। দাঙ্গা সম্বন্ধে বাঙালীরা থাকত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। হিন্দু বলতে মুসলমানেরা ভিন্নপ্রদেশীয় হিন্দুদের বুঝত। অন্তত সেদিন পর্যন্তও অর্থাৎ ১৯২৬।২৭ অব্দে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানে যে বড় দাঙ্গা বেধেছিল, তার আগের দাঙ্গা পর্যন্ত কলকাতাতে এই ধারাই প্রচলিত ছিল।

একদিন সকালবেলা আমাদের রাস্তায় চাঞ্চল্য ও চেঁচামেচি যেন বেশি হতে লাগল। বেলা তখন প্রায় নটা হবে—খুব একটা হৈ-হৈ শব্দ শুনে আমরা বারান্দায় গিয়ে দেখি, একদল ফিরিঙ্গী যুবক একটা ভাড়াটে ফিটনে চ'ড়ে ছুটছে—ঘোড়া দুটো ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে, আর ফিটনের পেছনে বোধ হয় জন পঞ্চাশেক লোক হৈ-হৈ করতে করতে ছুটে আসছে। গাড়ি চালাচ্ছিলও একজন ফিরিঙ্গী। আমাদের বাড়িটা ছাড়িয়ে একটু দূরে গিয়েই তারা গাড়িখানাকে থামিয়ে ফেললে। পেছনে যারা ছুটে আসছিল, তারা একটু দূরে প'ড়ে গিয়েছিল। গাড়িখানা হঠাৎ থেমে যেতেই তারা কাছে এসে গেল। গাড়ির ফিরিঙ্গীরা প্রায় সকলেই দাঁড়িয়ে ছিল। দেখলুম, তাদের মধ্যে একজন বন্দুক তুলে দুমদুম দুটো আওয়াজ করলে। তখুনি সবাই চেঁচিয়ে উঠল। বেশ বুঝতে পারা গেল, একজন প'ড়ে গিয়েছে ও তাকে তোলবার চেষ্টা করা হচ্ছে। ফিরিঙ্গীরা সেই অবসরে জোরে গাড়ি চালিয়ে সোজা' চ'লে গেল।

যে প'ড়ে গিয়েছিল, সবাই মিলে তাকে তুলে আমাদের বাড়ির সামনেই রাস্তায় জল দেবার একটা দমকল ছিল, সেখানে এনে শুইয়ে দিলে। আমরা ওপর থেকে দেখতে লাগলুম, জায়গাটা রক্তে ভেসে,

যাচ্ছে, কিন্তু দেহের কোন্‌খান দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে, তা বুঝতে পারলুম না।

যাকে এনে শুইয়ে দেওয়া হ'ল, তার বয়স বোধ হয় ষোলো-সতেরো হবে। রোগা—অত্যন্ত রোগা, ডান হাতে একটা শুকনো গাছের ডালগোছের কি তখনও ধরা রয়েছে।

সে একবার হাঁ করতেই তার মুখের মধ্যে দমকল থেকে সেই ময়লা জল আঁজলা ক'রে ক'রে দেওয়া হতে লাগল। একটুক্ষণ পরেই সবাই বলতে লাগল, মর্‌ গিয়া—মর্‌ গিয়া—

লোকেরা তাকে তুলে নিয়ে চ'লে গেল। তোলবার সময় দেখলুম, সেই ভাঙা ডালখানা তার হাত থেকে খ'সে রাস্তায় প'ড়ে গেল।

এই মৃত্যুকে দেখলুম, একেবারে চোখোচোখি—মুখোমুখি! এই মৃত্যু দুবার আমার অতি নিকটে এসেছিল, তখন তাকে চিনতে পারি নি।

এই দৃশ্য আমার সত্তাকে নাড়া দিয়ে এমনভাবে বিচলিত ক'রে দিলে যে, আমি সে জায়গা থেকে এক পাও নড়তে পারলুম না। মৃত ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে চ'লে গেছে, কিন্তু তার হস্তচ্যুত সেই দণ্ড যা দিয়ে তার গর্বোদ্ধত ধর্মবুদ্ধি অপরকে আঘাত করতে এসেছিল—সেটা যেন একখণ্ড চুম্বক। তারই আকর্ষণে অনড় হয়ে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার পাশে অস্থিরও দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, তার মুখখানা তুবড়ে তাবড়ে অদ্ভুত এক রকমের দেখতে হয়েছে। অন্য সময় সে রকম মূর্তি দেখলে হয়তো হেসে ফেলতুম। কিন্তু তখন আর হাসি ফুটল না। আবার রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হল।

মা এসে একবার ব'লে গেলেন, আজ কি আর নাইতে খেতে ইস্কুলে যেতে হবে না?

অস্থিরও সে বছর ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল। দুই ভাই নীরবে স্নান ক'রে খেয়ে ইস্কুলে যাত্রা করলুম। বাড়ির পাশেই ইস্কুল, তবুও একবার কয়েক পা এগিয়ে সেই মৃতব্যক্তির হস্তচ্যুত লাঠিটার কাছে গেলুম।

দেখলুম, অজস্র গাড়ির চাপে চাপে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে সেটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। দুজনে পাশাপাশি ইস্কুলে ঢুকে যে যার ক্লাসে চ'লে গেলুম। একটা বাক্য-বিনিময়ও হ'ল না।

ইস্কুলে পড়াশুনো কতদূর কি হ'ল জানি না; কিন্তু সমস্ত দিনটা ধ'রে সেই মৃত লোকটির মুখ চোখের সামনে ভাসতে লাগল। সমস্তক্ষণ মৃত্যুর চিন্তাই আমার মনকে আঁকড়ে ধ'রে রইল। মনে হতে লাগল, ম'রে গেলে আর সে ফিরে আসে না। আরও মনে হ'ল, মরণ যে কখন কি ভাবে আসে, তা আগে কেউ বুঝতেও পারে না। এই যে লোকটা, সে কি জানতে পেরেছিল যে, এক্ষুনি ম'রে যাবে! তার মুখখানা চোখের সামনে মাঝে মাঝে ভেসে উঠতে লাগল, আর ভাবতে লাগলুম, আজ কাল পরশু এমনই ক'রে যত দিন যাবে, তার বাবা মা আপনার জন যারা, তারা তাকে ভুলে যাবে।—এই সব নানা চিন্তা মনের মধ্যে তাল পাকাতে আরম্ভ করলে। ইস্কুল, শিক্ষয়িত্রী, পড়া, খেলা কিছুই ভাল লাগছিল না, লোকের সঙ্গ অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল, মনে হ'তে লাগল, কতক্ষণে নিজেকে একটু একলা পাব—প্রাণ ভ'রে মৃত্যুর কথা ভাবতে পারব।

ছুটির পর বাড়িতে এসে খেয়ে-দেয়ে ছাতে গিয়ে বসলুম। অস্থিরও এসে আমার পাশে বসল। সন্ধ্যেবেলা পড়ার আসরে বাবার শাসনগুলো বৃথাই গেল। রাত্রে তাড়াতাড়ি বিছানায় প'ড়ে মনের বল্গা ছেড়ে দিলুম।

বালকের চিন্তাসাগর মথিত হয়ে সেদিন কি সত্য উঠেছিল, তার সব আজ মনে নেই, তবে তিনটি কথা আজও ভুলি নি।

প্রথম সত্য হচ্ছে, একদিন আমাকেও মরতে হবে।

দ্বিতীয় সত্য, ছাত থেকে প'ড়ে আর জলে ডুবে আমি মরতে মরতে বেঁচে গেছি।

তৃতীয় সত্য হচ্ছে, মন্দিরে ও বাড়িতে উপাসনার সময় চোখ বুজে যাকে এত স্তুতি করা হয়, তার সঙ্গে মৃত্যুর কোথাও একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। পৃথিবীতে মৃত্যু যদি না থাকত, তা হ'লে সেই দুর্বোধ্য অদৃশ্য শক্তিকে লোকে এত স্তবস্তুতি করত না।

রাত্রি প্রায় দুটো-তিনটের সময় রোজই আমাদের বাইরে যাবার দরকার হ'ত। যার আগে ঘুম ভাঙত, সে অন্য জনকে জাগিয়ে তুলে নিয়ে যেত। সে রাত্রে আমারই আগে ঘুম ভেঙেছিল। অস্থিরকে তুলে বাইরে নিয়ে গেলুম। নর্দমার সামনে ব'সেই অস্থির ফিসফিস ক'রে আমাকে ডাকলে, স্থবরে!

ফিসফিস ক'রে উত্তর দিলুম, কি রে?

আবার সে ফিসফিস ক'রে প্রশ্ন করলে, তুই ম'রে গিয়ে কি ক'রে ফিরে এলি রে?

আমিও সেই রকম ক'রে জবাব দিলুম, আমি তো মরি নি, জলে ডুবে বেঁচে গিয়েছি।

• • •

এই সময় কলকাতায় বড় ভূমিকম্প হয়। কলকাতায় অনেক লোক, অনেক বাড়ি, এইজন্যে হৈ-চৈ এখানে খুব বেশি হয়েছিল বটে, কিন্তু ধরিত্রীদোলার বিষম ধাকাটা লেগেছিল আসামের বুকে। ভূমিকম্পের ফলে সেখানে নাকি অনেক প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনও হয়ে গিয়েছিল। শোনা গিয়েছিল যে, ব্রহ্মপুত্রের স্রোত এক জায়গায় ঘুরে অন্য দিকে প্রবাহিত হয়েছিল।

কলকাতায় ভূমিকম্প হয় এই বিকেল নাগাদ। আমরা ক ভাই সে সময় একটা টেবিলের চারিদিকে ব'সে ছিলুম, বোধ হয় বাবা আমাদের অঙ্ক কষাচ্ছিলেন। হঠাৎ দুদ্দাড় ক'রে বাড়িঘর কেঁপে উঠতেই মা চীৎকার ক'রে উঠলেন, ভূমিকম্প হচ্ছে।

তাড়াতাড়ি ছুটে সব রাস্তায় বেরিয়ে পড়া গেল। পৃথিবী যেন টলতে আরম্ভ ক'রে দিলে, তারই মাঝে মাঝে এক একটা জোর ধাক্কা আসতে লাগল। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি! রাস্তার লোকগুলো উন্মত্তের মতন ব্যবহার করতে লাগল। কেউ প্রাণপণে দৌড়চ্ছে, কেউবা একবার এক দিকে খানিকটা দৌড়ে আবার হঠাৎ ফিরে বিপরীত দিকে দৌড় দিচ্ছে। অদ্ভুত তাদের ভয়ার্ত্ত মুখ দেখে আমরা তিন ভাই হাসতে আরম্ভ ক'রে দিলুম।

আমাদের বাড়ির ঠিক নীচেই একটা টিন-মিস্ত্রীর দোকান ছিল। সে টিনের পাত কেটে বাক্স বানাত। মধ্যে মধ্যে লোকটা মাতাল হয়ে সারা রাস্তা তোলপাড় করতে থাকত। অতি শৈশবে আমরা কখনও উলঙ্গ হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লে সে তার প্রকাণ্ড টিন-কাটা কাঁচি বের ক'রে আমাদের অঙ্গচ্ছেদের ভয় দেখাত। এইজন্যে সে বয়েস পেরিয়ে গেলেও লোকটার প্রতি আমাদের মনোভাব বিশেষ অনুকূল ছিল না। সেদিন বোধ হয় তার মৌজের দিন ছিল। পাড়ার সবাই যখন ভয়ে আঁতকে 'নারায়ণ', 'নারায়ণ' চীৎকার ক'রে আকাশ ফাটাতে লাগল, এই লোকটা তখন চীৎকার ক'রে বলতে লাগল, এলি মা, এত দিনে এলি? ডুবিয়ে দে, ডুবিয়ে দে, সব শালা ভণ্ড, লণ্ডভণ্ড ক'রে দে মা, লণ্ডভণ্ড ক'রে দে।

পাড়ার এক হিন্দুস্থানী ময়রার দোকানের লোকেরা 'রাম' 'রাম' ব'লে পরিত্রাহি চীৎকার করছিল। তাদের অবস্থা দেখে টিন-মিস্ত্রী বললে, চোপ শালা, যখন ঘিয়ের বদলে চর্ব্বি দাও, তখন মনে থাকে না?

শাঁখ, ঘণ্টা, মানুষের চীৎকার ও টিন-মিস্ত্রীর উল্লাসধ্বনি মিলিয়ে এক বিষম হট্টগোল আরম্ভ হয়ে গেল। হঠাৎ ইস্কুলের বড় বাড়িটার একটা কোণ তেতলার ছাদ থেকে একতলা অবধি—ভয়ানক শব্দ ক'রে ভেঙে পড়ল। এইবার রীতিমতন ভড়কে গেলুম। একটা সাংঘাতিক কিছু যে হচ্ছে, আর সেটাকে নিবারণ করা যে মানুষের সাধ্যাতীত—এই কথা বুঝতে পেরে ভয় করতে লাগল।

ভূমিকম্প থেমে যাওয়ার পর আমরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখি যে, আমাদের বাড়িখানা ফেটে একেবারে চৌচির হয়ে গেছে। বাবা তখুনি আমাদের নিয়ে বেরুলেন শহরের অবস্থা দেখতে। যে রাস্তাতেই যাই, দেখি, একটা না একটা বাড়ি কাত হয়েছে। সেবারকার ভূমিকম্পে কলকাতা, শহরতলীর ও আশপাশের জায়গায় কত লোকের যে সর্ব্বনাশ হয়েছিল, তার আর ইয়ত্তা নেই।

টালার দাঙ্গা ও ভূমিকম্প হবার কিছু আগে থেকেই আমরা শুনতে পাচ্ছিলুম, বোম্বাই অঞ্চলে প্লেগ নামে এক সাংঘাতিক ব্যামো

আবির্ভাব হয়েছে। সেখান থেকে রোগটা বনবন ক'রে কলকাতার দিকে দৌড়ে আসছে। কলকাতায় মহা আতঙ্কের সঞ্চার হ'ল।

ইতিমধ্যে একদিন শোনা গেল যে, হাওড়ায় একটি স্ত্রীলোক বোম্বাই মেলে এসে হাওড়া স্টেশনে একখানা ঠিকে-গাড়ি ভাড়া ক'রে কলকাতার দিকে আসছিল। হ্যারিসন রোডে এসে গাড়োয়ান তাকে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাবে?

স্ত্রীলোকটা উত্তর দিলে, আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি প্লেগদেবী। এই ব'লেই সে গায়েব হয়ে গেল।

বাস্! আর যাবে কোথায়! শহরময় রব উঠল—পেলে গো—পালা গো। গুজববিলাসী বাঙালী সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। বাপ রে বাপ! সে কি ত্রাসের ঘটা!

আজ যুদ্ধের এই ডামাডোলের বাজারে কানের পাশে বোমা ফাটছে, দিবারাত্রি মাথার ওপরে পিংপিং ক'রে বিমান উড়ছে দেখেও বাঙালীরা তা গ্রাহ্যই করছে না, সেদিন কিন্তু প্লেগের নাম শুনে শহর-সুদ্ধ লোক উঠি কি পড়ি ভাবে পালাতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছিল।

ইতিমধ্যে একদিন শোনা গেল, শহরে প্লেগ হতে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কর্পোরেশন থেকে ঢেঁড়া পিটতে আরম্ভ ক'রে দিলে—বোম্বাইসে আদমী আনেসে থানামে খবর দেনে হোগা।

আর যায় কোথা! দুদিনে কলকাতার শহর খালি হয়ে গেল। নেহাত আমাদের মতন, অর্থাৎ যাদের কোথাও যাবার জায়গা নেই, তারাই প'ড়ে রইল। ইষ্টিশানে পৌছবার জন্যে ঠিকে-গাড়ির গাড়োয়ানেরা অসম্ভব দর হাঁকতে লাগল। তখনকার দিনে অশ্বের শক্তিক্ষয় নিয়ন্ত্রণের আইনকানুন ছিল না, তাই যার মাত্র একখানা ভাড়াটে গাড়িও ছিল, সে বেশ দু-পয়সা কামাতে লাগল।

কর্পোরেশন শহরবাসীদের প্লেগের টিকে নেবার জন্যে অনুরোধ করতে লাগল। কিন্তু টিকে সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে এমন সব সাংঘাতিক গুজব রটতে লাগল যে, এ যুগের লোক তা শুনলে হেসেই ফেলবে।

কেউ বললে, টিকে নেবার দশ ঘণ্টার মধ্যেই মানুষ কাবার হয়ে যায়।

কেউ বললে, পেট থেকে এক পয়সা মাপের মাংসের বড়া তুলে নিয়ে তার ভেতরে প্লেগের বীজ পুরে দেওয়া হয়।

এদিকে আবার স্বাস্থ্যরক্ষকেরা জানিয়ে দিলেন যে, টিকে নেয় নি এমন কোনও ব্যক্তি প্লেগে আক্রান্ত হ'লে তাকে জোর ক'রে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল। প্লেগের হাসপাতাল তৈরি হ'ল আবার মেছোবাজারের মার্কাস স্কোয়ারে। সোনায় সোহাগা পড়ল—শহরের নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেল, আর একটা দাঙ্গা বাধে আর কি!

ইতিমধ্যে একদিন বিকেলবেলা আমি, অস্থির ও দাদা ক্রুক ক'রে একবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে দূর থেকে মেছোবাজারের হাসপাতাল দেখে এলুম।

তখন শহরের স্বাস্থ্যরক্ষকদের মাথা ছিলেন একজন ইংরেজ আধা-ডাক্তার। তাঁর নাম ছিল কুক। শোনা যেতে লাগল যে, কুক সায়েবকে রাস্তায় পেলে লোকে মারবে।

শহরের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে উত্তেজনা আর অন্য শ্রেণীর মধ্যে ত্রাস—এই রকম তালবেতালের নাগরদোলা ঘুরছে, এমন সময় কর্পোরেশনের কর্তারা একটি প্যাঁচ লাগালেন। তাঁরা দেখলেন যে, ভদ্রলোকেরা যদি টিকে না নেয়, তা হ'লে প্লেগের টিকের চলন হওয়া মুশকিল হবে। তাঁরা ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে সাহস ক'রে টিকে নিতে পারে, এমন লোকের সন্ধান করতে লাগলেন। ব্রাহ্মরা ছিল তখন সব কাজে অগ্রণী—ভারত মহাসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্ম সপরিবারে টিকে নিতে রাজি হলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমার পিতার পরিবারটিও এই দলে ভেড়ায়, একদিন বিকেলবেলায় কুক সায়েব আমাদের হাত ফুঁড়ে প্লেগের বীজ দেহের মধ্যে পুরে দিলেন। বাবা আমাদের ছ-বছরের একটি ভাইকেও নিয়ে

গিয়েছিলেন, কিন্তু ডাক্তারদের মতে সে নেহাত বাচ্চা সাব্যস্ত হওয়ায় সে বেচারী রেহাই পেয়ে গেল।

টিকে নেওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এল জ্বর। তারপরে চব্বিশ ঘণ্টা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল, তা জানতেও পারি নি।

মাস দুয়েক বাদে কর্পোরেশন থেকে আমাদের নামে একখানা ক'রে কার্ড এল। সেগুলো হ'ল সার্টিফিকেট অর্থাৎ প্লেগ হ'লে সেগুলো দেখালে আর 'কোয়ারেন্টাইনে' ধ'রে নিয়ে যাবে না।

কিন্তু আমাদের এই অসমসাহসিকতার দৃষ্টান্ত শহরের ভদ্রশ্রেণীর মনে কোন রেখাপাতই করলে না। প্লেগের টিকে এদেশে তেমন চলল না। অবিশ্যি এজন্যে তাদের বিশেষ দোষ দিতে পারি না, কারণ বাংলার জমিতে প্লেগই তেমন চলল না তো তার টিকে চলবে কেমন ক'রে?

* * *

সেদিন ছিল বিদ্যাসাগর মশায়ের মৃত্যুদিন। প্রবাদ আছে, এক যুগে দুজন মহাপুরুষ থাকেন না। বোধ হয় সেইজন্যেই আমি ধরাধামকে ধন্য করার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাসাগর মশায় ইহলোক থেকে চ'লে গিয়েছিলেন।

জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যে মহামানবের কীর্তিকথা আমাদের কল্পনাপ্রবণ শিশুচিত্তকে আকৃষ্ট করেছিল, তাঁর নাম হচ্ছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাড়িতে মা-বাবার মুখে দিনরাতই বিদ্যেসাগর মশাইয়ের নাম শুনতুম। ইস্কুলে মাস্টারদের কাছে শুনতুম—বিদ্যেসাগর মশাই এই করতেন। বাড়িতে বাবা ও তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কথার মাত্রা ছিল—বিদ্যেসাগর মশাই বলতেন ইত্যাদি।

এই বিদ্যেসাগর মশাইকে বোধ হয় কলকাতার লোক চেনে না। ইনি মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাল্যে কলকাতায় এসে অশেষ কষ্টে বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন। রাজনীতির আলোচনা ও আন্দোলন না ক'রেও তাঁর জীবন ছিল স্বাধীনতার প্রতীক। মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মাত্র, কিন্তু কলকাতা ছিল

তাঁর কর্মভূমি এবং এইখানেই তাঁর সারাজীবন অতিবাহিত হয়েছে। এরই ধূলায় তাঁর দেহাবশেষ মিশিয়ে আছে। বাংলা দেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজ তাঁর কাছে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। তাঁর জীবিতাবস্থায় বাংলা দেশের, বিশেষ ক'রে কলকাতা শহরের, কত লোক কত পরিবার যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে তাঁর কাছে উপকৃত, তার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। মেদিনীপুরের লোকেরা তাঁর স্মৃতিগৃহ তৈরি করেছেন, কিন্তু কলকাতায় তাঁর বাসগৃহ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছে। তাঁর বাড়ির সামনেই যে সরকারী বাগান, তার নাম হয়েছে 'হৃষিকেশ পার্ক'!

ঈশ্বরের চাইতে হৃষিকেশের প্রতিই এখানকার লোকের আকর্ষণ যে বেশি, এই তার জলন্ত নিদর্শন। তবুও বাংলার সাহিত্যিক, মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ সমিতি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে ধন্যবাদ, তাঁরা যথাসাধ্য বিদ্যাসাগর মশাইয়ের স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা করেছেন।

যা হোক, সেদিন ছিল এই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুদিন। কলকাতার ছোটবড় সমস্ত বাঙালী-ইস্কুলের ছুটি সেদিন। যেদিন আমাদের ইস্কুলে ছুটি থাকত, সেদিন বাড়িতে আহারের কিছু ইতর-বিশেষ হ'ত। বাবা সেদিন স্পেশাল বাজার করতে বেরুতেন। বাড়ির কাছে শিমলের বাজারে না গিয়ে এই সব দিনে আমাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি যেতেন মাধববাবুর বাজারে। উদ্দেশ্য থাকত, বাজার কি রকম ক'রে করতে হয়, তাই শিক্ষা দেওয়া। গোলদীঘির সামনে আজ যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ-ভবন হয়েছে, সেই জমিতে ছিল মাধববাবুর বাজার।

সেদিন বাবার কি খেয়াল হ'ল, আমাদের কারুকে না নিয়ে একাই চ'লে গেলেন মাধববাবুর বাজারে। আমরা বাড়িতে ব'সেই জিভে শান দিতে লাগলুম।

বেলা বাড়তে লাগল, নটা দশটা। বাড়ির সামনেই বিদ্যেসাগর মশাইয়ের ইস্কুল কলেজে লোক-জমা ও চেঁচামেচি বাড়তে লাগল— সেখানে হবে কাঙালী-ভোজন। ওদিকে এগারোটা বেজে গেল, বাবার

দেখা নেই। কিদের নাড়ী সত্যিকারের ব্যাপার আরম্ভ ক'রে দিলে। অবশেষে মা আমাদের যা-তা দিয়ে খাইয়ে দিলেন।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দু-এক বাড়িতে খবর গেল। দু-চারজন বাড়িতে এসে জমতেও লাগলেন। বেলা দুটো নাগাদ দেখে তিন-চারজন লোক ছুটল তিন-চার থানায়। কেউ কেউ হাসপাতালেও ছুটল।

এদিকে বেলা তখন প্রায় চারটে হবে। বাড়িতে ছোটখাট বেশ একটু জনতা হয়েছে। মা বক্তৃতা দিচ্ছেন। বিষয়বস্তু অবশ্য বাবা। সবাই শুনছেন, এমন সময় বাবার আবির্ভাব।

বাবার সে সময়কার চেহারা একেবারে ভয়াবহ। মাথার চুলগুলো ঊর্দ্ধমুখী, রোদে পুড়ে পুড়ে রং তামাটে। ডান হাতে শিলংমাছের একটা বড় টুকরো। মাটি মাখলে যেমন হাত নোংরা হয়, সেই রকম দুই হাতের প্রায় কনুই অবধি শুকনো কাদা। জামার জায়গায় জায়গায় মাছের রক্ত শুকিয়ে রয়েছে। সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে দরদর ক'রে ঘাম ঝরছে।

তাঁর সেই চেহারা দেখে তো সবাই আঁতকে উঠল। এমন কি মা পর্য্যন্ত হাঁ হয়ে গেলেন।

প্রকাশ পেল যে, তিনি বাজার ক'রে ফিরছিলেন, এক হাতে বাজারের ঝুলি আর অন্য হাতে সের দেড়ের শিলংমাছের টুকরো, এমন সময় হেয়ার সাহেবের ইস্কুলের সামনে একটা চিল কোথা থেকে এসে ছোঁ মেরে তাঁর হাত থেকে মাছ নিয়ে উধাও হ'ল। চিলের আচমকা এই অভদ্র ব্যবহারে প্রথমটা তিনি একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তখুনি কর্ত্তব্য স্থির ক'রে নিয়ে চিলের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। দেড় সের ওজন নিয়ে চিল বেশি দূর উড়তে পারে না। একটু উড়েই কোন ছাতে গিয়ে বসে, আর তিনি ইট ছুঁড়ে তাকে উড়িয়ে দেন। কলকাতার শহর, রাস্তায় বেকার লোকের অভাব নেই। অনেকে মজা পেয়ে লেগে গেল তাঁর সঙ্গে চিলকে ইট মারার কাজে। শ্রাবণ মাসে লোকে বড় জোর শিলাবৃষ্টি আশঙ্কা ক'রে থাকে। বিনা কারণে ছাতে লোষ্ট্রবৃষ্টি হতে থাকায় অনেক বাড়িওয়ালা আপত্তি করায়

দু-একটা খণ্ডযুদ্ধ বাধতে বাধতে থেমে গিয়েছে। কারণ চিলকে দৃষ্টির বাইরে না যেতে দিতে তিনি বদ্ধপরিকর। এই রকম তাড়া খেতে খেতে চিলের-পো শেষকালে তিলজলার মাঠে মাছ ফেলে দিয়ে পালিয়ে বাঁচে।

একটা জোর নিশ্বাস ফেলে জামা ছাড়তে ছাড়তে বাবা বললেন, ব্যাটা আমার হাত থেকে মাছ ছোঁ মেরে নিতে এসেছিল! বাঙালকে চেনে না!

চিলের ঔদ্ধত্য দেখে তার প্রতি সম্মানে আমাদের বুক ভ'রে উঠতে লাগল।

এতক্ষণে মা কথা বললেন, বাজারের থলিটা কোন্ মাঠে ফেলে আসা হ'ল, শুনি?

এই-ই-ই-ই।—ব'লে বাবা আবার তাড়াতাড়ি জামা পরতে আরম্ভ করলেন। আগন্তুক যাঁরা বাড়িতে তখনও ছিলেন, তাঁরা বাবাকে ব'লে-ক'য়ে তখনকার মতন নিরস্ত করলেন।

জানতে পারা গেল, তালতলায় একজনদের রকে পরিপূর্ণ বাজারের থলিটি প'ড়ে আছে।

এতক্ষণ বাদে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

মা বললেন, না, তোমার জন্যে সব ব'সে আছে।

—তা হ'লে মাছটার যা হোক একটা ব্যবস্থা কর।

—ও মাছের আবার কি ব্যবস্থা হবে শুনি? ওই চিলে খাওয়া মাছ! দেখুন তো দিদি।

পিসীমা কাছেই ব'সে ছিলেন।

বাবা একবার করুণ চোখে চারিদিকে চেয়ে মাছ নিয়ে একতলায় নেমে গেলেন। তারপরে উনুনে আগুন দিয়ে মাছ ধুতে বসলেন। উনুনে আগুন ধরার পর ভাত চড়িয়ে মাছ কুটতে লাগলেন। প্যাজ কুটলেন এক রাশ। মসলাও কিছু কিছু বাটা হ'ল। ভাত নামিয়ে মাছের দু-তিন রকমের তরকারি হ'ল। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্ষুধার

আধিক্যও কিঞ্চিৎ হয়েছিল। স্নান সেরে এক হাঁড়ি ভাত ও সেই দেড় সেরটাক চিলে-মারা মাছ উদরস্থ ক'রে ওপরে এসে আপিসে ছুটির দরখাস্ত ক'রে একখানা পোস্টকার্ড লিখলেন।

বাবা বারান্দায় একটা পাটি পেতে তাতে আধ-শোওয়া হয়ে রয়েছেন। মা একটা ঘরের চৌকাঠে ব'সে আছেন—সারাদিন তাঁর পেটে অন্ন নেই। স্বামী যে একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে বাড়ি ফেরেন নি, একন্তে মনে মনে তুষ্ট, কিন্তু মুখখানা ঘিরে মহা অসন্তোষ বিরাজ করছে। পিসীমা মার কাছ থেকে একটু দূরে বাবার প্রায় কাছেই ব'সে আছেন। আমরা ফুড়ুক ফাড়াক ক'রে সন্তর্পণে এঘর ওঘর করছি। একবার সামনে পড়তেই তিনি বললেন, স্থবির, একটা ঝিনুক নিয়ে এসে আমার পিঠের ঘামাচি মার।

ঝিনুক নিয়ে বাবার পিঠের ঘামাচি মারতে লাগলুম। খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। শেষকালে বাবাই কথা আরম্ভ করলেন। পিসীমার উদ্দেশে বললেন, দিদি, কিছু বলছেন না যে?

মা (পিসীমা) যেন এই কথাটা শোনবার জন্তেই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধীর প্রকৃতির লোক। বাবার কথা শুনে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, কি বলব বল ভাই? তোমার আক্কেল দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। চিলে ছোঁ মেরে হাত থেকে মাছ ছিনিয়ে নিয়ে গেল আর তুমি সারাদিন সেই চিলের পেছনে পেছনে ছুটে বেড়ালে? এ যে গল্প-কথা হয়ে গেল। আমি আর কি বলব বল?

বাবা চুপ ক'রে চোখ বুজে ঘামাচি মারার আরাম উপভোগ করতে লাগলেন। পিসীমার কথার কোন জবাবই দিলেন না। ব্যাপারটার মধ্যে কোন রকম অস্বাভাবিকত্ব বা আতিশয্য আছে ব'লে তিনি ধারণাই করতে পারছিলেন না। সত্যি কথা বলতে কি, এই ব্যাপারটার সঙ্গে বাবার চরিত্রের এমন সামঞ্জস্য ছিল যে, আমাদের মনেও এটা খুব বেখাপ্পা ব্যাপার ব'লে মনে হচ্ছিল না।

কিছুক্ষণ আবার সব চুপচাপ। পিসীমা আরম্ভ করলেন, লোকের

উপকারের জন্যে জীবন বিপন্ন কর—যদিও সেটা তোমার করা উচিত নয়, কারণ তোমার মাথার ওপরে এই সংসারের দায়িত্ব রয়েছে—তার একটা মানে বুঝি। কিন্তু এ কি উঞ্ছবৃত্তি!

বাবা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, এতেও লোকের উপকার হবে, আপনি দেখে নেবেন দিদি।

পিসীমা বললেন, এতে লোকের কি উপকার হবে, তা আমি বুঝতে পারি না, অবিশ্যি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি—

বাবা তেড়ে-ফুঁড়ে উঠে ব'সে বললেন, এই চিল কোনও জন্মে মানুষের হাত থেকে আর কিছু ছোঁ মারবে না, এতে লোকের কম উপকার হবে না দিদি।

মা এতক্ষণ চৌকাঠে ব'সে ব'সে গজরাচ্ছিলেন। এবার তিনি এগিয়ে এসে পিসীমার কাছে ব'সে বলতে আরম্ভ করলেন, জানেন দিদি, ইল্লং যায় না ম'লে, স্বভাব যায় না ধুলে! এ ওঁর স্বভাব। জানেন দিদি, একবার গঙ্গা দিয়ে নৌকো ক'রে যাচ্ছি, ছেলেপুলে তখনও কেউ হয় নি। নৌকো গুণ টেনে চলেছে, নৌকোর ওপর শুধু মাঝি ব'সে আছে হাল ধ'রে। আমি ছইয়ের মধ্যে ব'সে তরকারি কুটছি আর উনি তোলা উনুনে বাইরে ইলিশমাছ ভাজছেন। একবার পেছন ফিরে দেখি, লোক নেই; দু-একবার ডাকাডাকি ক'রে সাড়া না পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলুম, চিনি কিনা!

মাঝিকে জিজ্ঞাসা করি, ও মাঝি, বাবু কোথায়?

মাঝি তো একেবারে থ। এই জলজ্যান্ত লোকটা কোথায় উধাও হয়ে গেল!

এদিক ওদিক দেখতে দেখতে নজর পড়ল, সেই দূরে জলের মধ্যে উনি একবার ক'রে উঠছেন আর ডুবছেন।

থামা থামা, নৌকো থামা! কিন্তু দাঁড়ীরা তখন গুণ টেনে চলেছে, তারা কি শুনতে পায়! অনেক কষ্টে মাঝি তাদের থামালে, উনি সাঁতরে এসে নৌকোয় উঠলেন।

ব্যাপার কি?

—শুনলুম, ঘুড়িটা কি ক'রে জলে প'ড়ে যাওয়ায় উনি লাফিয়ে পড়েছিলেন।

—আচ্ছা, বলুন তো দিদি, সেই ঘুড়িটা উদ্ধার ক'রে উনি কোন্ লোকের উপকারটা করলেন? ও স্বভাব, যার যা স্বভাব!

বাবা চোখ বুজেই বললেন, সেটা ছিল আসামের ঘুড়ি, দাম তিন পয়সা।

মা রেগে সেখান থেকে উঠে গরগর করতে করতে নীচে নেমে গেলেন।

সেদিনের হাঙ্গামাটা যদি আর একটু সন্ধ্যে ঘেঁষে হ'ত, তা হ'লে অমৃত ভাল, কিন্তু আমাদের বরাতে তা হ'ল না। সন্ধ্যে অবধি একটি ঘুম দিয়ে নবীন উৎসাহে বাবা আমাদের পড়াতে বসলেন। সেদিনকার চাঁটি-গাঁট্টাগুলোর মধ্যে মাধুর্য্যরসের পরিমাণ কিছু বেশি ব'লে বোধ হতে লাগল।

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

লিঙ্গ-বিভ্রাট

ওহে ও রমা রায়,
ও নামে চিঠি হায়,
  দিও না আর কভু মোরে।
বাবা সে কাকা মোর
দিত যে আজি ঘোর
  মেয়ের চিঠি মনে ক'রে!

মেয়ে যে তুমি নও
আসলে পুংই হও—
  জানিবে কি তা কাকাবাবু?
এবার হলে মতি
"রমা"র পাশে "পতি"
  লিখিও। ইতি তব হাবু।

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

গণ-ভোট

শ্মশানের নেই সহানুভূতির প্রয়োজন
  আগুনে যা দেবে তাকে পুড়ে হবে ভস্ম,
গণতন্ত্রের বৃথা গণ-ভোট আয়োজন
  লুণ্ঠন ক'রে এনেছে যাদের শস্য।

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

মেঘমল্লার

ধরণীর ক্ষুদ্র জল-কণা
মহাশূন্যে মেঘ-লোক করেছে রচনা।

প্রথম প্রভাতে
উষার কিরণ-পাতে
বহুবর্ণ স্বপ্নলীন
আবিষ্ট সে বাসনা-রঙিন ;
কামনার কল্প-লোকে ছড়াইয়া আবীর-কুঙ্কুম
ফুটাইছে আকাশ-কুসুম।

তপ্ততর হয় রবিকর,
ভাসে মেঘ অলস মন্থর।
আনমনে শোনে,
ধরণীর ধূসর প্রাঙ্গণে
উঠিতেছে করুণ মর্মর ;
চেয়ে দেখে ঊর্ধ্বমুখে মানব বর্বর
জানাইছে আদিম প্রার্থনা—
দাও, দাও, আরও দাও—ক্ষুধা মিটিল না।
চক্ষে শঙ্কা, বক্ষে দোলা আশা-নিরাশার,
কণ্ঠে সুর চির-পিপাসার।
থমকি দাঁড়ায় মেঘ ;
ঝরঝর ঝরে বারি—মনে জাগে বিচিত্র আবেগ।
কার আকর্ষণে
সহসা বর্ষণে
লুপ্ত করে আপনারে ?
কার লাগি ?   কে চেয়েছে তারে ?

কেহ তো চাহে নি কিছু!—হয় অপ্রস্তুত—
সহসা জলিয়া ওঠে দু নয়নে ব্যঙ্গের বিদ্যুৎ।
দূরে দূরে বহুদূরে ভেসে চ'লে যায়
অন্তহীন শূন্য নীলিমায়।

স্বর্গ হতে ঝ'রে পড়ে অঙ্গে তার আলোক-মঞ্জরী;
জ্যোছনার জরি
কখনও সাজায় তারে সোহাগে আদরে
নিশীথের নিস্তব্ধ বাসরে;
শুকতারাটিরে
ঘিরে ঘিরে ভাসে ধীরে ধীরে;
লোহিতাভা রোহিণীর মোহ
হয়তো গড়িয়া তোলে স্বপ্ন-সমারোহ;
হয়তো রেবতী, অনুরাধা
সৃষ্টি করে নব নব বাধা;
তবু
থামে না সে কভু।
ভেসে চলে ধীরে
অগণিত জ্যোতিষ্কের ভিড়ে।
প্রসারিয়া আপনারে স্বচ্ছ লঘুতায়
আলো-আঁধারির মাঝে শুধু ভেসে যায়।
দূর হতে দেখে ছায়া-পথ
প'ড়ে আছে ক্ষীণ যারাবৎ
অতীব স-সীম,
মহাশূন্যে অন্ধকারই আভাসিছে অনন্ত অসীম!

সহসা শ্রবণে পশে দীর্ণ করি স্তব্ধতা নিঝুম
বন্দী বিরহীর ডাক,—আহরিয়া ফুটন্ত কুসুম

কে যেন বসিয়া আছে কার লাগি চিত্রকূটমূলে,
কনক-বলয় ছুটি পড়িয়াছে খুলে :
হতাশে, বিবশে,
আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে
উন্মুখ অধীর চিত্তে ব'সে আছে নিবিড় লগনে
নির্ব্বাক বেদনা তার ভাষা খোঁজে গগনে গগনে
মেঘ হ'ল মেঘদূত। শ্যামকান্তি নব জলধর
নামিল কদম্ব-বনে, মাতিল ময়ূর-মধুকর,
উড়িল সারসকুল, ডাকিল দাছুরি,
মূর্ত্ত হ'ল অপরূপ বিরহ-মাধুরী
কেয়ায়, কেকায়—
লেখা হ'ল বিদ্যুৎ-লেখায়,
শিহরণ জাগিল গগনে,
উশীর-চন্দন-গন্ধ সমীরিল সজল পবনে।

চিত্রার্পিত প্রায়
হিমাচল-চূড়ালয় যেন শুভ্রকায়
নেহারিছে দূরে
টলমল স্বচ্ছ নীল মানস-মুকুরে
আপনার ছায়াখানি,—বিস্ময়ে মগন—!
ঊর্দ্ধে নিয়ে পরিব্যাপ্ত সীমাহীন অনন্ত গগন।
আবার সমাধি ভেঙে যায়—
কাঁদিতেছে কে যেন কোথায়!
নিষ্ঠুর দস্যুর পদে লুটাইছে ভিখারী লুণ্ঠিত?
উদ্ধত পাপীর দম্ভ পুণ্যবানে করেছে কুণ্ঠিত?
থামিল কি বাঁশী?
মদোন্মত্ত উচ্চকণ্ঠে শোনা যায় কার অট্টহাসি!

সহসা বিক্ষুব্ধ হয় মানসের স্বচ্ছ নীল নীর,
সহসা ঈশান-কোণে আসে বক্র কাল-বৈশাখীর
ভ্রুকুটি-কুটিল-ভাল আসে মেঘ রুক্ষ ভয়ঙ্কর
ঝঞ্ঝামত্ত বীর বজ্রধর,
তুলি সিংহনাদ
আলোড়িয়া সপ্ত সিন্ধু, বিদারিয়া পর্ব্বত প্রাসাদ,
উদ্‌ঘাটিয়া, উৎপাটিয়া, উৎখাতিয়া সকল জঞ্জাল
সৃষ্টিরে নির্ম্মল করে মূর্ত্ত মহাকাল।

দুগ্ধ-ধবল-কান্তি দেখি পুনরায়
হাসিছে সে ভাসিছে সে দিগন্ত-রেখায়,
নাহি ক্রোধ নাহি কোন জ্বালা
কণ্ঠে দোলে ইন্দ্রধনু-মালা!
এ মেঘের জন্মোৎসব জানি না তো কি করিয়া হবে
এ মেঘের জন্মদিন কবে?*

"বনফুল"

রিক্শা

এত গাড়ি ছিল, পয়সাও মোর ছিল তো কাছে,
ছিল তো মোটর, ছিল ঘোড়া-গাড়ি, বাসও তো আছে।
তবু সুন্দরী, কেন বেছে নিনু রিক্শাখানা,
এ যদি তোমার শুনতে কিছুই না থাকে মানা—
তবে শোন বলি: রিক্শায় আছে কাব্য বেশি,
ঘনিষ্ঠতর পারতো কি হতে এ ঘেঁষাঘেঁষি!
যে সাধ জীবনে হ'ত না পূর্ণ—জেনেও যদি,
আজি সত্বর মিটাইনু সখি, রিক্শা চড়ি।

শ্রীসুরেশ চট্টোপাধ্যায়

* কবি-বন্ধু শ্রীসজনীকান্ত দাসের জন্মদিন উপলক্ষে রচিত।

রঙীর ঘাট

ভোরের আলো সোনার রঙ নিয়ে ছড়িয়ে পড়বার আগেই দলে দলে গরু আর মহিষের গাড়ি এসে রঙীর খেয়াঘাটে জড় হয়। কিন্তু কানা ঠাকুরের ঘুম ভাঙে নি তখনও। ওই গাড়ির শব্দটা ওর স্নায়ু আর চেতনায় একান্তভাবে অভ্যস্ত, পরিপূর্ণ বিশ্রামের ভেতর কিছুমাত্র ব্যাঘাত তাতে সঞ্চার করতে পারে না।

ওপারে মহকুমা শহর, যাওয়ার পথে মাঝখানে এইটুকু বৈতরণী। ঠিক বৈতরণী নয়,—ঘাট ইজারা নিয়ে এক চোখ কানা বিশ্বেশ্বরী মণ্ডল খেয়া-নৌকোর ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। কানা ঠাকুর নামেই যে পরিচিত। আত্রাই অবশ্য ম'রে গেছে আজকাল, শুকনোর সময় চওড়া বালুতটের ভেতর দিয়ে ক্ষীণ প্রবাহ তিরতির ক'রে ব'য়ে যায়, চলতি জল আর রোদের চাকন্যে খোলা ঝিনুকগুলো একেবারে তলায় থেকে রূপোর মত ঝিলমিল ক'রে ওঠে। কিন্তু তাই ব'লে হেঁটে পার হয়ে যাওয়ার জো নেই। জেলা-বোর্ডকে পাঁচশো টাকা দিয়ে তবে ঘাট মিলেছে; হেঁটেই যাও কিংবা সাঁতরেই পার হও, পারানির পয়সা গুনে দিলে তবে নিষ্কৃতি। পশ্চিম থেকে এতদূরে অমচিন্তায় এসে নিশ্চয়ই দানছত্র খুলে বসে না কেউ।

মহকুমা শহর—আয়তনে আর লোক-সংখ্যায় বড় আকারের একটি পাড়াগাঁ। কিন্তু চারদিকের লোকের মামলা-মকদ্দমা, রেজিস্ট্রেশন আর ব্যবসা-বাণিজ্যের একমাত্র কেন্দ্র। আত্রাইয়ের একেবারে ওপারে বললে ঠিক হয় না, খানিকটা কাঁচা, তারপরে এবড়ো-খেবড়ো পাথর-ফেলা একটা দীর্ঘ পথ ঝাউবনের তলা দিয়ে আর ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে প্রায় আড়াই মাইল এগিয়ে শহরে গিয়ে ঢুকেছে। নদী পার হয়ে গাড়িগুলো ওই পথটা ধরবে, তারপর আস্তে আস্তে ঝাউ আর দেবদারুর ছায়ার নীচে দিয়ে ওই কালো অরণ্যরেখাটার পারে মিলিয়ে যাবে—যেখানে দু-তিনটি কালো কালো চিমনি ক্রমাগত ধোঁয়া ছড়িয়ে শহরের অস্তিত্ব সম্পর্কে আভাস দিচ্ছে।

গাড়োয়ানদের ধৈর্য্য লোপ পাওয়ার উপক্রম। আকাশ সাদা হয়ে উঠল আত্রাইয়ের পরপারে, অস্তযাত্রী শুকতারা জলজল করছে ঝাউ-বনের মাথায়। তা ছাড়া আজকে হাটবার।

বেলা জাগতে চলল যে। হোই হো ঘাটোয়াল, কত ঘুমুবে আর? ওঠ ওঠ, পার ক'রে দাও।

ঠাকুরের ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু ইচ্ছে ক'রেই সে ওঠে নি। এই লোকগুলো তারই আশায় এবং অপেক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষা করছে এবং পার না ক'রে দিলে আরও অনিশ্চিতকাল প্রতীক্ষা করতে হবে তাদের। নিজের মধ্যে সে অনুভব করে আভিজাত্যের একটা বিচিত্র উষ্ণতা।

বিরক্ত গম্ভীর স্বরে কানা ঠাকুর জবাব দেয়, সরকারের হুকুম। সকাল নইলে খেয়া খুলবে না। তোমাদের পার ক'রে দিয়ে আমি জেল খাটব নাকি?

গাড়োয়ানেরা মিনতি করে। দেরি হয়ে গেলে মহাজন মজুরি কেটে নেবে। কিন্তু উত্তর-বাংলার ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট চাষী-সম্প্রদায়—রক্তে জ্বরের টেম্পারেচার ছাড়া আর কোনও উত্তাপ নেই তাদের। বলে, দোহাই ঠাকুর, আর আটকে রেখো না। সকালের দেরি কোথায়? ওই তো পূবে রঙ দিচ্ছে, এখনই রোদ উঠবে।

মন নরম হয়, কিন্তু নিরস্ত্র হতে চায় না সম্পূর্ণভাবে। বলে, সরকারের আইন আছে, তোমাদের কথা শুনলে তো আমার চলবে না। নিজেরা গোলমাল ক'রেই তো সব হাঙ্গামা বাধিয়েছ, আমি কি করব?

গাড়োয়ানেরা নতমস্তকে চুপ ক'রে থাকে, অভিযোগটা তাদের বীজাণু-জর্জর শীতল রক্তেও দোলা লাগিয়েছে। বাস্তবিক, কানা ঠাকুর কিছুই করতে পারে না—দোষ সম্পূর্ণভাবে তাদেরই। আজ তিন মাস ধ'রে নানাভাবে সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত চলছে, আরও কতকাল যে চলবে, কে জানে।

দেশে নামমাত্র ফসল হয়েছে এবার—অজন্মাই বলতে হয়। গত বছর আট আনি আন্দাজ ধান হয়েছিল, এবার আরও কম। অনেক

কিছুদিন আগে পর্যন্ত এদিককার সব জমিগুলো অপর্য্যাপ্ত ধানে যেন মুঠোয় মুঠোয় সোনা বিলিয়ে দিত। কিন্তু দিনের পর দিন সে সব সোনা-ফলানো জমির প্রাণ-নির্য্যাস নিঃশেষে শুকিয়ে ঝ'রে আসছে—বছরে একবারের বেশি ফসল হতে চায় না। বোরোর জমিতে আগে বারো মাস বিলের জল থাকত, কিন্তু বিল শুকিয়ে এখন তলা থেকে রোদে ফাটা এঁটেল মাটি বেরিয়ে পড়েছে—বহুদূরের মজা নদী থেকে নালা কেটে জল আনতে হয় আজকাল। কিন্তু সে অশ্রু আর স্বেদের অর্দ্ধেক পুরস্কারও হয়তো মেলে না—একদিন দেখা যায়, অর্দ্ধপুষ্ট ধানের চারাগুলো ক্রমে লাল হয়ে উঠছে, তারপর খড়ের মত শুকিয়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে। পোকা। প্রতিকার নেই, শুধু আকাশ থেকে দুর্ভিক্ষের ছায়া কালো হয়ে নেমে আসে দারিদ্র্যজীর্ণ গ্রামগুলির ওপর; অন্ধ বিধাতার অসতর্ক হাত থেকে নিক্ষিপ্ত নির্বিচার মৃত্যুবাণ যেন।

শুধু কি তাই? বৃষ্টিও বিমুখ হয়েছে। আষাঢ় মাস পার হয়ে যায়, আকাশে লঘু মেঘ দেখা দিয়েই ঝ'ড়ো হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায় পাটল দিগন্তে। ন্যাড়া জমিগুলো কাঁটা-গাছ আর রুক্ষ মাটির চাঙাড় ব'য়ে প'ড়ে থাকে, ফলের চিহ্নহীন অহল্যা পৃথিবী যেন অভিশপ্ত পাষাণের মত শ্যামল মেঘের তপস্যা করে—করুণ, ব্যর্থ তপস্যা। তারপর হয়তো দু-একদিন কৃপণ বর্ষণ। ধুলো মরে, মাটি ভেজে না।

অন্যান্ত বছর যা হোক কিছু হয়, কিন্তু চরম দুর্দ্দিন এবার। যুদ্ধের বাজার একটা করাল বিভীষিকা। দু-চারখানা মাঠ ছাড়া একটি শীষ নেই ধানের। ক্ষেতের অবস্থা দেখে মহাজন ধার দেয় না, হাটে হাটে বিকি হয় গরু-মহিষ, শেষ সম্বল থালা-বাটি, এমন কি লাঙলের ফলা পর্য্যন্ত।

দুর্ভিক্ষ আর ক্ষুধার দুটো রূপ আছে—হত্যা আর আত্মহত্যা। একটা ব'য়ে আনে আর একটাকে। তাই একদিন বুভুক্ষু মানুষের একটা আত্মঘাতী ঝড় ব'য়ে গেল মধুগঞ্জের হাটের ওপর দিয়ে। হাট লুট হয়ে গেল, রাধাচরণ কুণ্ডুর গদিতে লাগল আগুন। হ্যাণ্ডনোটের তাড়া-বাঁধা কাগজগুলো পুড়ে রাশি রাশি কালো ছাই হয়ে গেল, আর বন্ধকী

সোনা-রূপোগুলো গ'লে গ'লে তাল পাকিয়ে রইল কতকগুলো যক্ষ নরমুণ্ডের মত।

কিন্তু আত্মহত্যার এটা প্রথম পর্ব। দুদিনের মধ্যেই আইন এল ধর্মসংস্থাপন করতে। গুলির মুখে কেউ কেউ ক্ষুধা আর দুশ্চিন্তার হাত থেকে লাভ করল মহা-নির্বাণ, সরকারের নিরাপদ আশ্রয়ে কেউ কেউ আশ্রিত রইল সুদীর্ঘকালের মত। অপ্রত্যাশিত মরা-নদীতে যে জোয়ার এসেছিল, প্রখর ভাঁটার টানে তার চিহ্নমাত্র রইল না।

এখনও তারই প্রতিক্রিয়া চলছে। আইনের অক্টোপাস-বাহু আজ পর্যন্ত দিকে দিকে প্রসারিত। সন্ধ্যার পরেই খেয়াঘাট বন্ধ হয়ে যায়, ভোর হ'লে আবার পারাপার।

কিন্তু কানা ঠাকুর পুরোপুরি মহাজন নয়। তাই এতক্ষণে করুণা হয় তার।

এ রামসুখী, এ হরনন্দন, আরে, নাওঠো খোল দিহ ভেইয়া।

লোটা রেখে দাঁতন ঘষতে ঘষতে রামসুখী আর হরনন্দন বড় নৌকোটা খুলে আনে। তারপর ঠেলাঠেলি ক'রে একখানার পর একখানা গাড়ি তুলে ফেলা হয় নৌকোতে। গরু-মহিষেরা জলের ওপর মাথা জাগিয়ে শিং তুলে সাঁতরে নদী পার হয়ে যায়, মহিষ অনেকক্ষণ পর্যন্ত গা ডুবিয়ে খেলা করতে চায়। ওদিকে ঝাউবনের ওপারে সাদা হয়ে আসা শুকতারা, ক্রমশ অস্তে নেমে যায়, আত্রাইয়ের নীল জলে সকালের আলো ঝলমল করে ময়ূরকণ্ঠী হীরার মত।

নৌকো খোলবার আগে পয়সাকড়িগুলো ভাল ক'রে গুনে নেয় কানা ঠাকুর। গাড়ি প্রতি তিন আনা। দুটো পয়সা কম নেবার জন্যে ঝুলোঝুলি করে দু-চারজন। ঠাকুরের উদারতা আছে, অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে যায় হয়তো।

কি আছে গাড়িতে? হাটবারে এত কি বিক্রি করতে চলেছ শহরে?

ধান।

ধান ! ঠাকুরের কণ্ঠস্বরে বিস্ময় প্রকাশ পায়, বলে, এবারেও যে ধান বিক্রি করতে যাচ্ছ, সারা বছর খাবে কি ?

রক্ষিত মশায়ের ধান গো, আমাদের নয়। আমরা কোথায় পাব ? দু-চার কাঠা যা হয়েছে, তাতে তো তিন মাসের বেশি চলবে না। কেমন ক'রে যে জান বাঁচবে, আল্লা জানেন।

ঠাকুর সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। হিন্দীর সঙ্গে ভাঙা ভাঙা বাংলা মিলিয়ে বলে, হাঁ হাঁ ভেইয়া, বড় খারাপ বছর পড়েছে এবার। লড়াইয়ের যা হাঙ্গামা ! গোটা দেশ না খেয়ে ম'রে যাবে।

গোটা দেশ না খেয়ে ম'রে যাবে—কথাটা এমন নির্মম এবং অনিবার্য সত্য যে, কিছু আর বলবার নেই। নিরুত্তরে ওরা একবার আকাশের দিকে তাকায়, হয়তো আল্লার কাছে আবেদন জানাবার জন্যেই। নির্মল নীল আকাশে সকালের আলোর সহজ প্রসন্নতা। হালকা হালকা মেঘের কিনারায় জরির পাড়ের মত রোদ জ্বলছে।

ঠাকুর আবার বলে, রক্ষিত মশাইয়ের ধান ! সব বিক্রি ক'রে দিচ্ছে নাকি ?

বাঃ, দেবে না ? পাঁচ টাকা দর, ওই কলওয়ালারা কিনে নিচ্ছে। রক্ষিত মশাই এবার লাল হয়ে গেল।

পাটনগরের রামনাথ রক্ষিত। তালুকদারি আর মহাজনিতে লক্ষপতি লোক। সমস্ত জেলা জুড়ে তার ধানের জমি, দুর্ভিক্ষের বছরেও তার গোলায় শূন্যতা নেই। শস্যবিরল রিক্তশ্রী মাঠের মধ্য দিয়ে ক্ষুধা-জর্জর মৃতকল্প গ্রামগুলির পাশ দিয়ে রক্ষিত মশাইয়ের ধান-বোঝাই গাড়িগুলি চ'লে যায় শহরে। চিনির বলদের মত নিরন্ন গাড়োয়ান অহিংসার বলদের সর্বাঙ্গ শাঁটার ঘায়ে রক্তাক্ত ক'রে দিয়ে গাড়ি হাঁকায়। অভুক্ত বলদ ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে চলে, শাঁটার রক্তচিহ্নে ভনভন করে ওড়ে ডাঁশের দল। সকাল আটটার ভেতরে শহরে পৌঁছনো চাই, কলওয়ালাদের জরুরি তাগিদ।

গাড়িগুলো সব নৌকোয় তোলা হয়ে গেছে। একটার কাঁধে আর একটা। রামহরী আর হরনন্দন নৌকো খুলে দেয়। মহুয়া-শহরের

প্রান্তরেখায় কলের কালো কালো চিমনিগুলির মুখ তখন রাশি রাশি ধোঁয়ায় উঠছে রেখায়িত হয়ে।

পুরানো অশথগাছটার মাথায় একটা বাঁশের ডগায় এক টুকরো লাল কাপড় পতাকার মত উড়ছে—হনুমানজীর ধ্বজা। ওর নীচেই খড়ের চাল দিয়ে ঠাকুর পাকাপাকি বাসের বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছে। বাইরে একটা বড় আকারের বাঁশের মাচা। গাঁজার কলকেটা হাতে নিয়ে কানা ঠাকুর মাচায় এসে বসে। রামসুখী আর হরনন্দন খেয়া-পারাপার করে। ঠাকুর ব'সে ব'সে পয়সা গুনে নেয়, অলস ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে মন ভেসে চলে তার। আত্রাইয়ের বালুচরে অভ্রবিন্দুগুলো তীক্ষ্ণভাবে জ্বলতে থাকে, নানা জাতের মাছরাঙারা তীরের মত জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, উল্লসিত চিত্তলের লেজে রূপোর চকিত ঝলক দিয়ে যায়। আর তারই সঙ্গে চোখে পড়ে, গরুর গাড়ির চাকায় চাকায় ওপারের পথটা যেন ধুলোর কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

আশ্বিনের নদী। শ্রাবণের পূর্ণতা থিতিয়ে ম'রে যায় নি এখনও। ওদিকে বৈঁচিবনের আশেপাশে যেখানে অজস্র কাশ ফুটেছে, তার তলায় নীল জলে এখনও ঘূর্ণি ঘুরছে। তিন-চারটে বড় নৌকোর মাস্তুল দেখা যায় ওখানে বাঁকের মুখে। গুণ টেনে এগিয়ে আসছে।

ধানের নৌকো। বছর বছর আসে, এবারেও এসেছে। ধান, ধান, ধান। দেশ আর জাতির প্রাত্যহিক অন্নমুষ্টি, পৃথিবীর খনি থেকে উছলে-ওঠা সোনা। উত্তর-বাংলার শস্যভাণ্ডার এই জেলায়, কেবল বাংলা দেশ নয়, পশ্চিমও তার ক্ষুধার্ত করপুট প্রসারিত ক'রে দেয়। তারাই আসছে বোধ করি।

গাঁজার কলকে নামিয়ে রেখে উৎসুক চোখে কানা ঠাকুর তাকিয়ে থাকে। সাত-আটশো মণী সব নৌকো—অতিকায় জলজন্তুর মত আসছে এগিয়ে। এই রতীর ঘাটেই তারা নোঙর করবে, প্রতি বছর যেমনভাবে করে। ঠাকুরের সঙ্গে ওদের অনেকেরই আলাপ আছে। তা ছাড়া দেশোয়ালী ভাই—মনটা খুশি হয়ে ওঠে।

ঘাটে নৌকো এসে ভেড়ে। শিউপূজন মাঝি এবারেও এসেছে—হালের মাথায় সেই-ই ব'সে আছে। বয়স হয়েছে, চুলগুলো সাদা, নারিকেলের ছোবড়ার মত পেশীতে পেশীতে গিঁট-পড়া কঠিন বাহু। কানা ঠাকুরকে দেখে হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তার মুখ। বলে, রাম রাম।

রাম রাম। সব আচ্ছা তো ভেইয়া? দেশের খবর কি এ সাল?

আর দেশের খবর! শিউপূজনের স্বরে বৈরাগ্য প্রকাশ পায়, বলে, ভারী হাঙ্গামা। থানা ডাকঘর সব লুটপাট হয়ে গেল—গোলী চলছে। কিন্তু বাংলা মুলুকের বাতচিত কি ঠাকুরজী? ধান কেমন?

ধান কোথায় মিলবে? পানি হয় নি। দেহাতি লোক সব ক্ষেপে গেছে। দু-চার কাঠা যা হয়েছে সে তো মহাজনের ঘরে। আধিয়াররা যা পেয়েছে তিন মাসের খোরাক হয় না তাতে।

বড়া মুশকিল! শিউপূজন গম্ভীর হয়ে যায়, ধান মিলবে না একেবারে?

থোড়া মিলতে পারে। বহুৎ দাম।

শিউপূজন আর একবার চিন্তিত স্বরে বলে, বড়া মুশকিল!

নদীর স্রোতের সঙ্গে বেলা গড়িয়ে চলে। হাটের দিন। এক মুহূর্ত খেয়া-নৌকোর বিশ্রাম নেই। নিশ্চিন্ত আরামে ব'সে পারানির কড়ি গুনে চলে কানা ঠাকুর। মাঝে মাঝে চোখে তন্দ্রার শিথিলতা যেন আমেজ দেয়, মনে পড়ে সুদূর পশ্চিমের কোন্ প্রান্তে অখ্যাত অজ্ঞাত একটি গ্রাম। মেটে দাওয়ার গায়ে গেরিমাটির আলপনা আঁকা, কঞ্চির মাচাভরা সিমের লতায় বেগুনীরঙা ছোট ছোট অসংখ্য ফুল। দাওয়ায় ব'সে যে মেয়েটি জাঁতায় ক'রে গহম পিষে চলেছে, তার গায়ে মোটা মোটা রূপোর গয়না, পরনে বাসন্তী রঙে ছোপানো শাড়ি। তার কালো চোখ দুটি কোন্ এক প্রবাসীর কথা স্মরণ করে অজ্ঞাতে সজল হয়ে উঠেছে।

মাথার উপরে নদীর জ'লো বাতাসে গান গায় অশথের পাতা।

দূরের থেকে অশ্রান্ত শিস শোনা যায়—পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা। নদীর জল ঘাটের গাড়ি-নামানো "করাশের" গায়ে ছলছল ক'রে ছোঁয়া দিয়ে যায়। আত্রাইয়ের বুকে ছোট নৌকোয় পাল ওঠে।

নারীকণ্ঠের কলরবে কানা ঠাকুরের তন্দ্রাচ্ছন্নতা কেটে যায়।

তিন-চারখানা গাড়ি ওপার থেকে এপারে এসে জমেছে—নিশ্চয়ই শহরের আমদানি। আট-দশটি পুরুষ, গুটিচারেক মেয়ে সঙ্গে। মেয়েগুলি ঠিক সাধারণ পর্য্যায়ের নয়। দুজন বিড়ি টানছে আর চারদিকে কটাক্ষ করছে, একজন ইয়ারকি দিচ্ছে পুরুষদের সঙ্গে, আর একজন তারস্বরে চীৎকার ক'রে চলেছে—প্রাণপণে উদ্ধার করছে কারও পূর্ব্বপুরুষকে। গাড়িগুলিতে বাঁয়া-তবলা, হার্মোনিয়াম, নাচগানের দশরকম সরঞ্জাম আরও।

এ তোমাদের কিসের দল ভাই?

খ্যামটা—খ্যামটার দল। পদ্মলতার নাম শুনেছ, পদ্মলতা? যার গানে গোটা দেশ মূর্চ্ছো যায়!

একটি মেয়ে কাঁচ ভাঙবার মত শব্দ ক'রে উচ্চ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হেসে ওঠে।

ও মা, নিতাইমামা মেড়োকে পদ্মলতার গান শোনাচ্ছে গো, কতবড় বাবু পেয়েছে একখানা! ও পদ্মী, একবার চোখ মেলে তোর মেড়োবাবুকে দেখে নে।

পদ্মী অথবা পদ্মলতা বিরক্ত ভ্রূকুটি করে। হৃতাবশেষ সৌন্দর্য্যের সঙ্গে বিষাক্ত অবসাদ। লীলাভরে বলে, মরণ!

মরণ কেন লো? ভাল ক'রে দেখ না তাকিয়ে। ভুঁড়ো পেট, তায় এক চোখ আবার কানা। মরি মরি, কি রূপই খুলেছে গো, যেন সাক্ষাৎ একাদশী ঠাকুর!

এত কথা কানা ঠাকুর বুঝতে পারে না। ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টি মেলে একবার বারাঙ্গনাদের দিকে তাকায় কেবল। বলে, গাওনা হবে নাকি?

নিতাইমামাই জবাব দেয়, বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, গাওনা হবে। পাঁচ-নগরের রক্ষিত মশাইয়ের বাড়ি। ভারী ধুমধাম হবে—বুড়ো বয়েসের ছেলে কিনা।

খ্যামটার গাড়ি চ'লে গেলে কানা ঠাকুরের অন্তমনস্ক চেতনায় সাড়া দিতে থাকে পাটনগরের রক্ষিতের কথা। লোকটাকে কতবার সে দেখেছে, তারই খেয়ায় পার হয়ে সে কতবার শহরে গেছে মামলা করতে। ষাটের ওপর পেরিয়ে গেছে লোকটার বয়স, সমস্ত শরীরে অথর্বতার প্রকাশ, হাতে গলায় নানা রোগের একরাশ মাদুলি আর তাবিজ। সেই রামনাথ রক্ষিত বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছে গত বছর। আর শুধু বিয়ে করাই নয়, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পুত্রমুখ-দর্শন। ভাগ্যবান লোক রামনাথ রক্ষিত।

পাঁচজনে অবশ্য পাঁচ কথা বলে, রক্ষিতের সুপুরুষ জোয়ান ভাগ্নেকে সন্দেহ করে অনেকেই; কিন্তু সে সব কথায় কান দেওয়া উচিত নয়। অন্তত ছেলের উপর নিজের দাবিটাকে পাকাপাকি প্রতিষ্ঠা করবার জন্মেই বোধ হয় সে এত ঘটা ক'রে খ্যামটার আয়োজন করেছে। এদিক দিয়ে খুব দরাজ হাত রামনাথ রক্ষিতের। ক্রিয়া-কর্মে সে দু হাতে টাকা উড়িয়ে দেয়।

এই যে ঠাকুরজী, ভাল আছ তো?

গোবিন্দ সাহা এসে দাঁড়িয়েছে। রতী বাজারের নামকরা মহাজন। পরম বৈষ্ণব লোকটি। কপালে তিলক আঁকা, গলায় তুলসীর মালার সঙ্গে লাল শালুর ঝুঁড়োজালি ঝুলছে, ডান হাতখানা সব সময়ে তার ভেতরেই থাকে।

আইয়ে আইয়ে মহাজন, বৈঠিয়ে।—ব্যস্ত হয়ে সম্বর্দ্ধনা করে কানা ঠাকুর। গোবিন্দ সাহার ধানের আড়ত বিখ্যাত। এই রতীর ঘাট দিয়েই তার আড়তের ধান দেশ-বিদেশে নেমে যায়। তাই ঠাকুরের সঙ্গে তার বেশ একটা হৃদ্যতার সম্বন্ধ আছে।

আর ব'লে কি করব? রাধামাধব—যা দিনকাল পড়েছে!

মাচার এক পাশে অতি সন্তর্পণে আসন নেয় গোবিন্দ সাহা। চেহারায় সর্বাঙ্গ নিষ্ঠা আর শুচিতার ছাপ। চন্দন-চর্চায় কোনরকম অযত্নের আভাস নেই। ঝুঁড়োজালিটির নতুন শালু রক্তের মত টকটক করছে। বাঁ হাতের পাঁচ আঙুলে পাঁচটা আংটি।

সমর্থন ক'রে ঠাকুর বলে, হাঁ, মহাজন, দিনকাল ভারী খারাপ।

রাধামাধব, রাধামাধব! গোবিন্দ সাহার কণ্ঠস্বর অধ্যাত্ম-প্রেরণায় গভীর ও গম্ভীর হয়ে ওঠে, বলে, দিনকাল ভাল থাকবার কি আর জো আছে? বৃষ্টি হয় না। আরে বাপু, বৃষ্টি যে হবে তার পথ রেখেছ কিছু? অধর্ম, পাপ আর ব্যভিচার—বিধাতার রাজ্যে আর কতকাল সয় এসব? রাধামাধব, রাধামাধব!

শিউপূজন মাঝি এরই মধ্যে কখন সামনে এসে দর্শন দিয়েছে।

রাম রাম মহাজন।

এই যে, কি খবর? গোবিন্দ সাহা প্রসন্ন হয়ে উঠে বলে, এখনও বেঁচে আছ দেখছি। তারপর কী মনে ক'রে?

রামজী নিলেন না, তাই এখনও বাঁচিয়ে আছি। ধান নিতে এলাম মহাজন।

ধান! ধান কি হে? দেশে কি ধান আছে এবার?

হেঁ—হেঁ—হেঁ। বিনীত হাসিতে শিউপূজন বিগলিত হয়ে পড়ে, বলে, দেশে ধান না হ'লে কি হয়, মহাজনের গোলাতে দশ বিশ হাজার মণ মজুত থাকবেই।

কুঁজোজালির ভেতর দিয়ে দ্রুত আঙুল চলতে থাকে গোবিন্দ সাহার। প্রসন্ন চোখ দুটি প্রখর হয়ে উঠেছে। স্তুতি-বাক্যে দেবতারাও বরদান ক'রে থাকেন।

কিন্তু সাত টাকার কমে ধান বেচব না এবার—তা-ও কাঁচি।

শিউপূজনের বিনীত হাসিতে ব্যতিক্রম ঘটে না। বলে, দর-দামের জন্যে কি আর ঠেকবে মহাজন, সে ব্যবস্থা একটা হবেই।

কুঁজোজালির ভেতর চলিষ্ণু আঙুল থেমে আসে। চোখের তারার রঙ যেন বাঘের মত নীলচে হয়ে উঠছে। চর্বিতে ভারী গোল মুখটা চকচক ক'রে ওঠে তৈলাক্তের মত।

এস এস, কথাবার্তা হোক। মাচার ওপর থেকে মাটিতে নেমে দাঁড়ায় গোবিন্দ সাহা, বলে, চল মাঝি, আড়তের দিকেই যাওয়া যাক, তামাক-টামাক খাবে।

গোবিন্দ সাহার সৌজন্য আছে প্রচুর। বৈষ্ণবসুলভ বিনয়ের আদর্শ দৃষ্টান্ত লোকটা।

রাত্রি নামে। হাটের নৌকোর পারাপার শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। মিটমিটে লণ্ঠনের আলোয় মাচার ওপর গানের বই খুলে বসেছে কানা ঠাকুর। রামসুখী প্রাণপণে একটা ঢোলক পিটিয়ে চলেছে আর হরনন্দন একটা করতাল।

হোই হো ঘাটোয়াল!

এত রাত্রে কে নৌকো ডাকে? বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করে কানা ঠাকুর। বলে, রাত হয়ে গেছে, সরকারী হুকুম—পার হবে না।

হবে বাবা, ঠিক পার হবে। রক্ষিত মশাইয়ের বাড়ি যাচ্ছে যাত্রার দল, তিন রাত গান হবে। দাও দাও, পার ক'রে দাও। ভাল বকশিশ মিলবে।

থ্যামটা, তারপরে যাত্রা। উৎসব-আয়োজনের কোন কিছু এবার বাকি রাখবে না রক্ষিত—ছেলের ওপর দাবিটা সে প্রতিষ্ঠা করবেই। মনে ক'রে রাখবার মত সমারোহ বটে।

কিন্তু সরকারী হুকুম—

আরে রাখ বাবা, সরকারী হুকুম। রূপচাঁদের মহিমা তো জানই চাঁদ, অমন কত গণ্ডা সরকারী হুকুম পালটে যায়। বকশিশ মিলবে—পার ক'রে দাও।

সামান্য দ্বিধা। বাংলা দেশে সে তো রোজগার করতেই এসেছে, সরকারী হুকুম মেনে চলবার জন্যে নয়।

এ রামসুখী, এ হরনন্দন!

পর পর আটখানা গাড়ি। গাড়ি প্রতি আট আনা—রোজগারের দিকটা নেহাত খারাপ নয় আজকে। রাত্রে মলিন চটের বিছানায় শুয়ে শুয়ে কানা ঠাকুর ভাবে, দেশে সে এবার আরও কিছু জমি কিনবে, সেই সঙ্গে গোটাকতক মহিষ। তারপর—তারপর হয়তো একদিন এই রামনাথ রক্ষিতের মতই—অলস কল্পনা পাখা মেলে দেয়।

তার। পৃথিবীতে অসম্ভব নেই কিছুই, কোন ব্যাপারই নেই অবিশ্বাস্য। আট টাকা মাইনের একদিন যাদবপুরের জমিদারদের গোমস্তা হয়ে রামনাথ রক্ষিত যে এদেশে এসেছিল, এ তো একটা প্রসিদ্ধ জনপ্রবাদ।

বাইরে রাত্রি বাড়ে। কয়াশের গায়ে কলকল ক'রে অশ্রান্তভাবে কথা ক'য়ে চলেছে আত্রাইয়ের জল। অনেক দূরে নবীপুরের বাঁকের মুখে শ্মশানে চিতার আলো দেখা যায়। দূরের জঙ্গল থেকে শেয়ালের চীৎকার আসে, অশথের ডালে কাকের আর্তনাদ রাত্রিকে বিদীর্ণ ক'রে দেয়। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে গুপ্ত ঘাতকের মত প্যাঁচা এসে কাকের বাসায় হানা দিয়েছে।

তীব্র খানিকটা প্রবল চীৎকার। ঘুম ভেঙে যায় কানা ঠাকুরের। অমানুষিক কোলাহলে নির্জন রত্তীর ঘাট উচ্চকিত হয়ে উঠেছে।

এ রামসুখী, এ চন্দনচন্দন, বাহার চলো তো।

কিন্তু বাইরে এসেই কানা ঠাকুর ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়। মাথার ওপরে পাণ্ডুর চন্দ্রকলা। সেই ঘোলাটে চাঁদের আলোয় অজস্র লোক এসে জমায়েৎ হয়েছে রত্তীর ঘাটে। দু হাজার, তিন হাজার, হয়তো চার হাজার। তাদের অর্ধনগ্ন কালো কালো দেহ জ্যোৎস্নায় দেখাচ্ছে প্রেতমূর্তির মত, তাদের চোখগুলিতে জোনাকির দীপ্তি। হাতে তাদের বড় বড় ঝুড়ি, ভার বইবার বাঁক, বস্তা আর কোদাল। কোন এক যাদুকরের মন্ত্রোচ্চারে মৃত্যু-নিমগ্ন বাংলার কৃষকপল্লী থেকে উঠে এসেছে জীবনকামী মুমূর্ষুর দল।

কোথায় চলেছ তোমরা?

উত্তর আসে হাজার কণ্ঠে। সে শব্দে আকাশ চিরে ফেড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায় যেন।

শহরে যাচ্ছি আমরা। চাল চাই, খাবার চাই, বাঁচতে চাই।

কানা ঠাকুর নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। শঙ্কিত জ্যোৎস্নায়, বিবর্ণ আকাশের তলা দিয়ে ছায়ার মত তারা নদীর জলে নেমে যায়—সাঁতরে পার হয়ে যায় ক্ষীণস্রোতা আত্রাইয়ের কালো জল। অসংখ্য মানুষ

দিকেশে অন্ধকার জলে মুক্তাচূর্ণ জ্যোৎস্নায় ঝলমল ক'রে ওঠে। ঠাকুর সেদিকে তাকিয়ে থাকে নিঃশব্দে—চার হাজার লোকের কাছে পারানির কড়ি চাইতে তার সাহস হয় না।

ঝাউবনের ছায়ায় এবড়ো-খেবড়ো পাথর-বাঁধানো পথ দিয়ে চার হাজার লোকের জনতা এগিয়ে যায় শহরের দিকে। আকস্মিক একটা আশঙ্কায় থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে কানা ঠাকুরের হৃৎপিণ্ডটা।

রাত শেষ হয়ে আসে। ঝাউবনের ওপর ঝুয়ে পড়ে শুকতারা। নবীপুরের বাঁকে চিতার আগুনটা কখন নিবে গেছে। অশথের ডালে কাকের কান্না আর শোনা যায় না।

আত্রাইয়ের জলস্রোতেও যেন আমেজ দিয়েছে ক্লান্তির।

অর্ধনগ্ন কালো মানুষের দল ফিরে এসেছে এতক্ষণে। চাঁদের পাণ্ডুর আলোয় তাদের হিংস্র চোখ ছুরির ধারার মত জ্বলে। খালি হাতে ফেরে নি তারা। কোঁচড় ভ'রে ধান এনেছে, চাল এনেছে, সেই সঙ্গে এনেছে নতুন কাপড়। শহরে কেউ সদাব্রত খুলে তাদের দান করেছে নাকি?

এবারেও পারানির কড়ি না দিয়ে যে পথ বেয়ে এসেছিল, সেই পথেই ফিরে যায় তারা। কোলাহল ক্রমেই মিলিয়ে আসে দূরে। খন্তা, কোদালের চকচকে ফলাগুলো এখন আর দেখা যায় না। কানা ঠাকুর সন্দিগ্ধ চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে দিকচক্রবালে, যেখানে কালো বনরেখার আড়ালে ক্রমে ক্রমে আবছা হয়ে ফুটে উঠছে কলের চিমনিগুলো।

•

ভোর। অশথগাছের পাতায় ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে—মাছরাঙারা এসে উড়ে বসছে আত্রাইয়ের বালুচরে। আর শেষ-রাত থেকেই জোয়ারের মত গরু আর মহিষের গাড়ি এসে জমেছে এপারে—মতীর ঘাটে খেয়া পার হয়ে শহরে যাবে তারা। কানা ঠাকুরের স্তিমিত চেতনা থাকে উৎকর্ণ হয়ে। দৈনন্দিনের পুনরাবৃত্তি।

সকাল না হতেই সিউপুজন মাঝি এসে দেখা দেয়। বলে, হাজার

মণ ধান বিলল ঠাকুর তাই। মহাজন বড় বদমাস আছে। আড়াই রূপেয়া ক'রে ধান কেনা আছে, ছ রূপেয়ার কম ছোড়ল না।

খেয়া-নৌকোর পারাপার শুরু হয়েছে। পারানির কড়ি গুনতে গুনতে কানা ঠাকুর বলে, মহাজন আদমী এইসাই হোতা হো ভেইয়া!

দেশে বুভুক্ষার কোলাহল। ক্ষেতে ধান হয় নি এবার। কিন্তু গোবিন্দ সাহার ভাণ্ডারে লক্ষী আছেন অচলা হয়ে। যুদ্ধের বাজার —ধানের দুর্মূল্যতা, বেঁচে থাকবার জটিলতম সমস্যা আর সংঘাত। গোবিন্দ সাহার চর্বিসমৃদ্ধ তৈলাক্ত মুখখানা মনের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে কানা ঠাকুরের।

রামনাথ রক্ষিতের ছেলের অন্নপ্রাশন। এতবড় একটা সমারোহের ব্যাপার এ তল্লাটে আর কখনও হয় নি। কানা ঠাকুর কান পেতে শোনে নানা রকমের উত্তেজিত আলোচনা—যাত্রা, বাইনাচ। শহরের সেরা খ্যামটাওয়ালীর বায়না হয়েছে রামনাথ রক্ষিতের বাড়িতে।

শহরের দিক থেকে তিন-তিনখানা বড় লরি এসে থামে ওপারে। খেয়া পার হবে। হিংস্র গর্জন ক'রে পোড়া পেট্রোলের ধোঁয়া ছড়ায় মোটরের এঞ্জিনগুলো। আর্মড পুলিসের লরি। পাগড়ির পাশে পাশে উঁচু হয়ে আছে বন্দুকের কালো কালো নল।

দুখানা বড় বড় নৌকো জুড়ে লরিগুলোকে পার ক'রে দিতে হয়। কিন্তু এবারেও পারানির কড়ি মেলে না।

এলোমেলো ভাবনায় হঠাৎ আলোড়িত হয়ে ওঠে কানা ঠাকুরের মনটা। মধুগঞ্জের হাট, শহরে চালের কল, কিন্তু—, কিন্তু সেইখানেই কি শেষ? ইতিহাসের গতি কি এই পর্যন্ত এসেই থেমে দাঁড়াবে? বন্দুকের গুলিতে মানুষের ক্ষুধা কি মিটবে চিরদিন?

আজাইয়ের জল কলচ্ছন্দে ব'য়ে যায়। হাজারমণী নৌকোগুলোর হালের পারে জলস্রোতে ঘূর্ণি জাগে। ধান—চাষার রক্তসিঞ্চিত সোনার ধান—বুভুক্ষু দেশের ভেতর দিয়ে চলেছে ফাটকা বাজারে।

শিউপূজনের নৌকোয় ধান তোলা হয়—রাম, দুই, তিন। হাজার মণ ধান বিক্রি ক'রে সাড়ে তিন হাজার টাকা লাভ করেছে গোবিন্দ

সাহা। পুণ্যাত্মা ধর্মভীরু লোক—হুঁকোজালির মধ্যে হাতখানা রত নামজপ ক'রে চলেছে। ব্যাঙ্কে এবার অনেকগুলো কাঁচা টাকা দশকের অঙ্কে রূপ নেবে তার।

ওপার থেকে চীৎকার আসে, কই গো মাঝি ভাই, পার ক'রে দাও। রক্ষিত মশাইয়ের বাড়ি যাব আমরা—শুনছ?

রতীর ঘাটে খেয়া-পারাপার চলে। তারই মাঝখানে এক ফাঁকে হরনন্দন এসে বসে কানা ঠাকুরের পাশে। শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কেন ফৌজ কোথায় গেল ঠাকুরজী? মেহনতী লোকের ওপর আবার কি গুলি চালাবে?

কানা ঠাকুর উত্তর দিতে ভুলে যায়। ওপারে বহরুয়া-শহরের পথটা তখন ধুলোর কুয়াশায় আচ্ছন্ন আর আবিল হয়ে গেছে।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মিছিল

পথ আছে লক্ষ্য নেই, রূপ আছে আত্মা নেই, ছায়ার মিছিল,
চিন্তা আছে অর্থ নেই, মাটি আছে ঘর নেই, উদাস নিখিল।
দুঃখ আছে মন নেই, প্রেম আছে প্রিয় নেই, গভীর বিষাদ,
তাপ আছে পাপ নেই, কবি আছে কাব্য নেই, শঙ্কিত বিবাদ।
সত্য আছে তথ্য নেই, আরোগ্যের পথ্য নেই, অকূল পাথার,
সর্প আছে শিব নেই, প্রেত আছে কালী নেই—কাতারে কাতার।

উপকর্ম-বিভাগ

হাক যদি হুকবাল করত
কাজল আগুনে পুড়ে মরত
পুতুল নাচত যদি চামারে
মাঠের আগুন দিত কামারে
রান্না-বান্না ছেড়ে যদি কবিতা
সতীপনা করে বারবনিতা

কাপালিক করে যদি হরিনাম
গোস্বামীর বৈষ্ণবী পরিণাম,
সব কাজ সকলের সাজে না—
বাঁশরিতে পাখোয়াজ বাজে না।

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

ফসিল

ব্রহ্মা। [অধীরভাবে] না, না, ওসব একদম বাজে কথা। তোমার অক্ষমতা ক্রমশই প্রকট হয়ে পড়ছে বিষ্ণু। কথা ছিল, আমি সৃষ্টি করব, তুমি রক্ষা করবে।

বিষ্ণু। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি পিতামহ।

ব্রহ্মা। এর নাম চেষ্টা করা? আদিম যুগে আমি যে সব বিশাল সমুদ্র, বিরাট পর্ব্বত সৃষ্টি করেছিলাম, তার চিহ্ন পর্য্যন্ত আছে আর?

বিষ্ণু। আপনি একটা কথা বিস্মৃত হচ্ছেন পিতামহ। আপনি নিজেই যে আবার নক্ষত্রাদির পরিবেশ বদলে দিলেন হঠাৎ একদিন। সব উলটে পালটে গেল, তাই মহেশ্বর সুবিধে পেলেন।

ব্রহ্মা। তুমি কি করছিলে, মহেশ্বরকে রুখলে না কেন তুমি? তোমার পালন করবার কথা না?

বিষ্ণু। তাবৎ কারণ ঘটলে মহেশ্বরকে রোধ করবার সামর্থ্য আমার নেই। আপনি নক্ষত্রাদির পরিবেশ না বদলে দিলে—

ব্রহ্মা। [ধমক দিয়া] বার বার খালি ওই এক কথা। বড় শিল্পী মাত্রেই নিজের রচনায় একটু আধটু অদল-বদল ক'রে থাকে, তাই ব'লে সব উড়িয়ে দিতে হবে? গোড়ার যুগে যে সব অপূর্ব্ব উদ্ভিদ, অদ্ভুত প্রাণী সৃষ্টি করেছিলাম, সব উপে গেল ওই জন্যে? ওসব কিছু শুনতে চাই না। হিসেব দাখিল কর তুমি।

বিষ্ণু। আপনি প্রোটারোজোয়িক না আর্লি প্যালিয়োজোয়িক, কোন্ যুগের হিসেব চাইছেন?

ব্রহ্মা। কি বললে?

বিষ্ণু। প্রোটারোজোয়িক, আর্লি প্যালিয়োজোয়িক—

ব্রহ্মা। ওসব আবার কি কথা!

বিষ্ণু। মানুষেরা আপনার বিভিন্ন যুগের সৃষ্টির বিভিন্ন নামকরণ করেছে কিনা!

ব্রহ্মা। কি রকম? কি কি নাম শুনি?

বিষ্ণু। অ্যাজোয়িক, প্রোটারোজোয়িক, আর্লি প্যালিয়োজোয়িক, লেটার প্যালিয়োজোয়িক, ক্যাইনোজোয়িক—

বিষ্ণু ব্রহ্মার দিকে কাতর দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন
উর্বশী আসিয়া প্রবেশ করিল

উর্বশী। [মধুর হাসিয়া] অর্ধ-স্ফুট পারিজাতের নব পরাগে যে ললিত সুষমা আছে, তাকেই আজ মূর্ত করেছি একটি রাগিণীতে। শুনবেন পিতামহ?

ব্রহ্মা। কাজের কথা হচ্ছে, ভ্যানভ্যান ক'রো না এখন, যাও।

উর্বশী বিষ্ণুর দিকে চাহিয়া বাম চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া অপসৃতা হইল

ব্রহ্মা। মানুষ কোন্ যুগে আছে?

বিষ্ণু। ক্যাইনোজোয়িক যুগে। মানুষ আবার নিজের যুগকে নতুন নানা নামে ভাগ করেছে—আর্লি প্যালিয়োলিথিক, লেটার প্যালিয়োলিথিক—

ব্রহ্মা। দৈত্যরা কোন্ যুগে আছে?

বিষ্ণু। ক্যাইনোজোয়িক।

ব্রহ্মা। দেবতারা?

বিষ্ণু। ক্যাইনোজোয়িকই বলতে হয়।

ব্রহ্মা। সবাইকে ওই এক যুগে পুরেছে! থামাও যত।

বিষ্ণু। স্তন্যপায়ী জীবমাত্রকেই ওরা একযুগে ধরেছে। কিন্তু সভ্যতার উন্নতির হিসেবে ওই যে বললাম—আর্লি প্যালিয়োলিথিক, লেটার প্যালিয়োলিথিক—

ব্রহ্মা। থামাও, থামাও, সব থামাও। জোয়িক আর লিথিক! তুমি এই সব বাজে খবর সংগ্রহ ক'রে সময় নষ্ট করেছ খালি। তোমার আসল কর্তব্য ছিল সৃষ্টি রক্ষা করা, সেইটিই কর নি কেবল।

বিষ্ণু। যথাসাধ্য করেছি বইকি পিতামহ।

ব্রহ্মা। কিছু কর নি।

বিষ্ণু। এ কথা বলছেন কেন পিতামহ, আপনার সৃষ্টি তো এখনও আছে।

ব্রহ্মা। আমি যে সব মহাকাব্য সৃষ্টি করেছিলাম, কোথায় সে সব? বহু-যোজনব্যাপী বিশালদেহ সরীসৃপ, দ্বীপাকৃতি কূর্ম, দিগন্তবিস্তৃত-পক্ষধারী বিহঙ্গম, পর্বতপ্রমাণ রোমশকায় হস্তী, কোথায় তারা? গোটাকতক ছুঁচো, ফড়িং আর চামচিকে বাদে সব তো লোপাট হয়ে গেছে।

বিষ্ণু। তার জন্যে আমাকে মিছিমিছি দোষ দিচ্ছেন। আমি চেষ্টার কসুর করেছি কি? কিন্তু কিছুতেই রাখা গেল না, কি করব বলুন? আপনার মহাকাব্যগুলি যে বড় বেশিরকম অমিত ছিল পিতামহ। বিরাট পাখী, বিরাট তার ঠোঁট—ঠোঁটের ভেতরও আবার বড় বড় দাঁত—

ব্রহ্মা। আমি কি তোমার ফরমাশ অনুযায়ী সৃষ্টি করব নাকি?

বিষ্ণু। আজ্ঞে না, আমি তা বলছি না।

ব্রহ্মা। তবে এ রকম বাঁকাচোরা কথা বলবার মানে?

বিষ্ণু। আজ্ঞে না। আমি বলছি কিছুতেই রাখা গেল না ওদের। নিজেদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি ক'রে গেল কিছু; কিছু গেল প্রাকৃতিক প্রভাবে—

ব্রহ্মা। কিন্তু তুমি করছিলে কি? তোমার কর্তব্য ছিল তাদের রক্ষা করা।

বিষ্ণু। আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি। প্রত্যেকবার অবতার হয়ে তাদের মধ্যে জন্মেছি আদর্শ স্থাপন করবার জন্যে। কূর্ম মৎস্য বরাহ রূপ ধ'রে অসীম কষ্ট সহ্য করেছি—কাদায় জলে বনে বাদাড়ে। সে যে কি অসহ্য কষ্ট—

ব্রহ্মা। মজাও কম লোট নি। কৃষ্ণলীলায় অট্টহাস্যে বৃন্দাবনে তুমি যে রকম ফুর্তি উড়িয়েছ—[সহসা] অথচ যদুবংশটাকে বাঁধতে পারলে না। একটা মূষল জুটিয়ে—আঃ! একটু দুরন্ত দাবাদ হ'লেই অমনিই মহেশটাকে ডেকে ধ্বংস, ধ্বংস আর ধ্বংস। অই

এক শিখেছ—[চীৎকার করিয়া] ওই ওওটার সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে আমার সমস্ত সৃষ্টি তছনছ করেছ তুমি—

বিষ্ণু কাতরভাবে পুনরায় দ্বারের দিকে চাহিলেন। যে সিনেমা-তারকাটি মর্ত্যলোক অন্ধকার করিয়া সম্প্রতি দেবলোকে উত্তীর্ণা হইয়াছেন, তিনি প্রবেশ করিলেন। তাড়কেকো চু ড়িদার চেহারা। কিন্তু আধুনিকা বলিয়া ইঁহার প্রতি ব্রহ্মার কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব আছে বলিয়া বিষ্ণুর বিশ্বাস। বিশ্বাস কিন্তু ভূলুণ্ঠিত হইল

ব্রহ্মা। [রুক্ষ কণ্ঠে] তুমি এখানে ঘুরঘুর করছ কেন ?

সিনেমা-তারকা। [সসঙ্কোচে] আপনি আপিঙের কৌটোটা ফেলে এসেছিলেন, তাই দিতে এসেছি। ভাবলুম, সন্ধ্যে হয়ে গেছে—

ব্রহ্মা। যাও এখান থেকে। ফক্কড় কোথাকার !

সিনেমা-তারকা আফিঙের কৌটাটি রাখিয়া মুখ ফিরাইয়া হাস্য গোপন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন

বিষ্ণু। আপনার অহিফেন-সেবনের সময় কিন্তু উত্তীর্ণ হয়েছে পিতামহ।

ব্রহ্মা। ওসব চালাকি রেখে দাও। হিসেব চাই আমি।

বিষ্ণু। হিসেব কি ক'রে দোব, তা তো বুঝতে পারছি না।

ব্রহ্মা। তা বুঝতে পারবে কেন ! [সগর্জনে] আমি আজ পর্য্যন্ত যত কিছু সৃষ্টি করেছি, তার পাই-পয়সা নিখুঁত হিসেব চাই।

বিষ্ণু। এ যে অসম্ভব কথা বলছেন পিতামহ, আপনার সৃষ্টি অনন্ত—

ব্রহ্মা। শুধু অনন্ত নয়, অপরূপ, বিচিত্র বিস্ময়কর। তুমি আর ময়না মিলে গোল্লায় দিয়েছ সব। আবার নাকি শুনছি যুদ্ধ বাধিয়েছ ! ময়না আবার নাকি নন্দকাণ্ড শুরু করেছে ! আমি অনেক সহ্য করেছি, আর করব না। হিসেব দাও। তোমার ওপর রক্ষা করবার ভার দিয়েছিলাম, পাই-পয়সা হিসেব বুঝিয়ে দাও আমাকে।

বিষ্ণু। কি মুশকিল ! হিসেব কি ক'রে দোব বলুন ? নানা বিবর্ত্তনে—

ব্রহ্মা। হিসেব দিতে তুমি বাধ্য।

বিষ্ণু কি যে বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না

ব্রহ্মা। কথার জবাব দিচ্ছ না যে ?

বিষ্ণু। দাঁড়ান, তা হ'লে সেই পণ্ডিতটিকে ডেকে আনি, তিনি সৃষ্টিতত্বের অনেক কিছু খবর জানেন।

বিষ্ণু উঠিয়া গেলেন ও হেকেলকে লইয়া প্রবেশ করিলেন

ব্রহ্মা। এ কে?

বিষ্ণু। ইনি একজন বড় বৈজ্ঞানিক। [হেকেলকে] বলুন।

হেকেল। [সবিনয়ে] আমি অবশ্য খুব বেশি জানি না। ফসিলে মিসিং লিংক্‌সের যে সব প্রমাণ আমি পেয়েছিলাম, তার থেকে আমি মানুষ আর অ্যান্‌থ্রোপয়েড্‌সের একটা যোগসাধন করবার চেষ্টা করেছিলাম।

ব্রহ্মা। [বিষ্ণুকে] বাজে ধাপ্পা দিয়ে আমার কাছে পার পেয়ে যাবে ভেবেছ?

বিষ্ণু। আজ্ঞে, ধাপ্পা নয়, ফসিলেই আপনার সৃষ্টির ইতিহাস নিহিত আছে।

ব্রহ্মা। ফসিল কি? ফসিল?

হেকেল। ভূস্তরে মৃত প্রাণীদের যে সব চিহ্ন পাওয়া যায়, তার নাম ফসিল। কোথাও হয়তো একটা দাঁত পাওয়া গেছে, কোথাও বা মাথার খুলির খানিকটা, কোথাও হয়তো পায়ের এক টুকরো হাড়, কোথাও—

ব্রহ্মা। [যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন] অ্যাঁ! আমার সৃষ্টির এই দুর্দশা হয়েছে নাকি? কোথাও একটা দাঁত, কোথাও একটা মাথার খুলি, আর তাই শোনাচ্ছ আমাকে এসে?

হেকেল। এই সব থেকে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তা হচ্ছে—

ব্রহ্মা। [সহসা ফাটিয়া পড়িলেন] বেরোও এখান থেকে, বেরোও, বেরিয়ে যাও—

হেকেল ক্রতপদে বাহির হইয়া গেলেন

বিষ্ণু। পিতামহ, ধৈর্য্য রক্ষা করুন। শুনুন—

ব্রহ্মা। [চতুর্মুখে একসঙ্গে] মূর্খ, ভণ্ড, ক্রূর, শঠ—

বিষ্ণু। শুনুন—

ব্রহ্মা। অস্পৃশ্য, নারকী, দুরাত্মা, দুর্মতি—

বিষ্ণু। পিতামহ, পিতামহ—

ব্রহ্মা। দুঃশীল, পাপাশয়, নীচমনা, বিভীষণ—

বিষ্ণু। [অতিশয় শশব্যস্ত হইয়া] শুনুন শুনুন পিতামহ—

ব্রহ্মা আর সংস্কৃত গালাগালি সংগ্রহ করিতে না পারিয়া প্রাকৃত ভাষা শুরু করিলেন

ব্রহ্মা। জালিয়াত, ধড়িবাজ, লম্পট, স্বার্থপর—

ব্রহ্মার আটনয়নে ক্রোধবহ্নি ধকধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নিরুপায় বিষ্ণু শেষে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন ও ব্রহ্মার দুই পত্নী—দেবসেনা দৈত্যসেনাকে ডাকিয়া আনিলেন

দৈত্যসেনা। ভীমরতি হয়েছে মুখপোড়ার।

দেবসেনা। [বিষ্ণুকে] আমরা পেরে উঠব না। ডাক্তার ডাক। দুজন আধুনিক ডাক্তার এসেছেন স্বর্গে সম্প্রতি, তাঁদেরই ডাক। বেশ ছেলে দুটি।

ব্রহ্মা। [সগর্জনে] দূর হও, ধুমসী, মুটকী, ধ্যাড়েড়ে, ধুকড়ি—

দেবসেনা দৈত্যসেনা চলিয়া গেলেন। বিষ্ণু ত্বরিতগতিতে গিয়া ডাক্তার দুইজনকে ডাকিয়া আনিলেন

প্রথম ডাক্তার। এখানে এম এণ্ড বি সিক্স নাইন থ্রি পাওয়া যাবে কি?

দ্বিতীয় ডাক্তার। আমার মতে কিন্তু সাল্ফানিলামাইড ট্রাই করলে হ'ত।

ব্রহ্মা। [ক্ষিপ্ত হইয়া] গুণ্ডা, গাড়োল, উল্লুক, গাধা—

প্রথম ডাক্তার। এ রাঁচির কেস মশাই।

দ্বিতীয় ডাক্তার। আমি কিন্তু একটা এন্‌কেফালাইটিসে সাল্ফানিলামাইড দিয়ে—। ও মশাই, খড়ম খোলে যে, চলুন, চলুন—

সন্ত্রস্ত হইয়া ডাক্তার দুইজন সরিয়া পড়িলেন। গালাগালি দিতে দিতে ব্রহ্মার চতুর্মুখে ফেকো উঠিতে লাগিল। নিরুপায় বিষ্ণু তখন যাহাকে পাইলেন ডাকিয়া আনিলেন। সকলেই আসিলেন, কিন্তু কেহই কাছে যাইতে সাহস করিলেন না। সকলেই অবশ্য পিতামহকে প্রশমিত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপ্সরাগণ দূরে সারিবদ্ধ হইয়া কটাক্ষ বাণে মনোহরণের প্রয়াস পাইলেন। কিন্নরগণ গান গাহিতে লাগিলেন। বায়ু পবন আসিয়া চামর দুলাতে লাগিলেন, বরুণ শীকর-সিক্ত ব্যজন করিলেন, বীণাপাণি বীণায় ঝঙ্কার দিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পিতামহের চতুর্মুখ হইতে সমবেগে চার লাইন করিয়া গালি একসঙ্গে ছুটিতে লাগিল

বিষ্ণু। [জনান্তিকে] শুনুন পিতামহ—

ব্রহ্মা। দাগাবাজ, বদমাস, বেইমান, জোচ্চোর—

সহসা বিষ্ণু করযোড়ে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং অন্য সকলকে তাহাই করিতে ইঙ্গিত করিলেন

সকলে। [সমস্বরে] হে দয়াময়, হে করুণাসাগর, হে আদি জনক—

ব্রহ্মা। অসভ্য, অন্ত্যজ, পাপী, পাজি—

সকলে। [সমস্বরে] হে ব্রহ্মা, হে পিতামহ, হে চতুরানন, তুমি সর্ব্বতোমুখ, বাগীশ্বর, সকলের বিধাতা তুমি, তোমাকে আমরা প্রণাম করি।

ব্রহ্মা। ফক্কড়, কাজিল, ডেঁপো—

সকলে। হে কমলযোনি, সূর্য্য যেমন প্রসন্ন কিরণজাল বিস্তার করত কুজ্ঝটিকাকুল পদ্মবনকে পুলকিত করে, তুমিও তেমনই প্রসন্ন কিরণজাল বিস্তার করিয়া দিশাহারা আমাদের চিত্তকে উদ্ভাসিত কর—

ব্রহ্মা। নির্লজ্জ, নচ্ছার—

সকলে। [সমস্বরে] হে আদিকারণ, সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র তুমিই বিদ্যমান ছিলে। হে অজ, সলিলগর্ভে একদা যে অমোঘ বীজ নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তাহা হইতেই এই চরাচর বিশ্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে, হে ব্রহ্মরূপী, হে গুণাকর, হে অনন্তশক্তিনিধান, হে পিতামহ—

ব্রহ্মা। যত সব—

সকলে। [সমস্বরে] হে জগৎপতি, তুমি ঋষি, তুমি সুখ, তুমি জ্ঞান, তুমি প্রজাপতি, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি সুব্রাহ্মণ, তুমি অমিতবল, তুমি অমৃত, তুমি সাধু, তুমি মহাত্মা, তুমিই স্থিরাস্থির সমস্ত পদার্থ, তুমিই সর্ব্বোত্তম, তুমিই পরিত্রাণস্থান, হে আদীশ্বর, তোমা ভিন্ন কাহারও গতি নাই—হে দেবোত্তম, হে মূলাধার—

সকলে তারস্বরে ব্রহ্মার স্তব করিতে লাগিলেন। প্রায় ঘণ্টা দুই প্রার্থনা চলিলে পিতামহ নীরব হইলেন। আরও ঘণ্টা দুই পরে দেখা গেল তাঁহার চতুরাননে হাসি ফুটিয়াছে এবং তিনি আফিমের কৌটা খুলিতেছেন

"বনফুল"

কবি ও অকবি

কবির প্রতি

কবিতা! বন্ধু, কবিতা কাহারে বল?
উদাস নয়ন বেদনায় ছলছল,
জ্যোছনা-নিশির সুরভিত নিশ্বাস,
বুকে লুণ্ঠিত প্রেয়সীর কেশপাশ—

মিথ্যা প্রলাপ, বৃথা বোনা মায়াজাল!
কান পাতি শোন, হা-হা হাসে মহাকাল—
মৃত্যু মাতিছে অকরুণ তাণ্ডবে
জীবন ভরিয়া দাবদাহ খাণ্ডবে।
পণ্যা পৃথিবী, প্রেম সে গণিকাতন্ত্রী
সর্ব্বনাশের রাজ্যে মরণ মন্ত্রী।
গগন ভরিল আর্ত্তের হাহাকারে,
এখানে, মূর্খ, কবিতা শোনাবে কারে?
কবিতা—তাহার সুকোমল পরমায়ু
নিমেষ ফেলিতে হরে দক্ষিণ বায়ু।
সুস্থ মনের প্রশান্ত অবসর
সেই অবসরে কবিতারা বাঁধে ঘর।
কবিতা মনোবিলাস—
চাঁদের আলোকে মলয়বীজনে বসন্তে তার বাস।
পৃথিবী কাঁদিছে বেদনাতে জর্জ্জর,
বিরলে বসিয়া কবিতা শুনিব, কোথা হেন অবসর?

ছাড় ছাড় খেলা, হে খেলা-বিলাসী, কল্পনা-জাল বুনি
নিভৃত আলসে বৃথা কালক্ষয় ছাড়,
ফুলের চাঁদের বন্দনা ছাড়ি মানুষের কথা বল,
মানুষের কথা বলিতে যদি হে পার।

ভ্রমর তোমরা, জীবন-বৃন্তে ফুল ফোটে শুধু জান ;
জান না, তাহার কাঁটাই সত্য বেশি,
জান না, পৃথিবী ছুটি ও কর্ম্মে রচিত সমান ভাগে—
অমৃতে গরলে সারাদিন মেশামেশি।
হে কবি, শিল্পী, হে গুণী গায়ক, বাঁচিবে এ পৃথিবীতে ?
বিলাস-শয়ন ছাড়িয়া তা হ'লে চল—
যাহারা মরিল যাহারা বাঁচিল জীবনের মহাহবে
সহজ গদ্যে তাহাদের কথা বল।
চন্দ্রালোকিত রজনীর শেষে প্রখর সূর্য্য জাগে—
কবিতা লিখো না, গেছে কবিতার দিন—
ফুল চাঁদ আর জ্যোৎস্না—সে ছিল বহু শতাব্দী আগে
সে দিনের স্মৃতি ধূলিতে হয়েছে লীন।

অকবির প্রতি

বন্ধু,

অতীব সত্য—ফুল চাঁদ আর জ্যোৎস্না যেদিন ছিল
সেদিন চলিয়া গেছে বহুকাল আগে।
আমরা জেনেছি, ফুল ধরে লতা বাস্তব প্রয়োজনে,
চাঁদে শুধু বালুকণ মরুই জাগে।
সায়ান্স দিয়াছে চিনায়ে, যা ছিল ভ্রান্ত চোখের ফাঁকি,
ফিলজফি তারে বলেছে অর্থহীন ;
মূঢ় আমরা, মস্তক নাড়ি তারিফ করিয়া কহি—
কি ঠকাটাই যে ঠকিয়াছি এতদিন—
সে তথ্যটা তো চক্ষেই পড়িত না,
সায়ান্স যদি না ফেলিত ধরিয়া এদের প্রবঞ্চনা !

চিরকাল ধ'রে ঠকায়েছে এরা, মূঢ় করেছে আঁখি,
ঘটায়েছে কত সময়ের অপচয়,

মানুষও দিয়াছে প্রশ্রয় তারে—শিল্পী এঁকেছে ছবি,
কবি রচিয়াছে কাব্য প্রলাপময়।
নিজেরা কাটায় অকেজো জীবন, পরেরও সময় নাশে,
এই পাজিদের উচিত শাস্তি চাই—
গর্জ্জিল সবে, একস্বরে কর, তাড়াও সমাজ হতে,
কর্মজগতে ইহাদের স্থান নাই।
শিল্পী পালাল ফেলিয়া রঙের তুলি,
কলম ফেলিয়া কবিরা বসিল ইটের দোকান খুলি।

উষার আবীরে রাঙানো আকাশ—শিল্পী দেখিল চাহি
অবশ হস্ত বারেক খুঁজিল তুলি।
কবির কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত গান সভয়ে মরিয়া গেল,
ঝুঁকিয়া বসিল ঝাড়িতে ইটের ধূলি।
বরবধূ চলে, কবি কহে, পারি এই মুহূর্ত্তটিকে
অমর করিতে একটি সনেট দিয়া—
কহে তারা, হের হীরার দীপ্তি প্ল্যাটিনাম-আংটিতে,
কি হবে তুচ্ছ বাক্যের জাল নিয়া?
আষাঢ় নামিল শিল্পীর আঁখিপাতে—
ইটের হিসাবে কড়া ও ক্রান্তি মিলাইতে কবি মাতে।

ধীরে বাড়ে বেলা। কর্মব্যস্ত দিবসের কোলাহলে
দীর্ঘশ্বাসের ক্ষীণ ধ্বনি পড়ে চাপা—
অবসর হেথা নাহি বিলাসের, কর্ম ও বিশ্রাম
দুইই এখানে নিক্তি-ওজনে মাপা।
সন্ধ্যা নামিছে বনানীর শিরে—ইহারে বাঁধিয়া রাখি,
শিল্পী কহিল, সে শক্তি আর নাই।
বকেয়া হিসাব খুলিয়া খরিদ্দারেরে কহিল কবি,
তিরিশে তারিখে সমস্ত টাকা চাই

বাঁচা গেল বাবাঃ—গেছে কবিতার দিন,
কাজের রাজ্যে মাথা না গলায় ন্যাকামি অর্থহীন।
কি পেয়েছি, আর কতখানি গেল চ'লে
ইহাদের হায় সে কথা কে দেবে ব'লে!

অতীত সে দিনে—ফুল চাঁদ আর জ্যোৎস্না যেদিন ছিল,
তাদের পরশ ভাসিত ধরার 'পরে,
বাতাস গন্ধ-ঘন হ'ত যবে মাঠ ভ'রে যেত ফুলে,
চাঁদ আলো দিত সবাকার ঘরে ঘরে।
কবির সেদিন পড়ে নাই ডাক জগৎসভার মাঝে
এই মাধুরীরে বুঝায়ে বলিয়া দিতে,
সকলেরই বুকে জাগিল যে সাড়া, তাহার ব্যাখ্যা ক'রে
বাক্যের মালা হয় নাই বিরচিতে।
ফুল ফোটে আজ সভয়ে গোপনে তাই,
নাসিকার ছ্যাদা বড় ক'রে দিতে ছুতোর-মিস্ত্রী চাই।

টিকার ঠেলায় চিরবসন্ত পালায়েছে দেশ ছাড়ি
বছরে দুদিন দেখা দেয় কোনমতে।
ঘন ধূমজালে আবৃত আকাশ, পঞ্জিকা দেখে জানি
কতটুকু আলো কবে এল চাঁদ হতে।
কচিৎ কখনো ক্ষণিক খেলায় মেঘপুঞ্জের ফাঁকে
চুরি-ক'রে-চাওয়া চাঁদের ঝিলিকে দেখা,
কবি চাহে দিতে সবারে বিলায়ে, যে সুন্দরের কণা
ভাগ্যের বশে পেল সে দেখিতে একা।
রাখে না নিজের করিয়া যা পেল সবই,
তাই হতভাগা কৃপার পাত্র অকর্মণ্য কবি।

কৃপণা ধরণী, ছিঁটেফোঁটা মধু কচিৎ-কখনো চালে,
কবি তাহে নিজ অন্তরে লয় ধরি—

বাঁচাইয়া রাখে নিঃশেষে ঢালি আপনার প্রাণবারি,
যেন সকলের তৃষার পাত্র ভরি।
কত যে কষ্টে করে আহরণ—সে কথা গোপন রহে
কবির মনের নীরব মধ্যখানে ;
বিশ্ব তো শুধু রসধারা পায়, আলসে মিটায় তৃষা,
কবিরে রসের ভাণ্ডারী বলি জানে।
যায় নাই—আজও আছে কবিতার দিন,
এখনি তো তার প্রয়োজন, যবে ধরণী জ্যোৎস্নাহীন।

শুধু চাঁদেরেই চেনে না তো কবি—দুর্যোগ-ঘন রাত্রি
আকাশ যখন স্তম্ভিত মেঘভারে—
একাকী সে জাগে নয়ন পাতিয়া অন্ধকারের মাঝে,
বুকের মাঝারে আঁকিয়া লয় সে তারে।
বজ্র যখন নামে দিগন্তে বিদ্যুতে ধাঁধি আঁখি,
কবি সহে তার বহ্নিদহন জ্বালা,
প্রদীপশিখায় ধরিয়া তাহারে ধরে সকলের আগে,
তারেই ঘিরিয়া গাঁথে সে কথার মালা,
তাহার বুকের বীণায় ছেঁড়ে যে তার,
কবির কণ্ঠে নিখিলের হয়ে বাজে তারই ঝঙ্কার।

আর দেরি নাই,—সমাসন্নিহি, গেছে কবিতার দিন,
অচিরে করিবে 'জ্ঞান' ও 'কর্ম' ধরণীরে প্রাণহীন।
শ্মশান-ভস্মরাশিতে দাঁড়ায়ে গাহিব, দুঃখ নাই—
মরিয়াছি বটে, মূঢ়তা সহিয়া মাথা নীচু করি নাই।
সেদিন প্রভাতে বন্ধুদের রাশি ধূলায় পড়িবে ঢাকা,
গঙ্গা বহিবে পদ্মা হইয়া, কলিকাতা হবে ঢাকা।

'সমুদ্র'

সংবাদ-সাহিত্য

বর্ত্তমান আশ্বিন সংখ্যায় 'শনিবারের চিঠি' তাহার মর্ত্ত্যজীবনের পঞ্চদশ বর্ষ সম্পূর্ণ করিল; পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি নিরবচ্ছিন্ন মালা নয়, মধ্যে একবার একটা বিনিসূতার লম্বা ছাড় গিয়াছে। ছাড় বাদ দিয়াই সুখে দুঃখে নানা অবস্থাবিপর্য্যয়ের মধ্যে সে জীবনের প্রথম পনরোটা বছর কাটাইয়া দিল। ভাগ্যক্রমে তাহার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের অভাব কোনও দিনই হয় নাই; পুরাতনেরা প্রায় সকলেই আছেন, নূতন সুহৃদেরাও আসিয়া জুটিয়াছেন—তাঁহাদের সকলকেই আজ নমস্কার জানাইতেছি। যে দুই-চারিজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু কালের, ধর্ম্মের ও কর্ম্মের তাড়নায় '..থর বাঁকে অদৃশ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও অশ্রুভারাক্রান্ত স্মৃতি মনকে বিচলিত করিলেও তাঁহাদের সান্নিধ্য অনুভব করিতেছি। যে যবনিকার এপারে-ওপারে আমরা পরস্পর অবস্থান করিতেছি, তাহা কালমহিমায় এত দীর্ণজীর্ণ ও সূক্ষ্ম হইয়া আসিয়াছে যে, মনে হইতেছে, তাঁহাদের নিশ্বাস আমাদের গায়ে লাগিতেছে, হাত বাড়াইলেই তাঁহাদের ধরিতে পারিব। জীবিত ও মৃতের মধ্যে ব্যবধান এত তুচ্ছ ও এত নগণ্য ইতিপূর্ব্বে মানুষের ইতিহাসে আর কখনও হয় নাই। আগামী কার্ত্তিকে ষোড়শ বর্ষ প্রাপ্তির পূর্ব্বেই 'শনিবারের চিঠি' বয়সানুচিত এতখানি গাম্ভীর্য্য এবং নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছে যে, বয়সসুলভ চপলতায় সে লজ্জানুভব করিতে শিখিয়াছে। যুগ-প্রভাবসঞ্জাত এই অকালপক্কতাকে এ যুগের মানুষ নিশ্চয়ই ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন।

* * *

"সংবাদ-সাহিত্য" লেখা তাই এত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সমধর্মীদের ভুলত্রুটি লইয়া সরস রহস্যাঘাত অথবা কঠিন দণ্ড প্রহার যখন করা হইত, তখন কাজটা সহজ ছিল। আজ দেশ ও জাতির

বৃহত্তর পটভূমিকায় এই সকল ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি অতিশয় তুচ্ছ ঠেকিতেছে। মৃত্যুর মহাগহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নীর মত মনে হইতেছে, মৃত্যুকে যাহা রোধ করিতে পারে না, তাহার প্রয়োজন কি? যে বস্তু অসার, যাহা স্বভাবতই মরণশীল, তাহার উপর নিপুণ অথবা স্থূল অস্ত্রাঘাত করিয়া সময় ও শক্তির অপব্যবহারে কোনই লাভ নাই; যাহা স্থায়ী, যাহা নিত্য, তাহার গৌরবপ্রচারে ব্যক্তিগত লাভ না থাকিলেও আত্মপ্রসাদ আছে। অভ্যস্ত হাতের সামান্য কণ্ডূয়নবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া সেই আত্মপ্রসাদ হইতেই বা বঞ্চিত হই কেন?

* * *

সুতরাং পদ্ধতি-বদলের কথাটা মনে হইতেছে। লাঞ্ছনা ও অস্বীকৃতির দ্বারা ঘৃণ্য ও হেয়ের মহিমা বৃদ্ধি না করিয়া মহতের স্মরণীয় কীর্তি ও ভাষণ সাধারণের গোচরে আনিলে পুণ্য অর্জনের সম্ভাবনা আছে। মহত্ত্বের বিচারে কালের পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সংখ্যায় তাঁহারা কম নন। পৃথিবীর বহু পণ্ডিত এবং মনীষী ইঁহাদের সম্বন্ধে স্ব স্ব বিচার-বুদ্ধি লিপিবদ্ধ করিয়া ভুল করিবার অল্প অবকাশই আমাদের দিয়াছেন। এই সকল পরীক্ষায়-উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের রচনা লইয়া আমরা যদি মাসে মাসে আলোচনা করি, তাহা হইলে এক দিকে যেমন মানসিক গঙ্গাস্নানের পুণ্য সঞ্চয় হইতে পারে, অন্য দিকে তেমনই বহু ভ্রান্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত মানুষকে পথের সন্ধানও আমরা দিতে পারি। আমরা এবারে তাহাই করিব।

ডক্টর Richard Francis Weymouth ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে মূল গ্রীক হইতে আধুনিক চলতি ইংরেজী ভাষায় নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ টিপ্পনি-সহ প্রকাশ করেন। অধ্যাপক James Alexander Robertson প্রথমে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং পরে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে এই অনুবাদ আগাগোড়া সংস্কার করেন। এই সংস্কৃত অনুবাদের একটি সদ্যপ্রকাশিত সংস্করণ আমরা পাইয়াছি। এই পুস্তকের শেষ অধ্যায়

"The Revelation of John" (Apocalypses নামেও খ্যাত) হইতে কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া শুনাইতেছি—

যীশুখ্রীষ্টের কৃপায় এই ভবিষ্যদর্শন সম্ভব হইয়াছিল; তিনিও আবার ঈশ্বরের এই অনুগ্রহ পাইয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার সেবকেরা অদূরভবিষ্যতে যে সকল ঘটনা ঘটিবে সে বিষয়ে পূর্ব্বেই জানিতে পারে। যীশু নিজের দেবদূত মারফৎ তাঁহার সেবক যোহনকে ইহা অবগত করান। ঈশ্বরের প্রেরিতবাক্য এবং যীশু-প্রদর্শিত সত্য, যোহন ভাবাবেশে

যেভাবে দর্শন করিয়াছিলেন, এখানে হুবহু তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই ভবিষ্যবাণী যাহারা পাঠ করিবে এবং শ্রবণ করিবে এবং মনে রাখিবে তাহারা ধন্য, কারণ এই বাণী সফল হইবার দিন আসিল বলিয়া।...

এবং আমি দেখিলাম। একটি শ্বেত অশ্ব আবির্ভূত হইল, অশ্বারোহীর হাতে একটি ধনুক এবং তাহার মাথায় মুকুট ছিল; সম্মুখে যাহা পড়িয়াছে তাহাই জয় করিতে করিতে বিজয়ী চলিয়াছে।...

আবার একটি অশ্ব দেখিলাম—হত্যাশ্বের মত লোহিতবর্ণ, পৃথিবীর শান্তি অপহরণ করিবার শক্তি এই অশ্বের আরোহী লাভ করিয়াছিল, মানুষকে দিয়া মানুষ হনন করিবার শক্তিও। তাহার হাতে সুবৃহৎ তরবারি।...

আবার দেখিলাম, এবারে একটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব দৃষ্টিগোচর হইল। অশ্বারোহীর হাতে তুলাদণ্ড।...

আবার দেখিলাম, এবারে যে অশ্বটি আবির্ভূত হইল তাহা ছাইয়ের মত বিবর্ণ। এই অশ্বের আরোহীর নাম মৃত্যু এবং ইহার পশ্চাতে নরক ধাবমান। পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশের উপর তাহাদিগকে প্রভুত্ব করিতে দেওয়া হইয়াছে—তাহারা তরবারির সাহায্যে অথবা দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সাহায্যে অথবা পৃথিবীর হিংস্র পশুদের সাহায্যে হনন করিবার শক্তি লাভ করিয়াছিল।...

দেখিলাম, ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য যাহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, তাহাদের আত্মা মন্দিরবেদীর পাদদেশে দিরিয়া আছে। তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতেছে, হে প্রভু, হে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, তোমার বিচারের জন্য আর কতকাল প্রতীক্ষা করিব? আমাদের রক্তপাতের প্রায়শ্চিত্ত ইহারা কবে করিবে?

এবং তাহাদের প্রত্যেককে দীর্ঘ শুভ্র গাত্রাবরণ প্রদত্ত হইয়াছিল এবং তাহারা ধৈর্যের সহিত আরও অল্পকাল অপেক্ষা করিতে আদিষ্ট হইয়াছিল—যতদিন না তাহাদের সমান বন্দীভাগেদের সংখ্যা পূর্ণ হয়।...

হঠাৎ, কেন জানি না, মনে হইতেছে, ভারতবর্ষের বন্দীশালাগুলিতে বাইবেল পড়িতে দেওয়া হয়তো? অদ্ভুত মন!

• • •

ডক্টর আর. শ্যামশাস্ত্রী-অনূদিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র একটি প্রসিদ্ধ বই। ইহার চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় "জাতীয় সর্ব্বনাশের প্রতিকার"-সংক্রান্ত। মূল সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারি নাই বলিয়া ইংরেজী অনুবাদের অনুবাদ দিতেছি।

ঈশ্বরের অভিশাপ নানাভাবে একটি দেশের উপর বর্ষিত হইতে পারে—অগ্নি, বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ...

দুর্ভিক্ষের কালে রাজা শস্যভাণ্ডার ও খাদ্য-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রজার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেন।

সর্ব্বনাশ-সমুৎপন্নে যাহা কর্তব্য তিনি তাহা সকলই করিবেন, বিজ সকল বণ্টন করিবেন, প্রজাদের মধ্যে যাহারা ধনী তাহাদের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ প্রজাসাধারণের মধ্যে বিলাইয়া দিবেন অথবা প্রয়োজন হইলে প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের সাহায্য গ্রহণ করিবেন।

অতিরিক্ত কর চাপাইয়া কর্ষণ-রীতির প্রয়োগে অথবা পীড়ন করিয়া বমন-রীতির দ্বারা ধনীদের অস্বাভাবিক স্ফীতি হ্রাস্ করাও চলিতে পারে।

ঈশ্বর না করুন, আমাদের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলা দেশে যদি সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে এখানকার ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিভূ সার্ জন হার্বার্ট, বর্ত্তমান রাজপ্রতিভূ সার্ টমাস রাদারফোর্ড, খাজা নাজিমুদ্দিন, মিঃ সুরাবর্দী ও মিঃ ইস্পাহানী প্রভৃতিকে এক এক খণ্ড কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র খরিদ করিয়া দেওয়া যাইবে তো! বালাই, মিথ্যা ভাবিতেছি—সোনার বাংলায় এরূপ ঘটিবে কেন?

*   *   *

বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র প্রচলিত সংগ্রহের ষোড়শ খণ্ড হাতে পাইয়া ভারী আনন্দ হইল। রবীন্দ্রনাথ কত লিখিয়াছেন! আঠারোটি এরূপ বৃহৎ বৃহৎ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে—এখনও অনেক বাকি। এই খণ্ডে মাত্র কবিতার দিক দিয়া 'পুনশ্চ' নাটক-প্রহসনের দিক দিয়া 'চিরকুমার সভা' গল্প-উপন্যাসের দিক দিয়া 'গল্পগুচ্ছ' দ্বিতীয় ভাগ এবং প্রবন্ধের দিক দিয়া 'শান্তিনিকেতন' ১৩-১৭ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। রচনাবলীর সমস্ত খণ্ডগুলিই একসঙ্গে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার বাসনা হইল। বিছানার উপর সারি সারি সাজাইয়া (টেবিলে কুলায় না) এক এক করিয়া দেখিতে লাগিলাম। প্রচলিত—প্রথম খণ্ডেই 'রাজা ও রাণী' নাটক, কত দিন আগের লেখা! পড়িতে আরম্ভ করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াই চলিলাম। কাশ্মীরের রাজকুমারী সুমিত্রা জালন্ধরের রাণী হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে কাশ্মীর হইতে যাঁহারা জালন্ধরে আসিয়াছেন, তাহারা লোক ভাল নয়। জালন্ধরের প্রজাপুঞ্জের দুঃখের অবধি নাই। তাহাদের ভাগ্য ভাল, রাণী সুমিত্রা তাহাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়াছেন। কাশ্মীর ভুলিয়া জালন্ধররাজ্যকে নিজের রাজ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া হয়তো। জালন্ধরের ব্রাহ্মণ দেবদত্ত রাজা বিক্রমদেবের বন্ধু। প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে অন্তঃপুরের কক্ষে রাণী সুমিত্রার সহিত দেবদত্তের কথা হইতেছে—

সুমিত্রা। ঠাকুর কিসের কোলাহল?

দেব। শোন কেন মাতঃ। শুনিলেই কোলাহল।

সুখে থাকো বন্ধ করো কান। অন্তঃপুরে,
সেথাও কি পশে কোলাহল? শান্তি নেই
সেখানেও? বল তো এখনি সৈন্য লয়ে
তাড়া করে দিয়ে যাই পথ হতে পথে
জীর্ণচীর ক্ষুধিত তৃষিত কোলাহল।

সু। বল শীঘ্র কী হয়েছে।

দেব। কিছু না, কিছু না।
শুধু ক্ষুধা, হীন ক্ষুধা, দরিদ্রের ক্ষুধা।
অভদ্র অসভ্য যত বর্বরের দল
মরিছে চীৎকার করি ক্ষুধার তাড়নে
কর্কশ ভাষায়। রাজকুঞ্জে তাই মৌন
কোকিল পাপিয়া যত।

সু। আহা কে ক্ষুধিত?

দেব। অভাগ্যের দুরদৃষ্ট। দীন প্রজা যত
চির দিন কেটে গেছে অর্ধাশনে যার
আজো তার অনশন হল না অভ্যাস
এমনি আশ্চর্য।

সু। হে ঠাকুর, এ কী শুনি।
ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা। তবু প্রজা কাঁদে
অনাহারে?

দেব। ধান্য তার বসুন্ধরা যার।
দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা। এরা শুধু
যজ্ঞকুণ্ডে কুকুরের মতো লোলজিহ্বা
এক পাশে পড়ে থাকে, পায় ভাগ্যক্রমে
কভু যষ্টি, উচ্ছিষ্ট কখনো। বেঁচে যায়
দয়া হয় যদি, নহে তো কাঁদিয়া ফেরে
পথপ্রান্তে মরিবার তরে।

সু। কী বলিলে,
রাজা কি নির্দয় তবে? দেশ অরাজক?

দেব। অরাজক কে বলিবে। সহস্ররাজক।

সু। রাজকার্যে অমাত্যের দৃষ্টি নাই বুঝি?

দেব। দৃষ্টি নাই সে কী কথা বিলক্ষণ আছে।

গৃহপতি নিদ্রাগত, তা বলিয়া গৃহে
চোরের কি বৃত্তি নাই? সে যে পরিপুষ্ট।
তাদের কি দোষ? এসেছে বিদেশ হতে
রিক্ত হস্তে, সে কি শুধু দীন প্রজাদের
আশীর্বাদ করিবারে দুই হাত তুলে?
সু। বিদেশী? কে তারা? তবে আমার আত্মীয়?
দেব। রানীর আত্মীয় তারা, প্রজার মাতুল,
যেমন মাতুল কংস, মামা কালনেমি।
সু। জয়সেন?
দেব। ব্যস্ত তিনি প্রজা-শাসনে।
প্রবল শাসনে তাঁর সিংহগড় দেশে
যত উপসর্গ ছিল অন্নবস্ত্র আদি
সব গেছে—আছে শুধু অস্থি আর চর্ম।
সু। শিলাদিত্য?
দেব। তাঁর দৃষ্টি বাণিজ্যের প্রতি।
বণিকের ধনভার করিয়া লাঘব
নিজ স্কন্ধে করেন বহন।
সু। যুধাজিৎ?
দেব। নিতান্তই ভদ্রলোক, অতি মিষ্টভাষী।
থাকেন বিজয়কোটে, মুখ দেখে আছে
বাপু বাছা, আড়চক্ষে চাহেন চৌদিকে,
আদরে বুলান হাত ধরণীর পিঠে,
যাহা কিছু হাতে ঠেকে যত্নে লন তুলি।
সু। এ কী লজ্জা। এ কী পাপ। আমার আত্মীয়।...

স্বদেশী লোকও যে বিদেশী মনোভাবাপন্ন হইতে পারে, রাজা বিক্রমদেবই তাহার প্রমাণ। দেশী শিলাদিত্য, যুধাজিৎ, জয়সেনেরও অভাব নাই। প্রথম অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে অন্তঃপুরের পুষ্পোদ্যানে বিক্রমদেব ও সুমিত্রার কথা হইতেছে—

বিক্রম। কী কহিতে চাহ রানী?
সু। আমার প্রজারে যারা করিছে পীড়ন
রাজ্য হতে দূর করে দাও তাহাদের।

বিক্রম। কে তাহারা জান ?
সু। জানি।
বিক্রম। তোমার আত্মীয়।
সু। নহে মহারাজ! আমার সন্তান চেয়ে
নহে তারা অধিক আত্মীয়। এ রাজ্যের
অনাথ আতুর যত তাড়িত ক্ষুধিত
তারাই আমার আপনার। সিংহাসন
রাজচ্ছত্রছায়ে ফিরে যারা গুপ্তভাবে
শিকার-সন্ধানে—তারা দস্যু, তারা চোর।...

পঞ্চম খণ্ডের 'কাহিনী'-অংশ খুলিয়া "গান্ধারীর আবেদন" নামক কবিতায় এই পরম কল্যাণময়ী নারীরই অভিশাপ-মূর্তি দেখিয়া স্তব্ধ হইতে হয়। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পাপাশয় পুত্র দুর্যোধনের বিরুদ্ধে নালিশ জানাইয়া কোনও প্রতিকার না পাইয়া জননী গান্ধারী মানস-নেত্রে এই পাপের ভীষণ পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়া ঘোষণা করিলেন—

হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও। নত শিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য ধরি। যেদিন সুদীর্ঘ রাত্রি পরে
সদ্য জেগে উঠে কাল, সংশোধন করে
আপনারে, সেদিন দারুণ দুঃখদিন।
দুঃসহ উত্তাপে যথা স্থির গতিহীন
ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু—জাগে ঝঞ্ঝাঝড়ে
অকস্মাৎ, আপনার জড়ত্বের 'পরে
করে আক্রমণ, অন্ধ বৃশ্চিকের মত
ভীমপুচ্ছে আত্মশিরে হানে অবিরত
দীপ্ত বজ্রশূল, সেই মত কাল যবে
জাগে, তারে সভয়ে অকাল কহে সবে।
লুটাও লুটাও শির, প্রণম, রমণী,
সেই মহাকালে; তার রথচক্রধ্বনি
দূর রুদ্রলোক হতে বজ্র-ঘর্ঘরিত

ওই শুনা যায়। তোর আর্ত জর্জরিত
হৃদয় পাতিয়া রাখ তার পদতলে।
ছিন্ন সিক্ত হৃৎপিণ্ডের রক্ত শতদলে
অঞ্জলি রচিয়া থাক্ জাগিয়া নীরবে
চাহিয়া নিমেষহীন। তার পরে যবে
গগনে উড়িবে ধূলি, কাঁপিবে ধরণী,
সহসা উঠিবে শূন্যে ক্রন্দনের ধ্বনি—
হায় হায় হা রমণী, হায় রে অনাথা
হায় হায় বীরবধূ, হায় বীরমাতা
হায় হায় হাহাকার—তখন সুধীরে
ধূলায় পড়িস লুটি অবনত শিরে
মুদিয়া নয়ন।—তারপরে নমোনম
সুনিশ্চিত পরিণাম, নির্ব্বাক নির্ম্মম
দারুণ করুণ শান্তি, নমো নমো নম
কল্যাণ কঠোর কান্ত, ক্ষমা স্নিগ্ধতম।
নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নির্বৃতি।
শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি।

এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের একটি মাস্টারপিস, সকলেরই পড়িয়া দেখা উচিত।

—

গত সংখ্যার 'শনিবারের চিঠি'তে মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণ হইতে একটি কোটেশন ঝাড়িয়াছিলাম। মনে মনে একটু আত্মপ্রসাদ যে অনুভব করি নাই তাহা নয়, এমন সময় হঠাৎ গোপালদা ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, কাজটা ভাল কর নাই। মনটা দমিয়া গেল। একে তো গৃহিণীঘটিত ব্যাপারে সর্ব্বদাই অপরাধী হইয়া থাকিতে হয়। ইহার উপর বাহিরেও যদি মুহুর্মুহু জবাবদিহি করিতে হয়, তাহা হইলে বাঁচিয়া সুখ কি! একটু গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলিলাম, কোন্ কাজটা? গোপালদা বলিলেন, দেখ ভায়া, ওই বাল্মীকি বেদব্যাস দুইজনেই সমান জাগ্রত। বেদব্যাসকে অবহেলা করাটা ভাল হয় নাই। আমি বলিলাম, সে আমার অপরাধ নয়, আমি প্রাণপণে খুঁজিয়াছিলাম,

কিন্তু না পাইলে করিব কি? ঘোড়ার রাজসূয় এবং শেষে যুদ্ধে অধিকাংশ অভিনেতা-অভিনেত্রী মরিয়া হাজিয়া গেলে অশ্বমেধ—নরমেধযজ্ঞের কথা কোথাও আছে বলিতে পার? ঘোড়ার ডিম, মানুষের তুলনায় ঘোড়া? বুঝিলাম, গোপালদার মহাভারতটা তেমন পড়া নাই; মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, আছে নিশ্চয় আছে, থাকতেই হবে। "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে"—এ কথা তা হ'লে চলতই না।

• • •

কিন্তু গোপালদা যাহাই বলুন, ভারতে অর্থাৎ মহাভারতে নরমেধ-যজ্ঞের কথা কুত্রাপি নাই। মহাবীর কর্ণ পুত্র বৃষকেতুকে স্বহস্তে ছেদন করিয়া অতিথিসৎকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে পুত্র আবার বাঁচিয়াছিল। পল্লীগ্রাম হইতে ললাটে জয়পতাকা লিখিয়া মানুষগুলাকে শহরের লঙ্গরখানা (যজ্ঞশালা) অভিমুখে আর কখনও পাঠানো হইয়াছে কি? অশ্বমেধের ঘোড়া থাকিত একটা—এক স্বভাবতই তেজী হয়, কিন্তু নরমেধের নর হাজার হাজার; একের জীবনশক্তি লক্ষের মধ্যে সঞ্চারিত। অশ্বমেধের ঘোড়াকে বলি দিতে হইত—নরমেধের মানুষ ছুঁইলেই মরিয়া যায়। এই মহানরমেধযজ্ঞে পুণ্যসঞ্চয় করিতেছে কে, সেইটাই কেবল বুঝিতে পারিতেছি না।

• • •

দক্ষিণ-সমুদ্রতীরে এক দল মানুষ ঘরবাড়ি জোতজমা সংসারপরিবার পাতিয়া যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটাইয়া দিত, চাষ করিত, ফসল কাটিত এবং বাকি সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামা মামলা-মকদ্দমা লইয়া মগ্ন থাকিত না। হঠাৎ একদিন সেই হাজার হাজার লোকের উপর হুকুম হইল, এলাকা ছাড়িয়া যাও—জরুরি প্রয়োজনে জমি চাষ করা চলিবে না। অবশ্য বিনিময়ে মূল্য তাহারা পাইল, কিন্তু কালবৈশাখীর মুখে শুষ্ক তৃণখণ্ড কতক্ষণ থাকে? বিনিময়ের বদান্যতায় এক বর্ষ কাটিল। তারপর?

তারপর—আর এক দিকে সমুদ্রের শান্ত জল হঠাৎ গুলি-খাওয়া বাঘের মতন হুঙ্কার দিয়া বিপর্য্যয় লাফ মারিতে মারিতে মানুষের গ্রাম-জনপদের উপর আসিয়া পড়িল। সে মানুষগুলা ভাল নয়, ভগবান তাহাদের শাস্তি দিলেন। সাধু লোকেরা সর্ব্বদাই ভগবানের সহায়। মানুষ ভগবানের সহায় হইল, কলসীর শত ছিদ্র দিয়া অসতী রাধার সযত্ন-সংগৃহীত জল গলিয়া পড়িল; বালির তলায় পলিমাটি দীর্ঘকালের জন্য চাপা পড়িয়া গেল। ক্ষুধিতেরা চীৎকার করিল, বুভুক্ষুরা কাঁদিল, কিন্তু মানুষ তাহাদিগকে রুটির বদলে পাথর দিল।

* * *

ওদিকে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত বণিক-কোম্পানির বাণিজ্যের প্রয়োজনে উচ্ছৃঙ্খল দামোদর-অজয়-ময়ূরাক্ষী-দ্বারকেশ্বর-কংসাবতী বাঁধা পড়িয়া গুমরিতেছিলেন, পাহাড়-দেশের মেঘের অত্যধিক সরসতায় তাঁহারাই একদিন ফুলিয়া ফাঁপিয়া বাঁধ ভাঙিয়া ছুটিলেন; পক্কশীর্ষ আউস এবং সদ্য-বোনা আমন সেই তোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। গোলা ভাসিল, খামার ভাসিল, গোয়াল ভাসিয়া গেল। জল নামিয়াও নামে না; আশার ক্ষীণালোক ধীরে ধীরে নিবিয়া যায়। ক্ষুধিত মানুষ ছোটে, পায়ে হাঁটিয়া মাইলের পর মাইল পার হইয়া যায়। শহর।

* * *

গ্রামের ক্ষুধিত মানুষ শহরের ভিক্ষুক হইয়া ছিন্নবস্ত্রে পরস্পর গিঁট বাঁধিয়া পথে পথে ফেরে। তারপর আরও ক্ষুধার আগুনে বাঁধন পুড়িয়া যায়। দল ভাঙে। কে যে কোথায় ছিটকাইয়া পড়ে, তাহার হদিস পাওয়া যায় না। অসহায় অসতর্ক পাইয়া মৃত্যু তাহার বীভৎস শীর্ণাঙ্গুলি প্রসারিত করে। নরমেধযজ্ঞ আরম্ভ হয়।

* * *

এই আধুনিক সরোষ এবং গযোরাকে শাস্তি দিবার অধিকার বিধাতা যাহাদের উপর দিয়াছিলেন, তাঁহারাও অকস্মাৎ রুদ্ধমুষ্ট্যা বুদ্ধির বেড়াজালে ফেলিয়া রাতারাতি দেশটাকে শাসন করিতে চাহিল। এমনই মাছ ধরিবার কৌশল যে, বড় বড় রুই-কাতলারা ধরা পড়িল

না, চুনোপুঁটিরাও নয়; শুধু মাঝারি একসেরী, দেড়সেরী, দুইসেরীরাই জালে বাঁধা পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। একেবারে উজাড় হইবার উপক্রম। নরমেধযজ্ঞের মানুষ দ্বৃতাহুতি! শ্যামাপ্রসাদ সদ্যপ্রস্ফুটিত গবর্নর বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়াছেন। পক মারিয়া জুতা দান করিবার পদ্ধতি যাঁহারা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের এবার প্রসন্ন হইবার পালা। আমরা হয়তো বাঁচিয়া যাইব!

[illegible]হয়। সেই কথাই এ যুগের একজন মনীষী লিখিয়াছেন—
(অনুবাদ সাধ্যাতীত)

The passage from agriculture to industry, from the village to the town, and from the town to the city, has elevated science, debased art, liberated thought, ended monarchy and aristocracy, generated democracy and socialism, emancipated woman, disrupted marriage, broken down the old moral code, destroyed asceticism with luxuries, replaced Puritanism with Epicureanism, exalted excitement above content, made war less frequent and more terrible, taken from us many of our most cherished religious beliefs, and given us in exchange a mechanical and fatalistic philosophy of life. All things flow, and we are at a loss to find some mooring and stability in the flux....

From this confusion the one escape worthy of a mature mind is to rise out of the moment and the part, and contemplate the whole. What we have lost above all is total perspective. Life seems too intricate and mobile for us to grasp its unity and significance; we cease to be citizens and become only individuals; we have no purposes that look beyond our death; we are fragments of men, and nothing more. No one dares today to survey life in its entirety; analysis leaps and synthesis lags; we fear the experts in every field, and keep ourselves, *for safety's sake*, lashed to our narrow specialties. Every one knows his part, but is ignorant of its meaning in the play. Life itself grows meaningless, and becomes empty just when it seemed most full.

আমরা নিরাশ্রয় ভেলার মত জীবনসমুদ্রে ইতস্ততবিক্ষিপ্ত হইতেছি ; কাহারও কোনও উদ্দেশ্য নাই। জীবনের পানপাত্র পরিপূর্ণ করিয়া ওষ্ঠে তুলিতে যাইব, দেখিতেছি, কখন অদৃশ্য ছিদ্রপথে তাহা বিগলিত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আবছা আলো-অন্ধকারের যুগ ভাল ছিল কি? হইলে অন্তত উপরে-উদ্ধৃত মানস-বিলাসের আনন্দ আমরা পাইতাম না। আমাদের মনে হয়, এই আনন্দই আমাদিগকে ডুবাইয়াছে। ওমর খৈয়ামের মিত্ররূপী শত্রু ফিট্‌জেরাল্ড তাঁহার মারাত্মক অনুবাদ দিয়া আমাদিগকে মারিয়াছেন—

A flask of wine, a book of verse and thou
Singing in the wilderness——

কলিকাতা শহরের জনতার মধ্যেও আমরা নিঃসঙ্গ বিচরণ করিতেছি।

* * *

অনুবাদে আমাদের অক্ষমতা এই কারণেই জ্ঞাপন করিয়াছি, নতুবা আজকাল বাংলা দেশের বাংলা সংবাদপত্রে অনুবাদের যে সকল নমুনা দেখি, তাহাতে আত্মনিন্দার কোনও কারণ ছিল না। এই "আত্মনিন্দা"র ঔষধই 'আনন্দবাজার' 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রত্যহ প্রকাশিত হইতেছে। বাংলা পড়িয়া খুবই বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম, হঠাৎ উক্ত বিজ্ঞাপনের ইংরেজীরূপ দেখিয়া বুঝিলাম রোগটি "self-abuse"। নিজের মতিগতি দেখিয়া মনে হইতেছে "পরনিন্দা" রোগের একটা ঔষধ পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞাপিত হইলে আমাদের কাজে লাগিত।

* * *

পরনিন্দা বলিতে মনে পড়িল, গত আষাঢ় সংখ্যা 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র শ্রীজীবেন্দ্রকুমার গুহের প্রবন্ধ "সমালোচনা"র কথা। রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের প্রকাশিত প্রবন্ধ-সংগ্রহ 'সমালোচনা'র "সমালোচনা"র সমালোচনা একান্ত নিরর্থক এই কারণে যে, প্রবন্ধটি সম্ভবত শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কোনও প্রিয়দর্শন ছাত্রের রচিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-সুরভিত পত্রিকার সম্পাদকসঙ্ঘ এই অক্ষর দুর্মূল্যের বাজারে এতখানি বেহুঁশ হইলেন কেমন করিয়া, তাহাই আমাদের গবেষণার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে

নস্যাৎ করিবার চেষ্টা করিয়া পরে বারংবার লজ্জা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় ছাপা হইয়াছে—

মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে তাঁর এই প্রথম বয়সের সমালোচনাই মাইকেলের কাব্যের সঠিক সমালোচনা।

রবীন্দ্রনাথের রচনার সহিত ছোকরা আর একটু অধিক পরিচিত থাকিলে জানিতে পারিতেন 'মেঘনাদবধ' সম্বন্ধে তাঁহার শেষ উক্তি এই—

একদিন বঙ্গসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে সমস্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যের সাধনা সিদ্ধ হইয়াছিল।...মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য।

অলমিতি।

আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে "শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা" শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখিত প্রথম প্রবন্ধ; বাংলা দেশে বীণাপাণি বাগ্দেবীর সেবক যাঁহারা, তাঁহাদের প্রত্যেকের ইহা পাঠ করা উচিত। মূল কথা তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা এই—

অতএব লক্ষ্মী সরস্বতী একই। উভয়েই বেদের দিব্য সরস্বতীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যাঁহার কৃপায় ধনসম্পদ বিদ্যা-বুদ্ধি মেধাবৃত্তি লাভ হয়।

অর্থাৎ লক্ষ্মী সরস্বতীকে ভিন্ন ভাবিয়া আমাদের ভীত অথবা লজ্জিত হইবার কারণ নাই; শেয়ার-মার্কেটের দালালি করিলেও আমরা সেই সরস্বতীরই সেবা করিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং কতিপয় কলেজের কতিপয় অধ্যাপক ঝুড়ি ঝুড়ি নোট ও পাঠ্যপুস্তক লিখিয়া লক্ষ্মীর প্রসাদাৎ লেকাকলে যে বাড়ি হাঁকড়াইতেছেন, বিদ্যানিধি মহাশয় তাহারও সরস্বতী-মতে স্যাংশন দিয়া অনেককে আত্মগ্লানির হাত হইতে বাঁচাইলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মহাজন (Head of the Department of Bengali) রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর আশ্বিনের 'ভারতবর্ষে'র প্রথম প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, নাম—"বাংলার সংস্কৃতি ও ভারতের রাষ্ট্রভাষা।" গবেষণামূলক প্রবন্ধে খোলের বোল এবং মাদলের ঠেকা যাঁহারা দেখিতে চান, তাঁহারা ইহা নিশ্চয়ই পড়িবেন। ফাঁকা আওয়াজ যে কতখানি চিত্তচমৎকারী হইতে পারে,

তাহাই আবার স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। একটু নমুনা দিতেছি—

এই ভাষার দুইটি ধারা—পদ্য ও গদ্য—যমুনা ও গঙ্গার মত বাঙালীর কল্পনার মানস-সরোবর থেকে জন্মলাভ করে নিজির [বৈষ্ণবী মতে ইহা সিদ্ধ তো !] সমুদ্রপানে বয়ে চলেছে। বাংলা পদ্যের যুগ অবশ্য প্রাচীনতর; তারপর একদিন যখন এই পদ্য রচনার যমুনাধারা গদ্য রচনার ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হলো তখন কাব্যসরস্বতীর সেই ত্রিবেণী ধারায় অবগাহন করে বাঙালীর সংস্কৃতি পূর্ণ গৌরবে মণ্ডিত হয়ে উঠলো।

এ যেন সরকারী চাকুরির পেনশনের ধারার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একস্টেন্‌শন ধারা মিলিত হইয়া প্রয়াগ এবং তাহাই টেকস্টবই প্রকাশনের ধারার সহিত ত্রিবেণীসঙ্গমে যুক্ত হইয়া দুর্দান্ত হইয়া উঠিল। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির প্রসাদে এ সকলই সরস্বতী-মহিমা লাভ করিয়া পূতও হইল।

—

এই সংখ্যা "ভারতবর্ষে"ই ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন' সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার একটি ভাইসচ্যান্সেলরী আপ্তবাক্য ছাড়িয়াছেন—

বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর আর কোন গ্রন্থ নাই।

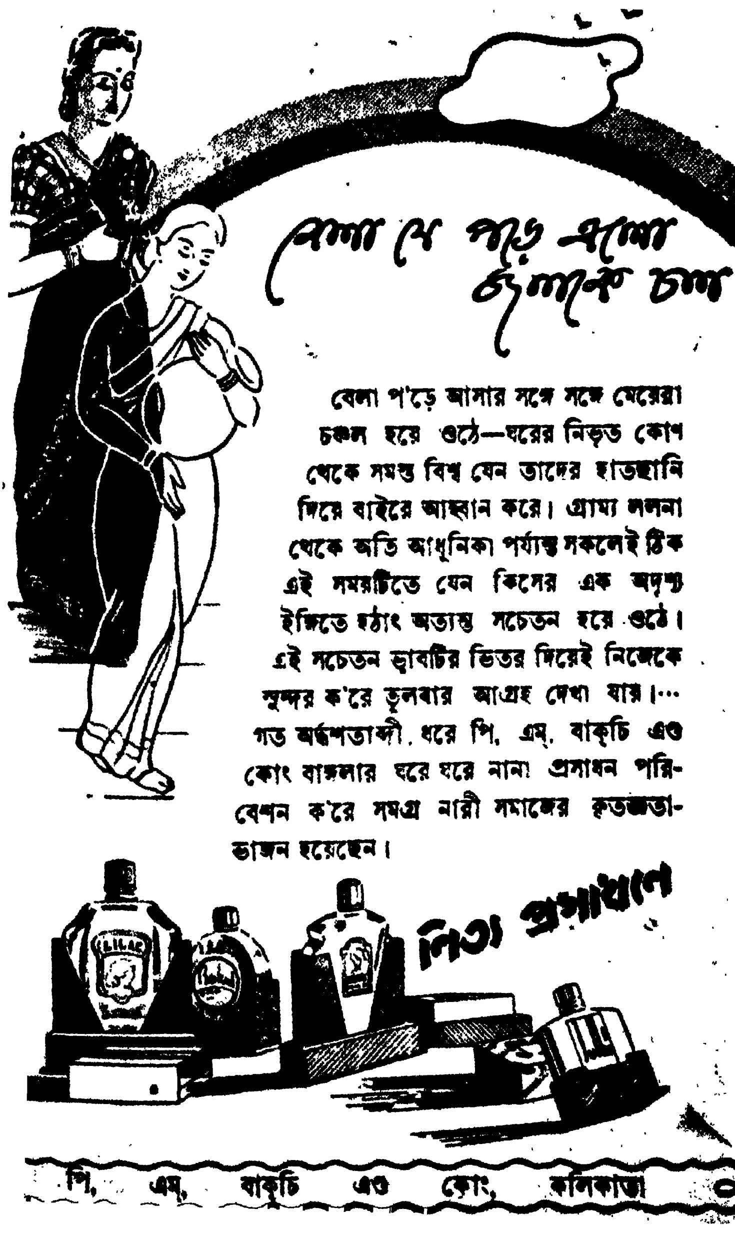
কেন না, আমি বলিতেছি। কিন্তু ঐতিহাসিকের যুক্তি তাহা হওয়া উচিত নয়। একটু সন্ধান করিলেই মজুমদার মহাশয় জানিতে পারিতেন, ওই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গীয় শিবরতন মিত্র মহাশয় *Types of Bengali Prose* নামক একটি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহা এইরূপ পত্র-সঙ্কলন মাত্র।

—

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পর্কচ্যুত হইয়া "অভিজাত" 'পরিচয়' মাত্র এই দুই মাসে কোথায় নামিয়াছে অথবা উঠিয়াছে, তাহা দেখিবার মত। প্রবন্ধগুলি না হয় সম্পাদকীয় আধুনিক মতবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—আমরা গল্পগুলির দিকে ইঙ্গিত করিতেছি। রাজকুমারী রাজরাণীদের স্থানে বেরজ (ব্রজ), চাপা, টগর; তাহাও বিল্ডিং হইতে লোজিং-এ নামিয়াছে। ভালই হইয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 'ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ড বাহির করিয়া গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ করিয়াছেন। এই খণ্ডের "বিদ্যাসুন্দর" অংশের পাঠ প্যারিসে রক্ষিত প্রাচীনতর পুথির পাঠ মিলাইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। ভূমিকা ও টীকা বিশদভাবে দেওয়া হইয়াছে। "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র ২৭ সংখ্যক পুস্তক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মীর মশার্‌রফ হোসেন'। 'বিষাদ-সিন্ধু'-প্রণেতা বাংলা দেশের প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক মীর মশার্‌রফ হোসেনের জীবনী প্রচার করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বিশ্বভারতী "বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ"গ্রন্থমালায় অবনীন্দ্র-নাথের সচিত্র 'বাংলার ব্রত' ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত 'জগদীশ-চন্দ্রের আবিষ্কার' প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমটি ওস্তাদ লিখিয়ে ও আঁকিয়ের বিখ্যাত ঐ নামীয় পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পুনর্মুদ্রণ। দ্বিতীয়টি অতি চমৎকার ভঙ্গীতে লেখা জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের সংক্ষেপ পরিচয়। বিশ্বভারতী "সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থমালা"র প্রথম পুস্তক 'কালিদাসের মেঘদূত'ও প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু উহার অনুবাদ অন্বয়সহ ব্যাখ্যা ও টীকা করিয়াছেন। এইরূপ সহজ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংস্কৃত মূল কাব্যের রসপরিবেশনের চেষ্টা ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই। 'গীতামৃত'—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ পাল-কৃত গীতার সরল কাব্যানুবাদ—দ্বিতীয় সংস্করণেই ইহার জনপ্রিয়তা সূচিত হইতেছে। শ্রীমতী বাণী রায়ের নূতন কাব্য-গ্রন্থ 'জুপিটার'—বিষয়বস্তু ও লিখন-ভঙ্গীর দিক দিয়া বাংলা কাব্য-সাহিত্যে অভিনব। ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত সত্যই লিখিয়াছেন—"এই গ্রন্থের কবিতাগুলি আধুনিক বাংলা কাব্যে গতানুগতিক সৃষ্টি নয়; সহজ স্বকীয়তায় নবীন।" 'অহঙ্কার' কবি পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় কাব্য গ্রন্থ—নূতন ছন্দে ও ভাবে কবির বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ। "ছবি"—"মেঘদূত"-রচিত নূতন-ধরনের উপন্যাস, লেখক যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত


বেলা যে প'ড়ে এলো
জলকে চল
বেলা প'ড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা চঞ্চল হয়ে ওঠে—ঘরের নিভৃত কোণ থেকে সমস্ত বিশ্ব যেন তাদের হাতছানি দিয়ে বাইরে আহ্বান করে। গ্রাম্য ললনা থেকে অতি আধুনিকা পর্য্যন্ত সকলেই ঠিক এই সময়টিতে যেন কিসের এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে হঠাৎ অত্যন্ত সচেতন হয়ে ওঠে। এই সচেতন ভাবটির ভিতর দিয়েই নিজেকে সুন্দর ক'রে তুলবার আগ্রহ দেখা যায়।... গত অর্দ্ধশতাব্দী ধরে পি, এম, বাকচি এণ্ড কোং বাঙ্গলার ঘরে ঘরে নানা প্রসাধন পরিবেশন ক'রে সমগ্র নারী সমাজের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন।
নিত্য প্রসাধনে
LILAC
পি, এম, বাকচি এণ্ড কোং, কলিকাতা

১৯৪৩ সালের যুগোপযোগী শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ঃ

● আজ ও আগামীকাল সিরিজ ঃ

শিবরাম চক্রবর্তী—মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী ২৲

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ ২৲, ১।০

সুশীলকুমার বসু—হিন্দু না মুসলিম ? ২।০

শুভেন্দু ঘোষ—শিল্প দর্শনের ভূমিকা ১৲

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ রায়—রুশিয়ার নৈতিক জীবন ৸০

সুধী প্রধান—কৃষিতন্ত্রের নবরূপ ১৲

● অন্যান্য প্রকাশাবলী ঃ

বিনয় ঘোষ—সোভিয়েট সভ্যতা (২য় ভাগ) ৪৲, ৩।০

„ সংস্কৃতির দুর্দিন ৶০

শুভেন্দু ঘোষ—চীনা গণনাটিকা ।০

শিবশঙ্কর মিত্র—সবিতাবৃত্ত ও বঙ্গদেশ ২।০

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়—এ যুদ্ধ বাধলো কেন ? ।০

অজিতেন্দু চক্রবর্তী—প্রবাহ (কবিতা) ১।০

কবি হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত ইংরেজী কবিতা

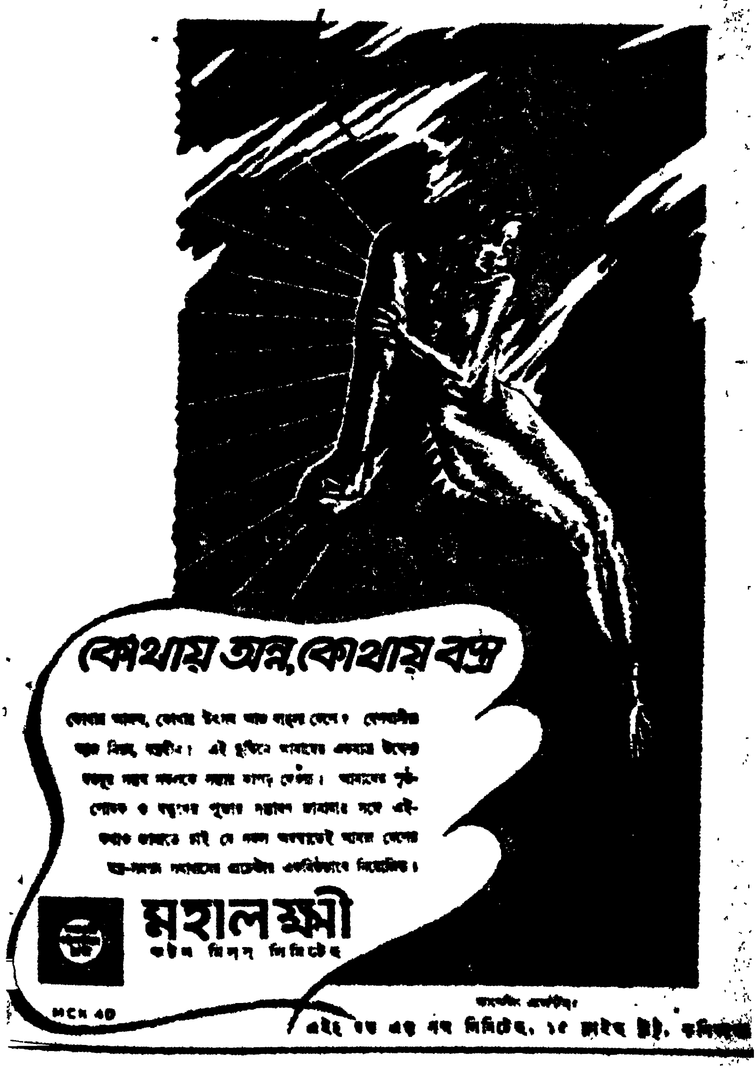
Sochi Raut Roy's—BOATMAN BOY ১।০

Com. V. Molotov's—Third Five-Year Plan—USSR—(Edited)

সন্ধানার পাব্লিশার্স, ৩৩।২ মণিভূষণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা

বিক্রয়কেন্দ্র : বুক এম্পোরিয়াম [কলেজ স্কোয়ার ষ্ট্রীট]
৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

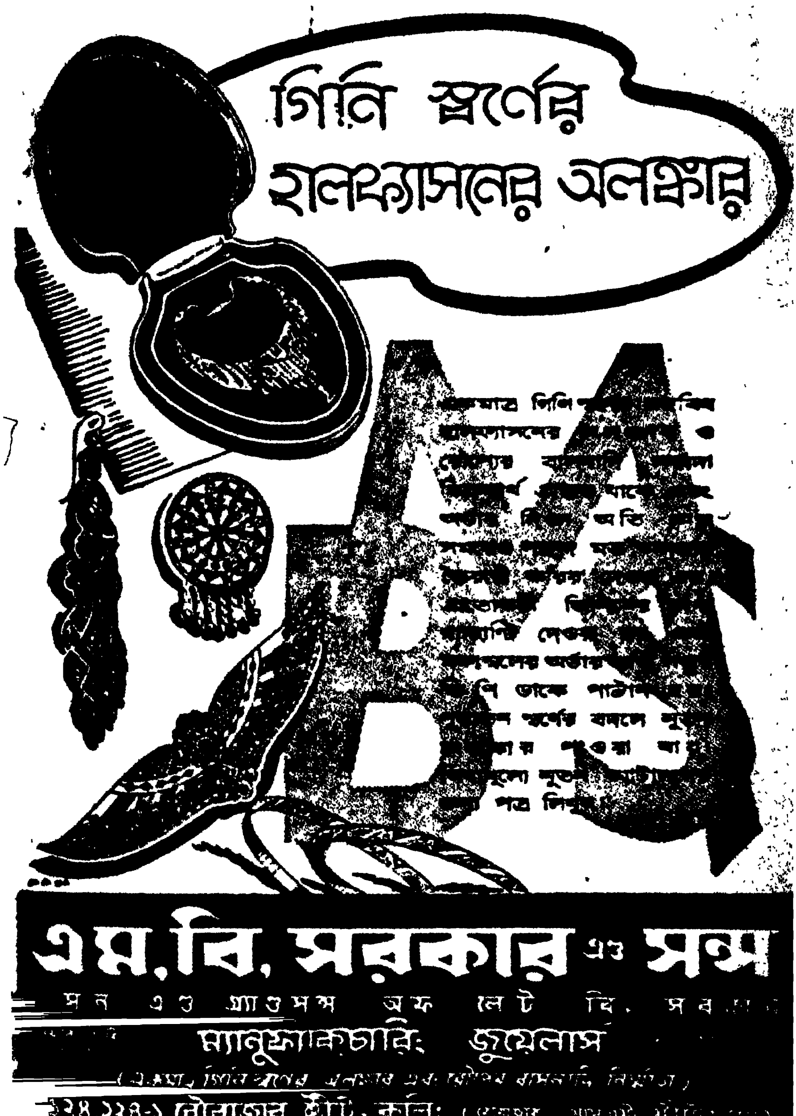

বই বড়
আর
চালের হিসাব বই
বড়
ফাউন্টেন পেন
ভাল
ফাউন্টেন
পেনের
ভাল কালি
CHEMICAL
Ink
লীগঞ্জ কেমিক্যাল ওয়ার্কস
বালীগঞ্জ : কলিকাতা


কোথায় অন্ন, কোথায় বস্ত্র
মহালক্ষ্মী
কটন মিলস্ লিমিটেড

সূচী

কার্ত্তিক—১৩৫০


গুণে-গন্ধে অতুলনীয়
বাথগেটের সুবাসিত
ক্যাষ্টর অয়েল
আপনার
পিতামহ ও পি
এই কেশ তৈ
ব্যবহার করিতে
নকল হইতে সাবধান
Bathgate & Co
CHEMISTS
CALCU


গিনি স্বর্ণের
হালফ্যাসনের অলঙ্কার
এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স
সন এণ্ড গ্রাণ্ডসন্স অফ লেট বি. সরকার
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
১২৪,১২৪-১ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলি:

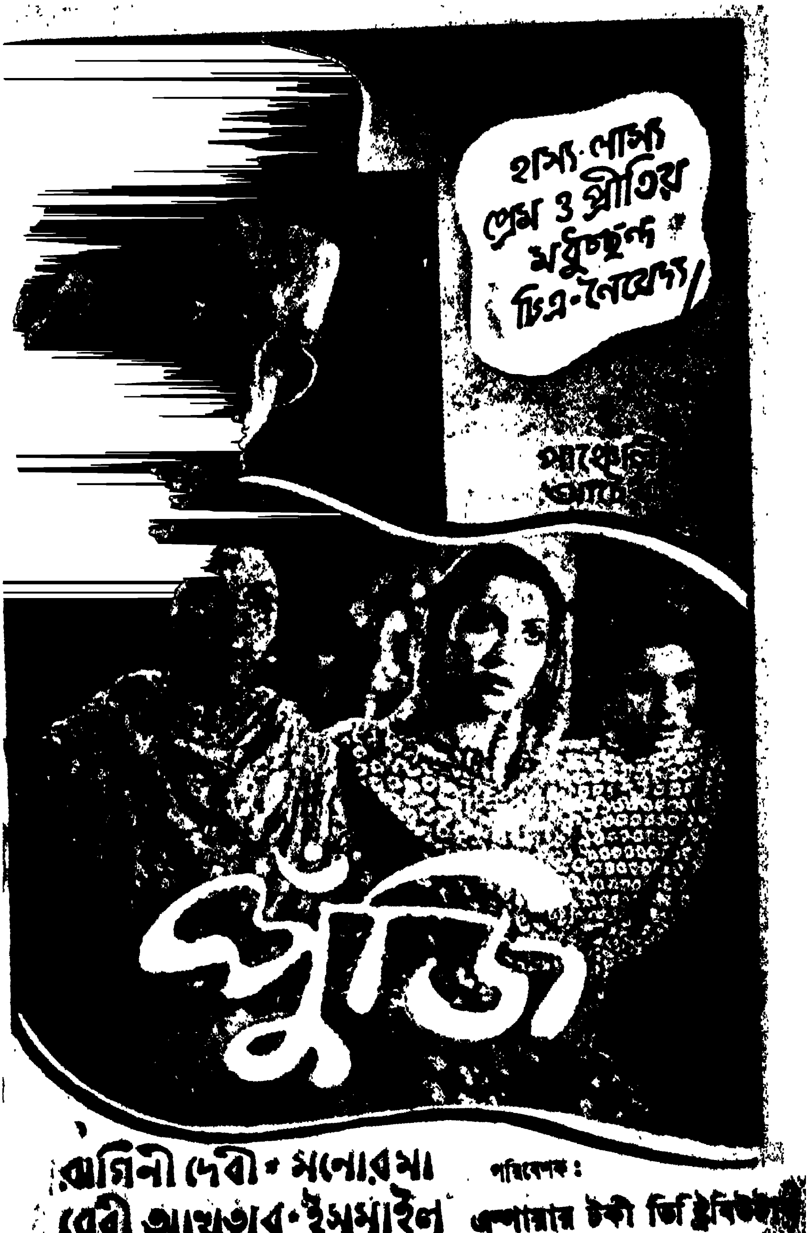

শিশুদের পক্ষে মাতৃস্তন্য অতুলনীয়
সন্দেহ নেই
কিন্তু
মাতৃ-দুগ্ধের অভাব
বা মাতৃদুগ্ধ বিকৃত
হ'লে, তার অভাব
পূরণ করতে পারে
একমাত্র
ভিটা-মিল্ক


প্রখর গ্রীষ্মে,
স্নানে আনন্দ
দেয়!
লক্ষ্মীবিলাস
তেল
এম. এল. বসু এণ্ড কোং লিঃ

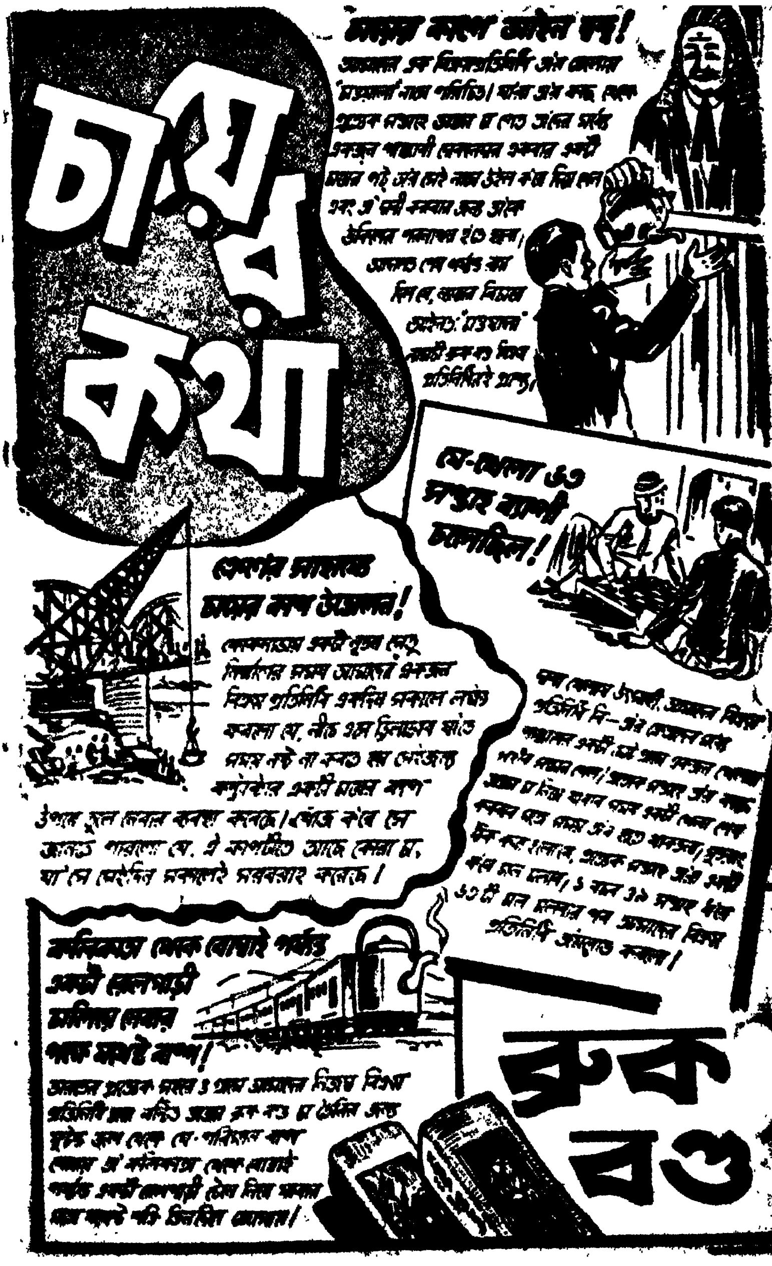
এ যুগের সর্ব্বজন-সমর্থিত প্রযোজকদের
সৌজন্যে বর্ষের শ্রেষ্ঠতম অবদান!



পরবর্তী আকর্ষণ লীলা ও জয়রাজ অভিনীত 'প্রেম-গীত'


হাস্য-লাস্য প্রেম ও প্রীতির মধুচ্ছন্দ চিত্র-নৈবেদ্য
পুঁজি
রাগিনী দেবী • মনোরমা
বেবী আখতার • ইসমাইল
পরিবেশক:


ভারত অয়েল মিল
ভারত অয়েল মিলের
BHARAT OIL MILL
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন
২৪৩ আপার সারকুলার রোড কলিকাতা
ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার


চায়ের কথা
উপরে তুলে দেবার ব্যবস্থা করছে। খোঁজ ক'রে সে জানতে পারলো যে, ঐ বাক্সটিতে আছে কেটলি চা, যা সে সেইদিন সকালেই সরবরাহ করেছে।
ব্রুক বণ্ড




চোখের জলের বন্যা
সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা


মাথা ধরা
দাঁতের যন্ত্রণা
সারিডন

শনিবারের চিঠির নিয়মাবলী

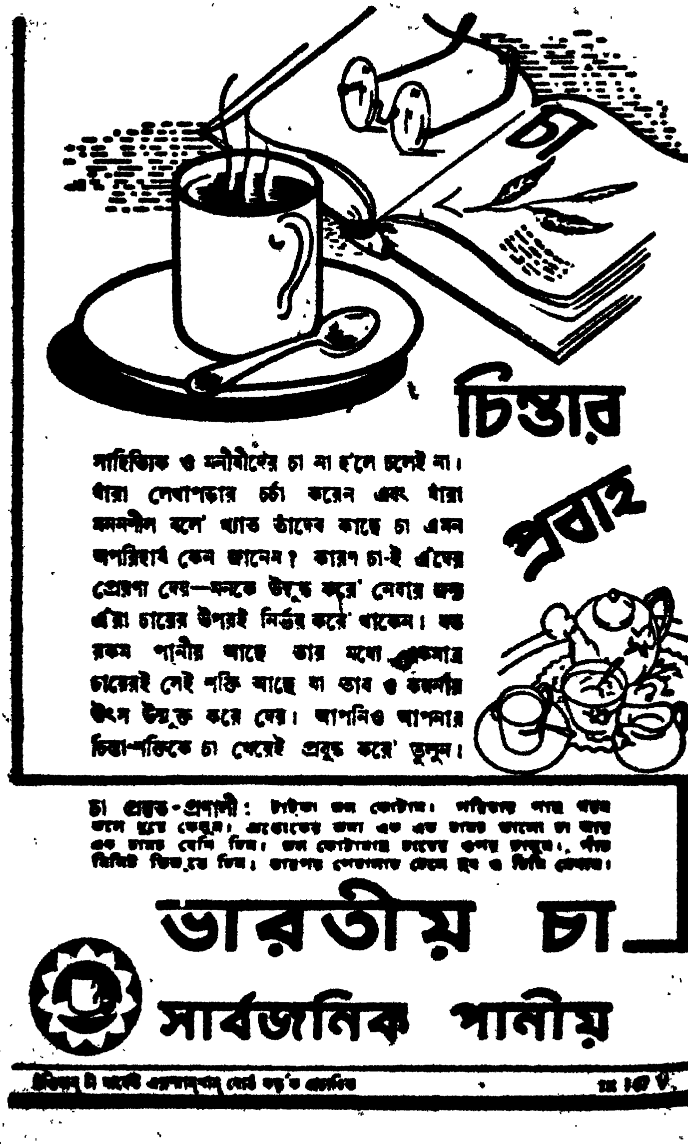
১। 'শনিবারের চিঠি'র ডাকমাশুলসহ বার্ষিক চাঁদা ৪৸০, ভি-পিতে ৪৸৶০ ষাণ্মাসিক ২।৶০, ভি-পিতে ২।৵০। প্রতি সংখ্যা ।৶০, ডাকে ।৶১০।

২। 'শনিবারের চিঠি'র বর্ষ কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ হয়; কিন্তু যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া চলে।

৩। নমুনার জন্ত সাড়ে ছয় আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইতে হয়।

৪। গ্রাহকগণ চিঠি লিখিবার সময় গ্রাহক-নম্বরের উল্লেখ করিবেন।


রতীয় চায়ের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
LIPTONS
WHITE LABEL
TEA
লিপটনের
জাকুজা হোয়াইট লেবেল
এবং টি গার্ল চা
লিপটনের চা খেতে খেতে অসাবধানে কথা বলবেন না


চিন্তার
প্রবাহ
সাহিত্যিক ও মনীষীদের চা না হ'লে চলেই না। যাঁরা লেখাপড়ার চর্চা করেন এবং যাঁরা মননশীল বলে' খ্যাত তাঁদের কাছে চা এমন অপরিহার্য কেন জানেন? কারণ চা-ই এঁদের প্রেরণা দেয়—মনকে উদ্বুদ্ধ করে' দেবার জন্য এঁরা চায়ের উপরই নির্ভর করে' থাকেন। বহু রকম পানীয় আছে তার মধ্যে একমাত্র চায়েরই সেই শক্তি আছে যা ভাব ও কল্পনার উৎস উন্মুক্ত করে দেয়। আপনিও আপনার চিন্তা-শক্তিকে চা খেয়েই প্রবুদ্ধ করে' তুলুন।
চা প্রস্তুত-প্রণালী: টাটকা জল ফোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। প্রত্যেকের জন্য এক এক চামচ ভালো চা আর এক চামচ বেশি দিন। জল ফোটামাত্র চায়ের উপর ঢালুন। পাঁচ মিনিট ভিজতে দিন। তারপর পেয়ালায় ঢেলে দুধ ও চিনি মেশান।
ভারতীয় চা
সার্বজনিক পানীয়
ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপ্যানশন্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

শনিবারের চিঠি
১৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫০

প্রার্থনা

রাম চাকরির জন্য দরখাস্ত পাঠিয়েছে। রামের মা তার মাথায় একটি টাকা ঠেকিয়ে মনে মনে মা-কালীর কাছে মানত জানিয়ে টাকাটি বাক্সে তুলে রাখলেন। এই মানত যদি ভাষায় বিস্তারিত করা যায় তবে এই রকম দাঁড়ায়:—হে মা কালী, চাকরিটি আমার রামকে দিও। ছেলের বিয়ে দিয়েছি, এখন রোজগার না করলে চলবে কেন। মা, আমি শুধু হাতে তোমার কাছে আসি নি, এই দেখ একটি টাকা নজর দিচ্ছি। আমার ছেলে প্রথম মাইনে পেলেই তা থেকে যা পারি খরচ ক'রে তোমার পূজো দেব, এই টাকাটি তারই বায়না।

সম্ভবত রামের মায়ের মনের কথা শুধু এইটুকু, কিন্তু যদি সাবধানে জেরা করা হয় তবে তাঁর অন্তরের গহন প্রদেশ থেকে আরও কিছু বার হবে। এই জেরা আপনার আমার সাধ্য নয়, কারণ রামের মা ধর্মশীলা, ঠাকুর দেবতার ব্যাপারে কোনও আজগবী প্রশ্ন করলেই তিনি খেপে উঠবেন। তাঁকে জেরা করতে পারেন কেবল একজন, স্বয়ং মা-কালী। দেবীকৃত প্রশ্নের অর্থ বোঝবার শক্তি হয়তো রামের মায়ের নেই, তিনি ঘাবড়ে গিয়ে বলতে পারেন—মা, আমি মুখ্যু মানুষ, কি বলছ কিছুই বুঝছি না, অপরাধ নিও না। ধ'রে নেওয়া যাক যে মা-কালী নাছোড়বান্দা, তিনি রামের মায়ের বোধগম্য ভাষায় জেরা করছেন এবং আমাদের বোধগম্য ভাষায় তা প্রকাশ করছেন।

হ্যাঁগা রামের মা, ওই যে টাকাটা ছেলের মাথায় ঠেকিয়ে তুলে রাখলে, ওটা কার জন্যে?

তোমারই জন্যে মা। শুধু একটি টাকা নয়, চাকরিটি হ'লে আরও অনেক কিছু দেব।

চাকরি যদি না হয় তা হ'লেও টাকাটা আমায় দেবে তো?

তা কি আর দিতে পারি মা, গরিব মানুষ। চাকরিটি হ'লে গায়ে লাগবে না।

ও, আমাকে লোভ দেখাবার জন্য টাকাটা বার করেছ?

সেকি কথা মা। এই যে দরখাস্ত করা ইস্তক রোজ মন্দিরে গিয়ে শ্রীচরণে পাঁচটি ক'রে পঞ্চমুখী জবাফুল দিচ্ছি তা তো আর ফেরত নেব না।

চাকরি না হ'লেও রোজ ফুল দিয়ে যাবে?

কোত্থেকে দেব মা, পাঁচটি ফুল দু পয়সা।

ও, এই ফুলগুলো আমাকে ঘুষ দিচ্ছ?

ঘুষ বলতে নেই মা, বল পূজো।

আচ্ছা রামের মা, শুনেছ বোধ হয় যে এই চাকরিটার জন্য দু হাজার দরখাস্ত পড়েছে। তোমাদের তো কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে, যেমন ক'রে হ'ক চ'লে যাচ্ছে। কিন্তু রামের চেয়ে গরিব উমেদার অনেক আছে, তাদের কেউ যদি চাকরিটি পায় তবে খুশী হও না?

এ যে ছিষ্টিছাড়া কথা মা। থাকলই বা গরিব উমেদার, আমার ছেলে আগে না যেলো মেধো আগে?

আচ্ছা, ওই যে চৌধুরীরা আছে, মস্ত বড়লোক, তাদের মেজো ছেলে হারু যদি চাকরিটা পায় তো কেমন হয়? তার মা এর মধ্যেই ঘটা ক'রে আমার পূজো দিয়েছে।

তা হেরোকে চাকরি দেবে বইকি মা; তারা যে বড়লোক, তোমাকে অনেক ঘুষ খাইয়েছে।

অর্থাৎ তোমার ঘুষ খেয়ে যদি আর সবাইকে ফাঁকি দিই তাতে তুমি খুশী হবে, আর যদি অন্যের ঘুষ খেয়ে তোমাকে ফাঁকি দিই তবে চটবে। আচ্ছা, এত লোক যখন উমেদার, আর অনেকেই আমার কাছে মানত করেছে, তখন চাকরিটা কাকে দেওয়া যায় বল তো? একচোখো হয়ে রামকেই দিতে বল নাকি?

তাই বলছি মা।

কিন্তু সকলেই তো একচোখো হ'তে বলছে, কার দিকে চোখ দেব ?

অত শত জানি না মা, যা ভাল বোঝ কর।

তাই তো চিরকাল করি।

চারুবালা শিক্ষিতা মহিলা, রামের মায়ের মতন তাঁর অন্ধ সংস্কার নেই। তিনি আগে ভগবানের খোঁজখবর নিতেন না, কিন্তু সম্প্রতি বিপদে প'ড়ে প্রার্থনা করছেন।—ভগবান, আমার স্বামীকে রোগমুক্ত কর। লোকটা আমাকে অনেক জ্বালিয়েছে, কিন্তু এখন আর আমার কোনও রাগ নেই, সে সেরে উঠুক—শুধু এইটুকুই চাই। যদি ম'রে যায় তবে আমার সর্বনাশ হবে, ছেলেমেয়েরা খাবে কি ? গয়না বাড়ি জিনিসপত্র সব বেচে ফেলতে হবে। দয়াময়, আমি অন্যায় আবদার করছি না, কাকেও বঞ্চিত ক'রে নিজের ভাল চাচ্ছি না। শুধু আমার স্বামীকে সারিয়ে দাও, তাতে বিশ্ব-সংসারের কোনও ক্ষতি হবে না।

এবারেও সওয়াল-জবাব আমরা কল্পনা করতে পারি।—

আচ্ছা চারুবালা, তুমি কি ক'রে জানলে যে তোমার স্বামী বেঁচে উঠলে কারও ক্ষতি হবে না ? সে মরলেই তার চাকরিটা যোগেন ঘোষাল পাবে, বেচারা অনেক কাল আশায় আশায় আছে। আর তোমাদের এই বাড়িটার উপর চৌধুরীদের নজর আছে, তোমরা নিরুপায় হ'লেই তারা সস্তায় কিনে নেবে।

ভগবান, এমন সাংঘাতিক কথা বলতে তোমার মুখে বাধল না ?

কিছুমাত্র না। তুমি এই যে রেশমী শাড়িটা প'রে আছ তার জন্ত কতগুলো পোকার প্রাণ গেছে জান ?

পোকার আবার প্রাণ! লক্ষ পোকার প্রাণের চেয়ে আমার একটু সাধ আহ্লাদ কি বড় নয় ?

নিশ্চয়ই বড়। আমার সাধ আহ্লাদও কোটি কোটি মানুষের প্রাণের চেয়ে বড়।

পোকা মরলে আমার একটি চমৎকার শাড়ি হয়। মানুষ মরলে তোমার কি লাভ হয় শুনি ?

তোমার তা বোঝবার শক্তি নেই। পোকা কি শাড়ির মর্ম বোঝে?

কি নিষ্ঠুর! লোকে তোমাকে দয়াময় বলে কেন?

তুমিও তো একটু আগে দয়াময় ব'লে ডাকছিলে, তোমার স্বামীর যদি মৃত্যু হয় তা হ'লেও দয়াময় ব'লে ডাকবে। হয়তো আশা কর যে বার বার দয়াময় বললে সত্যই আমার দয়া হবে।

সংকটে পড়লে অধিকাংশ লোকের দৈবের উপর নির্ভর বাড়ে। অশিক্ষিত জন কবচ মাদুলি হোম স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতির শরণ নেয়, শিক্ষিত জন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। সাধারণের ধারণা, মাদুলি স্বস্ত্যয়নের মতন প্রার্থনারও একটা শক্তি আছে। হোমিওপ্যাথি-ভক্তরা ব'লে থাকেন, যদি ঠিক মতন ওষুধ পড়ে তবে রোগ সারতেই হবে। প্রার্থনাবাদীরা বলেন, যদি ডাকার মতন ডাকতে পার তবে ভগবানকে সাড়া দিতেই হবে। বিশ্বাসের সঙ্গে লজিক বা স্ট্যাটিস্টিক্সের সম্পর্ক নেই। যে বিশ্বাসী সে আশা করে যে তার ওষুধ বা প্রার্থনাটি লাগসই হ'তেও পারে।

যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তুকতাক অথবা প্রার্থনা করা হয় তা ন্যায্য কি অন্যায্য ভাববার দরকার হয় না। সেকালে ডাকাতরা যাত্রার আগে কালীপূজা করত। উচ্চাটন মারণ প্রভৃতি অভিচারের চলন এখনও আছে। যারা বিপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মকদ্দমা আনে, তারাও দেবতার কাছে মানত করে। যে ছাত্র পরীক্ষায় প্রথম হ'তে চায়, যে লোক দু হাজার উমেদারকে নিরাশ ক'রে চাকরিটি বাগাতে চায়, যে মেয়ে প্রতিযোগিনীদের হারিয়ে দিয়ে সদ্য আগত আই. সি. এস.কে গাঁথতে চায়, তাদেরও অনেকে প্রার্থনা করে বা দৈবশক্তির শরণ নেয়। এরা কেউ মন্দ লোক নয়; রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি— এই প্রার্থনা সাধারণ মানুষের পক্ষে খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এমন ধারণা কারও নেই যে ভগবান ন্যায়বিচার করবেন, যোগ্যতম ব্যক্তিকেই করুণা করবেন। অধর্মের জয় আর ধর্মের পরাজয় যখন প্রত্যহ ঘটতে দেখা

যাচ্ছে তখন ন্যায়-অন্যায়ের চিন্তা না ক'রে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভগবানকে ধরতে দোষ কি? যদি মাদুলি, স্বস্ত্যয়ন বা প্রার্থনার মাহাত্ম্য থাকে তবে উদ্দেশ্য ভাল কি মন্দ তা ভাববার দরকার নেই।

সাধারণত ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই দৈবসাহায্য চাওয়া হয়, কিন্তু বিপদ যখন দেশব্যাপী হয় তখন লোকে সমবেতভাবে দেবতাকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করে। প্লেগ বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর সময় হোমযাগ, নগরসংকীর্তন, মন্দিরাদিতে বিশেষ উপাসনা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। গভর্মেণ্ট এসব ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকেন, কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের মহাভয়ে গভর্মেণ্টেরও নাস্তিকতা দূর হয়েছে। মাঝে মাঝে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল প্রজার উপর হুকুম আসে, অমুক দিনে সকলে মিলে নিজ নিজ ধর্ম অনুসারে ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা কর। সম্ভবত গভর্মেণ্টের কর্ণধারগণ বিশ্বাস করেন যে ভগবান এত লোকের অনুরোধ ঠেলতে পারবেন না, অথবা মনে করেন যে ভগবানের দয়া না হ'লেও প্রজার মনে কতকটা ভরসা আসবে।

আমাদের দেশে অল্পস্বল্প পাষণ্ড আছে, কিন্তু তারা সংযত, বেশী কথা বলতে সাহস করে না। বিলাত সর্ববিষয়ে স্বাধীন দেশ, সেজন্য সেখানকার পাষণ্ডদের মুখের বাঁধন নেই। সেখানে গির্জায় গির্জায় যুদ্ধজয়ের জন্য নিয়মিত প্রার্থনা ছাড়াও সরকারী হুকুমে বিশেষ বিশেষ দিনে বড় রকমের উপাসনা হয়। বিলাতী পাষণ্ডরা বলে—এ বড় আশ্চর্য কথা, যখনই বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা হয় তখনই বোমাবর্ষণ বাড়ে, আর যে গির্জায় বেশী উপাসনা হয় বেছে বেছে তাতেই বোমা পড়ে। আমাদের পাদ্রীরা ভগবানের কাছে শত্রুপক্ষের নামে অনেক লাগাচ্ছেন, আর আমরা যে নির্দোষ, অনিচ্ছায় যুদ্ধে নেমেছি, একথাও বারংবার বলছেন। কিন্তু শত্রুপক্ষের পাদ্রীরাও তো ঠিক এইরকম বলছে, আমাদের দু-তিন শ বৎসরের অপকর্মের ফর্দ ভগবানকে শুনিয়ে শুনিয়ে তাঁর কান ভারী করছে। ভগবান কার কথা শুনবেন?

বিলাতের যাজকসম্প্রদায় খুব সতর্ক। তাঁরা বোঝেন যে তাঁদের অনেক যজমান এখন স্বজাতির সমালোচনা করে এবং স্পষ্ট কথা বলে,

সুতরাং ভগবানের কাছে এই বাঁধাধরা মামুলী মন্ত্রে প্রার্থনা করা আর চলবে না।—'Save and deliver us, we humbly beseech Thee, from the hands of our enemies; abate their pride, assuage their malice, and confound their devices; that we, being armed with Thy defence, may be preserved evermore from all perils, to glorify Thee, who art the giver of all victory!' সুন্দর রচনা, কিন্তু সরল আর নিষ্পাপ না হ'লে কি এমন প্রার্থনা করা চলে?

সম্প্রতি আর্কবিশপ অভ ক্যান্টারবেরি এক বক্তৃতায় বলেছেন, আমরা এমন প্রার্থনা করব না—ঈশ্বর আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ কর; শুধু বলব—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক। আমাদের প্রার্থনা সমস্ত জগতের হিতার্থ, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই তা করব, নিজের ইচ্ছাপূরণের জন্য নয়।

পাষণ্ডরা এতেও ঠাণ্ডা হয় না। বলে—ঈশ্বর তোমাদের তোয়াক্কা রাখেন না, তোমরা প্রার্থনা কর আর না কর তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবেই।

পাদ্রীদের কাছে যুক্তি আশা করা বৃথা, তাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শাসনতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত, সুতরাং আবশ্যক মত তাঁদের কূটনীতি আশ্রয় করতে হয়। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক—এই প্রার্থনা অতি পুরাতন, বহু দেশের ভক্ত আর জ্ঞানী বহু ভাষায় এই বাক্য বলেছেন। কিন্তু সাধারণ প্রয়োগে এর মূল অভিপ্রায় লুপ্ত হয়েছে।

সামান্য লোকে (মায় বেতনভুক্ যাজক) যখন এই বাক্যটি বলে তখন জানাতে চায় যে ভগবানের ইচ্ছাই তার ইচ্ছা। হিন্দুর অনেক ক্রিয়াকর্মে কর্মফল বাক্যত শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করা হয়। কিন্তু স্বার্থকামনা সর্বত্র উগ্র থাকে। আশ্রিত ব্যক্তি যখন ক্ষমতাশালী প্রভুকে তুষ্ট ক'রে কাজ উদ্ধার করতে চায় তখন বলে—হুজুরের উপর কথা বলবার আমি কে? হুজুর সবই বোঝেন, সব খবর রাখেন, এই গরিবের অবস্থাটা ভাল রকমই জানেন। আপনার দ্বারা কি অবিচার হ'তে পারে? যা হুকুম করবেন মাথা পেতে নেব। আমাদের কথকঠাকুররাও দরবারী ভাষা জানেন, তাঁরা বিপন্ন প্রহ্লাদকে দিয়ে বলান—আমি মরি তাহে ক্ষতি নাহি হে, তোমার দয়াময় নামে যে কলঙ্ক হবে! ভগবানকে যখন

বলা হয়—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক, তখন সাধারণ প্রার্থীর মনে এই গূঢ় কামনা থাকে—ভগবান আমার ইচ্ছা অনুসারেই কাজ করুন।

এই প্রার্থনাবাক্য যাঁদের মুখ থেকে প্রথমে বেরিয়েছিল তাঁদের কোনও প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় ছিল না। নিষ্কাম ভক্ত এবং জ্ঞানী এখনও বলেন—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক। এই বাক্যে কিছু রূপক আছে, বক্তার বিশ্বাস অনুসারে তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা হ'তে পারে। কিন্তু রূপকের আবরণ ভেদ করলে শুধু এই অর্থই পাওয়া যায়।—আমি অভীষ্টসাধন বা বিপদ্‌বারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমার সফলতা বা বিফলতা দৈবাধীন, যা ঘটবে তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা বা বিধাতার বিধান বা নিয়তি। সেই নিয়তি মেনে নেবার এবং সইবার শক্তি আমার আসুক। তার জন্যই প্রার্থনা করছি, অর্থাৎ উদ্বুদ্ধ হবার জন্য বারংবার নিজেকেই বলছি—হে আমার আত্মা, ক্ষুদ্রতা পরিহার কর, সুখদুঃখে লাভালাভে জয়াজয়ে অবিচলিত থাক, বিশ্বাত্মার যে সর্বব্যাপী সমদৃষ্টি তা তোমাতে সঞ্চারিত হ'ক।

১১-৯-৪৩ রাজশেখর বসু

দুর্দিন

আতঙ্কিত এ নগরী ঝিমাইছে গাঢ় অন্ধকারে,
সব আলো নিবে গেছে, পথে নাই লোক-চলাচল ;
"মা গো খেতে দাও" ব'লে সহসা কে কাঁদিল দুয়ারে,
তন্দ্রাহত নিশীথিনী, হ'ল যেন ব্যথায় বিকল।
আকাশ মথিত করি শূন্যে শূন্যে যায় সে ক্রন্দন—
মহাকাল-গতি যেন স্তব্ধ হয় কালের আঘাতে ;
ক্ষণিক জীবন, তার বিফল সকল আয়োজন,
মহাকালী নরমুণ্ড গেঁথে যায় গলার মালাতে।
যোগের ধরিত্রী মাতা ভিখারিণী সম অসহায়,
স্তনে তার দুগ্ধ নাই ; নিরুপায় সন্তানের ভার
বহিতে পারে না মাতা—মাটি হতে শুধু "হায় হায়"
ধ্বনি উঠে অবিরাম, মৃত্যু খোলে আপনার দ্বার।
দুর্দিনের অন্ধকারে দেখি নাকো, শুধু শুনি কানে,
জীবনের কোলাহল চিরস্তব্ধ মরণের টানে।

লেণ্ড-লিজ রসায়ন

তিলের আধার তৈল কিংবা তৈলের আধার তিল—এইরূপ প্রশ্ন লইয়া বহুকাল হইতে এ দেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আধুনিক কালে ইহা অপেক্ষাও কঠিন, অথচ ঠিক এই জাতীয় প্রশ্নেরই সমাধা আমাদিগকে করিতে হইতেছে, পণ্ডিতদের বিচার-সভায় ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচয় দিবার জন্য নহে, জীবনমরণ-ক্ষেত্রে নিতান্তই প্রাণরক্ষার জন্য। বর্ত্তমান প্রশ্ন হইতেছে—কে কাহার জন্য লড়িতেছে? গোটা ভারতবর্ষটাকে যুদ্ধের শিবিরে পরিণত করিয়া উহারা আমাদের জন্য লড়িতেছে, না, আমরা উহাদের জন্য লড়িতেছি? অ্যাংলো-আমেরিকা বলিতেছে, আমাদের জন্যই উহারা লড়িতেছে এবং ইহার (অধিক) দায় আমাদেরই। আর আমরা ভাবিতেছি, দায় উহাদেরই, এবং উহাদেরই সম্ভ্রম ও সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে যাইয়া আমরা ধনেপ্রাণে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছি। তিল ও তৈলের মধ্যে এই যে অতি-আধুনিক মতদ্বৈধ, কে ধারক এবং কে ধারিত, কে উপকারক এবং কে উপকৃত—এই প্রশ্ন লইয়া যে মতান্তর তাহার মীমাংসা অবশ্য মোটেই আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে না। কারণ আমাদের প্রভুগণ শুধু যে চিরকাল প্রচার করিয়াই আসিয়াছেন তাহা নহে, মনেপ্রাণে বিশ্বাসও করিয়া আসিতেছেন যে, এশিয়া, আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশের কালা ও রংচটা আদমিদের উদ্ধারের বিবিদস্ত ব্রত-উদ্‌যাপনের জন্যই তাঁহারা পুরুষানুক্রমে জীবন উৎসর্গ করিয়া চলিয়াছেন। শ্বেত মনুষ্যের এই মহৎ মিশনের গুরু-ভার (whitemen's burden) বহন করিবার প্রোপাগাণ্ডা পৌনঃপুনিক আবৃত্তির ফলে আজ তাহাদের নিজেদের অন্তরের মধ্যেই এমন দাগ কাটিয়া বসিয়া গিয়াছে যে, তাহাদের পরোপকারের ঠেলায় জীবন অতিষ্ঠ ও দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতে চাহিলে যদি কেহ কখনও নিরুপায় হইয়া হাত-পা ছুঁড়িতে থাকে, তাহা হইলে সত্যই আমাদের প্রভুরা বিস্মিত হন, ভাবেন, "এ আবার কি! লোকগুলির রকম দেখ না!" তাঁহা-

ও বিস্মিত দৃষ্টির ভিতর দিয়া যে ভাষা নির্গত হয় তাহা এই—"দেখছ নিমকহারামি! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! আচ্ছা!" সুতরাং কে ধারক ও কে ধৃত এবং কে উপকারী ও কে উপকৃত—সে প্রশ্নের আর মীমাংসার প্রয়োজন নাই, তাহা পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ হইয়া আছে।

কিন্তু তাঁহারা দয়া করিয়া এই আশ্বাস এবার আমাদিগকে দিয়াছেন যে, দায় যদিও আমাদের, তবুও তাহার কতকাংশ তাঁহারা গ্রহণ করিবেন। তার জন্য হিজ ম্যাজেষ্টিজ গবর্ণমেণ্টের সহিত "আমাদের" গবর্ণমেণ্টের একটা আর্থিক চুক্তি (Financial Settlement) ইতিপূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং আমেরিকার গবর্ণমেণ্টের সঙ্গেও একটা পারস্পরিক চুক্তি (Reciprocal Agreement) শীঘ্রই সম্পাদিত হইবার কথা চলিতেছে। ব্রিটেনের সঙ্গে ফিনান্‌শিয়াল সেট্‌ল্‌মেণ্ট সম্পর্কে আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের অন্তর্গত নহে। সুতরাং সে বিষয়ে আজ বিশেষ কিছু বলিব না, শুধু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যদিও তিল ও তৈলের বিরোধ প্রকারান্তরে এ ভাবে নিষ্পত্তি করা হইয়াছে যে, তাহাদের উভয়েই উপকারী এবং উভয়েই উপকৃত (এই উদার নিষ্পত্তির জন্য কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন), তথাপি উভয় মধ্যে কে কতখানি উপকারী এবং কে কতখানি উপকৃত, তাহার মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে কতকগুলি 'ফরমূলা' বা সূত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যাহার ব্যাখ্যার উপর এই প্রশ্নের সমাধান এবং ব্যয়ের বণ্টন নির্ভর করিবে। সেই সব সূত্র প্রণয়ন ও উহাদের ব্যাখ্যার ভার আমাদের পক্ষেও উঁহারাই পরম উদারতার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন (যেমন সর্ব্বদা করিয়া থাকেন)। এবং এইরূপ ব্যাখ্যার ফলে এদেশে যুদ্ধের দরুন যে খরচ হইতেছে, তাহার মধ্যে আমাদের দেয় অংশের পরিমাণ শনৈঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। তবুও ইহাই আমাদের সান্ত্বনা যে, তৈলের উপকারী হিসাবে তিলও একটা আংশিক 'কাগজী' ডিক্রী পাইয়াছে, যদিও ইহার ফলে যুদ্ধের নামে আমাদের দেশের সৈন্য-সামন্ত, লোক-লস্কর, পণ্যসম্ভার পৃথিবীর দূরতম

প্রাণে পাঠাইবার লজ্জা ঢাকিবার জন্য কোন আবরণের প্রয়োজনও প্রভুপক্ষের আর রহিল না।

এই তো গেল ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধের খরচ-সংক্রান্ত আমাদের বোঝাপড়ার কথা। তাহার উপর এবার আবার নূতন করিয়া আমেরিকা আমাদের পরিত্রাণার্থ সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী সহ আমাদেরই মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার দাবিও উপকারীর দাবি; কিন্তু তিনি উপকারের প্রত্যুপকার বড় একটা চান না, শুধু যেন দিয়া যাইবার জন্যই তাঁহার আবির্ভাব। মিত্রপক্ষের কেহ আহ্বান করিলেই তিনি নিজ খরচে তথায় যাইয়া থাকেন এবং নিজ হইতে ঔষধ পথ্য দিয়া রোগীর জন্য যথাসাধ্য করিয়া থাকেন; 'ফী' তাঁহার চাই না, ভাবসাব দেখিয়া মনে হয়, দেবতার নামে ভোগ দিবার জন্য /৫ পাঁচটি মাত্র পয়সা পাইলেই যেন তিনি খুশি! এই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে সিদ্ধিলাভের জন্য যে অদ্ভুত দাওয়াই ইঁহারা দুনিয়ার দরবারে পেশ করিয়াছেন, তাহার মন্ত্রপূত সংক্ষিপ্ত নাম—"লেণ্ড ও লিজ"। আমরা সকলেই এই নাম শুনিয়াছি, কিন্তু পরিচয় এখনও পাই নাই। সম্যক পরিচয় পাইতে আরও অনেক বিলম্ব হইবে। তথাপি ইহার বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ইহার জন্মেতিহাস ও বাহিরের কাঠামোর কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া আবশ্যক।

* ১৯৩৯, সেপ্টেম্বর মাসে বর্ত্তমান যুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৯৪০, জুন মাসের মধ্যে ফ্রান্সের পতন ঘটে। এদিকে গত যুদ্ধের দেনা না দেওয়ার দরুন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সহানুভূতি পুরাপুরি ইংলণ্ডের দিকে থাকিলেও নগদ মূল্য (ডলার) ভিন্ন ইংলণ্ডকে যুদ্ধের মালমসলা, সাজসরঞ্জাম কোন কিছু দিয়াই সাহায্য করা আমেরিকার পক্ষে আইনত অসম্ভব হইয়া উঠে। ফলে আমেরিকার (Cash and carry) ফেল কড়ি, দাও পাড়ি—এই দাবি মিটাইতে গিয়া যুদ্ধের দেড় বৎসরে ইংলণ্ডের অবস্থা সঙ্গিন হইয়া পড়ে—ভারতবর্ষের সহিত বিরাট বাকি কারবার সত্ত্বেও। ফ্রান্সের পতন, ইংলণ্ডের একাকীত্ব, তদুপরি তাহার নিকট সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের উল্টা সাহায্যদাবি, এইরূপ

ঘোর দুর্দ্দিনে একমাত্র ভারতবর্ষই তাহার বিরাট ভাণ্ডার ইংলণ্ডের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল সত্য ; কিন্তু তাহাতেও ঘুণ ধরিয়াছিল। আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা যখন ইংরেজ ও তাহার ঔপনিবেশিক স্বজাতিগণের পক্ষে এতাদৃশ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, ভাগ্য-দেবতার পূজা দিবার জন্য যখন সম্মুখে "blood, sweat and tears" ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, তখন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁহার পূর্ব্বাধিকারী উড্রো উইলসনের মর্ম্মান্তিক লজ্জা ও ব্যর্থতা এবং তাঁহারই আমলে উপকৃত অধমর্ণগণের ঋণ অস্বীকার (repudiation of war debts by England, France and Italy) ইত্যাদি পূর্ব্ব অপমান সব বেমালুম হজম করিয়া ফেলিয়া সৈন্য-প্রেরণ ব্যতীত সর্ব্বপ্রকারে ইংলণ্ডকে সাহায্য করিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, এবং এই ব্যাকুলতা হইতেই লেণ্ড-লিজ-রূপ অভিনব মার্গটির আবিষ্কার সম্ভব হইল। দেশের ও কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধী মনোভাব পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতার দরুন যথেষ্ট প্রবল থাকায়, প্রেসিডেণ্ট সাহেবকে ধীরে ধীরে অত্যন্ত কৌশলে অগ্রসর হইতে হয় এবং ১৯৪১, মার্চ মাস নাগাদ ইহাকে তিনি অভীপ্সিত আইনে পরিণত করিতে সক্ষম হন। এই আইনের প্রচারিত "উদ্দেশ্য" হইল : "To promote the defence of the U. S. A."—(শত্রুর আক্রমণ হইতে) যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষার ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা (অপর কাহাকেও রক্ষা বা সাহায্য করা কিন্তু নহে !)। আত্মরক্ষার দোহাই না দিলে শুধু অপরকে রক্ষার মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে আমেরিকার জনমত এবার কিছুতেই সম্মতি দিবে না—এই আশঙ্কা হইতেই যে উদ্দেশ্যটাকে এ ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য ইহার মধ্যে সত্য যে একেবারেই ছিল না, তাহাও বলা চলে না। কারণ ১৯৪১, ডিসেম্বর মাসে আমেরিকা যখন প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে, তখন প্রায় সমস্ত ইউরোপ-ভূখণ্ড জার্ম্মানদের অধীন ; রাশিয়ার অবস্থাও যায়-যায়,—লেনিনগ্রাড ও মস্কোর বহির্দ্বারে আসিয়া জার্ম্মানির দুর্দ্দমনীয় সেনানী শীতের আবির্ভাবে শিবির ফেলিয়াছে। আমেরিকা পৃথিবীর অপর গোলার্দ্ধে,

আতলান্তিক মহাসাগরের অপর তীরে অবস্থিত হইলেও, বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর দূরতম অংশও আক্রমণের বা নাগালের একেবারে বাহিরে নয়। সুতরাং সেই দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে ইংলণ্ডকে লেণ্ড-লিজ সাহায্য-দানের জন্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট প্রথমত যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে—যদিও আমরা মনে করি, তিনিই একমাত্র রাষ্ট্রনেতা ছিলেন, যিনি এই যুদ্ধে জড়াইয়া না পড়িয়া নিজেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রাখিতে পারিলে দুইটি সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে হয়তো একটা আপস-মীমাংসা করিতে পারিতেন। অবশ্য তাহা সহজসাধ্য হইত না; কারণ ইউরোপের power politics-এর মধ্যে স্বার্থের সামঞ্জস্য আপসে হওয়া কঠিন। তাহার উপর যুদ্ধের বিপাকে পড়িয়া আশু প্রাণরক্ষার জন্য এক ধর্ম্মাবলম্বী অপর ধর্ম্মাবলম্বীর সাথাসঙ্গী (না সঙ্গিনী!) হইয়া বসিয়া আছে। এই অবস্থায় আমেরিকার মত বিত্ত ও শক্তি শালী নিরপেক্ষ জাতির পক্ষেও শুধু মিষ্ট কথা বলিয়া বা চোখ রাঙাইয়া এই বিশ্ব-বিরোধের জটিল গ্রন্থি ছেদন করা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। না হইলে নিরপেক্ষতার পরিণামফল ক্লৈব্যের কলঙ্কটীকা মস্তকে বহন করাই আমেরিকার সার হইত। আমেরিকার শক্তি ও প্রতিপত্তি তাহার সাম্রাজ্যের উপর নির্ভর করে না—নগণ্য ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে বাদ দিলে সাম্রাজ্য বলিতে তাহার বিশেষ কিছু নাইও। সেইজন্যই আমরা অনেকে এবারকার লড়াইয়ে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট সাহেবকে নিখিল-বিশ্বের তরফে সেনাপতি সালিশ বা Field-Marshal Arbitrator হিসাবে দেখিতে চাহিয়াছিলাম।

কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, আধুনিক যুগে কোথাও সমরাগ্নি একবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে, কোনও প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকা, আর আত্মহত্যা করিয়া আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে অবসর লওয়া প্রায় একই কথা। আরও ভুলিয়াছিলাম যে, পাশ্চাত্য পলিটিক্সে নিছক ন্যায়পরতা বা abstract justice বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। আত্মপরতাকে সেখানে ন্যায়ের মুখোশ ও

পরার্থপরতার বহির্বাস পরিধান করিয়া যথাসম্ভব আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হয়। সেখানে স্থূল লোভ ও লোলুপতার সহিত উদারতা ও মহানুভবতার সূক্ষ্ম রস মিশিয়া এমন অভিনব মিক্‌সচার অধুনা প্রস্তুত হইতেছে যে, ইহার মধ্য হইতে একেক বাদ দিয়া অপরকে বাছিয়া লওয়া আমাদের দেশের মূর্খ-পণ্ডিতদের পক্ষে দুঃসাধ্য কর্ম। অথচ এইরূপ মিক্‌সচার তৈরি করিতে এবং তাহার ব্যবচ্ছেদ করিতে পারাই হইল পাশ্চাত্য পলিটিক্স ও পাশ্চাত্য ধর্ম। রসের ক্ষেত্রে দি সাব্লাইম অ্যাণ্ড দি রিডিকুলাস যেমন অনেক সময় গা-ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বসিয়া থাকে এবং অপাথিবকেই অকিঞ্চিৎকর এবং অকিঞ্চিৎকেই অপাথিব বলিয়া ভ্রম হয়, তেমনই রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিশ্বজনীন প্রেম ও আত্মসর্ব্বস্ব ক্ষুধা দিব্য অজ্ঞাঙ্গী হইয়া বসিয়া আছে—যদি বিশ্বজনীন প্রেমের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে যাও, দেখিবে, সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার করাল মূর্ত্তি মুখব্যাদান করিয়া আছে তোমাকে গ্রাস করিবার জন্য। আর যদি রাক্ষসী ক্ষুধার দলে ভিড়িতে চাও, তবে শক্তির পরীক্ষা তোমাকে আগে দিতে হইবে, নহিলে বিশ্বজনীন প্রেমের খরস্রোতে ভাসিয়া কিংবা তলাইয়া যাইতে হইবে।

লেণ্ড-লিজের ঐতিহাসিক পটভূমিকা আমরা দেখিতে পাইলাম। কিন্তু এখনও ইহার বাহ্যিক কাঠামোর পরিচয় আমরা পাই নাই। এইবার সেই পরিচয় লইবার চেষ্টা করা যাক। লেণ্ড-লিজ ব্যবস্থার মূল সূত্রগুলির সংক্ষিপ্তসার এইরূপ :—

(১) মিত্রশক্তিবর্গের পক্ষে যে কোন দেশ যুদ্ধের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সাজসরঞ্জাম ও সংবাদ পাইবার সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিবে, যুক্তরাষ্ট্র তাহাকেই এইরূপ সাহায্য দান করিবে—যদি সেই দেশের আত্মরক্ষার উপর যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিশেষভাবে নির্ভর করে বলিয়া মনে করা হয়।

(২) যে দেশ সাহায্য প্রার্থনা করিবে, তাহার যদি উল্লিখিত সাজসরঞ্জাম ও সংবাদের মূল্য দিবার মত উপযুক্ত পরিমাণ ডলার না

থাকে, তাহা হইলেও প্রার্থিত সাহায্য পাইবার পক্ষে কোনরূপ বাধা হইবে না।

(৩) যে সাজসরঞ্জাম বা সার্ভিস সাহায্য হিসাবে পাওয়া যাইবে, যুক্তরাষ্ট্রের সমর-বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার পরামর্শ বা সম্মতি ব্যতিরেকে উহাদের বণ্টন বা বিধিব্যবস্থা করা চলিবে না।

(৪) যে যুদ্ধ-সরঞ্জামাদি লেণ্ড-লিজ বিধানানুযায়ী পৃথক-রক্ষিত তহবিল হইতে না দিয়া আমেরিকার আত্মরক্ষার সাধারণ তহবিল হইতে দেওয়া হইবে, তাহার মূল্য কোন একটি দেশবিশেষের জন্য ১৩০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি হইতে পারিবে না।

(৫) লেণ্ড-লিজ বিধান শুধু সেই সব যুদ্ধ-সরঞ্জাম সরবরাহের বেলায়ই প্রযোজ্য হইবে, যাহা অন্যত্র কোথাও বাজারে পাওয়া যায় না। বাজারে প্রাপ্তব্য যুদ্ধসামগ্রী হইলে নগদ মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে।

(৬) বিভিন্ন গবর্মেণ্টের মধ্যেই শুধু লেণ্ড-লিজ বিধানানুযায়ী লেনদেন হইতে পারিবে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত এইরূপ কারবার চলিবে না।

(৭) লেণ্ড-লিজ সাহায্যের জন্য নগদ মূল্য বা পণ্য দিবার প্রয়োজন না থাকিলেও, সাহায্যপ্রাপ্ত দেশকে প্রতিদানে যুদ্ধের জন্য তাহার সাধ্যমত সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধ-সরঞ্জাম, শ্রম ও সুযোগ-সুবিধা দান করিতে হইবে।

(৮) নগদ অর্থ, জিনিসপত্র বা সম্পত্তি (ইন ক্যাস, কাইণ্ড অর প্রপার্টি) দ্বারা লেণ্ড-লিজ সাহায্যের প্রতিদান করাও চলিবে ; অধিকন্তু সাহায্যপ্রাপ্ত দেশ হইতে অন্যভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপকার পাওয়া গেলে এবং উহা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের নিকট যথেষ্ট বিবেচিত হইলে, ওই উপকার বেনিফিট বা প্রতিদানরূপে গণ্য হইতে পারিবে।

(৯) আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য অন্য দেশ কর্ত্তৃক সামরিক সাহায্য-দান কিংবা অন্য দেশে আমেরিকার সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ-শিবির প্রতিষ্ঠা করিলে সেই দেশ কর্ত্তৃক প্রদত্ত সেবা, সরবরাহ এবং সংবাদ (সার্ভিস, সাপ্লাইজ অ্যাণ্ড ইন্‌ফরমেশন) প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের অভিরুচি

অনুযায়ী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপকার কিংবা প্রতিদানরূপে গণ্য হইতে পারে।

(১০) সর্ব্বোপরি, এই সম্পর্কে ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার যে মাস্টার-এগ্রিমেণ্ট* সম্পাদিত হইয়াছে, যুদ্ধোত্তর বাণিজ্য-নীতি বিষয়ে মিত্রপক্ষীয় অন্যান্য দেশের সহিতও যদি তদনুরূপ একটা বোঝাপড়া বা শর্ত্ত সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে ওই দেশকেও আর পৃথকভাবে লেণ্ড-লিজ দেনা পরিশোধ করিতে হইবে না—ইহাকেই পরোক্ষ প্রতিদান বলিয়া প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট ইচ্ছা করিলে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

এখন ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার যে "মাস্টার-এগ্রিমেণ্ট" সাধিত হইয়াছে, তাহার সার-মর্ম্ম উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাহা অনেকটা এইরূপ :—উভয় রাষ্ট্র পরস্পরের নিরাপত্তার জন্য সৈন্য, সরঞ্জাম, সর্ব্ববিধ সুবিধা, সংবাদ ও শ্রম যথাসাধ্য পরস্পরকে যোগাইবে। বলিতে গেলে একই ভাণ্ডারে ইহারা যুদ্ধের জন্য সব কিছু জমা দিবে এবং ওই মিলিত ভাণ্ডার হইতেই সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োজনমত সকল রণক্ষেত্রে সরবরাহ হইতে থাকিবে। যুদ্ধ যখন শেষ হইয়া যাইবে তখন যে সব অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম রক্ষা পাইবে বা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা আমেরিকাকে ফেরত দিতে হইবে (কারণ আমেরিকাই এখন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডকে দিয়া চলিয়াছে; নিজে এখনও কিছুই গ্রহণ করে নাই, প্রয়োজনও নাই)—যদি প্রেসিডেণ্ট মনে করেন, ওই সব জিনিস নিজ দেশরক্ষার জন্য বা অন্য কারণে আবশ্যক হইবে। ইহার পরে যাহা থাকিবে, তৎসম্পর্কে বিচার করিবার সময় ইংলণ্ড ১৯৪১, ১১ই মার্চ তারিখের পর এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে যাহা করিয়াছে, তাহা বিবেচনা করা হইবে। ইংলণ্ডকে শেষ-পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া যাইতে হইবে এবং ইহা লেণ্ড-লিজ সাহায্যের হিসাব-নিকাশকালে প্রতিদানস্বরূপ গ্রহণ করা হইবে।

এই "মাস্টার এগ্রিমেণ্টে"র সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিধানটি ৭নং ধারায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা এইরূপ—যুদ্ধ সমাপ্তির পর আমেরিকা

* নামটি প্রণিধানযোগ্য। ইহা কি জগতের 'মাষ্টারি' বা অভিভাবকত্বের ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব-সূচনা?

ও ইংলণ্ডের মধ্যে শেষ হিসাবনিকাশের সময়ে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে উভয়ের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে কোনরূপ বিরোধের সৃষ্টি না হইতে পারে এবং অর্থনৈতিক সম্বন্ধ, পরস্পরের পক্ষে সুবিধাজনক এবং অপরের পক্ষেও উন্নতিমূলক, হইতে পারে। উভয়ে একযোগে এই উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য করিবেন এবং এই একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া যদি অন্য কোন জাতি তাঁহাদের সহিত যোগদান করিতে চাহেন, তবে তাঁহাদের জন্যও দ্বার উন্মুক্ত রাখা হইবে। উভয়ের চরম লক্ষ্য হইবে—জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নূতন নূতন কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিয়া উৎপাদন ও কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার সাধন করা এবং পণ্যবিনিময়ের সুযোগ ও ভোগের উন্নতিবিধান করা—যাহার উপর নিখিল মানবের স্বাধীনতা ও আর্থিক কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। এতদ্ব্যতীত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে সর্ব্বপ্রকার পক্ষপাতমূলক আচরণ বিদূরিত করা এবং শুল্ক-প্রাচীর ও অন্যান্য প্রতিবন্ধের প্রতিকার করাও ইহাদের অন্যতম লক্ষ্য হইবে। সর্ব্বোপরি, ১৯৪১, ১২ই আগস্ট তারিখে বিঘোষিত আটলাণ্টিক চার্টারও (সার্ব্বজনীন স্বাধীনতা সনদ)* এই মাস্টার-এগ্রিমেণ্টেরই অন্তর্গত। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ইহাও বলিয়া রাখিয়াছেন যে, যদি কোন দেশ এই যুদ্ধের দরুন তাহার জাতীয় আয়ের (ন্যাশনাল ইন্‌কাম-এর) শত-করা এমন একটা অংশ ব্যয় করে, যাহা অপর দেশের জাতীয় আয়ের (শত-করা অংশের) সমতুল্য, তাহা হইলে সেই দেশকে লেণ্ড-লিজ হিসাবে ঋণী সাব্যস্ত করা হইবে না।

বিশ্লেষণ করিলে ঋণ ও ইজারা বন্দোবস্তের শেষ কথা ইহাই দাঁড়ায় যে, প্রেসিডেণ্ট সাহেব সাহায্যপ্রাপ্ত মিত্রশক্তির নিকট কোন প্রতিদানই চাহেন না, শুধু চাহেন, তাহারা ট্যাঙ্ক, প্লেন, মেশিনগান, যন্ত্রপাতি কোন কিছুর ভাবনা না ভাবিয়া প্রাণপণ কেবল লড়াই করিয়া যাইবে এবং যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত গুড কনডাক্ট-এর প্রমাণ দিতে পারিবে ; তাহা দিতে পারিলেই, ঋণ ও ইজারার সকল দায় হইতে তাহারা মুক্ত।

* "সার্ব্বজনীন" বা "নিখিল মানব" বলিতে এশিয়া বা আফ্রিকাবাসীকে বুঝাইবে না—চার্চিল-টীকা।

রকমসকম দেখিয়া মনে হয়, বৃদ্ধ পিতামহ ঠাকুর যেন পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া যুদ্ধক্রীড়ারত বালকদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিতেছেন, "হাত ঘুরালে নাড়ু দেব, নইলে নাড়ু কোথায় পাব।"

যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন মিত্রশক্তিকে ১৯৪৩, জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ-সরঞ্জাম ও সাহায্য সরবরাহ খাতে (কর গুড্‌স্ অ্যাণ্ড সার্ভিসেস) কি পরিমাণ ঋণ ও ইজারারূপ নাড়ু দিয়াছেন, তাহার একটি হিসাব এখানে দিতেছি, গ্রেটবৃটেন—১১১ কোটি স্টার্লিং, রুশিয়া—৪৬ কোটি স্টার্লিং, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা—৪০ কোটি স্টার্লিং, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, চীন ও ভারতবর্ষ—৩৪ কোটি স্টার্লিং, অন্যান্য এলাকা—১১½ কোটি স্টার্লিং। মোট ২৪২½ কোটি স্টার্লিং অর্থাৎ ৩২২৫ কোটি টাকা!*

এই বিরাট দানসত্র খুলিবার কারণ কি শুধুই বিশ্ব-পরিত্রাণ-যজ্ঞের নিষ্কাম পৌরোহিত্যের গৌরব-লাভ? শুধুই উৎপীড়িত, অত্যাচারিত মানবজাতির মুক্তি-অর্জন? হে বিশ্বত্রাতা, সত্যই কি তোমার কল্যাণে

"দুঃসহ বাধা হবে অবসান, জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ,
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে।
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে"?

পরোপকারের নাম করিয়া আত্মোপকার সাধন করাই যুগধর্ম। তুমি দেখিতেছি, আত্মোপকারের নাম করিয়া ("টু প্রোমোট দি ডিফেন্স অব ইউ. এস. এ." দ্রষ্টব্য) পরোপকার ব্রত আরম্ভ করিলে! এইরূপ অভিনব আচরণেরই বা কারণ কি? মুখেও পরোপকার, কাজেও পরোপকার যদি করিতে, তাহা হইলে ক্ষতি কি ছিল? উহাতে সত্য ও আদর্শ দুইই রক্ষা হইত না কি? অধুনা সকলেই অত্যন্ত সতর্ক ও সেয়ানা হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই কি পরোপকার-ব্রত উদযাপনের পথ সহজ ও সুগম করিবার জন্য নিজের মস্তকে এই কলঙ্কপসরা তুলিয়া লইলে?

তোমার শত্রুরা বলিতেছে, সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের সর্ব্বগ্রাসী দেনা কেহ শোধ দিতে পারে না, ইহা তুমি গতবারে দেখিয়াছ। নগদ মূল্য দিয়া

* তন্মধ্যে আমাদের অংশে ঋণ-ইজারার নাড়ু লাভ হইয়াছে (১৯৪৩, ১লা মার্চ নাগাদ) ৩২½ কোটি ডলার অর্থাৎ প্রায় ১০৪ কোটি টাকা মূল্যের।

এই অনির্ব্বাণ চিতার কাঠও কেহ খরিদ করিতে পারিবে না, ইহাও তুমি ভাল করিয়া জান। তাই নাকি এবার তুমি তোমার মিত্রগণকে ধারে মাল বিক্রয় কর নাই, নগদ টাকা ধার দাও নাই, নিঃস্বত্ব হইয়া কিছু দানও কর নাই। অথচ এই তিনেরই অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়া, ঋণ ও ইজারা এই দুইটি সমাসবদ্ধ পদের সাহায্যে এমন একটি অদ্ভুত রসায়ন সৃষ্টি করিয়াছ যাহাতে তোমার লাঠিও ভাঙিবে না, সাপও মরিবে এবং জগতে শ্যাম খুড়োর একাধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। এই ব্যবস্থায় পৃথকভাবে ধার, বিক্রয়, দান কিছুই নাই সত্য; কিন্তু একাধারে সবই আছে এবং যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহা পাইবার সুন্দর সুবন্দোবস্তও আছে! শুধু বলিতে হইবে—গুরুদেব, তোমার পতাকা যোরে দাও, আর তাহা বহিবারে দাও শকতি, তোমার সেবার মহান দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি। অমনই গুরুদেবের দেশ হইতে সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র, রসদ সব হুড়মুড় করিয়া আমাদের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতে থাকিবে। এবারে আর মাল লইয়া বা টাকা লইয়া সটকান দেওয়া চলিবে না, কারণ গুরুভাইরা এবার আমাদের ঘরের মধ্যেই অতিথি। আমাদের হাট-ঘাট, বাজার-বন্দর সবই আজ তাঁহার জিম্মায়, আমাদের ঘরের হাঁড়ির খবর সব কিছু তাঁহাদের নখদর্পণে। একবার যখন লেণ্ড-লিজ রসায়ন গলাধঃকরণ করিয়া গুরুভাই বলিয়া গৃহে আহ্বান করিয়াছি, তখন আমাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত অতিথি-সৎকার করিতেই হইবে। ইংরেজ প্রভুর অনুগ্রহে বিশ্ব-গুরুর কৃপালাভ আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। এবার এই মন্বন্তরের ধাক্কায় সবংশে যদি মরিও, তথাপি এই বিশ্বাস লইয়া শান্তিতে যাইতে পারিব যে, দেশের কুপুত্র আমরা মরিয়া বাঁচিয়াছি, কিন্তু গুরুর কৃপায় স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি আমাদের, শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া গেল!

শ্রীঅনাথগোপাল সেন

মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিকপত্র

অনেকের ধারণা, মহিলাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীই সর্ব্বপ্রথম মাসিকপত্রিকা পরিচালন করেন। এমন কি, স্বর্ণকুমারীর মৃত্যুতে 'প্রবাসী' লিখিয়াছিলেন:—"বঙ্গে মহিলাদের মধ্যে পত্রিকা সম্পাদনের কাজ তিনিই প্রথমে করেন" (শ্রাবণ ১৩৩৯, পৃ. ৫৭৭)।

স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের হস্ত হইতে 'ভারতী'র পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার ১১ বৎসর পূর্ব্বে—১২৮০ সালে (ইং ১৮৭৩) ভুবনমোহিনী দেবী "বিনোদিনী" নামে একখানি মাসিকপত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী রাধারাণী দেবী একটি প্রবন্ধে* এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

'বিনোদিনী' নামে একখানি মাসিকপত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নয়,—১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে; সম্পাদিকা হিসাবে পত্রিকায় ভুবনমোহিনী দেবীর নাম থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে উহা মহিলা-পরিচালিত মাসিকপত্রিকা নহে। কেন নহে, তাহার কারণ বলিতেছি।

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্র 'সাধারণী'র ২২ চৈত্র ১২৮১ তারিখের সংখ্যায় একটি বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়। এই বিজ্ঞাপনে প্রকাশ,—"সাহিত্য, বিজ্ঞান, নীতি ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় (ভ্রমরের অবয়বের) মাসিক পত্রিকা শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া সাধারণী যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইবে।..." পত্রিকাখানি ১২৮২ সালের বৈশাখ (এপ্রিল, ১৮৭৫) মাস হইতে প্রকাশিত হয়। ভুবনমোহিনী দেবী স্বাক্ষরযুক্ত অনেক কবিতা 'সাধারণী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বিনোদিনী' ও 'সাধারণী'তে মুদ্রিত তাঁহার কবিতাগুলি, ১২৮২ সালের শেষভাগে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "সম্পাদক ও প্রকাশক"-রূপে 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, ১ম ভাগ' নামে প্রকাশ করেন। কিন্তু 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' যে কোন মহিলার রচনা নহে,—নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই যে "ভুবনমোহিনী

* "আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে নারীর দান"—ঊনবিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যবিবরণ।

দেবী" এই ছদ্মনামের আড়ালে কবিতা রচনা ও প্রকাশ করিতেন, আজিকার দিনে অনেকের নিকট তাহা অবিদিত নহে। তিনিই যে 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র গ্রন্থকার তাহার একটি প্রমাণ—প্রথম সংস্করণের পাঁচ বৎসর পরে প্রকাশিত ২য় সংস্করণের পুস্তকের আখ্যাপত্রে "শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত" মুদ্রিত আছে। সুতরাং নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই যে ভুবনমোহিনী দেবীর ছদ্মনামে 'বিনোদিনী' সম্পাদন করিতেন তাহা নিঃসন্দেহ।

তাহা হইলে মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিকপত্রিকা কোন্‌খানি? স্বর্ণকুমারীর পূর্ব্বে কোন মহিলা পত্রিকা সম্পাদন অথবা পরিচালন করিয়াছিলেন কি? আমার মনে হয়, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত থাকমণি দেবী-সম্পাদিত 'অনাথিনী'ই মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক-পত্রিকা। কালীপ্রসন্ন ঘোষ-সম্পাদিত 'বান্ধব' পত্রিকার ১২৮২ সালের ভাদ্র সংখ্যায় 'অনাথিনী'র যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি :—

> অনাথিনী। মাসিক পত্রিকা, শ্রীমতী থাকমণি দেবী কর্তৃক সম্পাদিত।—শুনিয়াছি, সম্পাদিকা অল্প বয়সের বালিকা। তাঁহার লিখিত কবিতাটিতে শব্দলালিত্য আছে; কিন্তু পড়িতে লজ্জা হয়।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্বাস

গুলিগোলা চলেই যদি যত খুশি চলতে পারে।
এই কথাটা জেনেছি সার—ছুটো মাথা নেইকো কারে।

অন্তরালে

সবুজ পাতার আড়াল যতই কর,
চপল ভাবণ যতই হোক না ঝড়,
উপরে উপরে যত তোল ঢেউ,
আমি তো দেখেছি, না দেখুক কেউ,
গহন গভীরে নবীন জীবন হতেছে মহত্তর।
সবুজের যাযা ছায়া আবছায়া, তাহার অন্তরালে
নবযৌবন হবে চিরজয়ী যুগে যুগে কালে কালে।

নমুনা

সুশীল। আজও চাল পেলে না?

বিনোদ। [ম্লান হাসিয়া] কই আর পেলুম!

সুশীল। তুমি চেষ্টা করছ না ভাল ক'রে।

বিনোদ। আর কি করব, বল? পরশু দিন গালাগালি খেয়েছি, কাল গুঁতো খেয়েছি, আজ এই দেখ—

দক্ষিণ পদটি তুলিয়া দেখাইলেন। বুড়ো আঙুলে রক্তাক্ত নেকড়া জড়ানো

সুশীল। ছি ছি, এ কি কাণ্ড! কি ক'রে হ'ল এ?

বিনোদ। কাল জুতো জোড়া ছিঁড়ে গিয়েছিল, আজ খালি পায়েই গিয়েছিলুম, বুটজুতো-পরা এক ছোকরা মাড়িয়ে দিলে।

সুশীল। তোমার যাবার দরকার কি! জীবু গেলেই পারে।

বিনোদ। যায় না তো।

সুশীল। বলেছিলে তাকে?

বিনোদ। ছেলেমেয়ে বড় হবার পর আমি তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করি নি ভাই কোনদিন, আজই বা করব কেন? [একটু থামিয়া] তা ছাড়া নিজের সন্তানকে ওই ভিড়ের মধ্যে পাঠাতে ইচ্ছেও করে না।

সুশীল। জীবু সমস্ত দিন করে কি?

বিনোদ। জানি না। অধিকাংশ সময়ই বন্ধু বীরেনের বাড়িতে থাকে।

সুশীল। খাবার সময় ঠিক আসে নিশ্চয়।

বিনোদ। না এলে কোথায় যাবে, বল? কোন কোন দিন তাও আসে না।

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন

সুশীল। সারাজীবন মাস্টারি ক'রে কাটালে, অথচ নিজের ছেলে-মেয়েদের আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পার না কেন যে বুঝি না। তোমার স্ত্রী যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তবু—

বিনোদ। কি করি বল ভাই? নিজের স্বভাব তো বদলাতে পারি না।

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছি, তারা বড় হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের মুখে লাগাম লাগিয়ে কাঁহাতক টেনে রাখি, বল ?

সুশীল। তোমার এই ঢিলেমির জন্যেই শিবু আর সবিতার জেল হয়েছে। তুমি যদি মানা করতে, ওরা কখনও এ আন্দোলনে যোগ দিত না।

বিনোদ চুপ করিয়া রহিলেন। নিজের কেশবিরল মস্তকে একবার হাত বুলাইলেন। ভিতরের ঘর হইতে সেতারের টুং-টাং শোনা গেল

সুশীল। অমিতা বুঝি ?

বিনোদ। হ্যাঁ।

সুশীল। বেশ আছ তোমরা! ঘরে চাল নেই, অথচ মেয়ে সেতার বাজাচ্ছে ব'সে !

বিনোদ। সেতারটা ভেঙে ফেললে কি চাল পাওয়া যাবে ?

সুশীল। হ্যাঁ, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে রোজই ভুলে যাই। সুখময়-বাবুর সঙ্গে কি হয়েছে বল তো ? ও ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাব থাকলে চাল পেতে পার সহজে। বড়লোকের ছেলে, বড় চাকরি করে, অনেক বড়লোকের সঙ্গে ভাবও আছে, অনায়াসেই চাল যোগাড় ক'রে দিতে পারে। হ'ল কি ওর সঙ্গে ?

বিনোদ। ঠিক জানি না। শিবুর বন্ধু হিসেবে আমাদের বাড়ি আসত মাঝে মাঝে। শিবুর জেল হওয়ার পরও অনেকবার এসেছে। হঠাৎ একদিন দেখি, অমিতা তাড়িয়ে দিচ্ছে ওকে বাড়ি থেকে। সুখময় চ'লে যাবার পর অমিতাকে কারণটা জিজ্ঞেস করলুম, কোন জবাব দিলে না। প্রণয়ঘটিত কিছু বোধ হয়।

সুশীল। বেশ নির্বিকারভাবে বললে তো কথাটা !

বিনোদ। তুমি বাল্যবন্ধু ব'লেই বললুম। তা ছাড়া ওসব ব্যাপারে সত্যিই আমার কোন আপত্তি নেই, থাকলেও টিকত না। প্রতি ঘরেই বড় বড় অবিবাহিতা মেয়ে, সমাজের এমন অবস্থা যে ভদ্রভাবে বিয়ে দেওয়া যায় না, পুরুষের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখবারও

উপায় নেই, মিশতে দিতে হচ্ছে, সুতরাং এর অনিবার্য্য পরিণামটাকেও মানতে হবে।

সুশীল। ভাল।

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। ভিতর হইতে সেতারে ভিলককামোদ বাজিতে লাগিল

সুশীল। বাঃ, বেশ হাত হয়েছে তো! আচ্ছা, আমি এবার উঠি ভাই।

চলিয়া গেলেন। সেতার বাজিতে লাগিল। বিনোদবাবু চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে তাঁহার জনৈক প্রাক্তন ছাত্র সুরেন আসিয়া প্রবেশ করিল

বিনোদ। এস সুরেন। কি খবর?

সুরেন। চাল-টাল পাচ্ছেন স্যর্?

বিনোদ। কই আর পাচ্ছি!

সুরেন। হোর্ডিং স্টপ করতে না পারলে কেউ আর কিছু পাবে না।

বিনোদ। হোর্ডিং করছে কে?

সুরেন। অনেকে স্যর্, অনেকে। আমরা কত লোকের বাড়ি থেকে রোজ চাল সীজ করছি, বস্তা বস্তা চাল সব লুকিয়ে রেখেছিল।

বিনোদ। বটে?

সেতার থামিয়া গেল

সুরেন। আমি আপনাকে বলতে এসেছি যে, জীবুকে আমাদের ফুড-ফ্রন্টে যদি জয়েন করতে দেন, তা হ'লে বড় ভাল হয়।

বিনোদ। যারা সমুদ্র শোষণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের তোমরা কিছু বলতে পার না, কার বাড়ির চৌবাচ্চায় দু বালতি জল বেশি আছে তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছ কেন, বুঝতে পারি না।

সুরেন। না না, আপনি ব্যাপারটা ভুল বুঝছেন স্যর্।

অমিতা প্রবেশ করিল

অমিতা। বাবা, ঘরে তো চাল কিচ্ছু নেই। রমেশকাকার বস্তা খুলব একটা?

বিনোদ। না। রমেশ আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে, তাকে না জিজ্ঞেস ক'রে খোলাটা ঠিক হবে না। আমি বেরুচ্ছি আবার এখুনি।

সুরেন। ক বস্তা চাল আছে আপনাদের ?

বিনোদ। আমার এক বন্ধুর, আমার নয়।

সুরেন। ক বস্তা, বলুন না ?

অমিতা। পঞ্চাশ বস্তা।

সুরেন। মাপ করবেন স্যর্, আমরা সীজ করব।

বিনোদ। সীজ করবে !

সুরেন। নিশ্চয়ই। এসব ব্যাপারে আমরা কোন পার্শিয়ালিটি করি না। আপনিই ভেবে দেখুন না, একজনের বাড়িতে চাল জমা করা থাকবে আর বাকি সকলে স্টার্ভ করবে, সেটা কি ন্যায়সঙ্গত ? এখন হোর্ডিং বন্ধ করাই প্রকৃত দেশসেবা করা। আপনি জীবুকেও আমাদের দলে দিন। অমিতাদি, আপনিও আসুন না।

অমিতা। আমি পারব না।

সুরেন। জীবুকে কিন্তু চাই আমরা।

অমিতা। জীবু রাজি হবে না। এ. আর. পি.র অমন ভাল চাকরিটাই নিলে না।

সুরেন। আপনি একটু ব'লে দেখবেন স্যর্।

বিনোদ। আচ্ছা। রমেশের চালগুলো সত্যিই নিয়ে যাবে নাকি তোমরা ?

সুরেন। [হাসিয়া] খবর যখন পেয়েছি, নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। আচ্ছা, এখন চলি। জীবুকে বলবেন একটু। [চলিয়া গেল]

অমিতা। সুরেন আবার কবে কমিউনিস্ট হ'ল ! এমন জানলে ওর সামনে চালের কথা তুলতুমই না।

বিনোদ। আমার জুতোটা শুকিয়েছে ? আর একবার বেরিয়ে দেখি চেষ্টা ক'রে।

অমিতা। না, তুমি এখন বেরিও না। দুদিন থেকে প্রায় উপোষ যাচ্ছে তোমার।

বিনোদ। না বেরুলে চলবে কেন মা ? তুইও তো কিছু খাস নি। আধখানা শশা রেখেছিলাম, খেয়েছিস সেটা ?

অমিতা। খেয়েছি।

বিনোদ। জীবু আজ এখনও ফিরল না! কি যে করে সমস্ত দিন বুঝি না।

অমিতা। আজ বড্ড দেরি হচ্ছে।

বিনোদ। আমার জুতোটা দে।

অমিতা। না, তুমি এখন বেরুতে পাবে না।

বিনোদ। না বেরুলে চলবে কেন?

উভয়ে পরস্পরের দিকে অসহায়ভাবে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন

অমিতা। তুমি বরং বিশ্রাম কর একটু, আমি একটু বেরুই।

বিনোদ। তুই 'কিউ'য়ে গিয়ে দাঁড়াবি নাকি?

অমিতা। না, অন্য দরকার আছে।

বিনোদ। বেশি দেরি করিস না যেন।

অমিতা। না, বেশি দেরি হবে না।

অমিতা ভিতরে গিয়া বাহিরে যাইবার উপযোগী বেশবাস পরিধান করিয়া আসিল। দেখা গেল, ঘরে চাল না থাকিলেও বাক্সে শাড়ি প্রভৃতির অভাব নাই। অমিতা সুন্দরী, নূতন সাজে তাহাকে অপরূপ দেখাইতেছে। বিনোদবাবু ক্যাম্প-চেয়ারে চোখ বুজিয়া পড়িয়া ছিলেন। অমিতা নিঃশব্দপদসঞ্চারে বাহির হইয়া গেল। বিনোদবাবু ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমাইয়া তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ যেন একে একে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন

গৌতম বুদ্ধ। ভেঙে প'ড়ো না বিনোদ। পৃথিবীতে দুঃখ থাকবেই, নিজের কর্ম এবং চরিত্র দ্বারা সে দুঃখকে জয় করতে হবে।

যীশু খ্রীষ্ট। তুমি দুঃখী ব'লেই তুমি ধন্য, দুঃখের আগুনে পুড়িয়েই ভগবান মানুষকে নির্মল করেন।

চৈতন্য। কারও ওপর রাগ ক'রো না, কাউকে ঘৃণা ক'রো না, তা হ'লেই আর দুঃখ থাকবে না। অনুরাগের স্পর্শে পাষাণও বিগলিত হয়।

রামকৃষ্ণ। ভেদবুদ্ধির জন্যই কষ্ট। যে মুহূর্তে বুঝতে পারবি, আমরা সকলে একই সমুদ্রের ঢেউ, তখনই দেখবি, সব ঠিক হয়ে গেছে।

শঙ্করাচার্য। কিসের কষ্ট? সবই তো মায়া, একবার উপলব্ধি কর

দেখি যে, তুমিই সব, তুমি ছাড়া বাকি সব মায়া।

সকলে একে একে আবার মিলাইয়া গেলেন। যে নির্ব্বাক নিরুপায় হতাশ বিনোদের বুকে পাথরের মত চাপিয়া ছিল, তাহা যেন অনেকটা লঘু হইয়া গেল। ঘুমের ঘোরেই তিনি যেন অনুভব করিলেন যে, সমস্ত লাঞ্ছনা গঞ্জনা, সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি, নিয়তির সমস্ত নির্যাতন তিনি এবার হাসিমুখে সহ্য করিতে পারিবেন। দ্বারপ্রান্তে শব্দ হইল, ঘুম ভাঙিয়া গেল। বিনোদ চোখ খুলিয়া দেখিলেন, সুখময়বাবুর বাজার-সরকার বিপিন দাঁড়াইয়া আছে

বিপিন। [নমস্কার করিয়া] সুখময়বাবু আপনার জন্যে এক বস্তা চাল পাঠিয়ে দিয়েছেন, কোথায় রাখিয়ে দোব বলুন, কুলিটা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

বিনোদ। আমার জন্যে ?

বিপিন। আজ্ঞে।

বিনোদ। কোন কথা তো ছিল না!

বিপিন চুপ করিয়া রহিল

উনি চাল পেলেন কোথা ?

বিপিন। আমি কি ক'রে বলি বলুন ? ওঁরা বড়মানুষ।

নেপথ্যে কুলি। বাবু!

বিনোদ। খিড়কির দুয়ার খোলা আছে, ভেতরের বারান্দায় রেখে যাও।

বিপিন চলিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অমিতার প্রবেশ

অমিতা। [খুব একটা আনন্দের ভান করিয়া] বাবা, ভারী একটা মজা হয়েছে। রাস্তায় বেরুতেই সুখময়দার সঙ্গে দেখা, তিনি নিজে এসে—

বানানো কথাগুলো হঠাৎ কেমন যেন বেসামাল হইয়া পড়িল

মানে, আমি ঝগড়াটা মিটিয়ে নিলুম। হাজার হোক দাদার বন্ধু তো!

বিনোদ। ভালই করেছ।

অমিতা। আজ একটা সিনেমায় উনি আমাকে নিয়ে যেতে চাইছেন, যাব ?

বিনোদ। যেতে পার, কিন্তু চালটা ফেরত দাও।

অমিতার সমস্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল

অমিতা। চাল দিয়ে গেছে?

বিনোদ। হ্যাঁ।

অমিতা। কেন, নিলে ক্ষতি কি?

বিনোদ। বড্ড নোংরামি হয় সেটা।

অমিতা। [দৃঢ়কণ্ঠে] জীবন-মরণ সমস্যার সময় কি দরকার অত চুলচেরা বিচারের?

বিনোদ। মানুষ ব'লেই দরকার, পশুর কোন দরকার নেই। [ম্লান হাসিয়া] নিজেকে এখনও ঠিক পশুর পর্য্যায়ে নামিয়ে আনতে পারি নি মা।

অমিতা। কিন্তু আমাদের চলবে কি ক'রে? তিন দিন থেকে ভাত পড়ে নি পেটে, জীবুটা খিদের জ্বালায় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিনোদ। সবাই যেখান থেকে পাচ্ছে, আমাদের সেইখান থেকেই পেতে হবে। আমি মনে করছি, ওখানে গিয়ে শুয়ে থাকব আজ থেকে।

একটি পুঁটুলি হাতে সুশীলের প্রবেশ

সুশীল। এই নাও। নিজেদের চাল যতটুকু ছিল, তার অর্দ্ধেকটা তোমার জন্যে নিয়ে এলাম গিন্নীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি ক'রে।

বিনোদ। কি দরকার ছিল ভাই, আমি আবার বেরুচ্ছি, এবার পাব ঠিক।

সুশীল। শেষে আমারটা শোধ ক'রো, আমাকেও তো কিউ থেকেই নিতে হচ্ছে। ভাল কথা, রাস্তার ধারে একটা মড়া প'ড়ে আছে দেখেছ? শুষ্ক শীর্ণ অনাহার-ক্লিষ্ট চেহারা! আশপাশ দিয়ে জনতার স্রোত ব'য়ে চলেছে, কেউ বিশেষ লক্ষ্যও করছে না, মানুষ নয়, যেন ইঁদুর।

অমিতা চালের পুঁটুলি লইয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল

বিনোদ। মৃত্যুই এখন শান্তি।

দ্রুতপদে জীবুর বন্ধু বীরেনের প্রবেশ

বীরেন। জীবু গলায় দড়ি দিয়েছে।

সুশীল। সে কি !

বীরেন। হ্যাঁ, আমাদের তেতলার ঘরটায় সকাল থেকে চুপ ক'রে শুয়ে ছিল। খাবার সময় ডাকতে গিয়ে দেখি, কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে, আপনারা আসুন শিগগির।

বিনোদ। [স্থিরকণ্ঠে] যাও, যাচ্ছি।

বীরেন চলিয়া গেল। উভয়েই নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলেন

সুশীল। যা হবার তা তো হয়ে গেছে, এখন—

বিনোদ। ও কথা থাক। একটা কথার জবাব দাও দিকি। এসব সত্ত্বেও কি ভালবাসা যায়, ক্ষমা করা যায়, মায়া ব'লে সব উড়িয়ে দেওয়া যায়, দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে ভগবান আমাকে নির্ম্মল ক'রে তুলছেন—এ বিশ্বাসে কি মন ভরে সত্যি সত্যি ? জবাব দাও, [হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে] জবাব দাও, জবাব দাও।

দ্রুতপদে সুরেনের প্রবেশ

সুরেন। [উচ্ছ্বসিত গদগদকণ্ঠে] দাদু, হ্যাপি নিউজ ! একটা শত্রু নিপাত হ'ল। ইটালি হ্যাজ সারেণ্ডার্ড আন্‌কণ্ডিশনালি।

"বনফুল"

আমরা

আমরা পারি না কি ?
চাল তেল নুন , দাম দশগুণ
চার টাকা সের ঘি—
আমাদের তাতে কিবা আসে যায়,
শঙ্কর রব মোদের মাথায় ;
পুড়িলে উদর মোহ-মুদ্গর
ক'রে আওড়াই গী—
"পরকালটাই সত্য রে দাদা,
ইহকাল—ছি ছি ছি !"

(মোরা) ত্যাগের দাস তাই,
করি না নালিশ বিছানা বালিশ
নিয়ে পথে বাহিরাই।
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচি কিছুদিন,
ধীরে ধীরে নাড়ী হয়ে এলে ক্ষীণ
পড়ে চিৎপাত করি বাজি মাত,
মরিতে মরিতে গাই—
"সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।"

বন্ধু

লোকটা পাগল, কঙ্কালসার শীর্ণ দেহ, চক্ষু কোটরগত, দৃষ্টি তাহার সদাই স্থির ও অর্থহীন। পাগলের পায়ে মজবুত লোহার বেড়ি ও শিকল, স্তম্ভের সহিত তাহাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। লোকটা বিষাদের জীবন্ত ছবি, তথাপি সে হাসে। সে হাসি রহস্যময়।

বাঁধনের পীড়া অসহ্য হইলে, সে সর্বশক্তি প্রয়োগে শিকলটা ধরিয়া টানাটানি করিয়া থাকে—লোহার শিকল ছেঁড়ে না, ব্যর্থ হইয়া পাগল শূন্যে তাকাইয়া থাকে। তাহার পরই একটি ক্রূর হাসি তাহার বিষাদময় মুখের উপর খেলিয়া যায়। পাগল কি ভাবিয়া বন্ধন মানিয়া লয়। পরে মাথাটা নীচু করিয়া বিড়বিড় করিয়া বকিতে থাকে।

আপনার বলিতে পাগলের কেহ নাই। তাহার একমাত্র দরদী রাস্তার একটি খেঁকো কুকুর। প্রত্যহ একটি নির্দিষ্ট সময় পাগলের নিকটে সে আসে। পাগল নিজের আহারের অংশ হইতে তাহাকে খাইতে দেয়। আহারান্তে কুকুরটা পাগলের গা ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়ে, লেজ নাড়িয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। সময় অপরাহ্ণের দিকে অগ্রসর হইলে সে বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। দরজা খুলিলেই গৃহস্থ-বাড়ির শুচিবাতীরা তাহাকে মারিতে আসিবে—ইহা নিত্য ঘটনা, তথাপি তাড়া খাইবার আগের মুহূর্তটি পর্যন্ত পাগলকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার মন চায় না। সত্যই যখন লোকে 'দূর দূর' করিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসে, তখন সে করুণভাবে পাগলকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়ে, লেজ গুটাইয়া কোন অজ্ঞাত স্থানে চলিয়া যায়। পুনরায় গভীর রাত্রে ফিরিয়া আসে, পাগলের কাঁথার উপর নিশ্চিন্তমনে ঘুমায়—পাগল বসিয়া থাকে।

পাগল চিররুগ্ন। অতীতের কথা, কোন এক সময় তাহার কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যানুরাগ এমন একটি চারিত্রিক ও অধ্যবসায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, যাহা সাধারণের পক্ষে অননুকরণীয়। শুধু যাহা লইয়া অত্যধিক অধ্যয়ন ও তৎসহিত আদর্শ-চরিত্র গঠনের অস্বাভাবিক চেষ্টায় যে প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়াছিল, তাহারই ফলে আজ সে বিকৃতমস্তিষ্ক, মানুষের সমাজে পরিত্যক্ত।

পাগল ঘর ছাড়িয়াছে বহুদিন। সে আপন খেয়ালেই ঘুরিতেছিল, কিন্তু দূরসম্পর্কীয় কোন আত্মীয়ের কৃপায় পুনরায় মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। কৃপার সহিত বৈষয়িক স্বার্থ জড়িত ছিল, সেই কারণে আত্মীয় পাগলকে অতি আপনার করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। পাগল পোষায় কোন হাঙ্গামা ছিল না। বাড়ির সকলের উচ্ছিষ্টায়

একত্রে সংগৃহীত হইলেই সে পরম পরিতোষের সহিত ভক্ষণ করিত, আস্বাদ অথবা পরিমাণ সম্বন্ধে কখনই তাহাকে অভিযোগ করিতে শুনা যায় নাই।

সেদিন ভোর হইতেই মুষলধারায় বৃষ্টি নামিয়াছিল। খোলা বারান্দায় বৃষ্টির ছাটে পাগল ভিজিয়া চপচপে হইয়া গিয়াছে। মাঘের শেষে বৃষ্টি, শীতে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে, তথাপি শীত নিবারণার্থে আত্মীয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত কাঁথাটি গায়ে দেয় নাই। সেটা আতুপাতু করিয়া দেহালের একটি কোণে তুলিয়া রাখিয়াছে এবং নিজের দেহের আড়াল দিয়া কাঁথাটিকে জলের ছাট হইতে আগলাইতেছে। উদ্দেশ্য তাহার বন্ধু আসিয়া ওই কাঁথায় শুইবে।

মাঝে বৃষ্টির সামান্য উপশমের সুবিধা পাইয়া কর্তাবাবু সেই কখন আপিসে চলিয়া গিয়াছেন। পাগল ভাবিতেছে, বেলা বোধ হয় অনেক হইয়া থাকিবে। কর্তাবাবুর পোশাক-পরা প্রভৃতি বিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়াই পাগল সময় ঠিক করিয়া থাকে। পাগলেরও সময় নির্দ্ধারণের প্রয়োজন হয়, কারণ কর্তাবাবু পোশাক পরিয়া বাহির হইয়া গেলে একটি নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হইবার পর তাহার বন্ধুর আসিবার সময় সন্নিকট হইতে থাকে। আজ সেই সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বন্ধু আসে নাই, পাগল অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। বন্ধু ছাড়া আর একজনের অনুপস্থিতি পাগল অনুভব করিতেছিল—সে বাড়ির বুড়ী ঝি। বৃষ্টির অজুহাতে কামাই করিয়াছে, সেই কারণে পাগলও আহার পায় নাই। রোজ থালা ভর্ত্তি ভাত বাসায় লইয়া যাইবার সময় সে পাতা-কুড়ানো খাদ্য দূর হইতে পাগলের নিকট ফেলিয়া দিত। আজ এঁটো কুড়াইবার লোক নাই, তদুপরি অদ্যই এঁটো তোলার প্রতিবাদে বাড়ির মেয়েদের ভিতর একপ্রস্থ কলহ হইয়া গিয়াছে, পরে গত্যন্তর না থাকায় যে যাহার পাতা তুলিয়া নিজেরাই উঠানে ফেলিয়া দিয়াছে। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের মেয়েরা তো রাস্তার ডাস্টবিনের নিকট যাইতে পারে না। বারান্দাতে যায় হওয়াও অসম্ভব, পাগল লোক ভাল নয়। সকলে ভাবিয়াছিল—পাগল বই তো নয়, একদিন না খাইলে আর কি হয়? কিন্তু পাগলেরও ক্ষুধা পায়, যাহার তাড়নায় সে তখন বন্ধুর কথাও ভুলিয়াছিল। জন্মাবধি কাঁদিয়া উঠিলে কি হইবে, সে কখনও কাহারও নিকট খান চাহিয়া লয় নাই। পুষ্ট উদর যোড়া দিয়া উঠিতে শিকলটাকে ধরিয়া টান মারিল। লৌহশিকল সিমেণ্টের মেঝেতে আছাড় খাইয়া ঝনঝন করিয়া উঠিল। পাগলের অন্তঃস্থ উচ্ছ্বাসগুলি শিকলটারই মধ্য দিয়াই প্রকাশ হইয়া থাকে। শিকলের উত্থান-পতনে যে শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়, তাহাতে পাগল কি বোলে এবং বোঝে সেই জানে।

বার দুই তিন ভারী লোহা টানাটানি করিয়া পাগল ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। পাগল যে কেন শিকল ছিঁড়িবার চেষ্টা করে, তাহা লোকে বোঝে না, তাহারা বলে—এমন দয়ালু আত্মীয় না পাইলে বেচারা অনাহারে অথবা বেঘোরে কোথাও মার খাইয়া মরিত।

একে মাথার ঠিক নাই, তাহার উপর নজরটা কেমনতর—সমস্ত বয়সের বউ-ঝিদের একবার দেখিলে হয়, ওর চোখ দুইটা তখন জ্বলিতে থাকে ক্ষুধার্ত বাঘের দৃষ্টির মত—দর্শক ও দৃশ্যে যেন খাদ্য খাদক সম্বন্ধ।

বৈকাল হইয়া গিয়াছে, পাগলের ক্ষুধার এখন তীব্র জ্বালা নাই। কুকুরটাও আসে নাই। বৃষ্টি তখনও টিপটিপ করিয়া পড়িতেছে। পাগলের আজ কি হইয়াছে, কে জানে? সে থাকিয়া থাকিয়া নিজেকে দেয়ালের উপর এলাইয়া দিতেছে। পুরাতন বাড়ির নোনা-ধরা বালি-খসা ইঁট হইতে টসটস করিয়া ফোঁটার পর ফোঁটা জল বরফ গলার মত পাগলের কাঁধ হইতে ঝরিয়া বুক পর্য্যন্ত ভিজাইয়া দিতেছে, তথাপি সে কাঁথাটা ব্যবহার করে নাই। কিছুকাল পরে বুড়ী ঝিয়ের বদলি তাহার মেয়ে বাবুর বাড়িতে কাজে আসিল। নূতন ঝি সবে ফুটপাথ হইতে বারান্দার সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়াছে, এমন সময় পাগল শিকলটা প্রাণপণ শক্তিতে টানিয়া ঝিয়ের প্রায় নাগালে আসিয়া পড়িল, কিন্তু দেহ স্পর্শ করিতে পারিল না, কারণ শিকলের শেষ বিস্তৃতি ওইটুকু। অকস্মাৎ পাগলের এই আচরণে ঝি ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বৃষ্টির উপলক্ষে রাস্তায় দুই-একটি করিয়া পথিকের আবির্ভাব হইতেছিল। কপালগুণে ঝি একটি বাবু-ব্যক্তিকে দেখিতে পাইল। ভদ্রলোক কারণের প্রভাবে বৃষ্টির মধ্যেই সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, ভাবটা—কুছ পরোয়া নেই, বৃষ্টি পড়ল তো আমার কি!

বামাকণ্ঠের কাতর আহ্বানে তিনি নিকটে আসিলেন। ঘটনাটি কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া দুর্বৃত্তকে উপযুক্ত দণ্ড দিয়া ত্রাণকর্তা চলিয়া গেলেন। পাগলের তখন মুখ দিয়া গাঁজলা বাহির হইতেছে, একটা চোখ নীল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, মুখে গাঁজলার সহিত রক্তের ছিটাও দেখা যায়, তাহার ক্ষীণ স্রোত ভিতর হইতে বহিতেছিল কি না কে জানে।

পরের দিনের কথা, আকাশ পরিষ্কার হইয়া রৌদ্র দেখা দিয়াছে। পূর্ব্ববর্ণিত বারান্দায় পাগল আর বসিয়া নাই, শুইয়া পড়িয়াছে। দৃশ্যটি বিস্ময়কর, কারণ পাগলকে কেহ শুইতে দেখে নাই, সে সব সময়ই বসিয়া থাকে। শুধু পাগলের শোয়াটাই আশ্চর্য্য-জনক ঘটনা নয়, অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় সেই নেড়ী কুকুরটা যথেষ্ট বেলা হইলেও পাগলের পাশে বসিয়া আছে। প্রত্যহ ভোর হইবার আগেই সে বারান্দা ছাড়িয়া পলায়, আজ সে মারের ভয়কেও ভুলিয়াছে। এমন সময় গৃহস্বামী রাস্তার বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাগলের নিকট অগ্রসর হইতেই দেখেন, কুকুরটা পাগলের বাহুর উপর মুখ রাখিয়া অনিমেষ নেত্রে রাস্তার দিকে তাকাইয়া আছে। পাগল নড়ে না। বাবুর আবির্ভাবে কুকুর কিছুমাত্র ভীত হয় নাই, বরং থাকিয়া থাকিয়া পাগলের অসাড় বাহুটা চাটিয়া লইতেছে, কুঁইকুঁই করিয়া শব্দ করিতেছে পাগলের মুখ

তাড়াইবার জন্ত, কিন্তু পাগলের শরীরে স্পন্দন নাই, সে পরম শান্তিতে ঘুমাইতেছে। বাবু ভাবিতে লাগিলেন, এ কোন্ দেশী ঘুম বাপু, নেশাখোরেও তো কেহ এমন ভাবে মড়ার মত পড়িয়া থাকে না, তবে কি—! কাছে যাইবারও সাহস নাই, ওদিকে একটু অগ্রসর হইলেই কুকুরটা দাঁত বাহির করিয়া খেঁকাইয়া উঠিতেছে। অভিভাবকত্বের দাবিতে যেন কুকুরটাও একজন প্রতিবাদী হইয়া বসিয়াছে। উপস্থিতবুদ্ধিতে কোন পথ খুঁজিয়া না পাইয়া 'পাঁচির মা, পাঁচির মা' (বুড়ী ঝি) বলিয়া আবার ভিতরে ঢুকিলেন। ঝি তখন ময়লা কাপড় সিদ্ধ করিবার জন্ত সাবান-জল ফুটাইতেছিল। কর্ত্তাবাবুর নিকট কুকুরের স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া বিশেষ কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিল না, কেবল একটি জলন্ত চেলাকাঠ বাবুর হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, মারুন বাবু, মারুন, আজ ভোরে আমাকেও তেড়ে এসেছিল, যেমন পাগল, তেমনই তার কুকুর, যে মানুষ দেখলেই তাড়া করে। ঝি নিজে না দিয়া জলন্ত কাঠটি তাঁহারই হাতে তুলিয়া দিবে ভাবিতে পারেন নাই। না যাইলে পৌরুষও ক্ষুণ্ণ হয়, নিরুপায় হইয়াই চেলা কাঠ হাতে বারান্দায় আসিলেন। কিন্তু কুকুরকে প্রহারের প্রয়োজন হইল না, সে আগুন দেখিয়া নিজেই রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

বাবু জলন্ত কাঠটা হাতে রাখিয়াই পাগলকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কি সর্ব্বনাশ! শরীর যে হিম হইয়া গিয়াছে! অবশেষে আজই পাগলটা মরিল!

ইহার পরের ঘটনা পাড়ার লোকে না জানিলেও আমরা জানি। রোগা কুকুরটা রোজ একবার বারান্দার থামের কাছে আসিয়া চারপাশ শুঁকিয়া যায়। অনেক সময় তাহাকে বসিয়া থাকিতেও দেখা গিয়াছে। সেই অন্তরের কাঙাল পাগলের অপেক্ষায় কি?

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

সদাশয়

ইঁদুর-মারার কল পেতে যারা ইঁদুরের দুখে হাপুসে কাঁদে,
ইঁদুরেরা খাবে—এই ওজুহাতে নিজ আঙিনায় মরাই বাঁধে,
যারা ইঁদুরের ফোটোগ্রাফ-ছাপা কাগজ পড়িয়া যাদের আঁখি
ছলছল করে—ইঁদুরেরা বলো তাদেরে প্রণাম জানাবে নাকি?
ওগো সদাশয়, ওগো মহারাজা, দীন ইঁদুরে ভুলো না কভু,
ইঁদুর-দুঃখ-নিবারণী-সভা-প্রস্তাবগুলি পাঠিও প্রভু—
সেগুলি দাঁতে কুচিকুচি করি খাব জয় তব গুঞ্জন ছাঁদে,
শুধু প্রেম রেখো আমাদের প্রতি, যা হয় ফেলেছ কঠিন ফাঁদে।

অহেতুক

ওঠ না গো! বলি, শুনছ? ঘোষ-গৃহিণীর কণ্ঠস্বর অপ্রসন্ন। ঘোষের চোখে তখনও ঘুমের আমেজ: পরিপূর্ণ বিশ্রামের আরামের ঘোরে মস্তিষ্ক থেকে সর্ব্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্নায়ু-শিরা তখনও আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। জাগ্রত পৃথিবীর কর্ম্মকলরব দূরের বাঁশীর আওয়াজ না হোক আশ্বিনের ভোরের দূরবর্ত্তী চণ্ডীমণ্ডপের ঢাকের বাজনার মত মনে হচ্ছে বলা যেতে পারে। তবুও ঘোষ যেন বুঝতে পারলে, স্ত্রীর কণ্ঠস্বর ফাটা কাঁসির শব্দের মত বেসুরো। সে দেহে মনে চেতনার বেগ সঞ্চার করবার জন্যে পাশ ফিরে বললে, হুঁ। উঠি।

আবার পাশ ফিরে শুলে যে? কি ধারার মানুষ তুমি গা? পিরথিমী জাগল আর তুমি কুম্ভকর্ণের মত ঘুমুচ্ছ? একটু নজ্জা করে না তোমার?

ঘোষ সচকিত হয়ে আর একটা পাশ ফিরে আড়ামোড়া দিলে— এইবার একটা ঝাঁকি দিয়েই সে উঠে বসবে। কিন্তু তার পূর্ব্বেই ঘোষ-গৃহিণী তীব্রস্বরে বলে উঠল, কি কপাল রে আমার, কি নেকন! মনে হয় কপালে মারি খ্যাংরার মুড়ো। ঘর-সংসারের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়ে গঙ্গায় গিয়ে ডুবি গে!

ঘোষ অবিলম্বে উঠে বেরিয়ে এল। দেখলে, প্রাত্যহিক শয্যা-ত্যাগের সময় অতিক্রান্ত তো হয়ই নি, বরং খানিকটা বেশি সকালই বলতে হবে। তবু সে মুখে যথেষ্ট অপ্রতিভতার ভাব টেনে এনে বললে, এঃ! তাই তো!

গৃহিণী বাজারের থলেটা ছুঁড়ে সামনে ফেলে দিয়ে বললে, সংসারে এত লোক মরে, আমি মরি না!

কাল সন্ধ্যেতে তো বাজার ক'রে এনেছি।—কুণ্ঠিতভাবে অপরাধীর মতই ঘোষ কথাটা বললে। ঘোষ-গৃহিণী এ কথার কোন জবাবই দিলে না। কাল বিকেলে তিনটের 'শো'তে স্বামী-স্ত্রীতে থিয়েটারে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফেরবার পথে গৃহিণীর পছন্দমতই বাজার

ক'রে আনা হয়েছে! দেড় টাকার বাজার। তার ওপর গঙ্গার ঘাট থেকে টাটকা ইলিশ এসেছে এক টাকা দিয়ে; সেও গৃহিণীর ফরমাশ মত। স্বামী-স্ত্রী দুটি প্রাণীর সংসার, আক্রাগণ্ডা যতই হোক, এখন অন্তত দুটো দিন বাজারে যেতে হবে না। মাছটা কুটে অবশ্য গৃহিণী বাড়ির অন্য গৃহস্থদের কিছু বিলিয়েছেন, তবুও মাছও আজ আনতে হবে না।

স্বামীর কথার কোন জবাব না দিয়ে ঘোষ-পত্নী হনহন ক'রে এগিয়ে গেল কয়লা-ঘুঁটে রাখবার জায়গাটার দিকে; গাদার ওপরেই কে—হয় তিনি নিজে অথবা ঠিকে ঝিটা, কয়লার টুকরিটা উপুড় ক'রে রেখেছিল। এটা থাকে গাদার পাশে সোজা মুখে। ঘোষ-পত্নী কয়লার টুকরিটা তুলে নিয়ে পাঁচিল পার ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, এইটে হয়েছে একটা আপদ। কোনদিন এখানে, কোনদিন ওখানে, কোনদিন সেখানে; এর পর কোনদিন গিয়ে উঠবে ভাতের হাঁড়ির মুখে কিংবা লক্ষ্মীর আটনের ওপর। যাক, আপদ যাক, বিদেয় হোক।

সন্তানসন্ততিহীন, কুটুম্ব-আত্মীয়হীন, দুটি প্রাণীর সংসার। তকতকে উঠোনে অর্থাৎ তিন হাত বাই পাঁচ হাত একফালি খোলা বারান্দার ওপরে ঘোষের একটি টুল পাতাই আছে, সেটা এক ইঞ্চি সরে না; সেইটের ওপর ঘোষ সকালে বিকেলে বসে। ঘোষ টুলটার ওপরে ব'সে একটা বিড়ি ধরিয়েছিল। বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে সে ম্লান হাসি হাসলে। তার স্ত্রীর এমন ধারার অকারণ রূঢ় ব্যবহার একবিন্দু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তার বয়স হ'ল চল্লিশ, স্ত্রীর বয়স পঁয়ত্রিশ। বোধ হয় স্ত্রীর বয়স যখন পঁচিশ তখন থেকে এই দশ বৎসর ধ'রে তার ধারা-ধরন এমনই। মাথায় কোনরকম বিকৃতি ঘ'টে গেছে। ঘোষ চিকিৎসা অনেক করিয়েছে, এখনও সে মস্তিষ্কশীতলকারী দামী তেল নিয়মিতভাবে স্ত্রীকে মাখিয়ে আসছে। কিন্তু ফল কিছুই হয় নি।

ঘোষ ভাল ঘরের ছেলে। ভাল ঘর মানে, ঘোষ-বংশ কলকাতার ঊনবিংশ শতাব্দীর বনেদী মধ্যবিত্ত বংশ। তাদের দু পুরুষ কলকাতার বড় ইংরিজী ফার্মে বড় চাকরি করেছে। এ পুরুষেও তারা সবাই

চাকরে। লেখাপড়ার ধার তারা বড় ধারে না, স্কুল পর্যন্ত পড়াশুনা ক'রে চাকরিতে ঢুকে পড়ে। ডিগ্রী না থাকার জন্যে চাকরি পাওয়ার তাদের কোন অসুবিধা হয় না; তিন পুরুষ ধ'রে তারা যে পথে যাতায়াত করছে, সে পথের ওপর কেউ কাঁটা দিতে পারে না। ঘোষেদের নিজের বাড়ি আছে, পাঁচ ভাইয়ের একমালী বাড়ি। খান পনরো ঘর, দোতলার ছাদটাও যথেষ্ট প্রশস্ত, অ্যাসবেস্টস দিয়ে পাঁচখানা রান্নাঘর হয়েও অনেকটা স্থান প'ড়ে আছে। চার ভাইয়ের সংসারে ছেলেমেয়ে অনেকগুলি, জমজমাট সংসার; বাড়িতে ঠাকুর-দালান আছে, পূজো-পার্ব্বণ হয়; কিন্তু তবু ঘোষ ভাড়া বাড়িতে বাস করে। একমালী বাড়ির অংশ সে অন্য ভাইদের বিক্রি ক'রে দিয়েছে। ঘোষ রেস খেলে না, তার পান-দোষ বা অন্য কোন দোষ নেই, শেয়ার-মার্কেটেও কোনদিন শেয়ার কেনা-বেচা ক'রে ঋণগ্রস্ত হয় নি, তবু সে বাড়ি বেচে দিয়েছে। ওই স্ত্রীর জন্যই বেচেছে। কিছুতেই সে ওই বাড়িতে থাকতে রাজী হয় নি। ও বাড়ির কলরব-কচকচি তার মস্তিষ্কে অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে আঘাত করে। বাধ্য হয়ে ঘোষ বাড়ি বিক্রি ক'রে এই বাড়িতে বাসা নিয়েছে। তেতলা বাড়ি। তেতলায় থাকে খোদ বাড়িওয়ালা, দোতলায় থাকে একজন অধ্যাপক, একেবারে নীচের তলার চারখানা ঘর দু ভাগে বিভক্ত, এক ভাগে থাকে একটি অল্পবয়সী দম্পতি ও তাদের তিনটি ছোট ছেলে, অপর ভাগে থাকে সস্ত্রীক ঘোষ।

তেতলার বারান্দা থেকে হাঁক এল, নীচের কলটা বন্ধ ক'রে দিন। তেতলায় জল আপনি ওঠে না, দোতলা পর্যন্ত ওঠে; তেতলায় জল ওঠে হ্যাণ্ডপাম্পে, বাড়িওয়ালার স্ত্রী পুত্র কন্যা বধূ সকলে পালা ক'রে পাম্প ঠেলেন, জলও ওঠে, প্রাতঃকালীন ব্যায়ামও হয়। কিন্তু নীচের তলায় কল খোলা থাকলে, পাম্পটা ঠেলে ভেঙে ফেললেও জল ওঠে না। নিত্যনিয়মিত সকালে জলসমস্যা দেখা দেয় বাড়িতে—প্রথমেই তেতলা থেকে হাঁক ওঠে, নীচের কল বন্ধ কর।

মেজাজ ভাল থাকলে ঘোষ-গৃহিণী কল বন্ধ ক'রে দেয়, মেজাজ ভাল

না থাকলে প্রতিবাদ করে। আজ সে নিজের কলটা ভাল ক'রে খুলে দিয়ে বললে, বলি, কেন গা, কল বন্ধ করব কেন ?, কল বন্ধ করলে আমার চলবে কি ক'রে ?

বাড়িওয়ালার মেয়েটি বড় ভালমানুষ মেয়ে, মিষ্টস্বভাবের জন্য সকলেরই প্রিয়, ঘোষ-গৃহিণীর সঙ্গে তার প্রীতি যথেষ্ট, ঘোষ-গৃহিণীর মাথা ধরলে সে এসে শিয়রে বসে, বাতাস করে, শুশ্রূষা করে। বাড়িতে যা কিছু আসে, ঘোষ-গৃহিণী সঙ্গে সঙ্গে ডেকে তাকে খাওয়ায়। এবার সেই মেয়েটি কণ্ঠস্বরের মধ্যে বেশ একটু কাকুতি সঞ্চার ক'রে বললে, ওপরে এক ফোঁটা জল হয় নি বউদি।

তার আমি কি করব ? আমি এর পর রাস্তায় কল ধরতে যাব ? না গঙ্গায় যাব ?

ঘোষ মৃদুস্বরে প্রশ্ন বললে, আমাদের চৌবাচ্চা তো প্রায় ভ'রে গেছে—

ভ'রে গেছে ? যাক ভ'রে, আমার জল আমি ফেলে দোব ? নর্দমায় ঢেলে দোব।

তেতলা থেকে বাড়িওয়ালার গৃহিণী এবার ডেকে বললেন, কলটা একবার বন্ধ ক'রে দাও না মা। অ ঘোষ-বউমা !

ঘোষ-বউমা জ্ব'লে উঠল—বউমা ? কিসের বউমা ? আপনারা বামুন, আমরা কায়েত, বউমা কিসের ? ভাড়া দিই, বাড়িতে থাকি ; তার বউমা কিসের, কলই বা বন্ধ করব কেন ?

এ কথার জবাব বাড়িতে কেউ ভেবে পেলে না। সব চুপ হয়ে গেল।

দোতলার অধ্যাপকের স্ত্রী মৃদু উত্তেজিত স্বরে সমালোচনা করছিল—কি মেয়ে মা ! ছি ! ছি ! ছি ! তাকে মধ্যে মধ্যে জলের কষ্ট ভুগতে হয়, আজও ভুগতে হবে, নীচের কল খোলা থাকলে দোতলাতেও জল ওঠে না। আজ তারও জল হবে না। ছি-ছিকার ক'রেও অধ্যাপক-গৃহিণীর পরিতুষ্টি হ'ল না, একটু থেমে বললে, অনেক ঝগড়াটে

দেখেছি, এমন দেখি নি। আবার বললে, অত্যন্ত ছিঁচকুটে, বদমাইস, বজ্জাত। আবার বললে, পাজী। ছোটলোক।

কথাগুলো ঘোষ-গৃহিণীর শুনতে পাবার কথা নয়, মৃদুস্বরের কথা। কিন্তু ওদিকে তেতলার শূন্যতাহেতু ঘোষ-গৃহিণীর মন তেতলা থেকে দোতলায় নেমে এল ঠিক সেই মুহূর্ত্তে। সে বললে, তেতলায় জল নেই, আমায় কল বন্ধ করতে হবে। এর পর হাঁক আসবে দোতলার। পণ্ডিতলোকেরা, বিদ্বানমানুষেরা সাবান মাখবেন, তিনবার ক'রে চান করবেন; চৌবাচ্চাশুদ্ধ জল হুড়হুড় ক'রে ছেড়ে দেবেন, বাসী জলে চান করলে মাথা ভার হবে, গায়ে হাতে ব্যথা করবে, অসুখ করবে। রোজ টাটকা জল চাই। আমাকে কল বন্ধ করতে হবে। কেন? কিসের জন্যে? বন্ধ করব না কল।

বাইরের দরজার কড়া ন'ড়ে উঠল।

ঘোষ সাড়া দিলে, কে?

ওপাশ থেকে সাড়া এল না, কিন্তু কড়া আবার নড়ল।

এবার গৃহিণী বললে, কে? কে? সাড়া দাও না কেন? উত্তেজনাভরেই সে দরজা খুলে ফেললে। দাঁড়িয়ে ছিল পাশের বাড়ির একটি কিশোরী মেয়ে। সে বললে, মা গঙ্গা নাইতে যাচ্ছেন, আপনাকে বলতে বললেন।

বেশ, বলা হ'ল, এইবার চ'লে যাও।

মেয়েটি অবাক খুব হ'ল না, একটু বিরক্ত হ'ল। বললে, আপনি মাকে বলেছিলেন ডাকতে, তাই—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ঘোষ-গিন্নী বললে, ঘাট মানছি মা, ঘাট মানছি। হ'ল তো? ব'লে সঙ্গে সঙ্গেই দরজাটা তার মুখের ওপরেই বন্ধ ক'রে দিলে। তারপর আলনার কাপড়গুলো অকারণে টেনে নামিয়ে ফেলে, আবার পাট করতে করতে বললে, আমি কানাও নই, খোঁড়াও নই, গঙ্গার পথও না-চেনা নই; আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন!

ঘোষ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। আজ যে শেষ পর্য্যন্ত কি হবে,

সে তা ভেবেই পেলে না। জীবন তাদের অস্বাভাবিকই বটে, কিন্তু আজকের এ অস্বাভাবিকতার মাত্রা উত্তরোত্তর ছাড়িয়ে চলেছে।

কাপড়গুলো আবার গুছিয়ে রেখে উনুনের ওপর ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে দিয়ে গৃহিণী আবার আরম্ভ করলে, বাঁচতে আর একদণ্ড ইচ্ছে নেই। ইচ্ছে হয় না যে, ঘর-সংসার করি। যম ভুলেছে আমাকে। সকালে উঠে যে গঙ্গাস্নানে যাব, তার উপায় নেই।

ব'লে সে তেলের বাটি গামছা কাপড় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ব'লে গেল, দেখো, যেন ভাতটা পুড়ে না যায়। আমার কপাল পুড়িয়ে রেখো না।

* * *

ঘোষ সর্ব্বাগ্রে কলটা বন্ধ ক'রে দিলে। ডাকলে, চাঁপা!

চাঁপা বাড়িওয়ালার মেয়ে। সে সাড়া দিলে, কি?

কল বন্ধ ক'রে দিয়েছি।

দরকার নেই। আমরা নীচের এ পাশের চৌবাচ্চা থেকে জল তুলে নিয়েছি।

কুণ্ঠিত অপরাধীর মত ঘোষ বললে, দোতলায় ব'লে দাও তা হ'লে।

ওঁরাও নিয়েছেন।

ঘোষ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। এ দুর্ভোগ তার সমস্ত জীবন-ব্যাপী দুর্ভোগ। এর আর অন্ত নেই। জীবনে এটা তার সহ্য হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবুও মধ্যে মধ্যে এক-একদিন এমনই দুর্ভোগ আসে, সেদিন সহ্য করা তারও পক্ষে কঠিন হয়। ইচ্ছে হয়—। নিজের আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়। স্ত্রীর মৃত্যু হোক—এই কামনা সেদিন বার বার তার অন্তরে অত্যন্ত অবাধভাবে উঁকি মারে। সমস্ত জীবনটা সে ওরই জন্যে নিয়োজিত করেছে। আত্মীয়স্বজন ছেড়েছে, বাপ-পিতামহের ভিটে, নিজের বাড়ি ছেড়েছে। নতুন বাড়ি করলে তার অন্তে আইন অনুসারে ভাই বা ভাইপো মালিক হবে, সেইজন্যে নগদ টাকা সে ব্যাঙ্কে স্ত্রীর নামেই রেখে দিয়েছে। জীবনে তার বন্ধুবান্ধব পর্য্যন্ত নেই। আপিসে যায়, আপিস থেকে ফিরে সে ওই অপ্রিয়ভাষিণী

বিকৃতমস্তিষ্কার মনোরঞ্জন করে। তবু তার এতটুকু উপশম নেই, তার দিক থেকে এতটুকু মার্জনা নেই, বিবেচনা নেই।

এক-একদিন বেশ থাকে, হাসিমুখে ওঠে; সমগ্র বাড়ির লোকের সঙ্গে হেসে কথা বলে। নিজেই ডেকে প্রশ্ন করে, ও চাঁপা! জল হ'ল ভাই? কল আমি বন্ধ ক'রে দিয়েছি।

দোতলার অধ্যাপকের স্ত্রীকে ডেকে বলে, ও দিদি, আপনার কল খুলে দিন।

তেতলায়, দোতলায় যেখানে হাস্যধ্বনি উঠুক, সে হাসির রেশ কানে আসতেই কারণ না জেনেই সে হাসতে আরম্ভ করে, ডেকে প্রশ্ন করে, ও চাঁপা ভাই! ও দোতলার দিদি! হ'ল কি? হাসছেন কেন?

কেউ প'ড়ে গেলেও মানুষ হাসে, কিন্তু হাসিটা সেখানে সম্পূর্ণরূপে চোখের কৌতুক; কৌতুক হিসাবে অর্থহীন, এমন কি মানুষ প'ড়ে যাওয়ায় হাসাটা হৃদয়হীনতা ব'লেই মনে হয়। ঘোষ-গৃহিণী কিন্তু সেদিন শুনেও, যারা চোখে দেখে হাসে, তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাসে।

সেদিন তাদের নিকটতম প্রতিবেশী, নীচের তলার পাশের দুখানা ঘরের ভাড়াটে তরুণ দম্পতির প্যাঁকাটির মত কাঁদুনে ছেলেটাকেও ডেকে আদর করে।

ছেলেটা অবিরাম কাঁদে। কান্নার কণ্ঠস্বর এত উচ্চ এত কর্কশ যে, শুনে মনে হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ওপর ছেলেটার অভিযোগ, পৃথিবীকে সে অভিশাপ দিচ্ছে। ন্যূনতম সময় এক ঘণ্টার কমে তার কান্না থামে না। বেশি সময়ের পরিমাণ বলতে গেলে, বলা যায় না। পরিমাণ নির্ণয় করবার ধৈর্য বাড়ির কারও হয় নি। তাকেও সেদিন সে আদর ক'রে কান্না থামায়। কিন্তু তেমন দিন জীবনে আসে কদাচিৎ।

কাল তেমনই একটি দিন গিয়েছে। সকাল থেকেই সে বড় ভাল ছিল। অথচ খেটেছিলও প্রচুর। কলকাতার রাস্তায় যে নিরন্ন দলের আবির্ভাব হয়েছে, সকাল থেকে রাত্রি দুপুর পর্যন্ত যারা 'মর ভুখা হুঁ' 'মর ভুখা হুঁ' ব'লে মহানগরীকে ভয়াবহ ক'রে তুলেছে, তাদের কয়জনকে খাওয়াতে সে দ্বিতীয় বার রান্না করেছে রাত্রে। বিকেলে

থিয়েটারে গিয়েছিল, তারই আবদারে একজন প্রতিবেশিনীকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়েছিল। থিয়েটারে গিয়ে এক নতুন বান্ধবী পর্যন্ত জুটে গিয়েছে। সুন্দরী সুশ্রী মেয়েটি এবং তার চঞ্চল শিশুটি সম্বন্ধে সমস্ত পথ এবং সারা রাত্রিটা তার সে কি প্রশংসাময় উচ্ছ্বাস! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার তাদের কথা বলেছে। মেয়েটি প্রথম সন্তানের জননী, সবল দুর্দ্দম শিশুটিকে নিয়ে তার অক্ষমতার কথা বলেছে, আহা! কিই বা বয়েস! পারবে কেন সামলাতে! ছেলেটির দুষ্টুমির কথা বলেছে আর হেসেছে, আমার চুল ধ'রে সে যা টানতে আরম্ভ করেছিল! দেখ না, মাথাটা কি রকম হয়ে গেছে, এ-পাশটা দেখ না। বাবাঃ, ডাকাত ছেলে! কি কাণ্ড!

মা! মা গো! মা! মা! ওমা, চারটে ভাত দেবে মা?

ঘোষের চিন্তায় ছেদ পড়ল। হতভাগা নিরন্নের দল এরই মধ্যে চীৎকার শুরু করেছে।

মা-ঠাকরুণ! বাবা গো! বাবা-ঠাকুর! মা গো! ফ্যান দেবে মা? চারটি ফেন-ভাত? মা গো!

একটা নয়, দুটো। মুখে অন্ন ওঠা দায় হয়ে উঠেছে।

বলি হ্যাঁ রে! সকালবেলায় ভাত কোথায় পাবি, শুনি?—প্রফেসারের ছেলেদের একজন বলছে।

চারটি বাসী ভাত দাও বাবু—রাতের এঁটো-কাঁটা।

এঁটো-কাঁটা নেই। বাসীও নেই। এখন যাও।

কি দেশ হ'ল বাবা! দেশে টেঁকা যে দায় হয়ে উঠল!—তেতলার গৃহিণী বলছে।

তেতলার কর্তা সংস্কৃত স্তোত্র আওড়াচ্ছে। "ত্রাহি দুর্গে। ত্রাহি দুর্গে।" বললে, দুর্গাকে ডাক। দুর্গাকে ডাক। ভীষণ মন্বন্তর। হতভাগারা একবার ভগবানের নাম করে না। ওদের দুর্দ্দশা ঘোচাতে তুমি পার, না আমি পারি? রাস্তায় প'ড়ে মরছে। আজই কাগজ দেখ না—'কলিকাতায় পঁয়ত্রিশ জনের অন্নাভাবে মৃত্যু!'

বাপ রে!—শিউরে উঠল চাঁপা।

তেতলার গৃহিণী ডেকে বললে, এখন যা বাপু, এখন যা।

দোতলার প্রফেসারের স্ত্রী ডেকে বললে, দেখেছেন কজন জুটেছে?

কজন?

পাঁচজন।

মা গো! পাঁচজনকে কি একটা ছুটো গেরস্ত থেকে দেওয়া যায়?

দোতলার গৃহিণীর স্বামী অর্থনীতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নন; গৃহিণী কিন্তু হিসেবে পাকা, বললে, বেয়াল্লিশ টাকা মণ চাল।

দেখ দেখ, আর পাঁচ বাড়ি দেখ। তোদের বিবেচনা নেই বাবা?

গঙ্গায় স্নান ক'রে আগে ঘোষ-গৃহিণী অনেকটা সুস্থ শান্ত হ'ত। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ত, মাথার জ্বালাটা অনেকখানি ক'মে গেছে। একটি নিশ্চিত পারলৌকিক প্রাপ্তি সম্বন্ধে ধ্রুব বিশ্বাস নিয়ে সে বাড়ি ফিরত। গামছার আঁচলে থাকত চাল, কিছু আধলা, সেইগুলি রাস্তায় ভিক্ষুকদের দিয়ে মনে মনে সে ধন্য হয়ে যেত।

আজ কিন্তু গঙ্গাস্নানটাও তার কাছে ব্যর্থ হয়ে গেল।

পথে পা বাড়াবার উপায় নেই, নিশ্বাস নিতে বমি আসে। চারি-পাশে শুধু ময়লা আর নোংরামি। ভিক্ষুকের দল রাস্তার ফুটপাথের ওপরে দিব্য সংসার পেতে বসেছে। রাত্রে ফুটপাতের ওপরে কোন বারান্দার নীচে, কোন কার্নিসের তলায়, কেউবা গঙ্গার ধারের গাছতলায় শুয়ে কাটিয়েছে। সকালে চারিদিক ময়লা মাটিতে ভরিয়ে দিয়ে, মাটির হাঁড়ি, কলাই-করা লোহার থালা, ভাঁড়, ছেঁড়া মাদুর গুটিয়ে বেশ আয়েস ক'রে ব'সে গিয়েছে। ওই ময়লা মাটির জন্যে লজ্জা নেই, ঘৃণাও নেই। প্রতিটি পরিবার অন্যের সঙ্গে পৃথক হয়ে ব'সে আছে।

প্রায় প্রতিদিনই সে এই পথে যায় আসে। কিন্তু কোনদিন এদের দেখে এমন মনে হয় নি। আজ দেখে সে অবাক হয়ে গেল যে, দুঃখটা কান্নাটা অনেকখানি পোশাকী ব্যাপার। লোক দেখলেই সেই পোশাকে সেজে এরা কাতরায়। লোকের দোরে গিয়ে ককিয়ে কেঁদে ভিক্ষা চায়।

নইলে এই তো বেশ রয়েছে। দিব্যি পথের ওপর সংসার পেতে বসেছে।

একজন প্রৌঢ়া কতকগুলি পোড়া বিড়ি সংগ্রহ করেছে; বিড়িগুলি দুভাগে ভাগ ক'রে রাখছে। অপেক্ষাকৃত বড়গুলি স্বতন্ত্র ক'রে দিচ্ছে তার বারো-চৌদ্দ বছরের ছেলেটাকে। হ্যাঁ, ওটা তার ছেলেই, মুখের আদল দেখেই বোঝা যায়। ছোটগুলি দিচ্ছে একটি মেয়েকে; ওরই মেয়ে নিশ্চয়। মেয়েটা পোড়া বিড়ির পাতা খুলে তামাক সংগ্রহ করছে, দোক্তা ক'রে খাবে। প্রৌঢ়া ছেলেটাকে বললে, যা নিকিনি, পানের পাতা ছেঁড়া কুড়িয়ে আন। বোঁটাও আনিস।

ছেলেটা বললে, এক পয়সার পান কিনে আনি কেনে মা?

কিনে আনবি?

হুঁ। কাল তো অনেক ডাবল পয়সা পেলি—আটটা। দে না কেনে একটা।

প্রৌঢ়া সত্যিই দিলে একটা ডবল পয়সা বের ক'রে। বললে, একটু চুন চেয়ে আনিস বাবা।

কালকের ফ্যানটা ডালটা আমি না এলে বের করিস না যেন; দিদি বেশি নিয়ে লেবে। একটা পয়সা থাকবে, ফুলুরি আনব এক পয়সার?

তা আনিস। সব খাস না যেন। দিদিকে একটা দিস।

তোকেও একটা দোব।

দেখে-শুনে ঘোষ-গৃহিণী অবাক হয়ে গেল। মায়ের স্নেহ, ছেলের শ্রদ্ধা, পান খাবার শখ, ফুলুরির লোভ সবই আছে, সবই চলছে। শুধু বাড়ির দোরে গিয়ে কাতরাবে!

এদের প্রতারণার জন্য ঘোষ-গিন্নীর মন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। সমস্ত এদের জোচ্চুরি! কোথায় দুঃখ এদের? হনহন ক'রে সে এগিয়ে চলল।

থাম! থাম! এই হারামজাদা! ওই আঁস্তাকুড়ের ঝাঁটার ধুলো

গায়ে দিবি নাকি? ঘোষ-গৃহিণী প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। একজন পুরুষ ফুটপাথে তার পরিবারের দখলী অংশটুকু একটা আঁস্তাকুড়ের ঝাঁটার মত ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করছে। একজন বুড়ী, বোধ হয় ওই লোকের মা, ঘর গোছগাছ করছে; মাটির খোলাগুলো গঙ্গাজলের কল থেকে ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে এক পাশে রেখেছে, এখন পরিষ্কার করছে একটা রঙলিপ্ত কলাই-করা গামলা। একটি যুবতীর আরামের খুশির আর অন্ত নেই। চিত হয়ে শুয়ে দুই হাতে ছোট একটা শিশুকে বুকের ওপর দাঁড় করিয়ে আমোদ জুড়ে দিয়েছে। ছেলেটার দিকে চেয়ে উলু দিচ্ছে—উলু-লু-লু-লু।

ছেলেটা খিলখিল ক'রে হাসছে।

ঘোষ-গৃহিণীর সর্বাঙ্গ যেন জ্ব'লে গেল। হাসতে এদের লজ্জা করে না! মানুষের পথ জুড়ে সংসার পাতার পারিপাটী দেখে গালে হাত দিতে হয়। পেটে ভাত নেই, তবু মায়ে পোয়ে বউয়ে নাতিতে মিলে হাসির হর্রোড় জুড়ে দিয়েছে! বেহায়াপনার একশেষ!

পথে চলবার উপায় নেই। একটার পর একটা সংসার। এবার শুধু দুটি মেয়ে। নিশ্চয় মা আর মেয়ে। এই সকালবেলাতেই অল্প-বয়সী মেয়েটি বুড়ীর মাথাটা নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে উকুন বাছতে শুরু ক'রে দিয়েছে, বুড়ী চিবুচ্ছে বাসী রুটি।

আর দুটি মেয়েও অল্প দূরে ব'সে রুটি চিবুচ্ছে। তাদের একজন বলছে, আটার রুটিগুলো তুই বেশি খাস নে মাসী, হজম হতি চায় না পেরথম পেরথম। আমরা যখন পেরথম এয়েছিনু, তখন এই আটার রুটি খেয়ে কি যেন হ'ল পেটের মধ্যি—হড়হড়, হড়হড়! মনে হ'ল, পরাণডা বুঝি গেল।

বুড়ী আপনার আধ-খাওয়া রুটিখানা, পিছনের দিকে হাত বাড়িয়ে মেয়েটিকে দিলে, বললে, এডা তবে তুই খেয়ে নে বাসিনী। হাঁ কর, আমি দিয়ে দিই মুখে।

মেয়েটা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

বুড়ী বললে, মরণ, হাসিস ক্যান?

তুই যে গলায় দিচ্ছিস রুটিটা গুঁজে। সুড়সুড়ি লাগে না?

ঘোষ-গিন্নী মনে মনেই বললে, মর, মর, তোরা মর! মরে না হতভাগা হতভাগীরা!

মরেছে। একটু দূর এগিয়ে গিয়েই ঘোষ-গিন্নীর নজরে পড়ল, একটা চার-পাঁচ বছরের ছেলে মরেছে। তার মা কাঁদছে বুক চাপড়ে।

এও বিসদৃশ লাগল তার চোখে। না খেয়ে মরতে বসেছে, পেটের জ্বালায় খাক হয়ে যাচ্ছিস, দিন দিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় মিনিটে মিনিটে। যে মরেছে সে খালাস পেয়েছে। তার জন্যে এত কান্না কেন?

অন্য একটা ভিখিরীর মেয়ে আর দুটো ছেলেকে তার কোলের কাছে দিয়ে বললে, কাঁদিস নে। ও মা মানী, কাঁদিস নে। এ দুটোর পানে চেয়ে দেখ। এ দুটোরে বাঁচা। যেটা গেল ওটা তোর শত্তুর, ওটা তোর ছেল না।

মেয়েটা তবু কাঁদছে বেহায়ার মত। ওরে সোনা রে!

গিন্নী এবার আত্মসম্বরণ করতে পারলে না, ব'লে উঠল, সকালবেলা আর কাঁদিস নি বাপু। 'ভাত' 'ভাত' ক'রে বেরিয়েছিস, পথে প'ড়ে আছিস, তার ওপর পলুপোকার ঝাঁক। একটা গেছে তো তার জন্যে কাঁদে না। আদিখ্যেতা করিস না।

আশপাশের লোকজন স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্রথমটা কারুর মুখে কথা যোগাল না পর্যন্ত। ছেলেটার মা পর্যন্ত অবাক হয়ে তার দিকে চাইলে একবার। ঘোষ-গৃহিণী একরকম ছুটেই এবার চ'লে গেল। গঙ্গার ঘাটে এসে হুড়মুড় ক'রে জলে নেমে পড়ল। জলে নেমে সে বার বার ভাবলে, কিসের জন্যে সে লোকের কথাকে গ্রাহ্য করবে? সে সত্যি কথাই বলেছে। খাঁটি সত্যি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু চোখ মেলে সে ওদের তন্নতন্ন ক'রে দেখেছে।

লোকে পথে চলে—কাজের ঝোঁকে, আনমনে, সংসারের ভাবনায়, চোখ চেয়ে থাকে, কিন্তু দেখতে পায় না, দেখে না; যতটুকু এদের দিকে তাকায়, তাতে দেখে, ওরা পথে প'ড়ে আছে, ওদের ছেঁড়া ময়লা কাপড়,

ওদের হাতের মাটির হাঁড়ি; কানে শোনে কেবল ওদের ভিক্ষে চাওয়ার কাতরানি। মনে ভাবে, কত দুঃখ, কত কষ্ট!

সে যে আজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে এল, শুনে এল ওদের ভেতরটা, ওদের অন্তরের আসল কথা! দুঃখ! কষ্ট! সব ধাপ্পাবাজি।

ফেরবার সময় তবুও সে ঘোমটা দিলে এক বুক। অনুমান তার মিথ্যে নয়। মরা ছেলেটা এবং তার মাকে ঘিরে বেশ একটি জনতা জ'মে গিয়েছে। উত্তেজিত কণ্ঠে আলোচনা হচ্ছে তারই কথা। গাল দিচ্ছে তাকে। আর পয়সাও দিচ্ছে। পয়সা বাজারে নেই, ডবল পয়সা—তার মধ্যে আনি, দোয়ানি; সিকি, আধুলি; টাকাও দিয়েছে দুজন—মেয়েটা হাতে ধ'রে রয়েছে দুখানা এক টাকার নোট।

তাকে গাল দিচ্ছে, হারামজাদা মাগীর নরকেও ঠাঁই হবে না।

সাত জন্ম ওর ছেলে হবে না।

ভগবান যদি থাকে, এ জন্মেই ফলবে; এ জন্মে যেগুলো হয়েছে, সেগুলোও থাকবে না।

বাড়িতে ফিরেও কি শান্তি আছে? আপিসের ভাত আর আপিসের ভাত! মানুষের শরীরের ভাল-মন্দ নেই, সুখ-অসুখ নেই, উনুনের গনগনে কয়লার আঁচের সামনে দাঁড়িয়ে ভোর থেকে পুড়তেই হবে। আপিস! সাড়ে আটটায় দাও ভাত, আন ভাত!

ঘোষ বললে, আমি নামাচ্ছি ভাতের হাঁড়ি। তুমি বরং—

স্ত্রী চীৎকার ক'রে উঠল, না না না।

সস্নেহ কণ্ঠে ঘোষ বললে, ছি! এমন ধারা করে না। তোমার শরীর ভাল নেই—

না না না। আমি মাথা-মুড় খুঁড়ব ব'লে দিচ্ছি।

তীক্ষ্ণ তীব্র উচ্চ কণ্ঠস্বর, আশপাশের বাড়িগুলোর দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে আকাশের দিকে উঠতে লাগল। ঘোষ সভয়ে পিছিয়ে এল। আশপাশের বাড়ির মেয়েদের কাছে ঘোষ-গিন্নীর চীৎকার প্রায় নৈমিত্তিক ব্যাপার; কিন্তু আজকের চীৎকার নৈমিত্তিকতার মাত্রাকে

ছাড়িয়ে গিয়েছে ; মনে হচ্ছে, বাড়ির ছাদ ছাড়িয়ে আকাশের দিকে ক্রমাগতই ওপরে উঠছে, ওই যে বহু ঊর্দ্ধলোকে চিলগুলো উড়ছে—কালো কালো বিন্দুর মত, ওই চিলগুলোও যেন চকিত হয়ে উঠল ; ঘোষ-গিন্নীর চীৎকার ওদেরও অতিক্রম ক'রে ওপরে উঠছে পুরাকালের বাণের মত। এজন্য তারা আজ কৌতূহলী হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

বাড়িওয়ালার স্ত্রী এসেছিল নীচে। সে দুঃখিত হ'ল ঘোষের জন্য। ঘোষ তাকে 'মা' বলে। ঘোষের স্ত্রীর জন্যও সে বেদনা অনুভব করলে। সস্নেহ কণ্ঠে সে ডেকে বললে, আমি চাঁপাকে ডেকে দিচ্ছি বউমা। তোমার শরীর খারাপ—

তাতে আপনার কি ?—সে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ফেন গড়াতে লাগল।

বাড়িওয়ালার স্ত্রী অবাক হয়ে গেল। শুধু সে একা নয়, চারিদিকে সমবেত প্রতিবেশিনীরাও অবাক হয়ে গেল।

চাঁপার কাজ আমি নোব কেন ? সে আমার কে ?—এবার সে উনুনের ওপর কড়া চড়িয়ে দিলে।

মাস পোয়ালেই পাঁচ দিনের দিন আমি ভাড়া পৌঁছে দিই। একদিন কি, এক ঘণ্টা, এক মিনিট দেরি হয় না।—বড় বড় কয়েকখানা বেগুন-ফালি সে কড়াতে ছেড়ে দিলে। বঁটি টেনে নিয়ে কয়েকটা পটল কুটে ফেললে।

বাড়িওয়ালার স্ত্রী এবার উত্তপ্ত হইয়েই বললে, আমি যা বলেছি, তার কি এই জবাব বউমা ?

ঘোষ সন্তর্পণে স্ত্রীকে আড়াল দিয়ে হাত-জোড় করলে। কিন্তু বাড়িওয়ালার স্ত্রী শান্ত হ'ল না।

ঘোষ-গিন্নী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, নিশ্চয়। কিসের খাতির ? কেন খাতির করব ? ওই রকম খোজখবর মায়া-ছেদ্দায় আমার দরকার নেই।—বেগুনভাজা শেষ ক'রে সে পটলগুলি কড়ায় ছেড়ে দিলে।

ঘোষ এবার বললে, ছি ! কি করছ ? কি বলছ ?

কেন ছি ? কিসের ছি ? মায়া-ছেদ্দাতে তো আমি ম'লে

গেলুম। আপনাদের খেয়াল-খুশিমত এসে চাঁপা বলবে, মাথা ধরেছে বউদি? উনি একদিন এসে বলবেন, শরীর খারাপ, চাঁপাকে পাঠিয়ে দোব বউমা? ও ছেন্দায় কি দরকার আমার? ঝাড়ু মারি এমন ছেন্দার মুখে।

এবার বাড়িওয়ালার স্ত্রী রাগে ফেটে পড়ল, মুখ সামলে কথা ব'লো বাছা।

ঘোষের স্ত্রী মাছের ঝোল চড়াবার আয়োজন করছিল। সে উঠে দাঁড়াল, বললে, কেন, মারবেন নাকি? না, বাড়ি থেকে বের ক'রে দেবেন? দিন দেখি? আপনার তো লোকবলের অভাব নেই। আপনার ছেলেরা, দোতলার সুয়ো ভাড়াটের ছেলেরা সবাইকে আসুন জুটিয়ে, দেখি।

দোতলার অধ্যাপকের গৃহিণী বারান্দায় বুক দিয়ে ঝুঁকে সমস্ত শুনছিল। মুখের ভাবে ফুটে উঠছিল বিস্ময়ের পর বিস্ময়। সে এবার রেগে, খোঁচা-খাওয়া সাপের মত ফণা তুলে ফোঁস ক'রে উঠল, আমায় কেন জড়াচ্ছেন আপনি? ওঁর সঙ্গে হচ্ছে, যা হয় ওঁকে বলুন। আমি কি করলাম আপনার? আপনাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি।

সাবধান! কার সাধ্যি আমাকে সাবধান করে? কার কিসের ধার ধারি আমি? ভাঁড়ারের হাঁড়ি থেকে ঘোষ-গিন্নী বের করলে মুগের ডাল। কুলুঙ্গি থেকে নামালে স্টোভটা। ঘোষ নির্ব্বাক নিস্পন্দ হয়ে ব'সে আছে; মুখে ধ'রে আছে নিবে-যাওয়া বিড়িটা; এক হাতে ধ'রে আছে দেশলাই, অপর হাতে একটা কাঠি।

আমিই বা কি ধার ধারি আপনার? আমায় কেন বলবেন আপনি?

সত্যি কথা বলছি আমি। আমি কাউকে ভয় করি না। আপনারা সুয়ো ভাড়াটে। তেতলা থেকে এ-দিদি নেমে আসছেন, অ দিদি, সকাল থেকে যান নি কেন? সাড়া পাচ্ছি না কেন? দোতলা থেকে ও-দিদি তেতলায় উঠছেন, অ দিদি, রাগ করেছেন নাকি? দেখা নেই যে? স্টোভটা ধরিয়ে ফেলে ঝোলের কড়াটা স্টোভের ওপর চাপিয়ে দিয়ে উনুনে সে মুগের ডাল চড়িয়ে দিলে।

আমিও ধান-চালের ভাত খাই। আমারও চোখ আছে। কালাও নই আমি। সবই দেখতে পাই, সবই শুনতে পাই। আমি সত্যি কথা বলব। আমি কাউকে ভয় করি না। মানুষ দূরের কথা, যমকে ভয় করি না আমি। আসুক যম আমার সামনে, তাকে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে ঠিক এমনই ক'রে বলব। খানিকটা আমসত্ব বের ক'রে দুধ দিয়ে সেটা সে মাখতে লাগল এবং ব'কেই চলল।

এবার বাড়িওয়ালার গৃহিণী ওপরে উঠে গেল। দোতলার অধ্যাপকের স্ত্রীও চুপ ক'রে গেল। তারা পরাজয় তো মেনেছেই, উপরন্তু ভয়ও পেয়েছে। যমকে যে ভয় করে না, তাকে ভয় না ক'রে উপায় কি? যমকেই যে তাদের যথেষ্ট ভয়।

ঘোষ-গৃহিণী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাত ধুয়ে ফেললে। ঘোষকে তেল দেবে, গামছা দেবে, কাপড় বের করবে, জামা দেবে। চারিদিকে তাকিয়ে সে আরম্ভ করলে, দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন সব। এদের মত এমন ভাল আর দুনিয়াতে হয় না। কেউ ছেলের কাঁথা, কেউ ছেলের কাপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন কাঁথা তুলছেন, কাপড় মেলে দিচ্ছেন। কেউ কিচ্ছু জানেন না।

সঙ্গে সঙ্গে সকল বাড়ির বারান্দা শূন্য হয়ে গেল। সকলেই সুটসুট ক'রে যে যার ঘরের মধ্যে অন্তর্হিত হ'ল।

ঘোষ-গিন্নী ব'কেই চলল। ঘোষ আশ্বস্ত হ'ল, এবার ও চুপ করবে। চুপ না করলেও সমস্ত তারই ওপর বর্ষিত হবে। কিন্তু বিধাতা বোধ হয় বিরূপ। বাইরের দরজায় একটা ছেলে অত্যন্ত কাতর স্বরে ডাকলে, মা গো! মা! ও মা! মা! মা গো!

কে র‍্যা? কে? কে তুই?

চারটি খেতে দাও মা। চারটি ভাত দাও।

আবার ঘোষ-গিন্নী চীৎকার ক'রে উঠল, বেরো বেরো বেরো, জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী! বেরো।

ছেলেটাও নাছোড়-বান্দা, সেও সমানে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, ম'রে গেলাম গো, জ্ব'লে গেল গো, ওগো মা গো!

এই হারামজাদা, বদমাস, সয়তান! বেরো বলছি, বেরো!

চারডি ফ্যানভাত খাও মা! আমি ম'রে গেলাম গো!

যা যা, তাই ম'রে যা। মরণ যদি না হয় গলায় দড়ি দিগে যা। গঙ্গায় ডুবে মরগে যা।

ছেলেটা কাতর স্বরে কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলে। ওরে মা রে! ওরে বাবা রে!

সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠে কে ডেকে উঠল, মা গো, চারডি ফ্যানভাত খাও মা! কচি ছেলেডার মুখের দিকে তাকাও মা! মা গো!

ঘোষ-গিন্নী ক্ষেপে গেল। পুলিস ডাকব আমি। পুলিস ডাকব। বেরো বলছি, বেরো, নইলে পুলিস ডাকব আমি।

মেয়েটা সভয়েই চ'লে যাচ্ছিল, ছেলেটাও যাচ্ছিল, কিন্তু সে তখনও তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল, জ্ব'লে গেল, মা গো! ওগো মা গো!

যাস না, এই ছেলে, এই মেয়ে, যাস না, দাঁড়া। এই!

তেতলা থেকে ডাকছে তেতলার গৃহিণী। দোতলা থেকে ডাকছে অধ্যাপকের স্ত্রী।

মেয়েটা সভয়ে বললে, পুলিসে দেবে বলছে মা।

ব'স ওইখানে। দেখি আমি, কে পুলিসে দেয়!

তারস্বরে ছেলেটা চেঁচিয়ে বললে, ওগো মা গো!

এমন ক'রে চেঁচাচ্ছিস কেন?

পাঁচড়া হয়েছে মা! জ্ব'লে গেল মা!

ঘোষ-গিন্নী বললে, পাঁচড়ার জ্বালা খেলে বুঝি থামে! খবরদার বলছি, চেঁচাস নি।

বাড়িওয়ালার স্ত্রী ডেকে বললে, এই দিকে এসে ব'স। এই দিকের দরজায়। ওটায় নয়। হ্যাঁ, ব'স। সে দেখিয়ে দিলে নিজেদের দরজা।

প্রফেসরের স্ত্রী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, আহা-হা! ম'রে যাই রে! দেখলে বুক ফেটে যায়। ব'স মা, ব'স বাবা, ব'স।

ওরে চাঁপা, যা, দিয়ে আয় ভাত। একটা পুরো থালা ভাত তরকারি

রীতিমত অতিথি-সংকারের আয়োজন সাজিয়ে মা মেয়ের হাতে তুলে দিলে।

ছেলেটার জন্যে দিলে দুখানা রুটি। বললে, পাঁচড়া হয়েছে, ভাত খেলে বাড়বে।

দোতলার প্রফেসার-গিন্নী নিজেই সাজালে থালায় ভাত। ছেলেটার জন্যে দিলে একখানা পাঁউরুটি।

ঘোষ-গৃহিণী তখনও বকছে, কিন্তু ওপরের এদের এই সকরুণ বদান্যতায় হঠাৎ সে যেন কেমন হ'য়ে গেছে। তার কাছে পরাস্ত হয়ে যেমন ওরা চুপ করেছিল, ঘোষ-গিন্নীও এবার তেমনই যেন পরাস্ত হয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে, এমন নিষ্ঠুর তিরস্কার তারা তাকে করেছে, যার উত্তর তার জানা নেই। তার মুখের ওপর তারা চাবুক মেরেছে। জিভ যেন কেটে গিয়েছে।

শুধু দোতলা তেতলা নয়, আশপাশের বাড়িগুলি থেকেও আসছে খাদ্য; নিরন্নদের অন্ন, উচ্ছিষ্ট এঁটো-কাঁটা নয়, নিজেদের অন্নব্যঞ্জনের ভাগ।

ছোঁড়াটার পাঁচড়ার জ্বালার চীৎকার থেমে গেছে। সে রুটি চিবুচ্ছে। মেয়েটা ভাত-তরকারি নিয়েছে নিজের হাঁড়িটা ভ'রে। একটা ছোট ভাঁড়ে কেউ খানিকটা দুধও দিয়েছে, একটা ঝিনুকের খোলা দিয়ে ছেলেটাকে সে দুধ খাওয়াচ্ছে। আরও কয়েকজন এসে জুটে গেছে। তারাও খাচ্ছে। দাতাদের আশীর্বাদ করছে।

ঘোষ আপনার ঘরে খেতে বসেছে। খাবারের থালার সামনে ব'সে সে লজ্জিত হ'ল। কিন্তু সে কথা সে বলতে পারলে না। আয়োজন বিচিত্র এবং প্রচুর—ভাত, মুগের ডাল, বেগুনভাজা, পটলভাজা, মাছের ঝাল, বাড়িতে পাতা দই, আমসত্ব। সাধারণত সে খেয়ে যায়—ভাত, ডাল, ভাজা অথবা ভাতে, মাছের ঝোল; দইটা থাকেই। তার স্ত্রীকে সে বুঝতে পারে না। শরীর-খারাপ নিয়ে এত আয়োজনের কি প্রয়োজন ছিল? আর দরিদ্র নিরন্নদের নিষ্ঠুরতম কটু কথা বলার পর এত আয়োজন তার মুখে রুচবেই বা কি ক'রে?

তবু সে বললে, এত কেন করলে? কি দরকার ছিল?

স্ত্রী স্বামীর চাদরখানা নিয়ে কুঁচিয়ে পরিপাটী ক'রে তুলছিল। সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসবারও যেন চেষ্টা করছিল। ওই কথাতেই তার আবার কি হয়ে গেল, ব'লে উঠল, আমি জানি, আমার সেবাযত্ন তোমার ভাল লাগে না, আমি রাঁধতে জানি না। তোমার ভাই, ভাজ, ভাইপো, ভাইঝি যে যত্ন করে, সে আমি পারি না।

সেই কথাই চলতে লাগল। ঘোষ নীরবে খেয়ে উঠে গেল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘোষ-গৃহিণীর মনে হ'ল, এতক্ষণে কাজ শেষ হ'ল, সে বাঁচল। বিছানায় সে শুয়ে পড়ল।

ওপরে—দোতলায়-তেতলায় কোলাহল উঠছে, হাসছে। নানা কথার মধ্যে একটি কথাই বার বার উঠছে, "দানের তুল্য ধর্ম্ম নেই। দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান অন্নদান! ভগবান, এই মতি যেন চিরদিন দিও'।"

ঘোষ-গিন্নী মুখ বাঁকালে। বাইরে এখনও ভিখারীরা কাতরভাবে 'ভাত' 'ভাত' ক'রে কেঁদে ফিরছে। তার ঘরে আজ অনেক উচ্ছিষ্ট। কিন্তু সে দেবে না, কিছুতেই না। ঘুম কিন্তু কিছুতেই আসছে না। মাথা এখনও জ্বলছে। সে উঠল, মাথায় জল দিলে, ঘুরে ঘুরে বেড়ালে সঙ্কীর্ণ অপরিসর বারান্দায়, এ-ঘরে ও-ঘরে। বাক্স খুললে, গয়নাগুলো মেলালে, বন্ধ করলে। আবার শুল।

উঃ! মাত্র এই সাড়ে বারোটা! ও-বাড়িতে এইমাত্র রেডিও বেজে উঠল। ওই এক জ্বালা! কানের কাছে ঘ্যান—ঘ্যান। সে জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলে। কিন্তু তবু ঘুম এল না। আবার সে জানলা খুলে দিলে। রেডিওটা বাজছে। বাজুক। মাথা তার এখনও জ্বলছে। কাল সেই রাত্রি থেকে জ্বলছে, তার সেই পাগলা মাথা-ধরা উঠবে। সেই যে কাল রাত্রে নবপরিচিতা মেয়েটির অশান্ত ডাকাত ছেলেটা মাথার চুল ধ'রে টেনেছে, তখন থেকেই এ দিকটায় বেদনা হয়েছে, বেদনাটা বেড়েছে। এইখান থেকেই বেদনাটা আজ সমস্ত

মাথায় ছড়িয়ে পড়ছে। অসহ্য বেদনা। রগের শিরা ছিঁড়ে যাচ্ছে। দুনিয়া ভেঙো কি কম যন্ত্রণায় হয়!

হঠাৎ মনে পড়ল তার মৃত মা-বাপকে। দশ বৎসর আগে তারা মারা গেছে।

তাদের জন্তেই সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদায়ের আগে

করিও না অন্ধকার দিনান্তের তীরে
মম জীবনের পট ; মরণের হাসি
যেন পূর্ণ করি রাখে তারে ঘিরে ঘিরে
সৌন্দর্য্যের রস দিয়ে, দিয়ে দীপ্তিরাশি।
অনিত্যের ছন্দে ভরা মর্ত্ত্য-পানশালে
নিত্যতার ছন্দে বেঁধে নেব বীণা-তার,
সেই দুরাশায় নাহি রহি কোনো কালে,
অনিত্যেরি রসে ভরো পাত্র বার বার।
চিরতরে রেখো নাকো ভেঙে পাত্রখানি,—
রেখো নাকো বক্ষে মোর, মোর চিরতৃষা,
বেদনায় মোর দাও কিছু সীমা টানি
বিষে মোর দাও রস, কিছু সুধা-মিশা।
রিক্তচিত্তে মোর দিও বিদায়ের আগে
কিছু প্রেম, কিছু দয়া, সত্য অনুরাগে।

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

হিংসাবেদ

কে করে হিংসার নিন্দা? অগ্রাহ্য সে কথা।
প্রত্যক্ষ করিয়া পাঠ বিশ্বের বার্ত্তা
হিংসারই প্রতিষ্ঠা দেখি শ্রেষ্ঠ সর্ব্বকালে,—
হিংসার বিজয়মালা কালের কপালে!

দেবতা—যে নিত্য-পূজ্য সর্ব্ব মানবের,
দৈত্যসাথে হিংসাসূত্রে বাঁধা সে বিশ্বের;
কি কাজ অন্যের কথা? লক্ষ্মী আর বাণী,
পরস্পরে কি সম্বন্ধ—কে না তাহা জানি?

ঈশ্বর ঈশ্বর কিসে? শক্তিমদে মাতি
ফুৎকারে নিবায় যে-বা জীবনের বাতি
নির্জ্জিতের ঘরে ঘরে, তারই জয়ধ্বনি
কোটি নির্য্যাতিত-কণ্ঠে কাঁপায় ধরণী

হিংসার উদাত্ত মন্ত্রে বৃহৎ মহৎ,
তাই 'ধর্ম্মান্ধ' নামে উন্মত্ত জগৎ!
সৃষ্টিজয়ী ধর্ম্ম তার; দিবসের আলো
রাত্রির হিংসায় সেও হয়ে ওঠে কালো!

দুর্ব্বলের নাহি স্থান হিংসার সভায়,
বীর্য্যবান্ হিংসা তাই সিংহ-নাম পায়!
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা নিত্যযুগ ধ'রে
বিশ্বখ্যাত,—জন্ম তার হিংসারই অন্তরে!

একের হত্যায় যে-বা ঘৃণ্য নরঘাতী,
লক্ষ নরমেধে সেই লভে বীরখ্যাতি

জগৎবরেণ্যরূপে দেশে দেশান্তরে,—
শূদ্রত্ব দ্বিজত্ব পায় বৃহত্ত্বের বরে !

কোথা খ্রীষ্ট ? কে সে বুদ্ধ ? আছে বটে নাম
সঞ্চিত ধর্ম্মের গ্রন্থে, লভিতে বিশ্রাম
বঞ্চিতের শাস্ত্রে আর অক্ষমের দলে
বহিতে লাঞ্ছিত ভাগ্য হিংসাবেদীতলে !

খ্রীষ্ট ছাড়া কে খ্রীষ্টান—ক্রুসে মৃত্যু যার ?
বাকি সব ভিন্নধর্ম্মী রুদ্র-অবতার !
চৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম লুপ্ত সে লজ্জায়,
জাপানের বুদ্ধ-পূজা যুদ্ধের সজ্জায় !

এক হস্তে শাস্ত্র আর অন্য হস্তে অসি—
মহম্মদ আজও মুখে মাখেন নি মসী !
ভারতবিজয়ী আর্য্য—ভুলি ইতিহাস
অহিংসার মন্ত্রে টানে শেষ নাভিশ্বাস !

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে দেখে না সে চাহি,
ভগবানকণ্ঠে যেথা পাঞ্চজন্য বাহি
উঠিল হিংসার জয় মহৈশ্বর্য্যময়—
অপরূপ হিংসাবেদ দৃপ্ত বরাভয় !

কে সে ভীষ্ম, কে সে দ্রোণ, কে বা কর্ণ বীর ?
হিংসা-পরিচয়ে তারা বিদিত পৃথ্বীর !
নাহি পাপ হিংসাধর্ম্মে—কর শত্রুক্ষয়,
কহে কৃষ্ণ, ত্যজ ক্লৈব্য পার্থ ধনঞ্জয় !

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

পরিবর্ত্তন (দেবতাবদল)

[পূর্ব্বস্মৃতি, গদ্যচ্ছন্দে]

উনবিংশ শতাব্দীর আশির কোঠায় তখন পৌঁছে গেছি। তার অব্যবহিত পূর্ব্বে "প্রিন্স অব ওয়েল্‌স" (পরবর্ত্তী সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড) ভারতে পদার্পণ করেন। সে-কারণ ইন্দ্রপ্রস্থে মহাসমারোহে বিস্মৃত রাজসূয়ের পুনরাভিনয় হয়। তিনি প্রভূত পূজা-সম্মান লাভ ক'রে রাজা-রাজড়া ও ভাগ্যবানদের সেবায় তুষ্ট হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। ভারত যথাসাধ্য কর্ত্তব্য-পালনে ত্রুটি করে নি। সকলেই দিয়ে খুশি। তাঁরা ত্যাগধর্ম্ম পালন ক'রে কৃতার্থ হয়েছেন।

আমাদের বাংলা দেশ, রাজারাজড়া না হ'লেও, অদেয় কিছু রাখে নি। তার জোড়া কোন্ দেশ বা প্রদেশ ছিল, তা জানি না। সে তার আগেই জাত দিয়েছে, ধাত দিয়েছে, 'বাস্তু' দিয়েছে। ইংরেজকে দেবতা ব'লে নিয়েছে, প্রসাদ পেয়েছে। নিজের স্বভাব, আচার-অনুষ্ঠানাদি (ধাতের জিনিস) ছেড়েছে। বাপের ভাষা বদলেছে। পত্র-ব্যবহারে বাপকে মাই ডিয়ার ফাদার লিখেছে, স্ত্রীকে ওয়াইফ ব'লে আনন্দ পেতে শিখেছে। কারুকর্ম্মে গেটের মাথায় ওয়েলকাম লিখেছে, আশেপাশে গড সেভ দি কুইন, লং লীভ দি কুইন দুধার উজ্জ্বল করেছে। সাহেবের অনুচর চাপরাসীকে সাব্ বলেছে, চেয়ারও দিয়েছে। পাইপ দাঁতে চেপে চিবিয়ে কথা কইতে অভ্যাস করেছে। কুকুরের মুখে চুমো খেয়েছে, তাকে শেকহ্যাণ্ড করতে তালিম দিয়েছে। ভদ্র-সভায় রুমালে থুতু ফেলে বুক-পকেটে রেখেছে। বাপের শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিতদের লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টল্‌মেন ব'লে গাত্রোত্থান করতে আহ্বান করেছে, আবশ্যকে অনাবশ্যকে বেগ ইওর পার্‌ডন বলেছে। কটা বলব, সব কি আজ মনে আছে! জুতো শহর থেকে সাইড-স্প্রিং জুতো প'রে এসে আমাদের অভিভূত করেছে। এমন চুল ছেঁটে এসেছে, চেনা যায় না। বলে, রুমালখানা আস্তিনে গুঁজতে জানিস না, কি রে? নটবর আড়াই টাকা দিয়ে নাপিতকে ঘাড়ছাঁটা ক্লিপার কিনে দিয়েছে। ইভলিউশন কথাটার অর্থবোধের আগেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছে।

মদ্যপানটা শিক্ষাগুরু ডিরোজিও সাহেবের কল্যাণে অনেকেরই সহজ হয়েছে, বেড়েছে—সভ্যতার অঙ্গরূপেই।' তার আগে জমিদারদের ছেলেদের মধ্যেই ছিল। কি কহব আনন্দ ওর!

কই, কোন্ প্রদেশের কজন তখন তা পেরেছিলেন? আমরা ছিলাম সমাজকর্ত্তাদের অনুগত শহরতলীর লোক। তাঁদের ধারণা ও আদেশমত সংসারের ভাঙাগড়া চলত। তাঁরা সাহেবদের নরনারায়ণ ব'লে চিনেছিলেন—সে কথা দেবতাবরণের উদ্যোগপর্ব্বে একটু বলেছি। বিস্তারিত শুনলে আজকালের তরুণেরা আমাদের ঘৃণ্যজীব ব'লে মুখ ফেরাবে। ট্রেটার বলতেও পারে।

সেই আমরা। আজ নববিধানের আওতে প'ড়ে ধান ভানছি, যাক।

তখন নাকি বিলেত থেকে বড় ঘরের বা বনেদী ঘরের ছেলেরা নব অধিকার পাকা করতে আসতেন, তাঁদের কথাবার্ত্তা, ব্যবহার মোলায়েম ও মিষ্ট ছিল, বেছেগুছে মিশতেন, আবশ্যকে অবাধেও। দু-একটা বলি—

জেলার ম্যাজিস্ট্রেটরা মধ্যে মধ্যে গ্রাম পরিদর্শনে আসতেন। ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ করতেন, অসুবিধাদির কথা জিজ্ঞাসা করতেন, সুখ-দুঃখের কথা শুনতেন।

এর বেশি আর কি চাই, এই তো রামরাজ্য। তার ওপর ইংরিজীর একার ওকার জানা বেকার ছেলেদের কেরানী ক'রে নিতেন, সে কথা উদ্যোগপর্ব্বেই বলেছি। তাই কর্ত্তারা তাঁদের দেবতা না ঠাউরে পারেন নি।

সম্ভ্রান্ত বাঙালী বাবুদের নৌকো গড়িয়ে বাচ-খেলার প্রতিযোগিতা প্রবল ছিল। তাতে সাহেবদেরও আহ্বান থাকত, তাঁরা বাচ দেখতে আসতেন, জলযোগের ব্যবস্থাও থাকত।

ট্রাঙ্ক রোডের দুধারে বড়লোকদের প্রমোদ-উদ্যানাদি থাকত, এখনও আছে (মাড়োয়ারীদের দখলেই অধিকাংশ)। শনিবার শনিবার উদ্যান হেসে উঠত—মাছধরা, নাচগান, মদ্যপান চলত। ছোট সাহেবরাও জয়েন করতেন।

বড়লোকেরা ও বড় চাকুরেরা পূজা বা বিবাহাদি উৎসবে সাহেবদের নিমন্ত্রণ করতেন। তাঁরাও সস্ত্রীক আসতেন। যাত্রা, বাইনাচ থাকত, খানার ব্যবস্থাও থাকত।

এইরূপ মেলামেশায় প্রীতি সদ্ভাব স্বতই বাড়ত। কর্ত্তারা ছিলেন সেকেলে সাদাসিধে লোক, গল্প-গুজুক, হাসি-তামাসা আর তাস-পাশা নিয়ে দিন কাটত বা বয়স কাটত। বড় কাজের মধ্যে পঞ্চায়েৎ, দলাদলি, একটা কিছু রাখতেই হ'ত, নচেৎ অনাবশ্যক হয়ে পড়তে হয়। রাজনীতির গোলোক-ধাঁধায় কোনও দিন তাঁরা গলা বাড়ান নি, বলতেন, ওসব রাজাদের কাজ, আমরা ও বুঝতে চাই না—আদার ব্যাপারী। ছেলেদের চাকরি দিয়ে অন্নের উপায় ক'রে দিচ্ছে, আবার কি মাথায় ক'রে নাচবে নাকি? পরগণায় পরগণায় এজলাস, চুরি-ডাকাতি, অন্যায় অত্যাচার, জমিদারদের জুলুম ক'মে গেছে। চাষী মজুর, ভদ্র অভদ্র সকলেই খুশি। হাঁ, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তফাত খানিকটা থাকা উচিত ছিল বটে। একটু সা'বে মিলে-মিশে থাকলে তাও হবে। ওরা অবুঝ নয়, ইত্যাদি। তাঁদের যেমন চলছে, চললেই হ'ল। দৈবেতে কানে দিয়ে ধর্ম্মরক্ষার ব্যাঘাত না হয়।

সেটা ছিল কেশববাবুর উঠতি সময়। পূর্ব্ব থেকেই তাঁর অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, শক্তি ও যুক্তি যে প্রবল আলোড়ন এনেছিল, তার সংঘাতে অনেকেই মুগ্ধ ও বিচলিত হয়েছিলেন। সেটাও ভেতরে ভেতরে তার প্রভাব বিস্তার করছিল ও ক্ষেত্র প্রস্তুতে সাহায্য করছিল।

তখন 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক দেখা দিয়েছে। গ্রামেও আসে, কেউ কেউ চশমা চোখে দিয়ে পড়েন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাটা বাহবা পায়। দেশের অন্যান্য কথা দেখেন না। পাবনায় কি হয়েছে, সে ভাবনা রাখেন না। কেউ বললে বিশ্বাস করেন না, বলেন, চোখ কান খুলে নিজেরা দেখ শোন না কেন? অর্থাৎ তাঁরা সব দেখে ব'সে আছেন।

গ্রামের ভট্টচাষ্যিপাড়ার জমিতে আঁব-কাঁঠালের সময় গাছের গোড়ায় কাঁটার বেড়া দেওয়া ছিল। গ্রাম পরিদর্শনে এসে ম্যাজিস্ট্রেট

সাহেব দেখে প্রশ্ন করেন, এ কুদৃশ্য জঞ্জাল কেন? তলা বেশ পরিষ্কার থাকা উচিত। শোনেন, সাবধান না হ'লে চোরের উৎপাতে যে একটি ফলও পাওয়া যায় না সাব্। সঙ্গে থানার ছোট দারোগা ও কনস্টেবল ছিল, তাদের দিকে রোষ-কটাক্ষ হেনে বলেন, তোমরা কি করতে আছ? তোমাদেরই সামনে আমার এলাকার এই নিন্দে আমাকে শুনতে হ'ল? এসব জঞ্জাল এখনই খুলে ফেলে দাও। চোরের উৎপাতের কথা আর যেন আমাকে শুনতে না হয়। এই অভয়বাণী শুনে সকলে কতটা তুষ্ট হয়েছিল, সেটা লেখবার অপেক্ষা রাখে না।

এমন কত আছে। আর একটি মাত্র বলি। দক্ষিণেশ্বরে তখন একটি বারুদের গুদাম ছিল। সেপাই-শান্ত্রী ছাড়া সামরিক বিভাগের একজন ইংরেজ তার চার্জ্জে থাকতেন। সেবার যিনি এসেছিলেন, তাঁর স্ত্রীপুত্রাদিও সঙ্গে ছিলেন।

আমাদের বয়স তখন বোধ হয় নয় বৎসর। হরি চট্টো ছিল আমার পড়ার সাথী, অন্তরঙ্গ, এক পাড়ায় থাকি। সাহেবটির ছেলে বাবির ভয়ে গঙ্গাতীরে যাবার পথ প্রায় ছাড়তে হয়েছিল। একটা রাংচিত্তিরের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে রাস্তায় বেড়াত, পথচারীরা তার এক-আধ ঘা পেতেন। মেয়েদের গঙ্গাজল আনতে যাওয়া বন্ধ। কথাটার কানাঘুষা চলছিল। কর্ত্তারা শুনে বলেন, ছেলেরা সব দেশেই অমন ক'রে থাকে, আমাদের গ্রামে এসেছে, তোমরা যেন কিছু ব'লো না। ভট্‌চাযিয়-পাড়া ঘুরে মেয়েরা জেলে-পাড়ার ঘাটে স্নানে যেতে পারে। অর্থাৎ মাইলটাক ঘুরে অপরিচিত পথে মেয়েরা যাবে।

সেদিন হরি চাট্টার পিঠে বেশ সজোরেই এক ঘা পড়ে, তার প্রমাণও ফুটে বেরোয়। হরির বাপ কর্ত্তাদের আড্ডার লোক ছিলেন না, জজের স্কুলে পড়া লোক, পঁচিশ টাকা পেনশন পেতেন, চেম্বার্স মিস্‌লেনি আর যোগবাশিষ্ঠ প'ড়ে সময় কাটাতেন। রাগী লোক, অন্যায় সইতে পারতেন না। চুপড়ি হাতে কি আনতে বাজারে যাচ্ছিলেন— খালি পা, খালি গা। হরির মায়ের কাছে হরির অবস্থা শুনে বললেন, সে কোথায়? হরি চোখের জল মুছছিল, "কাওয়ার্ড, দু ঘা দিতে পার নি"

ব'সে তার হাত ধ'রে টেনে বেরিয়ে পড়লেন। সেই অবস্থায় একদম ম্যাগাজিনে হাজির। সাহেব বারাণ্ডায় চেয়ারে ব'সে ছিলেন, অগ্নিমূর্ত্তি বৃদ্ধকে দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন, কি হয়েছে বাবু?

নো 'বাবু', ইওর মিজারেব্‌ল সাব্‌জেক্ট সার্, ফর সাফারিং অপ্রেশান। তারপর হরির পিঠের অবস্থা দেখিয়ে সাহেবের ছেলের অত্যাচারের কথা সবিস্তারে শুনিয়ে দিলেন, ইভ্‌ন উইমেন আর নট স্পেয়ার্ড, মে আই টেক ইট ফর দি ট্রেনিং চিল্‌ড্রেন রিসিভ ফ্রম পেরেন্ট্‌স? ইত্যাদি। তারপর সাহেব-মেমের অনুনয়-বিনয়, ক্ষমা-প্রার্থনা। চাটুজ্যে মশায়ের সামনেই বানি সাত ঘা চাবুক খেলে ও তাঁর পায়ে টুপি খুলে রাখলে। সাহেব বললেন, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, উই'ল সেণ্ড দি রাস্কেল ব্যাক টু ব্যারাকপুর টুমরো।

কর্ত্তারা শুনে বলেছিলেন, অন্নদা চাটুয্যে মশায়ের এটা কি ভাল কাজ হ'ল? আর সাহেবের মহত্ত্বটা দেখ! ওরা অমনই বড় হয় নি!

এসব ১৮৭০-এর কোঠাতেই হয়ে গেছে। যাক, কিন্তু ১৮৭০ থেকে ১৮৮০-র মাঝামাঝির মধ্যেই আমরা নতুন নতুন বৈচিত্র্য বা ইভলিউ-শন ও রেভলিউশনের খেলা দেখতে পাই।

স্থানমাহাত্ম্য ও সময়মাহাত্ম্য নাকি কাজ করেছে। উচ্চশিক্ষা-লাভার্থে আমাদের বিলাত যাওয়া, আই. সি. এস. হওয়া, ও ব্যারিস্টার হয়ে আসার পর হাওয়া বদলাতে আরম্ভ করেছিল। শহরের বড় বড় সম্ভ্রান্ত ধনীরা, যারা দেশে বিদেশে আমদানি-রপ্তানির কাজে লিপ্ত ছিলেন, তাঁরাও টের পাচ্ছিলেন, তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যে সাহেবদের তথা সরকারের দৃষ্টি পড়ছে এবং তা নানা ছলে বাধা সৃষ্টি করছে। উদ্দেশ্য সেসব নিজেদের দখলে নেওয়া। ধনিকরা সেটি নীরবে সহ্য করতে পারছিলেন না। তাতে খিটিমিটি চলতে আরম্ভ হয়। সাহেবদের দেশ-জয় প্রধানত নাকি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে, সুতরাং ওটা হওয়াই স্বাভাবিক। ক্ষমতা থাকলে তার ব্যবহার করাই তো মানুষের কাজ।

তখন কর্ত্তাদের পূর্ব্বপরিচিত দেবতারা মিঠে সুরে সকলকে তুষ্ট ক'রে দেশে ফিরেছেন। সময়োপযোগী পাস-করা পুরুষেরা এসে

পড়েছেন—মেজাজ, ব্যবস্থা, ব্যবহার, সুর বিভিন্ন। প্রদেশে প্রদেশে তাঁদের অ্যাসোসিয়েশন গঠন হচ্ছে, কড়া সুর সাড়া দিচ্ছে। বোধ হয় সেই সময়েই 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ভূপালের পলিটিকাল এজেন্ট মিঃ প্রিক্কিকে লক্ষ্য ক'রে ভীমরুলের চাক খোঁচান। তার আগে বাংলা 'অমৃতবাজার পত্রিকা', শম্ভু মুখুজ্জোর 'রিজ ও র‍্যায়েট' (?) হরিশ মুখুজ্জের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নীলকর প্রভৃতির কাহিনী প্রচার ক'রে ভীষণ একটা আলোড়ন এনে দিয়েছিল। এসব বিষ পরাধীনের স্পর্দ্ধা ব'লেই জমা হচ্ছিল। বরপক্ষের তরফ থেকে 'ইলবার্ট' বিল প্রভৃতি বিল দেখা দেয়; বিশেষ ব্র্যান্সন সাহেবের গাত্রদাহপূর্ণ, অভদ্রোচিত, কুৎসিত বক্তৃতা সকলকে চমকে ও বিগড়ে দেয়। ফলে বড়রা টাউন-হলে সভাসমিতি ক'রে প্রতিবাদ আরম্ভ করেন। সেটাও মনিবের জাতের সহনীয় ছিল না।

বিরোধ বাড়তে থাকে। তা থেকেই কংগ্রেস বা জাতীয় সভা-সমিতির জন্ম হয়। রাজকার্য্য আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত, আইনমতই আবেদন-নিবেদন চলতে থাকে। কিন্তু চাইলেই পায় কে? "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।" ভেতরে ভেতরে উত্তাপ বাড়তে থাকে, বহ্নি ধূমায়িত।

এর পরের কথা ও ঘটনায় তো আর স্মৃতিকথা বলা চলে না। দুঃখের জীবন দীর্ঘ, প্রত্যক্ষদর্শী এখন বহুত আছেন, সুতরাং ই অ্যাণ্ড ও. ই. লিখে এইখানেই ইতি করাই সমীচীন। আমার ভুলচুকের দিনও এসে গিয়েছে। যাক।

এসব জাহাজী ব্যাপারের সঙ্গে, আধপেটা-খোরাকী আদার-ব্যাপারী নির্জীব কেরানীকুলের কোনও সংস্রব ছিল না, থাকতেও পারে না। তারা ঘরজামাইয়ের মত সেজে-গুজে দিন সাড়ে আটটায় পান মুখে দিয়ে বেরিয়ে রাত সাড়ে আটটায় মুখ শুকিয়ে এসে খোঁয়াড়ে ঢুকত। ঝড় কিন্তু ছোট বড় বেছে বয় না। এ বেচারাদের ওপরেও তার দমকা হাওয়ার ঝাপ্টা লাগে। ঘরে পোষ্য বাড়ছিল, বাইরে বেতন না বেড়ে মনিবদের ব্যবহার মিলছিল, খাটুনি বাড়ছিল, পুরুষের উৎসাহ আনন্দ হ্রাস পাচ্ছিল। অসহায়ের মত বিরক্ত ও ব্যাজার ভাব।

বছর ফিরে যাচ্ছিল। তাদের সেই "পাঁচ কম" আর ঘুচছিল না। "এখন কত পাচ্ছ হে অবিনাশ.?" লোকের স্বভাব জিজ্ঞাসা করা, কিন্তু বেচারারা আত্মসম্মান বজায় রেখে পাওনাটা মুখে আনতেন না, সেই "পাঁচ কম" ব'লেই দ্রুত এগিয়ে পড়তেন। এখন তোমরা বুঝে নাও পঁচানব্বই কি পঁচিশ। তাতে মালিকদের কি আসে যায়? চাকরি ছাড়লে বিশখানা পিটিশন, "বেগ টু বি ইওর অনার্স মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সার্ভ্যান্ট স্যর্", হাজির হয়। যে পঁচত্রিশে পৌঁছেছিল, তার জায়গায় আবার আঠারো বিশে লোক মেলে, নিউ ব্লাডের ফ্লাড আসে, পরোয়া কি?

কাজেই ছুটি-ছাটাতেও বাবুদের ছুটে আসতে হয়, নচেৎ দশজনের কাজ ছজনে চলে কি ক'রে? সে কথা বলে কে, আর শোনেই বা কে? নতুন নতুন মালিক, মেজাজ সপ্তমে বাঁধা। এক সুমধুর "হোয়াট"-এই 'চাটের' কাজ করে। সয়ে থাকতে হয়। কর্ত্তাদের কৃতী কেরানী ছেলেরা এই অবস্থায় উপনীত। তাদের মনের দুঃখ শোনবার কেউ নেই। নব-আমদানি মনিবেরা সাড়ে তিনটে বাজতেই টুপি নিয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে যান। বাবুরা ঠিক দেন—ঠিক দেন সাতটা পর্য্যন্ত। আর যা দেন, সে দান গোপনেই বাড়ে।

কিন্তু "বড়বাবু" ব'লে আশি টাকার যে অস্থিভুক জলহস্তীটি চেয়ার জুড়ে চোলেন অর্থাৎ পাহারা দেন বা নাক ডাকান, আক্রোশটা তাঁদের ওপরেই গিয়ে পড়ে—"বেটা যেন কলিক পেনের মত চেপে বসেছে, সরবার নাম নেই, মরবার তো নেইই" ইত্যাদি। ফলে ক্ষুব্ধ নির্জ্জীব মড়ারাও নাড়া পাচ্ছে, নিশ্বাস ফেলছে। তাতে, কার কি? কর্ত্তারা বেশ আছেন। ছেলে এক মুঠো টাকা এনে দেয়।

তাঁরা চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে "দুর্গা দুর্গা" বলেন, তাদের দুর্গতির শঙ্কা দূর ক'রে দেন। সাহেবরাই তো নররূপী নারায়ণ, পাথরের খেলনা নয় হে জগবন্ধু! তোমার ছেলে শিবু লেখাপড়া শিখে শেঠের চাকরি নিয়ে যে ভুলটি করেছে, সেটি শোধরাতে না পারলে আর স্বস্তি নেই। ও আড়াইশো ক দিনের? এদের চাকরি চিরস্থায়ীর ওপরে যায়।

তারিণী পুরুত বলেন, ও কি করলেন, "দুর্গা" আবার কি?"

রামব্রহ্ম বলেন, ওটা যাত্রার মাত্রা হে—হ্যাবিট, হ্যাবিট। খাঁটি পেলে আর মাটির মূল্য থাকে না। গ্রাম্য কর্ত্তাদের মধ্যে রামব্রহ্ম রায়েরাই জবরদস্ত বুদ্ধিমান। পরকীয়ায় প্রীতি অ্যাডামান্ট, গল্প করেন, গুড়ুক ফোঁকেন। তাঁরাই দেবতা বাছাই ক'রে দিয়েছিলেন।

রায় মশায় বিষয় বদলে সহসা ব'লে উঠলেন, ভাল কথা, বাড়িতে মেয়েদের কি একটা ব্রত-উদ্‌যাপন আছে, তুমিই তো করবে তারিণী। রবিবার বারশটি ব্রাহ্মণ খাওয়াতেও হবে। সমস্ত করলেই অশান্তি। কি কল্পিই সব ক'রে রেখেছ! যাক, কিন্তু ছেলেদের ও বিয়ে শিখিও না, অন্ন হবে না। তুমি বন্ধুলোক, দিন থাকতে তাই সাবধান ক'রে দিচ্ছি, বুঝলে? কথাটা শুনো।

তারিণী বললে, গ্রাম সুদ্ধ লোক আপনার পরামর্শ নেয়, আর আমি শুনব না? আমার বলাই বোঝ ডেঙ্গ পেতে হাত পাকায়।

রামব্রহ্ম খুশি হলেন, বললেন, বেশ বেশ, একে বলে সুবুদ্ধি, ওতে তো কেবল অন্নই নয়, দেবসেবাও হয়ে যায়, পরকালের কাজ হে। হাঁ, যে কথা বলছিলুম, চল না, দুজনেই শনিবার কলকেতা যাই; বাজারটা ক'রে আসি।

তারিণী। তা যেতে পারি, কিন্তু সন্ধ্যের আগে ফিরে আসতে হবে, হরদেব চাটুয্যের বাড়ি শ্রীসত্যনারায়ণের কথা আছে।

রামব্রহ্ম। শ্রী হোক বিশ্রী হোক, ক'রে নাও যে কদিন চলে। আচ্ছা, তাই হবে। ভাক্তভিক্তির ব্যবসায় বাধা দিতে চাই না। তবে একটা কথা ব'লে রাখি, ওদের চেনবার পর অর্থাৎ জ্ঞান হ'লে আর ক'রো না।

• • •

এরই পরের কথা। বহুদর্শী, অভিজ্ঞ বৃদ্ধ রামব্রহ্ম, বেলা তিনটের মধ্যে কলকাতার বাজার মুটের মাথায়, হাতে ভেটকিমাছ ও "সাথে" তারিণী—গঙ্গার ঘাটে এসে দেখেন, কয়েকখানি নৌকো যাত্রীর অপেক্ষা করছে। নিকটেই একখানি নতুন রং-করা পেনেটির পানসি ছিল, তাতেই মাল নাবিয়ে উঠে পড়লেন। "ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো

পেয়েছিস, চান ক'রে এক ছিলিম সাজ দিকি, এখুনি লোক হয়ে যাবে" ব'লেই মাঝিকে হুকুম ক'রে হাতমুখ ধুয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নৌকোয় ঢুকে আড় হলেন, আঃ, বাঁচলুম, বড় ক্লান্ত হয়েছি। তারিণী বাইরেই হাওয়ায় বসলেন, বললেন, আপনার কি আর ঘোরাঘুরির বয়েস আছে, আপনি ব'লেই পারেন। মাঝির হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে রায় মশায়কে দিলেন। তিনি গঙ্গাজলের হাত বুলিয়ে টানতে আরম্ভ করলেন। তখনও গোল ধোঁয়া বেরোয় নি, গটগট শব্দে দুই দেবমূর্ত্তি, সঙ্গে চাপরাসী, সেই রংদুরস্ত পানসিতে বীরদর্পে পদার্পণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারিণীর দ্রুত অবতরণ।

রামব্রহ্ম। কোথা যাও তারিণী? ওঁরা আমাদের কুচুটে জাত নন, বললেই নেবে যাবেন।

সাহেব। নিকালো নিকালো, ইউ ডার্টি চ্যাপ—লুক শার্প।

আমাদের মোটঘাট অনেক সাব্, ঐ পাশের নৌকো খালি, বৃদ্ধ লোককে কষ্ট দেবেন না—ইত্যাদি অনুনয়-বিনয় কাজ দিলে না। ক্রমোচ্চ স্বরে, জলদি করো, জলদি করো, চাপরাসী, সব উঠাকে ফেক দেও।—ব'লেই মাছটায় বুটের এক গুঁতো। ভাগ্যে সেটা ডাঙায় গিয়ে পড়ে।

নিরুপায় রায় বেরুতে বেরুতে 'এসব কি জুলুম, আপনারা কোন্ ক্লাসের—' যাই বলা, অমনই একটি চালতার মত বজ্রমুষ্টি কান ঘেঁষে কলকেটার ওপর দিয়েই গেল, রায় কাত মেরে বেঁচে গেলেন, কলকেটা গঙ্গা পেল।

আগুন ছড়াছড়ি দেখে তারিণী মোট টেনে বার ক'রে ফেলেছিল, কাঁপতে কাঁপতে বললে, বুড়ো মানুষকে দয়া ক'রে বেরিয়ে আসতে দিন সাহেব।

টেক হিম অ্যাওয়ে।—ব'লে স'রে দাঁড়াতে তারিণী তাঁর হাত ধ'রে নাবিয়ে নিলে। পাশের পানসিতেই তাঁরা উঠলেন। যাত্রীও হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে কোন্নগরের শিববাবু ছিলেন, তিনি রায় মশায়কে চিনতেন,

এ কি! আপনি? এমনই যে ব্রহ্মহত্যা হয়েছিল! ওরা রাজার জাত, কথা শুনে খাটো হবার লোক নয়।

কে একজন বললেন, তা গন্ধ পেয়েছেন।

সোনার চাঁদের বাড় দেখেছ? ওদের আমি চিনি, আলমবাজারের চটকলের খুদে নবাব। মিরজাফর নিকে ক'রে এনেছিলেন। সেদিন কুকুর লেলিয়ে এক গরিবের ছেলেকে—উঃ, কি অত্যাচার! ঘুষোঘুষিতে হাত পাকিয়ে আসেন। মাঝি, তামাক দাও, তামাক দাও। একটা ফাঁড়া গেছে, ওদের ঘাঁটাতে আছে? হেম বাঁড়ুয্যের বাণীটে দেখেন নি?

ভয়ে ভয়ে চাই, ভয়ে ভয়ে যাই,
গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই।

এই তো সেদিনের লেখা।

একজন বললেন, আহা, ওঁর কাছে এসব নতুন কথা নয়, শাস্ত্র-জানা লোক। কাদের কাছে "শত-হস্তেন"—এসব কথা, এসব মাপ, এ দেশের গদার-মাপ জানে।

নৌকো ছেড়ে দিয়েছে। রায় মশায় গুম হয়ে ব'সে রইলেন। তারিণী পুরুত মনে মনে ভাবছিলেন, রায় মশায়ের কথা, যেটি তিনি যখন তখন ব'লে থাকেন, বুঝতে পার না, ওঁরা যা করেন, আমাদের ভালর জন্যে। নারায়ণ রক্ষা করেছেন, ওর বেশি ভালটা আর আমাকে দেখতে হ'ল না, মড়া নিয়ে কি বিপদেই পড়তুম!

নৌকো ঘাটে এসে গেল, তারিণী মোটঘাট নাবিয়ে নিলে। রায় মশায় এতক্ষণে একটি কথা কইলেন, দেখ তারিণী, এসব কথা প্রকাশের দরকার নেই, বুঝেছ?

রামঃ, এ কি একটা কবার কথা?

ভেবে দেখলুম, ওরা সব ছেলেছোকরা, শহরে এসেছিল, প্রকৃতিস্থ ছিল না, বুঝেছ? নচেৎ সুড়সুড় ক'রে নেবে যেত।

সে আমি অনেকক্ষণ বুঝেছি।

হেমবাবুটি কে জা? নিশ্চয়ই ছেলেদের চাকরি যোগাড় করতে পারেন নি, সেই আক্রোশে—বুঝলে?

ঠিক ধরেছেন, মন অন্তর্য্যামী। আমারও সেই সন্দেহ হয়।

সন্দেহ নয়, ঠিক।

আপনার সাত্ত্বিক মন যখন বলেছে, নিশ্চয়ই ঠিক। চলুন এগুলো পৌঁছে দিয়ে যাই।

তারিণী মোট নিয়ে এগুল। রায় মশায়ের পা এগুতে চায় না, নির্জ্জীবের মত চললেন, ভাগ্যে কলকেটার ওপর দিয়ে গেছে, লাগলে আর—। কেঁপে উঠলেন।

বাড়ি পৌঁছে গেলেন। তারিণী বাড়ির মধ্যে মোট রাখতে গিয়ে দেখে, রায় মশায়ের ছেলে হরিমোহন দু হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে দাওয়ায় ব'সে।

কুঠি যাও নি ?

উত্তর নেই। রায় মশায় ঢুকছিলেন, তারিণী জিজ্ঞাসা করলে, হরিমোহনের অসুখ নাকি, কুঠি যায় নি ?

শুনে রায় মশায়ের যেন চটকা ভাঙল, কুঠি গিয়েছিল বইকি, ছুটি হয়ে থাকবে। সন্ধ্যে হ'ল, তুমি যাও, তুমি যাও, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

আজ্ঞে, এই চললুম।

তিনি আর তারিণীকে সহ্য করতে পারছিলেন না। তারিণী কিন্তু বাইরে একটু দাঁড়াল, ছুটির কথাটা তার মনে লাগে নি। রায় মশায়ের তাড়া দেওয়াটাও বেশ স্বাভাবিক ছিল না।

তারিণী চ'লে যেতে হরিমোহন মুখ গুঁজেই বললে, আমি আর ওদের চাকরি করব না বাবা।

কেন, কি হয়েছে ?

ঠিক দিতে একটা ভুল হয়েছিল, আমাদের চারে আর ওদের আটে ঘুলিয়ে গিয়েছিল, কারণটা বললুম, ভুল স্বীকার ক'রে মাপ চাইলুম, এই ফার্স্ট মিস্টেক সার্, আর হবে না। ভুলু, মতি, জগৎ সব পরদার পাশ থেকে দেখছিল। সাহেব তেড়ে উঠে বললেন, নো পার্ডন, ইউ সোয়াইন, কান পাকড়ো—

"আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, ও-গালাগালি আর দেবেন না"—বলতেই, "হোয়াট! ব্লাডি নিগার!" ব'লে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, আমিও ছুট। আর কিছু জানি না। চাকরি আমি আর করব না, আমার অদৃষ্টে যা আছে হবে। কুড়ি টাকা বিচুলির ব্যবসায় পাওয়া যায়।

তারিণী আর দাঁড়ায় নি।

রামব্রহ্ম স্তম্ভিত। একদিনে দু-দুটো ধাক্কা! ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, এমনটা তো ছিল না, শুনিও নি!

শুনবেন আর কার কাছে? শুনিয়ে কে কথা শুনতে যাবে, ওরা যে আপনাদের—। ব'লেই থেমে গেল। তারপর বললে, চাদরখানা ফেলে এসেছি—

যাকগে, গোলামদের চাকরি আর ক'রে কাজ নেই। যাও, হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খাওগে। ওর জন্যে ভেবো না। ভুল সকলেই করে; অজ্ঞাতকুলশীল ইত্যাদি।

রায় মশায় আহার করলেন না, শরীর ভাল নয়। একটাই জ্বর দেখা দিলে, বিকারের বোধ হয় ঘুম ভেঙে চমকে চমকে "ওরে বাপ রে, যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি বাবা" ব'লে উঠে পড়েন। চোদ্দ দিনে জ্বর বন্ধ হ'ল। ইতিমধ্যে প্রিয় বন্ধুরা দেখতে আসেন। সবার মুখেই 'হরিমোহনের জন্যে ভাববেন না, ও গেলেই চ'লে যাবে, ওরা সে জাত নয়—কিছু মনে রাখে না' ইত্যাদি সান্ত্বনাবাক্য। নেপাল খুড়ো বলেন, ওদের আমরা কতটুকু বুঝি? শ্রীনাথ জ্যাঠা ওয়াকিবহাল লোক, বল'ছলেন, ও গেলেই ওর মাইনে বাড়িয়ে দেবে, দেখে নিও। আমাকে একবার ঐ রকম বলেছিল, তারপর দেখছেই পাচ্ছ। সবুরে মেওয়া ফলে। রায় মশায় কিন্তু আগের মত আলোচনায় আর যোগ দেন না।

জগৎ আর মতির কল্যাণে সকল মহলেই খবরটা সকলে উপভোগ করেছে। পাড়ুলীর ছেলে গদাধরের পিটিশনও পৌঁছে গেছে।

• • •

রামব্রহ্ম রায় মাগুরমাছের ঝোল খাবার পর, 'শিশুবোধক'খানা বার ক'রে, চশমা চড়িয়ে শিবকালীকে চিঠি লিখলেন—কোটি কোটি

আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক: সহস্র সহস্র শুভাশিসমিদং। বাপজীবন তোমাদের কুশল সর্ব্বদাই ভগবৎসকাশে প্রার্থনা করি। কিরূপ আছ সত্বর জানাইয়া চিন্তা দূর করিবা। বিদেশে সাবধানে থাকিবা, শ্রীশ্রীনারায়ণকে ভুলিবা না। তুমি আমাদের গ্রামের রত্ন, বহুদূরে রহিয়াছ সে কারণ সর্ব্বদাই দুর্ভাবনায় থাকি। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, হরিমোহন বালক। এখানে সৎসঙ্গের অভাব। সে তোমার নিকটে থাকিলে আমি নিশ্চিন্তে শেষজীবন অতিবাহিত করিতে পারি। তোমার বিশুদ্ধ প্রভাবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, কর্ত্তব্যে সে মানুষ হইতে পারিবে। তোমার নিকট এই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ বাবা। তুমিই তার অভিভাবক রহিলে, আর অধিক কি বলিব, নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন। তোমার পত্র পাইলে তাহাকে পাঠাইব। ইত্যাদি।

পুনশ্চ লিখিলেন, দেখিও বাবা, ব্রাহ্মণসন্তানকে যেন অজাত-কুলশীল ম্লেচ্ছের চাকুরি করিতে না হয়।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চকন্যাস্মরেন্নিত্যম্

সার্ জন হাবার্ট এবং পত্নী তাঁর,
সবাশয় সদাশয়া—মাঈ-বাপ বাংলার
ছিলেন সবাই জানে। চাচা নাজিমুদ্দীন,
দিন দিন দীন্ দীন্ রবে বাঁচে যত দীন।
ভুলো না ভুলো না ফুকা সুরাবর্দ্দীর নাম—
সত্য দ্বাপর ত্রেতা তিন যুগে এসা কাম্
কোই নাহি কিয়া; উত্তো রাজচক্রবর্ত্তি হায়,
নিজ জেল খালি করি ভরিবে কে এত দেয়?
ভাগো ছিলেন হেথা এ ইস্পাহানী ভাই,
হাসেম-কাসেম দাদা, বেঁচে আছি আজো তাই।
অন্নদানের সেবা ক্ষুধিতের নিয়েছেন,
আড়ালে যা হয় হোক বেচাকেনা লেনদেন
সেসব মোদের দাদা, দেখিবার কথা নয়,
অন্তরে নামগুলি হয়ে থাক অক্ষয়।

ভিখারিণী

ওগো ভিখারিণী, দেখি আয়,
কি মিলেছে আজি ভিক্ষায়।
কত চাল, মরি মরি,
চলেছ ঝুলিতে ভরি
এ-গাঁ হতে অন্য কোন্ গাঁয়?

এ কি হায় দেখি ভিখারিণী,
কাঁধে তো ঝুলিটা নাই!
কে বুঝি সুযোগ পাই'
একা পথে নিল তাহা ছিনি?

কেন তোর আঁখি ছলছল্?
এমনি আপনি গিয়ে
থানায় খবর দিয়ে :—
কি হয়েছে মোরে খুলে বল্।

হায় ভাগা, ছিন্ন সেই ঝুলি
করেছিস বুকের কাঁচুলি!
রাখিতে লাজের মান
ঝুলিটায় দিলি টান,
উদরের কথা গেলি ভুলি?

ভিক্ষা চাস, কাঁধে ঝুলি নাই,
দান যে দাঁড়াবে—কোথা ঠাঁই?
দ্বারে দ্বারে মুঠো মুঠো
দাক্ষিণ্যে করি নি ঠুঁটো,
বালাইয়ের উপর বালাই।

ভিখারিণী কারে তোর লাজ?
পিঠাবে রাজ্যের কালি
ঢাকিয়া যৌবন-গ্লানি

নিরন্ন ফিরিছ পথে আজ।
ক্ষুধায় ছিঁড়িছে নাড়ী ;
তবু জেগে ব'সে নারী
রক্ষা করে মানব-সমাজ।

মানবের লজ্জা আছে নারী ?
পট্ট-বাসে দেহ ঘেরা
পাটনাই পেঁয়াজেরা
তোরে হেরে ফেলে অশ্রুবারি !
ভিখারিণী, কথা রাখ্
বিবসনা হয়ে থাক্
যত দিন অন্ধ নহি মোরা।
কারে লাজ, কোন্ ভয় ?
তনু তোর গোরা নয়,
নাহি তার কনক-কটোরা।

তোরি মত কালো মেয়ে,
—রূপসী বা তোরও চেয়ে,—
হয়তো এমনি কোনো দুখে
ফেলিয়া কটির বাস
হেসে উঠে অট্টহাস
পা দিয়ে দাঁড়াল শিব-বুকে

তখন বিশ্বের লোক
চমকি মেলিয়া চোখ
আনে পূজা শত-উপচার ;
বলে—এ কি রূপরাশি
তিমিরে তিমির-নাশী !
দয়াময়ী তুমি মা আমার !

শুনে কালো মেয়ে হাসে,
ভুবন ভরিয়া ত্রাসে
তাথৈ তাথৈ নেচে ধায় ;
কপালের চুল যত
অনল-গিরির মত
কপাল ভাঙিয়া বাহিরায় ।

ঝল-মল নৃত্য-ভরে
মালা ছিঁড়ে মুণ্ড পড়ে,
হানে অসি মাভৈঃ মাভৈঃ ।
দু কানে দোদুল সুখে
কচি শিশু মরা মুখে
মার বুকে দুধ খোঁজে ওই ।

মানুষের হাত কাটি
ঘাঘরা পরেছে আঁটি
কটির মিটিল বুঝি ক্ষোভ ;
'ক্ষুধা চঁ' 'ক্ষুধা হঁ' ব'লে
খর্পর মুখে তোলে,
যত পায় তত বাড়ে লোভ ।'
ভিখারিণী, কথা শোন—
তুই যে রে তারি বোন,
প্রলয়ের জানিস সন্ধান ।
ফেলে দে ফেলে দে টানি
ঘৃণ্য ওই চীরখানি,
ও—লাজ নারীর অপমান ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ভক্ত

১

জায়গাটা কলিকাতা হইতে বেশি দূরে নয়, যাহাদের মোটর আছে এবং সন্ধ্যার দিকে একটু বাহিরের হাওয়া খাইয়া আসিবার শখ আছে, গিয়া ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারেন। অনেকে যায়; অবশ্য জায়গাটার যে কোন বিশেষ আকর্ষণ আছে এমন নয়, তবে পথটার একটা মোহ আছে নিশ্চয়,—অন্তত মুগ্ধ হইতে জানে এমন দৃষ্টির কাছে। প্রশস্ত পিচ-ঢালা পথ, কলিকাতার রুক্ষতা এড়াইয়া ক্রমশই গাঢ়তর সবুজের মধ্য দিয়া দক্ষিণে নীল চক্রবালের দিকে চলিয়া গিয়াছে—ছায়াচ্ছন্ন পল্লী, প্রশস্ত মাঠ, চারণ-ভূমি; আবার পল্লী, মাঠ, বাগান—ক্রমে এই জায়গাটা আসিয়া পড়ে, খুব সমৃদ্ধ একটা বড় গ্রাম। অনেকগুলি ক্ষুদ্রতর গ্রামের সমাবেশ বলিলেও চলে; বাড়ি, বাগান, দেউল, পাঠশালা, ইস্কুল, জনসমাকীর্ণ বাজার। চারিদিকটা ম্যালেরিয়াবিধ্বস্ত, হতশ্রী; তাহারই মধ্যে পুরাতন বাংলার নমুনা হিসাবে যেন বিধাতা এই স্থানটুকু বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। একটু ঢিলাঢালাভাবে বলিতে গেলে এটা যেন তাঁহার পুরাতত্ত্ব-বিভাগের একটা নিদর্শন; ঢিলাঢালাভাবে এইজন্য বলিতেছি যে, এটা নবীনের মাঝে ধ্বংসস্তূপ নয়, ধ্বংসের মাঝে কালজয়ী নবীনের প্রতীক।

গ্রামটির নাম রাজগ্রাম।

এই রাজগ্রামে একদিন অপরাহ্নে একটি বেশ মাঝারি সাইজের সেডান-বডি মোটর-কার আসিয়া বড় রাস্তার ধারে একটি গাছের নীচে দাঁড়াইল। ধারেই একটি ছোট্ট বাংলো-গোছের বাড়ি, সঙ্গে লোহার রেলিং দিয়া ঘেরা একটি পরিচ্ছন্ন বাগান। মোটরের কি একটা অংশ সাময়িকভাবে বিকল হইয়াছে, একটু ঠিক করিয়া লওয়া দরকার। মোটরে দুইজন আরোহী: খুব ব্যাকরণদুরস্ত করিয়া বলিতে গেলে—একজন আরোহী, একজন আরোহিণী। আরোহী আস্তিন গুটাইয়া মোটরের তদারকে লাগিয়া গিয়াছেন, আরোহিণী মাঝপথে বাহনের

এরূপ ব্যবহার দেখিয়া কতকটা নিরুৎসাহভাবে সামনের আসনে বসিয়া আছেন।

রাস্তার অপর দিকে খানিকটা প্রশস্ত খালি জায়গার পর একটি বেশ বড়-গোছের পুকুর। বেশ একটি ভাল করিয়া বাঁধানো ঘাট, ঘাটের মাথায় দুই দিকে দুইটি শানের বেঞ্চ। একটি বেঞ্চে তিনজন ছেলে বসিয়া আছে—অতুল, ধীরেন আর পরিমল। ইহারা স্থানীয় স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র। আজ স্কুলে সন্ধ্যার সময় একটা মীটিং আছে, সরস্বতীপূজার কমিটী গঠন হইবে। ভোট ইত্যাদি লইয়া যে কূটচাল চলিতেছে তাহা লইয়া, সেই সঙ্গে পাশের দুই-তিনটি গ্রামের স্কুলে যে পূজা হইবে সেগুলার সহিত টেক্কা দেওয়া লইয়া আলোচনা চলিতেছে। এই পথে দলের আরও কয়েকজন জুটিবে, তাহার পর সকলে স্কুলাভিমুখী হইবে। অতুল ছেলেটি ইহাদের মধ্যে একটু মাতব্বর-গোছের। বছর সতেরো-আঠারো বয়স হইবে, বইয়ে মুখ গুঁজিয়াই পড়িয়া থাকে না, আরও পাঁচটা ভালমন্দ জিনিসের খোঁজখবর রাখে।

মোটরটা আসিয়া এই দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল। আরোহী সেখানেই নামিলেন, আরোহিণী করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া রাস্তার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন,—একেবারে বিমুখ হইয়া নয়, আধখানা অর্থাৎ কপাল, নাসিকা, ওষ্ঠাধর ও চিবুকের রেখাটা দেখা যায়।

অতুল, যেখানে বসিয়া থাকে সেইখানটুকুতেই, দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখে না; একটু পরে হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া বলিল, তোরা ব'স, এলাম ব'লে।

উঠিয়া কোঁচাটা একটু ঝাড়িয়া জামাটা ঠিক করিয়া নিতান্ত নিরুদ্বেগভাবে মোটরটার পাশ দিয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেল। অনেকটা দূর গিয়া একটা মোড় পড়ে, সেটার ওদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। খানিকটা পরে তেমনই নির্লিপ্ত গতিতে মোটরের পাশ দিয়া শানের বেঞ্চটিতে আসিয়া বসিল। ঠিক সে অতুল নয়, নিশ্বাস ঘন ঘন, সমস্ত মুখটি খানিক রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, আর নীরব। একটা কিছু ব্যাপার হইয়াছেই।

ধীরেন প্রশ্ন করিল, হঠাৎ অমন ক'রে গেলি আর চ'লে এলি ?

অতুল একবার 'উঁ' বলিয়া ঘাড়টা বাঁকাইয়া দাঁতে নখ খুঁটিতে লাগিল, ভয়ানক অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে।

মোটর হইতেই এই ভাবান্তরের উদ্ভব, যতদূর মনে হয় মোটরের আরোহিণী লইয়া,—সঙ্গী দুইজনে গভীর অভিনিবেশের সহিত এবং যতটা সম্ভব ভদ্রতা রক্ষা করিয়া আড়চোখে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পরিমল একটু অসহিষ্ণুভাবেই বলিল, ব্যাপারখানা কি রে ? তোর যে বাক্‌রোধ হয়ে গেল !

অতুল কথা কহিল, বলিল, আগে তাড়াতাড়ি দেখে আয়, মোটর সেরে নিয়ে চ'লে গেলে চিরকাল আপসে মরবি।

পরিমল বলিল, দুজনেই যাব ?

অতুল মন্তব্য করিল, বাঃ, পাব্লিক রোড, দুজন ছেড়ে আমরা যদি চারজন জোট বেঁধে যাই, কার কি বলবার আছে ?

পরিমল আর ধীরেন মন্থরবড় প্রয়োজনের তাগিদে ক্ষিপ্রপদে মোটরের পাশ দিয়া অতুলের মত চলিয়া গিয়া রাস্তার মোড়ের ওদিক হইতে ফিরিয়া আসিল। যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া যাওয়া, এদের যাইবার সময় তিনি মুখটা আরও একটু বাঁকাইয়া লইয়াছিলেন, ফিরিবার সময় ইহারাই সাহস করিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিতে পারিল না।

বসিতে বসিতে ধীরেন বলিল, হ'ল না, ঘাড়টা একেবারে বেঁকিয়ে বসল ; কে বল দিকিন ?

অতুল বলিল, তোরা একেবারে অপদার্থ ; আমি তো ওঁর ঘাড় বাঁকাবার কায়দা থেকেই ধ'রে ফেললাম, ওইটে ওঁর ফেবরিট পোজ।

পরিমল বলিল, হেঁয়ালি রেখে কে বল মাইরি, আর একবার না হয় চেষ্টা করি তা হ'লে।

অতুল কণ্ঠে যতটা সম্ভব সংযত গাম্ভীর্য্য আনিয়া বলিল, বনলতা দেবী।

পরিমল বিস্ময়ে একেবারে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল,

বনলতা!—ফিল্মস্টার! তিনি রাজগাঁয়ের মত জায়গায় কি করতে আসবেন? রাজগাঁয়ের এত সৌভাগ্য—

ধীরেনের বিস্ময় এত বেশি যে, বাকস্ফূর্ত্তিই হইল না।

অতুল মোটরের দিকে একটা চক্ষু রাখিয়া একটু চাপা গলায় ধমক দিয়া বলিল, ব'স, দেখছেন এদিকে। তোরা যেন আদেখলে হয়ে পড়েছিস।

মোটরে আর ঘাটে বেশ খানিকটা তফাত হইলেও মাঝখানে কিছুর অন্তরাল নাই। পরিমল মুখটা ঘুরাইয়া দেখিল, আরোহিণী তখনও, ঠিক এদিকে চাহিয়া না থাকিলেও, এমনভাবে আছেন যাহাতে তীর্য্যক দৃষ্টিতে ফল পাওয়া যায়। একটু অপ্রতিভভাবে বসিতে বসিতে বলিল, তুই শিওর জানিস—বনলতা?

ধীরেনের এতক্ষণে যেন সম্বিৎ হইল, বলিল, একটা অভিনন্দনের ব্যবস্থা করলে হয় না?

কথার উপর কথা পড়ায় পরিমল খিঁচাইয়া বলিল, দেখছিস একটা বিপদে পড়েছেন উনি,—অভিনন্দন!

অতুল চিন্তা করিতেছিল, বলিল, সাহস আছে?

দুইজনে মুখের পানে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিল, অতুল বলিল, তা হ'লে মেয়েলী লজ্জা ছেড়ে একটু এগিয়ে যেতে হয়, ওঁদের সাহায্য দরকার।

পরিমল উঠিতে উঠিতে বলিল, রাজগাঁয়ের দুর্ভাগ্য—এত দেশ থাকতে এখানে এসেই ওঁদের মোটর বিগড়ে গেল।—তুই শিওর, উনি বনলতা দেবী?

মেয়েলী লজ্জাটা সম্পূর্ণ পরিহার করা গেল না; একটু কুণ্ঠিত চরণে ইহারা আসিয়া রাস্তার ধারে দাঁড়াইল। তিনজনেরই মুখ রাঙা হইয়া গিয়াছে। ভদ্রলোক মোটরের ওপাশে ঝুঁকিয়া একটা যন্ত্র হাতে লইয়া কি তদারক করিতেছেন, আরোহিণী ইহাদের একবার চকিতে দেখিয়া

লইয়াই মুখ ফিরাইয়াছিলেন, বোধ হয় কোন রকম অস্বস্তি বোধ হওয়ায় ধীরে ধীরে ফিরিয়া বসিলেন এবং অতুল ও অতুলের দেখাদেখি অপর দুইজনেও অভিবাদন করিতে হাত তুলায় প্রত্যভিবাদন করিলেন। একটু চুপচাপ গেল, তাহারই মধ্যে ধীরেন ফিসফিস করিয়া বলিল, ঠিক সেই রকম স্টাইলের নমস্কার! কি প্লেটা রে অতুল? মনে আসছে না।

আরোহিণী প্রশ্ন করিলেন, আপনাদের এখানেই বাড়ি?

তিনটি কণ্ঠেই একসঙ্গে ত্রস্ত উত্তর হইল, আজ্ঞে হ্যাঁ। অতুল সেই সঙ্গে প্রতি-প্রশ্নও করিল, আপনাদের কোন সাহায্যের দরকার আছে?

আরোহিণী একটু হাসিয়া বলিলেন, ওঁকে জিজ্ঞেস করুন, আমি তো দিব্যি রাণীর হালে ব'সে আছি।

নিজেই আরম্ভ করিলেন, শুনছ? এঁরা বলছেন—

ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইলেন, প্যাণ্ট আর শার্ট পরা, হাতের আস্তিন গোটানো, দুই-এক জায়গায় তেল-কালি লাগিয়া গিয়াছে। মাঝবয়সী লোকটি, একটু বিপর্যস্ত হইলেও মোটামুটি মুখটা বেশ প্রসন্ন। হাসিয়া বলিলেন, শুনেছি। তাহার পর ইহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, সাহায্য তো রাণীরই দরকার, কি বল? তোমরা স্কুলে পড়?

ত্রিকণ্ঠে উত্তর হইল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হ'লে তো কুইন-বী অর্থাৎ মক্ষীরাণীর ইতিহাস—

আরোহিণী ক্রোধের অভিনয় করিয়া বলিলেন, কি হচ্ছে ছেলে-মানুষদের সঙ্গে?

ভদ্রলোক বলিলেন, না না, আমায় সাহায্য করলেও সাহায্যটা আসলে বর্তাবে কোথায় তাই বলছিলাম। আছে দরকার সাহায্যের, কাছে-পিঠে কোথাও মোটরের কারখানা আছে?

অতুল আগ্রহ সহকারে প্রশ্ন করিল, ঠেলে নিয়ে যেতে হবে?

ভদ্রলোক সেই জাতীয় রসিক মানুষ, যাহারা বিদ্রূপের সুবিধা হইলে ছেলে, বুড়া, সমবয়সী কাহাকেও বাদ দেয় না; হাসিয়া বলিলেন, না, মিস্ত্রিকে ডেকে আনলেই হবে। যদিও ঠেলে নিয়ে যেতে না পারায় তোমরা বোধ হয় একটু নিরাশ হবে।

এরা তিনজনে একটু লজ্জিত হইল, আরোহিণীর কণ্ঠে একটু আপত্তি-সূচক শব্দ উঠিল, আঃ!

পরিমল অতুলের দিকে চাহিয়া বলিল, কারখানা তো সেই যার নাম তিন মাইল এখান থেকে, তার চেয়ে মলিনদার কাছে যাব? যদি তাঁর শফারটাকে ছেড়ে দেন, ওঁর যন্ত্রপাতি সবই আছে। কতক্ষণ লাগবে সারতে মনে হয় আপনার?

ভদ্রলোক বলিলেন, তা যে রকম বিগড়েছে ঘণ্টা তিনেক লাগবে, শফার যদি এক্সপার্ট হয় তো—

আরোহিণী ভীতভাবে বলিয়া উঠিলেন, তিন ঘণ্টা! তিন ঘণ্টা এই রাস্তার মাঝে ব'সে থাকতে হবে?

ভদ্রলোক বলিলেন, আর একটা উপায় আছে।

কি? তাই কর।

সেটা হচ্ছে তাহ' মোটরটাকে বালিগঞ্জে ঠেলে নিয়ে যাওয়া। ওরা তো তোয়ের রয়েছেই। সঙ্গিনী আবার রাগিয়া উঠিলেন, এই বিপদের মধ্যেও তোমার তামাশা করতে যায় ইচ্ছে?

উত্তর হইল, মোটর বিগড়েছে; সঙ্গে সঙ্গে সারাবার উপায় হয়েছে, এটাকে যদি বিপদ বল তো সারাবার উপায় না হওয়াটাকে কি বলবে?

সঙ্গিনী অধিকতর ক্রোধে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। এদের তিন-জনের মধ্যে ফিসফিস করিয়া কি পরামর্শ হইল; অতুল গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইল; সে এমনিই একটু বেশ চলবলে; একটু সঙ্কোচ যা ছিল, সহজ কথাবার্তায় সেটা কাটিয়া গিয়াছে, বলিল, আজ্ঞে, রাজগাঁয়ে এসে যদি আপনাদের মত দেশের গৌরবকেও রাস্তায় ব'সে থাকতে হয় তো রাজগাঁ কি আর লজ্জায় মাথা তুলতে পারবে? সে ব্যবস্থাও আমরা করছি।

আবার তিনজনে কি পরামর্শ হইল, পরিমল আর ধীরেন দুইজনে দুই দিকে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল, অতুল উপস্থিত রহিল।

এদিক ওদিক পাঁচরকম গল্পে খানিকটা অতীত হইয়াছে; দেখা গেল, ছোট বড় দলে চারিদিক হইতে ছেলেদের দল মোটর লক্ষ্য করিয়া চলিয়া

আসিতেছে, যতই আগে আসিতেছে গতি ততই শ্লথ হইয়া পড়িতেছে; মিনিট কুড়ি-পঁচিশেকের মধ্যে বিভিন্ন পথে প্রায় জন ত্রিশেক ছেলে আসিয়া অতুলের পিছনে জড় হইয়া গেল, আরও আসিতে লাগিল। সকলে যেন হাঁপানি চাপিবার চেষ্টা করিয়া হাঁপাইতেছে, বেশ বোঝা যায়, প্রথম দিকটা ইহারা ছুট দিয়াই আসিয়াছে। ছাত্রই, আশেপাশে কিছু কিছু কৌতূহলী ইতর-সাধারণও আসিয়া জুটিল।

সমস্ত জায়গাটি চাপা কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্নে, নানারকম মন্তব্যে, একটু কবোষ্ণ বাদপ্রতিবাদে গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। অতুলের প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে; সে পুরাদমে ভদ্রলোকটির সঙ্গে গল্প করিয়া যাইতেছে, আরোহিণী মাঝে মাঝে কিছু বলিলে সেদিকেও খেয়াল রাখিতেছে, উত্তর বা অভিমত যেটি দরকার চালাইয়া যাইতেছে, অবসর-মত সঙ্গীদেরও এক-আধটা চাপা প্রশ্নের চাপা উত্তর দিতেছে, এক-একবার দুই পা পিছাইয়া গিয়া গুঞ্জনকারীদের মৃদু ধমক দিতেছে, একটু চুপ কর, তোরা ডোবালি গ্রামের নাম; কি আইডিয়া নিয়ে যাবেন বল দিকিন?

এখানে-ওখানে অনেকগুলি পকেট হইতে নানা ছাঁদের অটোগ্রাফ-বুক আত্মপ্রকাশ করিবার প্রয়াস করিতেছে। অতুলদা! ভাই অতুল! অতুল ভাই, কিছু না হোক, শুধু নামটা, নিজের হাতে—

অতুল চোখ আর হাতের খুব ইশারা করিয়া চাপা গলায় বলিতেছে, হচ্ছে ব্যবস্থা, সবুর; কি যে আদেখলে সব!

পরিমল আসিয়া উপস্থিত হইল, যেন একটা বেশ জয় করিয়া ফিরিতেছে। সঙ্গে একজন শকার, হাতে গোটা দুই যন্ত্র, তাহার পিছনে যন্ত্রপাতির বাক্স লইয়া একটা কুলি-গোছের লোক।

পরিমল আসিয়া বলিল, মলিনদা ভয়ঙ্কর দুঃখিত, তিনি নিজে আসতে পারলেন না, তাঁর ১০২ ডিগ্রী জ্বর আর কোমরে অসহ্য বেদনা।

পরিমল নিজের কোমরটা অল্প একটু বাঁকাইয়া মুখটা কুঞ্চিত করিল।

তবু মোটরে আসতেন, একটা মস্তবড় সৌভাগ্য কিনা—গাঁয়ের সৌভাগ্য—কিন্তু মোটর দু'দিন থেকে ভেঙে প'ড়ে রয়েছে। এত দুঃখু করছেন, বোধ হয় আরও এক ডিগ্রী জ্বর উঠে গেছে। বললেন, মোটর ঠিক হয়ে গেলে একবার নিশ্চয় ওঁর এখানে হয়ে যাওয়া চাই। ডাক্তার তালুকদারও ছিলেন, আসবার সময় আমায় একপাশে ডেকে বললেন, ওঁদের নিশ্চয় নিয়ে এস, হার্টটা দুর্বল যাচ্ছে, ডিসাপয়েণ্টমেণ্ট হ'লে টপ ক'রে কোল্যাপ্স ক'রে যেতে পারে। নাও হে, তোমরা লেগে যাও।

শফার যন্ত্রপাতি বাহির করিতে লাগিয়া গেল।

ভদ্রলোক বলিলেন, সে কি, তিনি এতটা ভদ্রতা করলেন, আর আমরা দেখা না ক'রে কখনও চ'লে যেতে পারি? তিনি এখানকার কে? জমিদার?

অতুল পরিমলের পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, কে নন এখানকার তিনি?—লাইফ অ্যাণ্ড সোল।

ধীরেন আসিল,—মুখ নীচু, গম্ভীর, ত্রস্ত; একটু এদিক-ওদিক হইলেই যেন একটা গোটা রাজ্য হাতছাড়া হইয়া যাইবে। সঙ্গে একজন মালী। কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সোজা বাড়িটার দিকে গিয়া গেট খুলাইল, খটখট করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া রকে উঠিয়া সামনের দুয়ার খুলাইল, মালীটাকে সঙ্গে করিয়া ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল, খটখট ঝটপট দুয়ার-জানালা খুলিবার আওয়াজ শুরু করাইয়া দিয়া, মিনিট দুয়েকের মধ্যে আবার বাহিরে রকে আসিয়া ভিড়ের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল এবং আধ মিনিটটাক চোখ বুলাইয়া নাটকীয় পদ্ধতিতে আঙুল উলটাইয়া ইঙ্গিত করিল, যতীন, রমেশ, নেড়ু, মদন, হরকালী!

দলের মধ্যে হইতে নামকরা পাঁচজন ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া সামনে মাথা ঝুঁকাইয়া আধা-দৌড়ের চালে জুতা ঘষিতে ঘষিতে উপরে উঠিয়া গেল। আরও কয়েকজন অনুগমন করিতেছিল, অতুল কথাবার্তার মধ্যেই ইংরেজীতে বলিল, নট নাউ। তাহারা একটু অপ্রতিভ হইয়া

দাঁতে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে, কি কোমরে কোঁচা গুঁজিতে গুঁজিতে ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করিল।

মিনিট দশেকও হইবে না, ধীরেন আবার বাহিরের রকে আসিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, রেডি। এবার ওঁদের নিয়ে আসতে পার অতুল।

৩

দুইজনকে লইয়া অতুল বাংলোটাতে প্রবেশ করিল ; 'নট-নাউ'এর বোর্ডটি তখনও বাতাসে রুনরুন করিতেছিল। কিছু গেটের বাহিরে কিছু গেটের ভিতরে, যাহাদের সাহসটা আর একটু বেশি অথবা কৌতূহল-প্রবৃত্তিটা বেশি অনমনীয় তাহারা রকের উপর পর্যন্ত উঠিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। অতুল একবার বাহিরে আসিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, ভাই, উনি একটু হাত-পা ধুয়ে জিরিয়ে নিন, তারপর তোমাদের কিছু প্রশ্ন থাকে, কি কিছু বাণী নেবার থাকে, কি শুধু অটোগ্রাফ-বুক থাকে—সব ব্যবস্থা হবে। তোমাদের মনের অবস্থা বুঝছি, কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধরতেই হবে।

এই দশ মিনিটের মধ্যে অব্যবহৃত বাড়িটা ধীরেনের দল এমন করিয়া তুলিয়াছে যে, মনে হয়, বাড়ির লোকেরা এইমাত্র যেন বাহিরে একটু বেড়াইয়া আসিতে গিয়াছে। চেয়ার-টেবিল ঝকঝকে তকতকে, দুয়ার-জানালায় ধূলির চিহ্নমাত্র নাই, ফুলদানিতে ফুল, ওদিকে কুয়া হইতে জল তুলিয়া বাথরুমের টব পর্যন্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। আলনায় পাট-করা ধবধবে তোয়ালে, একটা চৌকির উপর ধবধবে ফরাশ বিছানো, গোটা কয়েক গির্দা, তাহাতে নূতন খোল ;—কাহার বাড়ি, কে এসব করিল, কখন কি ভাবেই বা করিল—ভাবিলে যেন মাথা গুলাইয়া যায়।

বাহিরে ধৈর্য্য ধরিতে বলিয়া আসিয়া অতুল বলিল, এঁদের চা-টার ব্যবস্থা ভাই পরিমল ?

পরিমল, ধীরেন আরও সকলে তটস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, পরিমল বলিল, এসে পড়ল ব'লে ?

বাথরুমে জল?

ধীরেন বলিল, রেডি।

অতুল বলিল, আপনারা তা হ'লে মুখ-হাত ধুয়ে নিন। মলিনদার ওখান থেকে চা এসে পড়বে এক্ষুনি।

দুইজনে একে একে বাথরুম হইতে ফিরিতে না ফিরিতে দুইটি লোকে প্রচুর জলযোগের সরঞ্জামের সঙ্গে খুব বড় একটা ফ্লাস্কে চা হাজির করিল। ভদ্রলোক কতকটা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, বলিলেন, এ কি ব্যাপার? যন্ত্রপাতি নিয়ে এলে যে আলাদিনের প্রদীপের খানিকটা কিন্তু তোয়ের ক'রে নিয়ে যেতে পারা যেত। না গা?

সঙ্গিনী হাসিয়া বলিলেন, তাই না তাই; আর উনি অসুস্থ, ওঁকে এভাবে ব্যস্ত করা, কি কুণ্ঠিত যে হতে হচ্ছে আমায়—কি দরকার ছিল এসবের?

অতুল বলিল, দরকার হয়তো আপনার নেই, কিন্তু দরকার ওঁর আছে, দরকার রাজগাঁয়ের, দরকার, দরকার—

ভাবের আতিশয্যে কণ্ঠনালী এমন আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, আর বলিতে পারিল না। পরিমল যোগাইয়া দিল—দরকার আমাদের।

ভদ্রলোক যেন একটা ছুতা পাইয়া হাসিয়া বাঁচিলেন, বলিলেন, এই এতক্ষণ একটা কাজের কথা হয়েছে, ঠিক, এস, তা হ'লে সবাই ব'সে যাওয়া যাক।

পরিমল অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, বলিতে লাগিল, তাই বললাম নাকি? সে হয় না, আমি তা মনে করি নি।

অতুল, ধীরেন এবং ভিতরের অন্যান্য সকলেও আপত্তি করিল, কিন্তু বনলতা দেবীর সঙ্গে আহারের গৌরব অর্জন করার বাসনাটা এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, আপত্তিটা আপনা হইতেই ক্রমে ক্রমে কেমন যেন মিলাইয়া গেল। উঁহারাও ছাড়িলেন না। পাত্রের অভাব হইল না, মালী একটা আলমারি খুলিয়া চিনামাটির ডিশ, প্লেট, কাপ ইত্যাদি বাহির করিয়া দিল। বনলতা পরিবেশন করিলেন; জলযোগ-পর্ব্ব শেষ হইল।

সন্ধ্যা উত্তরাইয়া গিয়া অন্ধকার বেশ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। পরিমল নামিয়া গিয়া একবার খবর আনিল, মোটর ঠিক হইতে এখনও প্রায় ঘণ্টা দুয়েক দেরি। জলযোগ শেষ হইলে বনলতা একটা সোফায় হেলিয়া বসিলেন, সঙ্গীও একটি আরাম-চেয়ারে বসিয়া রূপার কেস হইতে একটি সিগারেট বাহির করিলেন, অগ্নিসংযোগ করিয়া বলিলেন, ওঁদের ডাক; একটু আলাপ-সালাপ করা যাক এবার।

রাত হইয়া যাওয়ায় দলটা অনেকটা পাতলা হইয়াছিল, যাহারা বাকি ছিল আসিয়া ফরাশের উপর অথবা চেয়ারে আশ্রয় গ্রহণ করিল; কয়েক-জন বিনয়াধিক্যবশত উপরে বসিতেই চাহিল না; মেঝেয় পাতা শতরঞ্চির উপর দুই হাত জড়ো করিয়া বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাঁহার নিজের যে কোন মূল্যই নাই—ভদ্রলোকের একথা অগোচর ছিল না, বলিলেন, নাও, তোমাদের যদি কিছু জিজ্ঞেস করবার থাকে তো ওঁকে জিজ্ঞেস কর।

একটি ছেলে অত্যন্ত বিনীতভাবে, প্রায় বিগলিত হইয়া প্রশ্ন করিল, সব কথার কি উত্তর দেবেন উনি আমাদের দয়া ক'রে?

ভদ্রলোক হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, তা ব'লে আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন, টিপু সুলতান কোন্ সালে মরেছিল, সে উত্তর কি উনি দিতে পারবেন?

ছেলেরা অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া বলিল, না, সে কথা বলছি না, সে কথা—

একটা চাপা হাসি উঠিল; কি বলিতে চাহিতেছিল সেটা আর আপাতত বলা হইল না। একে একে খান-দশেক অটোগ্রাফ-বুক বাহির হইল। সাহস বাড়িয়া যাইতেছে, শুধু নাম-সহিতেই কেহ সন্তুষ্ট হইতে চাহিল না; কিছু 'বাণী'ও ছাড়িতে হইল। এ পর্ব্বটা শেষ হইলে সকলে আবার আসিয়া যথাস্থলে বসিল। একটু চুপচাপ গেল।

অগ্রণী হিসাবে অতুলই আলাপ শুরু করিল। সোজাসুজি বনলতার দিকে যাইয়াই প্রশ্ন করিল, আমাদের গ্রাম আপনার লাগছে কি রকম?

উত্তর হইল, খুব চমৎকার।

ধীরেন বসিয়া বসিয়াই অল্প একটু আগাইয়া বলিল, কি রকম 'খুব চমৎকার'?

ভদ্রলোকের ঠোঁটে যেন একটু হাসি ফুটিল, সিগারেটে একটা চাপ দিয়া সেটা মিলাইয়া লইলেন। বনলতা বলিলেন, কেমন এর মধ্যেই নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, কলকাতায় এতক্ষণ বাস, ট্রাম, মোটর—কান যেন ঝালাপালা ক'রে দেয়।

পরিমল পাশের ছেলেটিকে বলিল, বলবার ভঙ্গিটা মার্ক ক'রে যাস, ওঁর ফেবারিট স্টাইল।

অতুল প্রশ্ন করিল, তা হ'লে রাজগাঁয়ের কথা আপনি ভুলে যাবেন না—আমরা এ রকম আশা করতে পারি?

ভদ্রলোক চোখ বুজিয়া সিগারেট টানিতেছেন। এরূপ নিগ্রহে যেন অভ্যস্ত, এই করিয়াই কাটাইয়া দেন।

বনলতা অল্প একটু সোজা হইয়া ডান হাতের উপর বাঁ হাতটা রাখিলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন, আমায় এতই অকৃতজ্ঞ ভাবেন?

সকলে সামনে ঝুঁকিয়া উৎকট আবেগে চাহিয়া ছিল, পরিমল 'উস' করিয়া কতকটা সজোরেই শব্দ করিয়া উঠিল, তাহার পর রগ দুইটা টিপিয়া চাপা গলায় বলিল, হুবহু এই পসচার, এই কথা। কোন্‌ সেটা, কোনমতেই নামটা মনে পড়ছে না, আরে আরে!

সব প্রশ্নের উত্তর পাইবে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া যে ছেলেটি প্রথমেই কথা কহিয়াছিল, সে কয়েকবার হাঁ করিয়া আবার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ বন্ধ করিয়া লইয়া এতক্ষণ কাটাইল। তাহার প্রশ্নটা একটু বেখাপ্পা আর অদ্ভুত ধরনের বলিয়া সাহস সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না; হাসিমুখে এতবড় একটা কথা বলিতে শুনিয়া আর নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না; একটু উঠিয়া বলিল, একটা কথা—

বনলতা বলিলেন, বলুন।

ভদ্রলোক চোখ খুলিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে তাহার দিকে চাহিলেন। চোখোচোখি হইতে ছোকরা নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, না, থাক।

ভদ্রলোক আবার সিগারেটে মনঃসংযোগ করিলেন।

ধীরেন প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, কো-এডুকেশন সম্বন্ধে আপনার মত কি? এই—ছেলে-মেয়েদের একসঙ্গে স্কুল-কলেজে যাওয়া সম্বন্ধে?

সঙ্গিনীর অবস্থা অনুমান করিয়া ভদ্রলোক নিজেই উত্তর দিলেন, চক্ষু বুজিয়াই বলিলেন, মন্দ কি?

অন্য প্রশ্ন আসিয়া এটাকে চাপা দিল।

আচ্ছা, গান্ধীজী সম্বন্ধে আপনার মত কি?

বনলতা আবার একটু নড়িয়া বসিলেন, যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন, তিনি আমার প্রণম্য।

পরিমলের আবার কোন্ প্রেমের কথা মনে পড়িয়া গেল, শব্দ করিয়া উঠিল, ইস্!

আবার প্রশ্ন হইল, চরখার সম্বন্ধে?

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন। সিগারেটটা সরাইয়া বলিলেন, তাও প্রণম্যই, তবে দূর থেকে।

বনলতা তাঁহার পানে চাহিয়া রাগের অভিনয় করিয়া বলিলেন, আঃ!

প্রশ্নকর্তার দিকে চাহিয়া বলিলেন, আপনি কাটেন চরখা?

ছোকরা একটু থতমত খাইয়া গেল, অতুল বলিল, ওর বলবার উদ্দেশ্য, মানে আপনি যদি বলেন তো—

ভদ্রলোক বলিলেন, হ্যাঁ, যার তার কথা শুনে একটা কিনে বসা—

সেই প্রথম-প্রশ্নকারী ছেলেটি ইহার মধ্যে আরও অনেকবার হাঁ করিয়াছে, মুখ বন্ধ করিয়াছে, আর থাকিতে পারিল না। ভদ্রলোকের দিকে একেবারেই না চাহিয়া, বেশ খানিকটা উঠিয়া বসিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, হ্যাঁ, আমি যা বলছিলাম, আপনার ওই কানবালা,—ওই জোড়াটাই কানে দিয়ে কি আপনি 'তরুণের অভিমানে' অ্যাপিয়ার হয়েছিলেন?

যাহাকে বলা, তাহার কানের অবস্থা যে কি হইল, অবশ্য বোঝা গেল না। ভদ্রলোকের মুখটাও গম্ভীর হইয়া গেল, ছেলেদের ফিসফিসিনিও হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। অতুল সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল,

স্টারেদের ব্যবহারের জিনিস জাতির গৌরবের বস্তু কিনা, কেষ্ট তাই বলছিল, হলিউডে শুনেছি—

ভদ্রলোক হাতঘড়িটা দেখিয়া বলিলেন, মোটরের দেরি কত আর? রাত নটা হতে চলল। একবার দেখ তো ভাই।

অতুল উঠিল, তাহার সঙ্গে ধীরেন উঠিল, কেষ্ট উঠিল, পরিমল উঠিল, তাহার পর বাকি সকলেই প্রায় একসঙ্গে উঠিয়া পড়িল। গেটের কাছে আসিয়া একটা ঘটনা হইল। সবাই মুগ্ধ, অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, কি চমৎকার লোক, একটু গুমর ব'লে জিনিস নেই, আর ঠিক যেমনটি সিনেমায় দেখা, সেই চেহারা, সেই পোজ, সেই কথা বলিবার ভঙ্গি,—হাসিটা তো হুবহু সেই। সকলের মুখেই এক অনুরোধ—অতুল ভাই, অন্তত রাতটুকুও যাতে থেকে যান তার চেষ্টা কর, চব্বিশ ঘণ্টা না হোক, একটা রাতও রাজগাঁয়ে কাটিয়ে গেলে বলবার মুখ থাকবে।

অতুল বলিল, আমি ঠিক রাস্তা ক'রে আনছিলাম, কথাটা পাড়ব পাড়ব, কেষ্টা কাননবালার কথা তুলে সব মাটি ক'রে দিলে। ভুই, হতভাগা, এত জিনিস থাকতে কাননবালার কথা তুলতে গেলি কেন?

কেষ্ট কি বলিতে যাইতেছিল, চারিদিক হইতে ধাবা খাইয়া চুপ করিয়া গেল। অতুলের উপর জোর তাগিদ হইতে লাগিল, রাত্তিরটা কোনমতে করতেই হবে রাজি। বলবি, আমরা এতগুলি—এতগুলি—

পরিমল বলিল, সোজা কথাটাই বল না, লজ্জাটা কিসের? একটা ভাগ্যি! এতগুলি ভক্ত মিলে অনুরোধ করছি।

অতুল ভাবিতেছিল, বলিল, ভক্ত, সে তো আর ওঁকে গিয়ে বলা যায় না; ওটা হৃদয়ের কথা। যাই হোক, একটা ব্যবস্থা করছি, একটা ঠাউরেছি মতলব। ধীরেন, তুই সাইকেল নিয়ে বোঁ ক'রে বেরিয়ে যা, বলিনদাকে বল, ওঁরা রাত্তিরটা থেকে গেলেন, বড় শিগগির হয় দুজনের খাবার করিয়ে পাঠিয়ে দিতে, বিছানাপত্র তো এখানে আছেই।

রমেশ প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, কি মতলব?

অতুল বাধা দিয়া বলিল, ঠাউরেছে অতুল ঘোষ একটা। তোমরা কিন্তু বাড়ি যাও সবাই, ভেজাল করলে চলবে না। কাল ভোরে আসবে

সব। আমরা তিনজনে রইলাম, আর যতীন আর মদনও থাক না হয়। আর হরকালী, তুই সোজা গিয়ে দোত-কলম নিয়ে ব'সে যা, একটা অভিনন্দন, পত্তে।

হরকালী বলিল, বাঁধাব কি ক'রে?

বাড়িতে ঠাকুর-দেবতার একটা বাঁধানো পট-ফট নেই? খুলে তার ফ্রেমে এঁটে নিয়ে আসিস, পরে দেখা যাবে।

রাত প্রায় এগারোটা। আহারাদি সারিয়া বনলতা আর তাঁহার সঙ্গী বাহিরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। দুইজনেই দারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কাহারও মুখেই কোন কথা নাই, সঙ্গী শুধু ঊর্দ্ধমুখ হইয়া নিঃশব্দে চুরুট টানিয়া যাইতেছেন।

উহাদের মধ্যে শুধু অতুল আসিয়াছে, মালীটাকে লইয়া হলের ওদিককার ঘর দুইটাতে শয্যা রচনা করিতেছে। বাকি চারজন এখনও আহার সারিয়া আসিতে পারে নাই। সবাই যে আসিতে পারিবে তাহারও কোন স্থিরতা নাই, লুকাইয়া পলাইতে হইবে তো।

বনলতা একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছেন, যে বেঘোরে পড়িয়াছেন দোষ দেওয়াও যায় না। অনেকক্ষণ চুপ থাকিয়া বলিলেন, আমি বলছি, এদের মতলব খারাপ, আমার কানবালার দিকে নজর এইজন্তেই পড়েছিল। তুমি যাও পুলিসে খবর দিতে।

চিন্তিত টানের মধ্যে প্রশ্ন হইল, যদি হয়ই সেই ধরনের সব তো আমি যেতে গেলেই পথ আটকাবে না? চাই কি, খুনজখমও করতে পারে। আর পথই কি চিনি?

বনলতা আবার এলাইয়া পড়িলেন, অসহায়ভাবে বলিলেন, কি হবে? একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, হয়েছে, ওরা এখন ওদিকে, তুমি চট ক'রে বেরিয়ে পড়।

তোমায় একলা ওদের হাতে ফেলে রেখে?

বনলতা আবার এলাইয়া পড়িলেন, বলিলেন, তাই তো! আমার

বুক ধড়ফড় করছে, ওরা রাত্তিরে একটা কাণ্ড করবেই, চারিদিকেই ডাকাতির খবর শোনা যাচ্ছে আজকাল।

কাঁদকাঁদ হইয়া বলিলেন, না হয় এক কাজ কর।

কি?

ওদের ওই সর্দ্দারকে ডাক, আমার গায়ের গয়না সব খুলে দিই, প্রাণে রেহাই দিক।

যদি তেমনই কিছু হয় তো সেই সময় খুলে দিলেই হবে। একটু চুপ ক'রে দেখ, বিপদে অত উতলা হ'লে চলে না। আমার মনে হয়, ওসব কিছু নয়, আমার অনুমানটাই ঠিক।

তোমার মাথা-খারাপ হয়েছে।

আবার একটু নিস্তব্ধতা। ওদিককার ঘর হইতে একটু-আধটু শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে, বোধ হয় মশারি খাটাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। একটু পরে বনলতাই বলিলেন, একটা টায়ার এদিক ওদিক কেটে দিলে, একস্ট্রা চাকাটা সরিয়ে ফেললে—কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পেলে না?

টের পাওয়ার যতক্ষণ সম্ভাবনা, ততক্ষণ এসব করে নি।

আমাদের আটকে রাহাজানি করবারই মতলব যদি না থাকে তো কেন করতে যাবে অমন? তোমার পাজুরি কথা।

ওদের হিংসে নেই, শুধু আমারই আছে?

রসিকতা রাখ, ওদের হিংসেটা কিসের জন্যে শুনি?

একদল ভেতরে রইল, সঙ্গে গেলে পর্য্যন্ত। যারা বাইরে প'ড়ে রইল, তাদের হিংসে হবে না?

তোমার মাথা-খারাপ হয়েছে।

মেনে নিলাম।

মেনে নিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাক।

আর একটা সুবিধে আছে; এক-আধটা মোটর গেলে চেঁচিয়ে থামাব।

সঙ্গিনীর বোধ হয় মনে হইল, মাথাটা নিতান্ত খারাপ হয় নাই।

একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, মোটর তোমার জন্তে হুড়োহুড়ি ক'রে আসবে!

সম্ভাবনা খুবই কম, রাত বেড়ে গেল, একটা লোকের পর্য্যন্ত মুখ দেখা যাচ্ছে না, তবু—যদি নিতান্ত—

অতুল আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, বিছানা হয়ে গেছে, উঠবেন?

ভদ্রলোক বলিলেন, এইখানেই একটু বসি, বেশ ঠাণ্ডা আছে; আপনি বাড়ি চ'লে যাবেন?

অতুল একটু হাসিয়া বলিল, আমার কি মনুষ্যত্ব নেই? এরাও আসছে, সবাই না থাকুক, পরিমল আর ধীরেন তো আসবেই, আপনাদের কোন রকম ভয় নেই।

ভয়ের মধ্যে এক রকম কাটিতেছিল, সান্ত্বনার কথায় বনলতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, দেখুন, ভয় আমরা সত্যিই পেয়েছি—

সঙ্গী হাতটা টিপিয়া ইশারা করিলেন, কিন্তু বক্তৃীর তখন গলা কাঁপিয়া গিয়াছে, আর নিজেকে সংযত করিতে পারিলেন না, বলিলেন, না, বাধা দিও না, এঁদের বলি সব, দেখুন, আপনাদের যদি গয়নাটয়নার দরকার হয় তো খুলে দিচ্ছি, আমাদের প্রাণে—

আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

কাঁদিবার একটু অবসর দিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, তুমি শান্ত হও, এদের মিছে অপবাদ দিচ্ছ। মোটর বিগড়েছে অবধি এরা এত করছে, সে—

অতুলও প্রায় সংযম হারাইয়া ফেলিয়াছিল, কতকটা নাটকীয় ভঙ্গিতেই বসিয়া পড়িয়া বলিল, উনি মিছে অপবাদ দিচ্ছেন না।

ভদ্রলোক বিস্মিতভাবে চাহিলেন।

অতুল বলিল, মিছে অপবাদ কি ক'রে বলব? আমাদের মধ্যেই কারও এই কীর্ত্তি। বিশ্বাস করুন, কাল সকালেই তাকে আপনার

পায়ের কাছে এনে হাজির করব, যা সাজা হয় দেবেন। তবে এই বলি, যেই হোক, আপনি যা বলছেন, ওরকম অভিসন্ধি তার ছিল না—

তাহারও গলাটা কাঁপিয়া উঠায় আর অগ্রসর হইতে পারিল না।

● ● ●

অতুলের কণ্ঠে আন্তরিকতার সুর থাকায় অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেও, রাত্রিটা উভয়েরই এক রকম অনিদ্রায় এবং বাহিরে বাহিরেই কাটিল। ক্লান্তি এবং উদ্বেগে অবসন্ন হইয়া শেষের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, যখন উঠিলেন, একটু বেলা হইয়াছে। অনেকগুলি ছেলে একত্রিত হইয়াছে, আরও আসিতেছে। উভয়ে মুখ-চোখে জল দিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কালকের সেই দফার আসিয়া কাটা টায়ারটা প্রায় খুলিয়া বাহির করিয়াছে। কাছেই অতুল, তাহার হাতে এক জোড়া নূতন টায়ার আর টিউব। তাহার পাশে আর একটি ছেলে, হাতে গোটা দুই মালা আর ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মত একটা কি।

ইহারা বাহিরে আসিতেই অতুল আর অপর ছেলেটি উঠিয়া আসিল, অন্যান্য ছেলেরাও পিছনে পিছনে আসিয়া ইহাদের চারিদিক দিয়া ঘিরিয়া ফেলিল—খুব একটা থমথমে সম্ভ্রান্ত ভাব।

অতুল ভাবে একেবারে অরজর হইয়া রহিয়াছে, টিউব আর টায়ার জোড়া বাঁ হাতে গলাইয়া লইল, সঙ্গীর হাত হইতে মালা আর ফ্রেমটা লইয়া বনলতার পানে চাহিয়া হাত দুইটা অল্প একটু চিতাইয়া বলিল, এই আপনাদের অপরাধী, যা ইচ্ছে হয় সাজা দিন।

দুইজনে ঘুম হইতে সদ্য উঠিয়াই এমন অদ্ভুত সমাবেশের মধ্যে পড়িয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছেন। নির্ব্বাক হইয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। অতুল বলিয়া চলিল, কিন্তু বিশ্বাস করুন, অপরাধীর কোন কু-অভিসন্ধি ছিল না, ওসব দুর্ব্বলতার সে বহু ঊর্দ্ধে, তার একমাত্র দুর্ব্বলতা:—সে রাজগ্রামকে ভালবাসে, আর তার একমাত্র বাসনা ছিল যে—অন্তত একটা রাত কাটিয়েও আপনি সেই রাজগ্রামের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে—

ভদ্রলোক বুঝিয়াছিলেন, বাধা দিয়া বলিলেন, দাঁড়াও, আগে ওই টায়ার আর টিউবটা দিয়ে আসতে বল, ফিট ক'রে ফেলুক।

ভাবের ঘোরে বাধা পাইয়া অতুল একটু মুষড়াইয়া গেল, হাত হইতে টায়ার আর টিউব বাহির করিয়া পরিমলের হাতে দিয়া বলিল, যাও ভাই, দিয়ে এস।

পরিমল প্রশ্ন করিল, আর কাটা টায়ার-টিউব জোড়াটা রাজগাঁয়ের সম্পত্তি হয়ে থাকবে তো? স্মৃতিচিহ্ন—

অতুল করুণ নেত্রে বনলতার পানে চাহিল। মেয়েছেলের মন বোধ হয় গলিয়া যাইবে, কিন্তু ভদ্রলোক ভাবরাজ্যে অনেক ঘা খাইয়াছেন, কাটা টায়ারটার মূল্য সম্বন্ধেও পুরা জ্ঞান আছে, বলিলেন, না না, সে কি ঠিক হয়, কাটা টায়ারটি দেখে ক্রমাগতই বুকে একটা অশ্রু ঠেলে উঠবে, সেটা আমরা প্রাণ ধ'রে কি ক'রে হ'তে দিই।

অতুল একটা বুক-ভাঙা নিশ্বাস মোচন করিল, বলিল, তবে তাই হোক, যাও ভাই। একটা রাত সে ধ'রে রাখতে পেরেছিলাম এই আমাদের পরম সান্ত্বনা।

তাহার পর ফ্রেমটা সোজা করিয়া ধরিয়া আবেগকম্পিত স্বরে অভিনন্দনটা পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

এক-চক্ষু

মায়ের প্রেত-আত্মা বিদায়
কলেজস্কোয়ার-তীরে,
শ্রেণী-সংগ্রাম চাপিতে পড়িল ঢাকা,
দূর বাহিরের "ক্যাপি"-ভয়ে আজ
আমাদের ঘুম নাই,—
ঘরের ক্যাপিই তুলিছে প্রাসাদ পাকা।
পৃথিবী ঘুরিছে, তার সাথে ঘুরে
জীবন ও মতবাদ,—
মানব-মনের রং বদলায় কত।
জল মেরে যারা করে জুতো দান
আজি শুনি তাহাদের—
পঞ্চমুখেতে জয়গান শত শত।
ভিক্ষার কণা পেয়ে ভিক্ষুক
জানায় আশীর্বাদ,
ভাবে মনে,—এরা এতদিন কোথা ছিল?
দিনের আলোতে বুঝিতে পারে না,
ইহাদেরই কেহ কেহ
রাতের আঁধারে ঘরে তার সিঁদ দিল।

শ্রীকমলাপ্রসাদ চৌধুরী

চতুর্দ্দশপদী

চোদ্দটি অক্ষরে গড়া মধু পদাবলী—
রৌদ্র-ক্লান্ত বৈশাখের দীর্ঘ পথ চলি
রথ হতে নামিয়াছে মোর দ্বারে আসি
শ্রান্ত কণ্ঠে বলেছে সে, লহ মোর বাঁশী।

বাঁশী খানি হাতে লয়ে নির্জ্জন সন্ধ্যায়
সপ্তমীর চাঁদ-আঁকা তারা-বীথিকায়
ফিরিতেছি আর ভাবিতেছি।
কি বাজাব?
কি সুর সাধিব? কোন্ লোক হতে পাব
হেন নিবেদন যাহা মোর চিত্ত ভরি
বাঁশরীর সপ্তরন্ধ্র-পথ ধরি ধরি
মহাপ্রাণ বর্ণে বর্ণে জাগাবে শিহর?

আচম্বিতে জলে স্থলে ওঠে হাস্য-ঝড়।

চোদ্দটি অক্ষরে সাধা দেখি গাহে বাঁশী—
ভালবাসি, ভালবাসি, তোরে ভালবাসি।

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

জীবনের মূল্য

জীবনটা যেন হাট-বাজারের পণ্য
বণিকস্বার্থে কমে বাড়ে তার মূল্য,—
নানা সময়ের সজীবা যেন কণ্ঠে
কভু পাদুকায় কখনও ফুলের মাল্য।

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

গোপন কথা

প্রথম নাতিনী হইয়াছে, তাহাকেই দেখিবার জন্য ট্রেনে চড়িয়া বহুদূরের পথে যাত্রা করিয়াছিলাম।

প্রথম নাতিনী হইলে মনের ভাব কেমন হয়, তাহার বর্ণনা করিব না; সুহৃদ্বর তারাশঙ্কর সম্ভবত তাঁহার স্বীয় মনঃসমীক্ষণের বিবরণ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন;—পঞ্চদশ বৎসর পরে তাঁহার নাতিনীটি পঞ্চদশ বৎসরের হইবে, এই সুমধুর ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া তিনি বিভোর, ইহা আমরা জানি। সুতরাং অলমিতি।

ট্রেনে অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়াছি, এখনও অর্দ্ধেক বাকি। একটা বড় স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছিল; আমি বোধ করি নবীনা নাতিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতে একটু আচ্ছন্নের মত হইয়া পড়িয়াছিলাম, পাশের প্ল্যাটফর্মে উল্টা দিক হইতে একটা গাড়ি আসিয়া থামিতে সচেতন হইয়া উঠিলাম।

দুই গাড়ির মধ্যে হাত দুই-আড়াই ব্যবধান। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইতেই ও-গাড়ির জানালায় একটি মহিলার সঙ্গে চোখোচোখি হইয়া গেল। যুবতী নয়, বয়স চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে; ভারিভুরি গড়ন। কিন্তু মুখ হইতে যৌবনের কমনীয়তা সম্পূর্ণ মুছিয়া যায় নাই। শাড়ির চওড়া লাল পাড় কাঁধের উপর খসিয়া পড়িয়া তাঁহার মুখটিকে যেন অপরাহ্নের অস্তরাগে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। ও-গাড়ির ভিতর দিকে বোধ হয় আরও দুই-চারিটি স্ত্রীলোক ছিলেন, কিন্তু আমার চোখে তাঁহারা অস্পষ্ট পশ্চাৎপটের মত আবছায়া হইয়া রহিলেন; আমি কেবল এই মহিলাটির দিকেই বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলাম।

তিনিও প্রথমটা মুখ ফিরাইয়া লইয়া, আবার যেন দ্বিগুণ আগ্রহ-ভরে আমার মুখের পানে চাহিলেন। দুইজন অপরিচিত প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া নির্লজ্জ উৎকণ্ঠায় পরস্পর মুখের পানে তাকাইয়া আছে। কিন্তু—সত্যই কি অপরিচিত? তাঁহার অধরোষ্ঠ ঈষৎ খুলিয়া গেল; দেখিলাম, সম্মুখের দুইটি দাঁতের মধ্যে একটি অপরটির উপর সামান্য অনধিকার অভিযান করিয়াছে।

পঁচিশ বৎসরের রুদ্ধ কবাট মুহূর্ত্তে খুলিয়া গেল; একসঙ্গে অনেকগুলা কথা হুড়মুড় করিয়া কণ্ঠ দিয়া বাহির হইতে চাহিল, কিন্তু কোনটাই বাহির হইতে পাইল না। এই সময় হেঁচকা দিয়া আমার গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

. .

ক্ষণকাল জড়বৎ বসিয়া রহিলাম, তারপর জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম, গোপন কথা!

তিনি তখন দূরে সরিয়া যাইতেছেন; দেখিলাম, শাড়ির লালপাড় আঁচলটা মাথায় তুলিয়া দিয়া তিনি মুখ বাড়াইয়া হাসিলেন, তারপর সঙ্কেত-ভরা একটি তর্জ্জনী তুলিয়া ঠোঁটের উপর রাখিলেন। পঁচিশ বছরের পুরানো একটি দিন চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। ওই হাসি ও সঙ্কেতের মর্ম্ম আমরা দুইজন ছাড়া পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।

গোপন কথা! একটি নবীন যুবক ও একটি সম্পূর্ণ অপরিচিতা নবযুবতীর মধ্যে একদিন একটি নির্জ্জন স্থানে কিছু গোপন কথার বিনিময় হইয়াছিল। নিন্দনীয় কথা নয়, জানিতে পারিলে পুলিসে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে এমন কথাও নয়—তবু গোপন কথা! শতাব্দীর একপাদ ধরিয়া এই কথাটি বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছি; ইহজীবনে যে নারীটির সহিত সর্ব্বাপেক্ষা নিবিড়তম ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, তাঁহার কাছেও কোনদিন প্রকাশ করি নাই। পাঠকের হয়তো কৌতূহল হইতেছে, কি এমন গোপন কথা! কিন্তু বলিব না। হয়তো তাহার মধ্যে একটু অম্লমধুর কৌতুকের রস ছিল, হয়তো যৌবনের অর্থহীন চপলতা ছাড়া তাহাতে আর কিছুই ছিল না। তবু বলিতে পারিব না, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যিনি এই গোপন কথার অংশভাগিনী ছিলেন, যিনি এইমাত্র চকিতের জন্য দেখা দিয়া কোন্ অজানা নিরুদ্দেশের অভিমুখে চলিয়া গেলেন, যাঁহার সহিত ইহজীবনে বোধ হয় আর কখনও চোখোচোখি হইবে না, তিনিও এই কথা সযত্নে অতি সন্তর্পণে সকলের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিয়াছেন; যে পুরুষটির সহিত তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, তাহাকেও একটি কথা বলেন নাই।

মনটা কিছুক্ষণ পূর্ব্বে দূরভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতেছিল, এখন দূরতর অতীতের পানে ফিরিয়া চলিল। কি আশ্চর্য্য এই মানুষের মন! শুধু অতীত আর ভবিষ্যৎ লইয়াই কি তাহার অস্তিত্ব? বর্ত্তমান কতটুকু? স্মৃতি ও আকাঙ্ক্ষার মাঝখানে দ্রুতসঞ্চরমান একটি বিন্দু! তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই, এক ফোঁটা পারার মত কেবলই সে পিছলাইয়া হাতের বাহিরে চলিয়া যায়, ধাবমান ট্রেনের জানালা দিয়া দৃষ্ট নিসর্গের মত মুহূর্ত্তে সম্মুখ হইতে পশ্চাতে অদৃশ্য হয়—

আমার নাতিনী যখন পনেরো বছরের হইবে, তখন তাহার কানে কানে আমার গোপন কথাটি বলিব কি? না, বলিব না। অতীতের এই সামান্য কথাটি ভবিষ্যতের কাছে চিরদিনের জন্য অকথিত থাকিয়া যাইবে। এই সেখানেই আমাদের গোপন কথার পরম পরিপূর্ণতা।

* * *

স্থানটি লোকালয় হইতে দশ-বারো মাইল দূরে। পাহাড় আছে, ভগ্নস্তূপ আছে, একটি মুখরস্রোতা গিরিনির্ঝরিণী আছে—আর আছে, তন্দ্রানিবিড় মুগ্ধ নির্জ্জনতা। একদিন ফাল্গুনের আরম্ভে একটি কবোষ্ণ দ্বিপ্রহরে বাইসিক্লে আরোহণ করিয়া একাকী এই স্থানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

স্থানটি বড় ভাল লাগিয়াছিল। সুদূর অতীত যেন কর্ম্মক্লান্ত বৃদ্ধার মত সংসারের কাজ শেষ করিয়া একান্তে বসিয়া ঝিমাইতেছে; আর তাহার কর্ম্ম নাই, কর্ম্মে আসক্তিও নাই, হয়তো তাহার স্বপ্নের মধ্যে পুরাতন স্মৃতি ছায়ার মত আনাগোনা করে। ভাঙা পাথরের ভূমি-শয়ান মূর্ত্তির উপর দিয়া শিকারসন্ধী বন্য গিরগিটি যখন সরসর করিয়া ছুটিয়া যায়, বুড়ী তন্দ্রার মধ্যে একটু উসখুস করে—

কিন্তু সেদিন আমার মনে ঐতিহ্যের রস ভাল করিয়া জমিতে পায় নাই। তাহার প্রধান কারণ, দুইটা কোকিল ভগ্ন স্তূপের দুই প্রান্তের কোন্ পল্লব-পুঞ্জে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বড় তর্ক আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। একটি তার্কিকের মেজাজ কিছু কড়া, অপরটি মৃদুবাক্য-প্রিয়। একজন যতই মোলায়েম সুরে ব্যক্ত করিতেছিল, অন্যটি ততই ঝাঁঝিয়া উঠিয়া

রূঢ়কণ্ঠে জবাব দিবার চেষ্টা করিতেছিল। কি লইয়া তর্ক তাহা অনুমান করিতে পারি নাই, কিন্তু লক্ষ্যহীনভাবে এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে ঈষৎ কৌতুকের সহিত মনে হইয়াছিল, বুড়া কাজ শেষ করিয়া যতই ঝিমাক, পৃথিবীতে যৌবন বসন্ত ও কোকিলের কাজ কোনও দিনই শেষ হইবে না।

ডাকিকদের তর্ক ক্রমশ উষ্ণতর হইয়া উঠিতেছিল। হঠাৎ এক সময় একটা ভাঙা মন্দিরের মোড় ঘুরিয়া দেখিলাম, বাক্‌প্রিয় কোকিলটি পাখী নয়—একটি মেয়ে। তাহার উৎকণ্ঠনিঃসৃত কুহুধ্বনি আমাকে দেখিয়া অর্দ্ধপথে থামিয়া গেল।

মেয়েটি মন্দিরের দেয়ালে পিঠ দিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে; আমার পানে অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর বলিল, আপনি কোথা থেকে এলেন?

আমিও কম অবাক হই নাই। তাহার বয়স ষোল কি সতেরো; ঈষৎ তন্বী, মুখখানি মোমের মত সুকুমার, গলাটি মিষ্ট; কিন্তু কোকিলের গলা যে অবিকল নকল করিতে পারে, তাহার গলা সম্বন্ধে অধিক বলাই বাহুল্য। আমি বলিলাম, আমি ভেবেছিলুম আপনি কোকিল।

সে হাসিল। সম্মুখের একটি দাঁতের উপর অন্য দাঁতটি একটু অনধিকার অভিযান করিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলাম। সে মৃদু তরল কণ্ঠে বলিল, আপনি বুঝি অন্য কোকিলটা?

সত্যকার অন্য কোকিলটা অপর পক্ষের সাড়া না পাইয়া থামিয়া গিয়াছিল, এখন সহসা বিজয়োৎফুল্ল কণ্ঠে কয়েকবার দ্রুতচ্ছন্দে ডাকিয়া উঠিল; কু কু কু কু কু—

দুইজনে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলাম।

তারপর ভাব হইতে বিলম্ব হয় নাই। এত শীঘ্র এত ভাব হইয়া গিয়াছিল কি করিয়া এখন ভাবি। এ দেশটা বিলাত নয়, অন্তত তখনও বিলাত হইয়া উঠে নাই। অনাত্মীয়া যুবতীর সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিবার অভ্যাসও ছিল না। অথচ মুহূর্ত্তের জন্যও বাধোবাধো

ঠেকে নাই। বালক-বালিকা যেমন সহজ প্রীতির সহিত কিছুমাত্র আত্মসচেতন না হইয়া পরস্পর মিলিত হয়, আমরাও তেমনই মিলিত হইয়াছিলাম। তাহার নাম তটিনী; সে সপরিবারে এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে; আর সকলে দুই মাইল দূরে আর একটা ভগ্ন স্তূপ পরিদর্শন করিতে গিয়াছেন, তটিনী কিন্তু অনর্থক ঘুরিয়া বেড়ানোর চেয়ে এখানে বসিয়া কোকিলের সহিত কলহ করাই অধিক উপাদেয় মনে করিয়াছে—এসব কথা পরিচয়ের আরম্ভেই জানিতে পারিয়াছিলাম। আমিও পরিচয় দিতে কার্পণ্য করি নাই।

সেদিন বসন্তের বাতাস আতপ্ত আলিঙ্গনে আমাদের জড়াইয়া লইয়াছিল। কোকিল তো ডাকিয়াছিলই; কয়েকটা নবজাত প্রজাপতি চারিপাশে নাচিয়া নাচিয়া অকারণ চটুলতা প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু সেদিনকার স্মৃতির মঞ্জুষায় যে কথাটি আজও আমার মনে আনন্দের প্রভা বিকিরণ করিতেছে তাহা এই যে, বসন্ত আমাদের জয় করিয়া লইয়াছিল বটে, কিন্তু বসন্তসখার দেখা সেদিন পলকের জন্যও পাই নাই। আমাদের স্বর্গে কৌতুকের কোনও দেবতা আছেন কিনা জানি না; সম্ভবত আছেন, কারণ তিনিই সেদিন আমাদের যৌবন-যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন।

দুইজনে ছুটোছুটি করিয়াছিলাম; লুকাচুরি খেলিয়াছিলাম; নির্ঝরিণীর ধারে পাশাপাশি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিয়াছিলাম। এমন স্বাদু ও এত শীতল জল আর কখনও পান করি নাই। সেই ঝরনার জলের স্বাদ আজও আমার মুখে লাগিয়া আছে।

ক্রমে বিদায়ের কাল উপস্থিত হইয়াছিল।

আপনি এবার চ'লে যাবেন?

হ্যাঁ। দূরে গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। ওঁরা এসে পড়বার আগেই আমি চ'লে যাই। নইলে আজকের এই নিখুঁত দিনটার ওপর দাগ প'ড়ে যাবে।—আচ্ছা, চললুম।

অকপট সৌহার্দ্যে তাহার পানে হাত বাড়াইয়া দিয়াছিলাম। সে

আমার হাতখানা দুই হাতে তুলিয়া লইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়াছিল।

আর কখনও আমাদের দেখা হবে না!

সম্ভব নয়। কিন্তু এই ভাল।

হ্যাঁ। আজকের দিনটা আমার অনেক দিন মনে থাকবে।

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল।

এস, এক কাজ করি। তা হ'লে কেউ কাউকে ভুলব না। আমি তোমাকে আমার একটি গোপন কথা বলি, তুমি আমাকে একটি গোপন কথা বল। কিন্তু শপথ রইল, কেউ কোনদিন আর কারুর কাছে এ কথা বলব না।

সে ক্ষণকাল ভাবিয়াছিল; ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

আচ্ছা।

আমি তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া একটি গোপন কথা বলিয়াছিলাম—শুনিয়া সে চকিত সকৌতুক দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়াছিল। তারপর একটু হাসিয়া একটু লাল হইয়া আমার কানে কানে তাহার গোপন কথাটি বলিয়াছিল।

সে দাঁড়াইয়া রহিল, আমি চলিয়া গেলাম। কিছুদূর গিয়া একবার ফিরিয়া দেখিলাম। সে একটু হাসিয়া ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিল।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনর্মিলন

আমারি প্রাক্তন বঁধু, পথে দেখা, এল কাছাকাছি।
শুধাল, 'আছেন ভাল?' ম্লান হেসে কহিলাম, 'আছি।'●

"কল্লোল দল"

নিষ্কৃতি

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি। সকালবেলায় বৈঠকখানায় বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম। রাশিয়া ও জার্মানির বিপুল সৈন্য-সমাবেশ, আমেরিকায় চার্চিল ও রুজভেল্টের যোগাযোগ, চীনে চীনা সৈন্যের জয়লাভ ও জাপানী সৈন্যের পশ্চাদপসরণ, বর্মাতে ব্রিটিশ বিমানবহরের বোমা-নিক্ষেপ, দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা কর্ত্তৃক কালাদের কর্ণমর্দ্দন, ভারতে গান্ধীজীর জিন্নার সহিত বদ রসিকতা, বাংলায় নিদারুণ খাদ্যাভাব, চট্টগ্রামে চল্লিশ টাকা চালের মণ—চমকিয়া উঠিলাম, চেতাবনির ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়া উঠিতেছে দেখিতেছি! কলিযুগের আয়ুষ্কাল তাহা হইলে শেষ হইল বলিয়া! পনরোই শ্রাবণ মহাপ্রলয়, এবং আমরা যে কয়জন ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি 'নোয়া'র নৌকায় চড়িয়া প্রলয়সমুদ্রের ঢেউ কাটাইয়া সত্যযুগে উত্তীর্ণ হইব, তাহাদের জন্য প্রচুর সুখ শান্তি ও ঐশ্বর্য্যের ব্যবস্থা। হিসাব করিয়া দেখিলাম, এখনও দুই মাস বাকি। কিন্তু চারিদিকেই অবস্থা এমন সঙ্গিন হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এই কয়টা দিনই পুণ্যের পুঁজির জোরে কোনমতে কাটাইয়া উঠিতে পারিব কি না কে জানে!

দরজার সামনে রাস্তা দিয়া সকাল আটটা হইতেই ভিখারীদের সারি শুরু হইয়াছে। এক-একটা যেন কোনমতে চামড়া দিয়া ঢাকা কঙ্কাল, দেহে মাংস নাই, দেহ ঢাকিবার জন্য পরিধেয় নাই, পরিধেয়ের প্রয়োজন-বোধও নাই। মৃত্যুর সহিত মুখামুখি দাঁড়াইয়া একমাত্র বাঁচিয়া থাকিবার প্রাণী-সুলভ বৃত্তি ছাড়া মনের অন্য সব বৃত্তিগুলি যেন মরিয়া গিয়াছে।

স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি, ত্রিশ টাকায় চাল কিনে আর ভিক্ষে দিতে পারব না, বা। একমুষ্টি ভিক্ষা দিয়া বলিতেছেন, আজকের মত দিলাম, কাল থেকে আসিস না। একটা বুড়ীর স্খলিত কম্পিত কণ্ঠের করুণ মিনতি, যে কদিন বাঁচি ছুটি ক'রে দিবে মা, মরণ যে হচ্ছে না

কিছুতেই, কি করব বল ? একটি কচি কোমল শিশুকণ্ঠের প্রার্থনা, একটু মাড় দাও মা। স্ত্রীর উত্তর, এত সকালে কোথায় পাবি ? আসবি বেলা হ'লে।

এখন তবে দুটি মুড়ি দাও।

স্ত্রীর হয়তো দয়া হইয়াছে, মুড়ি আনিতে ভাঁড়ার ঘরে গিয়াছেন। ভালই হয়তো ক'রয়াছেন, দয়া হৃদয়ের অত্যন্ত মহৎ বৃত্তি। কিন্তু মুড়ি জিনিসটিও বিশেষ সুলভ নয়; আজকাল টাকায় তিন পাই মুড়ির জন্য মুড়িওয়ালীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিতে হয়,' অবশ্য আমাকে নয়, স্ত্রীকে।

তাহা ছাড়া, চালের মণ ত্রিশ টাকা, ধুতির জোড়া দশ টাকা, শাড়ির জোড়া পনরো টাকা, আটা চিনি কেরোসিন ও অন্যান্য জিনিসও অগ্নিমূল্য। আমরা নীতিপাঠ-পড়া ভদ্র গৃহস্থেরা, কি করিয়া আত্ম-সম্মান বজায় রাখিয়া সাধুভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিব ভাবিয়া চোখে সরিষাফুল দে'খতেছি।

মাস্টার বাবু রইছেন ?—চৌকিদার গোষ্ঠ ডোমের গলা। হাঁ।—জানাইলাম। গোষ্ঠ কহিল, আপনকাকে একবার গাঙ্গুলী মশয় ডাকছে। কহিলাম, কেন রে ? সাহেব এসেছেন নাকি ?

আজ্ঞে হাঁ।—বলিয়া গোষ্ঠ চলিয়া গেল।

স্কুলে যাইয়া দেখিলাম, আফিসে ছোট সাহেব বসিয়া আছেন, পাশে দাঁড়াইয়া গাঙ্গুলী ও রাধানাথ। আমাকে দেখিবামাত্র সাহেব মুচকি হাসিয়া কহিলেন, আসুন। চোখের ইঙ্গিতে কহিলেন, বসুন। একটা চেয়ার টানিয়া আনিয়া বসিলাম। রাধানাথ চোখ পাকাইয়া তাকাইল, ভ্রূক্ষেপ করিলাম না।

সাহেব কহিলেন, হাকিম হচ্ছেন যে। বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিলাম, মানে ? সাহেব সোজা হইয়া বসিয়া কণ্ঠস্বর নামাইয়া কহিলেন, খুব গোপন খবর, কাউকে বলবেন না এখন, একটা অ্যান্টি-হোর্ডিং ড্রাইভ হবে শিগগির। কহিলাম, তাই নাকি ? গাঙ্গুলী মশায় হাতজোড় করিয়াই ছিলেন, সাম্নয়ে প্রশ্ন করিলেন, হুজুর, এর অর্থ ? হুজুর

কহিলেন, এর অর্থ সঞ্চয়বিরোধী অভিযান, সারা বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে সরকার নিজের বিশ্বস্ত কর্মচারীদের পাঠাবেন; তাঁরা প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতে গিয়ে কার কি সঞ্চয় আছে, খুঁজে বের করবেন। গাঙ্গুলী ও রাধানাথ উভয়েই আঁতকাইয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিলেন, সে কি হুজুর? সব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে যাবে? হুজুর প্রায় চিত হইয়া শুইয়া পড়িয়া হাকিমী হাসি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, আপনার যদি প্রয়োজনমত জিনিস থাকে তো নেবে না, তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যদি থাকে, তা হ'লে নিয়ে যাবে।

রাধানাথ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, আমার কত প্রয়োজন, তা তারা জানবে কি ক'রে, হুজুর? গাঙ্গুলী মশায়ও ঘাড় নাড়িয়া রাধানাথকে সমর্থন করিলেন। হুজুর কহিলেন, পুরুষ স্ত্রী ছেলে মেয়ে মাথা-পিছু গড় কত খাদ্য প্রয়োজন, সরকার তার একটা হিসাব ঠিক করেছেন; সেই অনুসারে আপনার পরিবারের ছয় মাসের জন্যে যত খাদ্য প্রয়োজন, তা আপনাকে রাখতে দেওয়া হবে, বাড়তিটা আপনাদের গ্রামের যাদের খাবার নেই, তাদের দেওয়া হবে। আপনাদের গ্রাম থেকে এক কণা ধানও বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে না, ভয় নেই আপনাদের।

রাধানাথ শুষ্কমুখে কহিল, হুজুর, শুধু খাবার খরচই দেবে? অন্য খরচ—তেল, নুন, কাপড়, ডাক্তার, ওষুধ—? গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, গৃহদেবতার নিত্যসেবা, কুটুমকুটুম্বিতে, আসা-যাওয়া, মুষ্টিভিক্ষা—হুজুর, ভিক্ষে দিতেই দিন তিন সের ক'রে চাল লাগে যে! হুজুর হাসিয়া কহিলেন, কি ব্যবস্থা আছে, আমি সব জানি না। মাস্টার মশায়ের কাছে জেনে নেবেন। ওঁকে একটা দলের কর্তা করা হবে ঠিক হয়েছে কিনা। রাধানাথ মুখ কালো করিয়া কহিল, তাই নাকি হুজুর? গাঙ্গুলী মশায় পুলকিত হইয়া কহিলেন, হুজুর, আমাদের গাঁয়ের?

হুজুর কহিলেন, তা কি ক'রে হবে? নিজের গ্রামে আইনমত কাজ করতে চক্ষুলজ্জায় ওঁর বাধতে পারে। রাধানাথ ঠোঁট ও ভুরু কুঁচকাইয়া ঘাড় নাড়িল, অর্থ—উহার চক্ষুলজ্জা থাকিলে তো! অত

কেহ বুঝিলেন কি না জানি না, আমি বুঝিলাম, কিন্তু গ্রাহ্য না করিয়া কহিলাম, কত দিনের জন্যে যেতে হবে ?

সাহেব কহিলেন, তা সপ্তাহ দুই তো বটেই।

সভয়ে কহিলাম, এতদিন বাইরে থাকতে হবে ? সাহেব আশ্বাস দিয়া কহিলেন, তা হ'লই বা। সরকারের সাহায্য তো প্রত্যেকেরই করা উচিত। তা ছাড়া একেবারে অনাহারী নয়, পারিশ্রমিক কিছু পাবেন। যাওয়া-আসা, খাওয়া-থাকার খরচের জন্যে দু-তিন সপ্তাহে শ খানেক টাকা পেয়ে যেতে পারেন। রাধানাথ আঁতকাইয়া উঠিয়া কহিল, বলেন কি হুজুর ? হুজুর কহিলেন, নিশ্চয়। যাকে তাকে তো এ কাজের ভার দেওয়া হবে না। যাঁরা শিক্ষিত সভ্য লোক তাঁদেরই দেওয়া হবে, যেমন—সরকারী কর্মচারী, স্কুলের হেডমাস্টার, কলেজের অধ্যাপক এঁদের। মুচকি হাসিয়া কহিলেন, তা রাধানাথবাবু, ক গোলা ধান আছে আপনার বাড়িতে ? রাধানাথ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, কোথায় পাবেন হুজুর ? সব বিক্রি হয়ে গেছে, এত বড় সংসারের খরচ, বাইরে থেকে এক পয়সা আয় নেই। কহিলাম, কেন, কাপড়ের দোকানে তো বেশ লাভ করেছ এ বছর। রাধানাথ আমার দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানিয়া, হুজুরের দিকে চাহিয়া কহিল, তা লাভ কিছু হয়েছে হুজুর, কিন্তু এক পয়সা ঘরে আসে নি। মহাজনের সিন্দুকেই সব পৌঁছে দিতে হয়েছে। পাড়াগাঁয়ের কাপড়ের দোকান, হুজুর, লোকসান দিয়ে চালানো—শুধু গাঁয়ের লোকের সুবিধের জন্যে।

বাড়ি ফিরিবার সময়ে রাধানাথ একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, কারও বা পৌষ মাস, কারও বা সর্বনাশ। কহিলাম, কি হ'ল রাধানাথদা ?

রাধানাথ তিক্তকণ্ঠে কহিল, আমাদের সব কেড়ে-কুড়ে ঝেড়ে-ঝুড়ে নিয়ে যাবে, আর তোমার পকেট ভর্তি হবে। কহিলাম, ওই টাকাতেই পকেট ভর্তি হয়ে যাবে ? রাধানাথ বাঁকা হাসি হাসিয়া কহিল, আর ঘুষ ? আমার মুখের দিকে তাকাইয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, যে ঘুষে লাল হয়ে যাবে বাবা ! প্রতিবাদ করিয়া কহিলাম,

পাগল হয়েছ নাকি? রাধানাথ চোখ পাকাইয়া কহিল, পাগল! কি বোঝাতে চাও বল দেখি? ঘুষ নেবে না তুমি? সরকারী চাকরি করতে গিয়ে ঘুষ নেয় না, এমন লোক এখনও জন্মায় নি ভূভারতে। ব্যঙ্গের স্বরে কহিলাম, রাতদিন সরকারী চাকরেদের সঙ্গে মিশছ যে! ওদের নাড়ীনক্ষত্র সব তোমার মুখস্থ, গণ্যমান্য ব্যক্তি কিনা। রাধানাথ রাগিয়া উঠিয়া কহিল, মুখ সামলে কথা কও বলছি মাস্টার। আমিও কড়া গলায় কহিলাম, আমার সামলাবার দরকার হবে না, তুমি নিজেই সামলাও দেখি। রাধানাথ কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া ভারী গলায় বলিতে লাগিলাম, দেখ রাধানাথদাদা, ভুলে যেও না, আমি একজন শিক্ষক, তোমার মত ব্যবসাদার নই। তোমার মত দু বছর আগে কেনা দু টাকার জিনিস দশ টাকায় বিক্রি করি না আমি, গাঁয়ের লোকের মুখের দিকে না তাকিয়ে ঘরের ধান মাড়োয়ারীর হাতে তুলে দিই না আমি, টাকায় দু পাই ক'রে ধান বিক্রি ক'রেও মাপে চুরি করি না আমি। রাধানাথ ক্রুদ্ধকণ্ঠে চেঁচাইয়া কহিল, বেশ করেছি, নিজের জিনিস যেমন ইচ্ছে, যাকে ইচ্ছে বিক্রি করব। তা ছাড়া কে করে নি গাঁয়ে? গাঙ্গুলী মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া কহিল, গাঙ্গুলী-দাদাও তো বিক্রি করেছেন।

গাঙ্গুলী মশায় নীরবে শুনিতেছিলেন, কহিলেন, রাস্তার মাঝে চেঁচামেচি ক'রো না রাধানাথ, আমি বিক্রি করেছি বটে, কিন্তু মাড়োয়ারীকে দিই নি। গাঁয়ের লোককেই দিয়েছি, আর বাজার-দরের চেয়ে সুবিধে ক'রেই দিয়েছি। তা ছাড়া মাস্টার কিছু অন্যায় বলে নি। এই যে বাড়িতে এখনও দু গোলা ধান পুরে রেখেছ; বললাম তখন, চার পাই দরে বিক্রি ক'রে দাও গাঁয়ের লোককে, খেয়ে বাঁচুক সব, টাকা তো যথেষ্ট কামিয়েছ যুদ্ধের বাজারে, তা তখন কানে তুললে না, এখন তো সব কেড়ে নিয়ে গিয়ে বিলিয়ে দেবে সবাইকে।

রাধানাথ জবাব না দিয়া হাঁড়ির মত মুখ করিয়া রাস্তা চলিতে লাগিল।

বাড়িতে আসিতেই গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় ছিলে এত

বেলা পর্য্যন্ত, রোদে রোদে ঘুরতে এত ভালও লাগে! জামা খুলিতে খুলিতে কহিলাম, সার্কল অফিসারের কাছে। তারপর একটা মোড়া টানিয়া বসিয়া পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে কহিলাম, রোদ! রোদে রোদেই দিন কয়েক ঘোরাঘুরি করতে হবে বোধ হয়। গৃহিণী ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিলেন, মানে? কহিলাম, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুকুম। গৃহিণী অবিশ্বাসের সুরে কহিলেন, গাঁয়ে এত লোক থাকতে শুধু তোমার ওপর এই হুকুম? গম্ভীর বদনে কহিলাম, গাঁয়ের হাক-ডাক বাবু-সাবুর সঙ্গে সমান ভাব নাকি আমাকে? গৃহিণী দুই চোখ ডাগর করিয়া কহিলেন, পাগল! তা আবার ভাবতে পারি আমি! মস্ত বড়লোক তুমি। রাগত স্বরে কহিলাম, মস্ত বড়লোক না হতে পারি, তা ব'লে ডাক-হাকদের পর্য্যায়ের নই আমি। গৃহিণী একদৃষ্টে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া, গালে হাত দিয়া কহিলেন, বাবা! কি অহঙ্কার! কহিলাম, হবে না? ধন নেই, সম্পত্তি নেই, এই অহঙ্কারটুকুও থাকবে না আমাদের? এর জোরেই পৃথিবীতে কারও কাছে মাথা না নুইয়ে জীবন কাটিয়ে দোব আমরা। গৃহিণী হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, জানি গো জানি, আমাকে আর শোনাতে হবে না। কিন্তু আসল কথাটা কি বল দেখি? সরকার কেন ডেকেছে তোমাকে? সার্কল অফিসারের কাছে যাহা শুনিয়াছিলাম, খুলিয়া বলিলাম। গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, লোকে কত দুঃখ কত পরিশ্রমে ছেলেমেয়েদের জন্যে ভবিষ্যতের আহার সঞ্চয় ক'রে রেখেছে, তাই কেড়ে নিতে যাবে তুমি? তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, কিছুতেই যেতে পাবে না, ছেলেপিলের মা হয়ে যেতে দিতে পারব না আমি। বুঝাইয়া বলিলাম, দুঃখের সঞ্চয় কাড়তে কে যাচ্ছে? যারা তেজারতি মহাজনি ক'রে প্রজা ও খাতকদের পথে বসিয়ে গোলা ভর্ত্তি ক'রে রেখেছে, চোখের সামনে লোককে অনাহারে মরতে দেখেও যারা এক ছটাক ধান বার করতে চাচ্ছে না, যারা দামের দশ গুণ দাম পেয়েও যাদের লাভের লোভ মিটছে না, তাদেরই রাশীকৃত সঞ্চয়কে কেড়ে নিতে যেতে হবে আমাদের। গৃহিণী চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন; ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তাও যেতে

পাবে না তুমি। যাদের সরকার আজীবন মোটা মাইনে দিয়ে পুষছে, এই মাগ্গি-গণ্ডার দিনে যাদের সস্তা চাল-আটা খাওয়াচ্ছে, তাদের দিয়ে এ কাজ করাক গে। তোমাদের মত নিরীহ মাস্টারদের দিয়ে কেন? কণ্ঠস্বর ধারালো করিয়া কহিলেন, কি সম্পর্ক সরকারের সঙ্গে তোমাদের? কোন্ ভালটা তোমাদের দেখেছে সরকার? আমরা পাড়াগাঁয়ের ভদ্র গৃহস্থরা যে কি ক'রে দিন চালাচ্ছি, কোনদিন খবর নিয়েছে তোমাদের সরকার? দম লইয়া কিঞ্চিৎ শান্ত স্বরে কহিলেন, তা ছাড়া এই চুরি-ডাকাতির দিনে এতদিন তোমাকে বাড়ি ছেড়ে থাকতে দিতে পারব না আমি। কহিলাম, সরকার তো বিনা পয়সায় করাবে না, টাকা দেবে। গৃহিণীর মেজাজের মাত্রা এক মুহূর্তে নামিয়া আসিল, নিরুদ্ধ ঔৎসুক্যের সহিত কহিলেন, কত? কহিলাম, শ খানেক বোধ হয়। গৃহিণী একেবারে শান্তমূর্তি ধারণ করিয়া কহিলেন, তাই নাকি? কহিলাম, হ্যাঁ, তাই তো শুনলাম সার্কল অফিসারের কাছে। দায়িত্ব-পূর্ণ কাজ তো, এ একটা দলের কর্তা, হাকিম ছাড়া কাউকে বিশ্বাস ক'রে এ কাজ দিচ্ছে না। গৃহিণী চুপ করিয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া, হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, তা হ'লে তুমি হাকিম হতে চলেছ বল, কিন্তু ওই পোশাকে লোকে তোমাকে মানবে? বলিয়া আলনায় টাঙানো আমার জামা-কাপড় ও বিশেষ করিয়া খাটের নীচে রক্ষিত আমার জুতো জোড়াটির দিকে দৃষ্টি চালনা করিলেন। গম্ভীর হইয়া কহিলাম, ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে লোকে কত বড় বড় কাজ করছে আজকাল, তা ছাড়া এক জোড়া জুতো কিনে নোব শহরে গিয়ে। গৃহিণী নাক ও ঠোঁট কুঁচকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তোমাদের মত ধুতিচাদরওলাদের কেউ মানবে না, আমি ব'লে দিলাম তোমাকে। মনে হইল, গৃহিণী সত্য কথাই বলিয়াছেন। আমাদের বাংলা দেশের লোক, বিশেষ করিয়া পাড়া-গাঁয়ের লোক ধুতিচাদরধারীদের খাতির করিতেই চাহে না। আমাদের গ্রামের ফটিক ধানবাদে মোটর-ড্রাইভারি করে। সে একবার খাঁকির হাফপ্যান্ট ও হাফ-হাতা শার্ট, মোজা ও বুটজুতা পরিয়া বাড়ি আসিল। তাহাকে লইয়া গাঁয়ের লোক যা হৈ-চৈ করিল, স্বয়ং লাটবাহাদুর ধুতি-

চাদর পরিয়া আসিলে তেমনটি হইত না। কটিকের বৃদ্ধা ঠাকুমা রাস্তাঘাটে যাহারই সহিত দেখা হইয়াছিল, তাহারই কাছে ফ্যাচ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিল, ভাগ্যে বেঁচে ছিলাম, তাই দেখতে পেলাম। তারপর ক্রন্দন সংবরণ করিয়া অশ্রুজড়িত কণ্ঠে কহিয়াছিল, অনেক কষ্টে বাপ-মা-মরা ছেলেটাকে মানুষ করেছিলাম, সার্থক হ'ল আজ, আশীর্বাদ কর সব, বেঁচে থাকুক। কিন্তু পোশাক সংগ্রহ করিব কি প্রকারে? আমাদের সরকারী ডাক্তারবাবুটির সঙ্গে যথেষ্ট বন্ধুত্ব আছে, নেহাত দরকার হইলে তাঁহার কাছে পোশাক ধার করাও চলে। কিন্তু যে রকম প্যাকাটির মত দেহ তাঁর, আমার গায়ে সে পোশাক আঁটিবে না। মনে পড়িল আমাদের নকুড়ের কথা, কালেক্টরিতে কাজ করে; সিভিক গার্ড হওয়ার দরুন এই সব পোশাক তাহাকে পরিতে হয়। কিন্তু যে রকম বেঁটে-খাটো মানুষ সে, তাহার পোশাকও গায়ে লাগিবে না বোধ হয়। কহিলাম, পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে লোকে খাতির করে না, যাদের হাতে সত্যিকার ক্ষমতা আছে, তাদেরই লোকে খাতির করে। দেখ নি, সেবার সুভাষ বোস এসেছিলেন খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবি প'রে; কিন্তু কি সম্মানটা পেলেন বল দেখি? সরকারী রাস্তার ধারে বাড়ির বউ-ঝিরা কলসী কাঁখে ক'রে দাঁড়িয়ে রইল ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমন খাতির হ্যাট-কোট-প্যাণ্টলুন-পরা কজন হাকিম পেয়েছে? গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন, ওদের যা কাজ, তার ওই পোশাক। যাত্রার দলে দেখ নি, ভিন্ন ভিন্ন পার্টে ভিন্ন ভিন্ন পোশাক? ভীম নামে মালসাট মেরে কাপড় প'রে, হাতে গদা নিয়ে; কৃষ্ণ নামে ধড়াচূড়া প'রে, হাতে বাঁশী। কৃষ্ণের পোশাক ভীমের চলে না। বাম চোখ ছোট করিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন, কিছু ভেবো না তুমি। শুধু তোমাকেই তো ডাকে নি, তোমার মত আরও অনেককে ডেকেছে। শহরে হাকিমী পোশাক ভাড়া দেবার দোকান ব'সে গেছে হয়তো, সস্তা পাও তো তাই ভাড়া ক'রে নিও। মোটের উপর বুঝিলাম, গৃহিণীর অনুমতি হইয়াছে; কাজেই আর তর্ক না করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

দিলেন। 'ও বউমা, বউমা!' বলিতে বলিতে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহিণী কাছে বসিয়া পাখা করিতেছিলেন, ত্বরিত হস্তে ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া গিয়া বলিলেন, আসুন 'কাকা। কাকা আমার নাম করিয়া কহিলেন, ও বাড়িতে রয়েছে নাকি? গৃহিণী মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, খাচ্ছেন।

ও নাকি হাকিমী চাকরি পেয়েছে, পরাণের কাছে শুনলাম। আমি জানতাম, পাবে। দু-দশ দিনের জন্যে হ'লেও, করতে করতে হাত আসবে, তারপর হয়তো পাকা চাকরি পেয়ে যেতে পারে একদিন। বলিতে বলিতে ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন।

যুগল কাকা আমার একজন শুভানুধ্যায়ী। যখন স্কুল-কলেজে পড়িতাম, কাকা বরাবর আমার পরীক্ষার ফলের তদারক করিতেন। ভাল হইলে অহঙ্কারে বুক ফুলাইয়া পাড়ায় পাড়ায় প্রচার করিয়া আসিতেন, এবং ভবিষ্যতে জেলার জজ অথবা ম্যাজিস্টেট যে কোন একটা পদ যে আমার জন্য সরকার নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, অন্তরঙ্গদের কানে কানে বলিয়া আসিতেন। আমি হাকিম হইতে না পারায় তাঁহার মত মনঃক্ষোভ বোধ করি আর কাহারও হয় নাই।

কাকা খসিয়া কহিলেন, কবে যেতে হচ্ছে বাবাজী? কহিলাম, ঠিক জানি না। কাকা কহিলেন, ভারী আনন্দ হ'ল এ কথা শুনে। আমার স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, ভারী শক্ত কাজ বউমা। বিশ-ত্রিশটা গাঁয়ের ডাল-ভাতের মালিক। কার বাড়িতে কত ধান-চাল থাকবে, শুধু ওর হুকুমের ওপর নির্ভর করবে। ও যদি ইচ্ছে করে, আমাদের রাধানাথের মত পেট-মোটা মহাজনের কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি চড়িয়ে দিয়ে আসতে পারে। গৃহিণীর দিকে তাকাইলাম, চোখোচোখি হইতেই মৃদু হাসিলেন। কাকা কহিলেন, তুমি দুর্গা-নাম ক'রে বেরিয়ে পড় বাবা। বাড়ির জন্তে ভাবনা নেই। বল তো আমি এসে থাকব রাত্রে। আমার স্ত্রীকে কহিলেন, আর দেখ বউমা, এক কাজ করতে হবে, আমি রামদাস (পুরোহিত)-কে ব'লে আসব এখন রোজ ওর নামে জনার্দ্দনের কাছে তুলসী দিতে। যেন ভালয় ভালয় কাজ সেরে বাড়ি ফিরে আসতে পারে।

সারা গাঁয়ে রাধানাথ ঢাক পিটাইয়া দিয়াছে, আমি হাকিম বনিয়া গিয়াছি। বিকালে বৈঠকখানা হইতে পিসিপিসীর গলা শুনিতে পাইলাম, গৃহিণীকে বলিতেছেন, ভারী আনন্দ হ'ল শুনে বউমা। আমি জানি, এ হবে। লক্ষ্মী, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী যার ঘরে, তার আবার না হয়! জন্ম জন্ম মাথার সিঁদুর, হাতে নোয়া নিয়ে বেঁচে থাক মা, ছেলেমেয়েগুলো বেঁচে থাকুক—দিনরাত ভাগবানের কাছে এই প্রার্থনাই করি আমি। তোমরা ছাড়া আমার আর কে আছে বল? কণ্ঠস্বর মৃদু ও যথামাত্রায় মিনতি-মিশ্রিত করিয়া কহিলেন, আমার জন্যে একটি নামাবলী কিনে আনতে ব'লে দিও মা ছেলেকে, যেটা ছিল সেটা ছিঁড়ে গেছে একেবারে; আর, এক ভরি আফিং পাওয়া যাচ্ছে না বড়জুড়াতে; অনেকবার লোক পাঠিয়েছি।

সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হইলাম। রাস্তায় আমাদের গ্রামের তারক মণ্ডলের সহিত দেখা হইল। তারক সম্পন্ন চাষী, চালের কারবার করে। দেখিলে কিন্তু বুঝিবার জো নাই। পরিধানে গাঁয়ের তাঁতিদের বোনা সাত-হাতি মোটা ও খাটো কাপড়, কাঁধে একটা গামছা, গা খালি। দুই হাত জোড় করিয়া, কোমর হইতে মাথা পর্যন্ত দেহের উর্দ্ধভাগ মাটির সহিত প্রায় সমান্তরাল করিয়া তারক পরম ভক্তিভরে আমাকে নমস্কার করিল। প্রশ্ন করিলাম, কি খবর হে মোড়ল? তারক যুক্তহস্ত বুকে রাখিয়া, বার দুই জিব দিয়া ঠোঁট চাটিয়া সবিনয়ে কহিল, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। কি হবে আমাদের বলতে পারেন? আপনিও তো এই কাজেরই কর্ত্তা হয়ে যাচ্ছেন শুনলাম। ভারী গলায় কহিলাম, কি হবে তা তো জানি না এখনও, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা না হ'লে কিছু জানতেও পারব না। তারক সাগ্রহে কহিল, আপনি যদি আসতেন আমাদের গাঁয়ে সাহেবকে ব'লে ক'য়ে। কহিলাম, তা কি দেবে আমাকে নিজের গাঁয়ে? তারক কহিল, যিনি আসবেন আমাদের এখানে, তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবে নিশ্চয়, যদি আমার হয়ে তাঁকে একটু ব'লে ক'য়ে দেন।

তারককে নিরাশ করিতে ইচ্ছা হইল না ; কহিলাম, নিশ্চয় দেখা হবে, তোমার কথা ব'লে দোব, ভেবো না তুমি।

বাড়ি ফিরিবার পথে রাধানাথের দোকানে সোরগোল শুনিতে পাইলাম। থামিয়া, কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া শুনিয়া বুঝিলাম, আমার সম্বন্ধেই আলোচনা হইতেছে। রাধানাথ জোর গলায় বলিতেছে, হাকিমি বেরিয়ে যাবে বাছাধনের, ভাঙা হাত-পা-মাথা নিয়ে বাড়ি না ফেরে তো আমাকে 'বেধো' ব'লে ডেকো সব তখন থেকে।

পরদিন বিকালে দারোগাবাবু ডাকিয়া পাঠাইলেন। পুলিসে চাকরি করিলেও বেশ ভদ্রলোক, সদাচারী ব্রাহ্মণ, মাথায় টেরির সঙ্গে একটি ছোট টিকি, সাধারণত গম্ভীরপ্রকৃতি, কিন্তু মেজাজ ভাল থাকিলে রসিকতাও করেন। আপ্যায়নসহকারে বসাইয়া, এক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া হাতে দিলেন। দেখিলাম, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আদেশ-পত্র, আমাকে একজন দলপতি নিযুক্ত করা হইয়াছে ; একদিন পরেই সকাল দশটায় জেলা-শহরে এস. ডি. ও. সাহেবের সমক্ষে উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য হাজির হইতে হইবে। নীচে এক পাশে স্থানের নাম দেওয়া আছে।

দারোগাবাবু কহিলেন, আমাদের এখানেও আসছে এক দল ; তাদের থাকবার ব্যবস্থা করবার জন্যে হুকুম হয়েছে।

প্রশ্ন করিলাম, কি ব্যবস্থা করলেন ?

দারোগাবাবু তাচ্ছিল্যের স্বরে কহিলেন, কিছুই করি নি এখনও, গাঙ্গুলী মহাশয়কে ব'লে পাঠাব, যা পারেন করবেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মুচকি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, সারওয়ার্দি সাহেব মস্ত বড় একজন যোগী পুরুষ মশায়। কহিলাম, তাই নাকি ? দারোগা-বাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের বড় বড় সোহং স্বামীরাও ওঁর কাছে নগণ্য। নির্বাকভাবে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তিনি হাস্যমুখে বলিতে লাগিলেন, মন্ত্রিত্ব পেয়েই সাহেব একবার যোগাসনে ব'সে ধ্যানস্থ হলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে যোগদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন, বাংলা দেশের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘরে ঘরে গোলায় গোলায়

ধান-চাল ঠাসাই হয়ে রয়েছে। তা টেনে বের ক'রে সবাইকে বিলিয়ে দিতে পারলেই দেশের খাদ্যসমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কি আশ্চর্য্য রকমের সহজ সরল সমাধান বলুন দেখি? চারদিক ভেবে-চিন্তে, বুদ্ধি খরচ ক'রে আর কেউ কি কোনদিন করতে পারত? ভ্রূ দুইটি উপরে তুলিয়া, মাথায় মৃদু ঝাঁকানি দিয়া কহিলেন, অসম্ভব। নেহাত যোগবল ছাড়া অতবড় একটা জটিল সমস্যার এ রকম একটা মির‍্যাকুলাস মীমাংসা করা কারও সাধ্য ছিল না। হাসিয়া কহিলাম, সত্যি! আমরা যারা গ্রামে বাস করি, তারা তো দেখেছি—। দারোগা বাধা দিয়া কহিলেন, কি দেখেছেন? কহিলাম, গ্রামে কারও ধান নেই, যা ছিল মাড়োয়ারীর হাত দিয়ে দেশের বাইরে চ'লে গেছে। দারোগা চোখ বড় করিয়া নাক উঁচাইয়া ধমকের সুরে কহিলেন, আপনাদের দেখার মূল্য কি মশায়? কটা চোখ আপনাদের? দুটো তো? মাথা নাড়িয়া কহিলেন, ওতে হবে না, তিনটে চাই, ত্রিনয়ন, শিবের ছিল আর যোগী পুরুষদের আছে। কহিলাম, আর আপনাদের—মানে হাকিমদেরও। দারোগাবাবু হাসিয়া কহিলেন, পুরোপুরি তিনটে নেই ছোটদের, সওয়া দুটো, বড়-বড়দের আড়াইটে, তা আমরাও তো টের পাই নি কিছুই।

কহিলাম, পেয়েছিলেন বইকি মশায়। না হ'লে আমাদের জেলার একজন জাঁদরেল হাকিম কি ক'রে বলেছিলেন, এ জেলায় প্রচুর ধান মজুত আছে, বাইরে থেকে আমদানি করবার তো প্রয়োজন নেইই, বরং এখান থেকে বাইরে চালান দেওয়া উচিত। তাই মাস কয়েক আগে আমরা যখন চাষী ও মহাজনদের মধ্যে ধান বাইরে বিক্রি না করবার জন্তে আন্দোলন চালাবার চেষ্টা করেছিলাম, আপনারা সবাই বাধা দিয়েছিলেন। দারোগাবাবু এক মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া উঠিয়া ভারী গলায় কহিলেন, সেটা সরকার ভালই করেছিলেন, যারা আপনাদের জন্তে যুদ্ধ করছে, তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করা উচিত, কিন্তু ও কথা যাক, ব্যাপারটা হচ্ছে এই, পাড়াগাঁয়ে যে ধান একেবারেই নেই তা নয়, এক একটা গ্রামে হয়তো দু-চারজনের আছে এবং

থাকাটা অন্যায় বা অস্বাভাবিক নয়। শহরের বড়লোকেরা টাকা জমায় ব্যাঙ্কে, পাড়াগাঁয়ের বড়লোকেরা ধান জমায় গোলায়, ছুটোতে কোন তফাত নেই। এখন ওই ধান বের ক'রে যাদের অভাব আছে, তাদের দিতে হবে, অবশ্য একেবারে নয়, সুরাহা হ'লে সুদ সমেত তারা শোধ ক'রে দেবে। আচ্ছা, সরকার যদি এমন আদেশ দিতেন যে, যেহেতু খাদ্যের মূল্য খুব বেশি এবং দেশের অধিকাংশ লোকের আয় অসমাপ্ত, কাজেই দেশের লোক খাদ্যদ্রব্য কিনতে পারছে না, অতএব বড়লোকদের ব্যাঙ্কে জমানো টাকা সব বের ক'রে সবাইকে ধার দিয়ে দেওয়া হবে, শহরে শহরে কি রকম একটা তুমুল আন্দোলন চলত বলুন দেখি? অবশ্য এ ব্যাপারটা টাকা নিয়ে নয়, ধান নিয়ে, লক্ষ্মীদের বাড়ি শহরে নয় গ্রামে, কাজেই হৈ-চৈ যা হচ্ছে কাগজে কলমে, গলার জোর কারও শোনা যাচ্ছে না।

কহিলাম, একটা কথা নিবেদন করি, এক-একটা গাঁয়ে যে ধান আছে, তা সবাইকে ভাগ ক'রে দিলে কি সবাইকার অভাব মিটবে? দারোগাবাবু কহিলেন, কিছুতেই না, আর যদি মেটেই, তবু ওই ধান বের করবে কারা এবং কেমন ক'রে? যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁরা অধিকাংশই কেরানী অথবা মাস্টার, জাঁদরেল হাকিমরা কেউ যাচ্ছেন না, ম্যাজিস্ট্রেট ও এস.ডি. ও. অবশ্য মোটর-যোগে তদারক করতে পারেন ইচ্ছে হ'লে, কিন্তু আসল কাজটা করবে এই নিরীহ মাস্টার আর কেরানীর দল। সঙ্গে চৌকিদার থাকবে বটে, কিন্তু তারাও গ্রামের লোক। তা ছাড়া, গ্রামের যাদের বাড়িতে কিছু সঞ্চয় আছে, তাদের অনেকেই হয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট অথবা জবরদস্ত মেম্বার, কেউ কেউ আবার হাকিমদের অনুগৃহীত ব্যক্তি, কাজেই চৌকিদারই বলুন দফাদারই বলুন, কারও কাছ থেকে বিশেষ কিছুই সাহায্য পাওয়া যাবে না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, সরকার ফতোয়া জারি করেছেন বটে, কিন্তু পা বাঁচিয়ে চলছেন, ভাবটা এই—বাপু হে, তোমাদের অভাব কিছু নেই, সব আছে তোমাদের, খুঁজে পেতে নাও। মুচকি হাসিয়া কহিলেন, একেবারে উঁচু সাধনমার্গের কথা, বড় বড় মুনিঋষিরাও

তো ওই কথাই আমাদের ব'লে গেছেন, ওহে অমৃতের পুত্রগণ! সব ঐশ্বর্য্য তোমাদের নিজেদের মধ্যেই নিহিত আছে, সাধনার দ্বারা তাকে করায়ত্ত কর।

আরও কিছুক্ষণ গল্প করিয়া উঠিলাম। আসিবার আগে, দারোগাবাবু কহিলেন, নানা কথা বললাম, বন্ধুর মত মনে করি আপনাকে, কারও কাছে বলবেন না। কহিলাম, আমাকে কি সেই রকমই মনে করেন নাকি? দারোগাবাবু হাসিয়া কহিলেন, মনে করি না ব'লেই দু'চারটে মনের কথা বলি; সরকারী চাকরি করলেও আমরা তো আপনাদেরই।

জবাব দিলাম না। মনে হইল, আপনাদের বড় ছোট সব প্রভুদেরই শৃগালত্বের কথা আমরা ভাল করিয়াই জানি। কিন্তু আপনারা নীলবর্ণের মহিমায় সে কথা ভুলিয়া যান, এই আমাদের দুঃখ।

গাঙ্গুলী মশায়ের বাড়ি গেলাম। দেখিলাম, বৈঠকখানায় বসিয়া জমা-খরচ করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া কহিলেন, এস ভায়া, বস। বসিয়া কহিলাম, কি হচ্ছে? গাঙ্গুলী মশায় মুখ তুলিয়া কহিলেন, প্রজাদের চাষের ধান, যাকে যা দেবার দিয়ে দিলাম। কহিলাম, এত তাড়াতাড়ি? সব যদি দুদিনে খরচ ক'রে বসে? গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, তা তো করবেই, ঠিক চাষের সময় আবার হাত পাততে এসে। কিন্তু কি করব বল? সরকার যে কি ব্যবস্থা করবে তা তো বলা যায় না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, ধারও দিয়ে দিলাম কতক, বাকি দু-চারটি যা রইল তারও ব্যবস্থা করেছি এক রকম। কহিলাম, কি? গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, দেখাচ্ছি, এস।

গাঙ্গুলী মশায়ের সঙ্গে বাড়ির ভিতরে গেলাম। বিস্তৃত উঠানের এক পাশে লম্বালম্বি গোয়াল ঘর। তারই একটু দূরে একটা প্রকাণ্ড খড়ের পালুই। তার পাশে কতকটা জায়গা শাক-সব্জির ক্ষেত, এ বৎসর এখনও কিছুই ব্যবস্থা হয় নাই, তবে সম্প্রতি কতকটা জায়গা লইয়া শাকের ক্ষেত তৈয়ারি করা হইয়াছে।

সেখানে লইয়া গিয়া গাঙ্গুলী মশায় চোখের ইঙ্গিতে কহিলেন, ওইখানে। বিস্ময়ের স্বরে কহিলাম, সে কি! বৃষ্টি হ'লে সব নষ্ট হয়ে যাবে

যে! গাঙ্গুলী মশায় করুণ কণ্ঠে কহিলেন, কি করব বল? হয়তো নষ্ট হবে কিছু, কিন্তু নিয়ে যেতে তো পারবে না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, ব্যবস্থা করেছি যতদূর সম্ভব, নীচে পাশে তালাই পেতে দিয়েছি, ওপরেও দু-তিনখানা তালাই দিয়ে ঢেকে দিয়েছি, কটা দিন তো।

প্রশ্ন করিলাম, গর্ত খুঁড়ে এসব ব্যবস্থা করলে কে? কহিলেন, আমি আর তোমার দিদিমা, আর কাকে বিশ্বাস করা যাবে বল? কাল সারা রাত ধ'রে এই কর্ম করা গেছে। একটু হাসিয়া কহিলেন, ভায়া, একটা হাত কেটে দেওয়া যায়, কিন্তু সঞ্চয় পরের হাতে তুলে দেওয়া ভারী শক্ত। তা ছাড়া সরকার মাথা গুনতি হিসেব ক'রে খাবার রেখে যাবে বলছে। হাতে হাতে পুজো আসছে, মেয়ে-জামাই নাতি-নাতনীরা সব আসবে, সরকার তাদের তো কোন ব্যবস্থা ক'রে রেখে যাবে না! আর চাল বাড়ন্ত ব'লে তাদের আসতে নিষেধ করতেও পারব না। শেষে বস্তা কাঁধে ক'রে ধান ধার করতে বেরোব নাকি?

কহিলাম, দিদিমা কোথায়?

সারাদিন প'ড়ে প'ড়ে ঘুমিয়েছে, আবার বিকেলে বলছে, গা-হাত-পা কনকন করছে, বেতো রুগী তো।

আপনার শরীর-খারাপ হয় নি?

গাঙ্গুলী মশায় ঘাড় নাড়িয়া মুখ কুঁচকাইয়া কহিলেন, খুব। কিন্তু উপায় কি বল? সব ব্যবস্থা তো আমাকেই করতে হবে!

বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধানাথ কি করলে? গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, চালাক ছেলে। অনেক লোক ভাঁবেদারে, চার হাজার টাকার ধান আজ বিক্রি করেছে মাড়োয়ারীকে, টাকায় পাঁচ পাই দরে, তখন গাঁয়ের লোককে চার পাই দরে বিক্রি করতে রাজী হ'ল না। বাকি ধান সব চালান ক'রে দিয়েছে খাতকদের ঘরে ঘরে। কহিলাম, যদি ফেরত না দেয়? গাঙ্গুলী মশায় ক্ষোভের হাসি হাসিয়া কহিলেন, ওর ধান কেউ মারবে না ভায়া। জানে তো, সব জাল-জোচ্চুরি কিছুতেই পিছ-পা নয় ও।

কহিলাম, আমাকে তো কাল যেতে হবে, কালই দশটার সময়ে মিটিং, এস. ডি. ও. সাহেব সব বুঝিয়ে দেবেন সবাইকে। গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, কোথায় দিয়েছে? স্থানের নাম বলিলাম। গাঙ্গুলী মশায় কপাল কুঁচকাইয়া কহিলেন, জেলার ওদিকে কোন জায়গা হবে বোধ হয়, ঠিক বুঝতে পারছি না।

পরদিন সকালে বাক্স-বিছানা বাঁধিয়া দুর্গা-নাম স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলাম। গ্রাম হইতে কতকটা হাঁটিয়া আসিয়া বাস ধরিতে হয়। রাধানাথের দল ছাড়া পাড়ার সবাই প্রোসেশন করিয়া বিদায় দিতে আসিল।

বাসে আরও জনকয়েক ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইল। তাঁহারা ওই কাজেই চলিয়াছেন। জোড়দা মাইনর স্কুলের হেডমাস্টার ও হেড-পণ্ডিত, রোনেড়া হাই স্কুলের হেডমাস্টার ও জনকয়েক সহকারী শিক্ষক, পিয়ালডাঙা হাই স্কুলের হেডমাস্টার হেমন্তবাবু, অন্যান্য আরও দুই-চারিটা স্কুলের শিক্ষক, সকলেরই খুব উৎসাহ দেখিলাম। হেমন্তবাবু তো সস্ত্রীক চলিয়াছেন; বছর খানেক হইল দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছেন, এই সুযোগে হানিমুনটা সারিয়া আসিবেন বোধ হয়। আগেই আলাপ ছিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, সস্ত্রীক যে? উঠবেন কোথায়? উত্তর দিলেন, আমার শ্বশুর থাকেন শহরে, উকিল। উঠব তাঁরই বাড়িতে। আমাকে যেখানটায় দিয়েছে, সেখানে শুনলাম ডাক-বাংলা আছে একটা, কাছেই পাহাড়-জঙ্গল, দেখবার মত জায়গা, শুনে উনিও যেতে চাইলেন। মনে একটু হিংসা হইল, ভাবিলাম; আছেন বেশ! প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েগুলি বড় হইয়া খুঁটিয়া খাইতে শিখিয়াছে, দ্বিতীয় পক্ষটি এখনও শুরু করেন নাই, কাজেই ঝাড়া-হাত-পা লইয়া দুই সপ্তাহের হাকিমিটা পুরাপুরি ভোগ করিয়া আসিবেন। আর আমাদের খাঁটি নন্দনকাননে পাঠাইলেও, এক পাল ছেলে-মেয়ে সমেত গৃহিণীকে লইয়া টানা-পোড়েন করার মজুরি পোষাইত না।

আগামী বারে সমাপ্য

শ্রীঅমলা দেবী

পলায়ন

আপনার আত্মারই অন্বেষণ হতে
দ্রুতবেগে পলায়ন করি ;
জীবন-মৃত্যুরে ঘেরি নামে যে শর্ব্বরী,
তারে করি আপনার চির-আবরণ।
পলায়ন করি
দ্রুতবেগে, অপরাধী ত্রস্ত পলায়ন।
    রাত্রির সীমানা যেথা রচেছে তোরণ,
    তারি অঙ্কে চির-জাগরণ ;
    উষার হীরক-তারা জলে অনিমিখ,
    সোনার সূর্য্যের আলো হাসে,
    তাহারে এড়ায়ে মম চির-পলায়ন।
সহসা সংসার-মাঝে বিরামের ক্ষণ,
জেগে ওঠে মন,
সহসা সত্যের দেখা পেতে চাহে মন,
তবু সে উদয় হতে ফিরাইয়া মুখ
জীবনের জটামাঝে পরি যে বন্ধন,
নিজের নিকট হতে চির-পলায়ন।
    জনতার মাঝে আমি মাগি যে আশ্রয় ;
    উইলোর পাতা-ছাওয়া কুঞ্জবাস হতে
    যেখানে আঁধার সন্ধ্যা নামে আচম্বিতে
    যেখানে সহসা পাখী গেয়ে ওঠে গান,—
    আমি খুঁজি চৌরঙ্গীর সজ্জিত বিপণি,
    বিদেশী পণ্যের মাঝে নিজের বিলয়।
ভয় পায় মন—
নির্জন পাহাড়চূড়ে নির্ঝর-সদনে,

চক্রবাল্যে বালিশখানা বিছানো সাগরে,
মাদুর পল্লীর কোণে
শঙ্খের কঙ্কণে
পল্লীবধূ যেথা করে সন্ধ্যাদীপ ধরে।
রাত্রির প্রহরে
নগরীর ধূম্রজাল নিয়ে বিস্ময়িয়া
যদি মম শ্রান্ত আত্মা ওঠে
সে মহান সৌন্দর্য্যের কল্পনাস্বপনে,
আনি ফিরাইয়া
রাজপথে ত্রিভুবনের সুখশয্যা-বুকে।
ভয় পাই আমি
সে নিঃসঙ্গ সৌন্দর্য্যের স্পর্শসন্ধানে।

তোমার প্রদীপ্ত আঁখি যদি
আমার এ তন্দ্রাতুর অন্তরেতে পশে,
দেখিবে সেখানে তুমি নাহি কোন সুখ,
প্রণয় উন্মুখ ;
শুধু আছে ভীতি নিরবধি।
প্রেমের সন্ধান হতে চির-পলায়ন ॥

শ্রীমতী বাণী রায়

হিসাব

সংসারের মাঝে থাকি, তাই বুঝি প্রেমের মহিমা,
অতীতের ব্যাকুলতা থাকিবে কি, জেনে জেনে সীমা ?
আবরণ খুলে যদি, থেকে থেকে ঘুম আসে ঢ'লে—
থাকে মূর্ত্ত এক বিবাগী মনের কোণে।

মহাস্থবির জাতক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমার বাবা গাইয়ে ছিলেন। শুধু গাইয়ে ছিলেন বললে তাঁর সম্যক পরিচয় দেওয়া হয় না। অদ্ভুত ছিল তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা।

আমি জীবনে অনেক সঙ্গীতজ্ঞ গায়ক-গায়িকা দেখেছি। তাদের সঙ্গে দিনের পর দিন বছরের পর বছর একসঙ্গে বসবাস করেছি, কিন্তু এক বিষয়ে বাবার মতন গুণী আমার চোখে পড়ে নি। অস্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল তাঁর কণ্ঠের। সন্ধ্যের সময় পড়ার আসরে তাঁর হাঁক-ডাকের চোটে প্রায় প্রতিদিনই বেচারি ছেলের প্রদীপ অকালে নির্ব্বাপিত হ'ত। এমন কি হারিকেনের আলোও দপদপ করতে থাকত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত যে 'ব্রহ্মসঙ্গীত' তখন পাওয়া যেত, তখনকার দিনেও তাতে নানা রাগরাগিণীর প্রায় পাঁচশো গান থাকত। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় তিনি বইখানি নিয়ে ব্রহ্মোপাসনায় বসতেন। উপাসনার আগে একটি এবং পরে একটি গান হয়ে পালা শেষ হ'ত। ব্রহ্মসঙ্গীতের গোড়ার পাতা থেকে ধ'রে প্রতিদিন তিনি নতুন গান গাইতেন। গান নতুন হ'লেও সুর সম্বন্ধে তাঁর অস্বাভাবিক একনিষ্ঠতা ছিল এবং যে কোন গানকে যে কোন সুর ছন্দ ও লয়ের মধ্যে ফেলে ভক্তিভাবে অক্লেশে তাঁকে গেয়ে যেতে দেখেছি। বাবার এই সঙ্গীতপ্রতিভা বংশানুক্রমে তাঁতে বর্ত্তেছিল কি না জানি না, তবে তাঁর বংশধরদের মধ্যে যাতে তাঁর এই শক্তি অপ্রতিহতরূপে সঞ্চারিত হতে পারে, সে সম্বন্ধে তিনি মোটেই অমনোযোগী ছিলেন না। কাজেই আমাদের তিন ভাইকেও বাবার সঙ্গে সেই গানে যোগ দিতে হ'ত। আজ সেই অপূর্ব্ব কণ্ঠ-কন্‌সার্টের কথা মনে হ'লে ভগবানের দয়া ও প্রতিবাসীদের সহ্যশক্তির তারিফ না ক'রে পারি না।

আমাদের ছেলেবেলায় বাড়িতে পরিবারের মধ্যে নিশিদিন উপদেশ শুনতে হ'ত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর মশাই—এঁদের সমস্ত কথাবলী যাতে

প্রত্যেকেই আমরা আয়ত্ত করতে পারি, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ বিধিমত কড়া নজর রাখতেন। পাঠ্যপুস্তকগুলি ছিল উপদেশে পরিপূর্ণ। গারিবল্ডি, গ্যারিবল্ডী, থিয়োডোর পার্কার, মার্টিন লুথার, জর্জ ওয়াশিংটন বা নেলসনের মুখ দিয়ে কখন কি বেদবাক্য বেরিয়েছিল, প্রশ্ন করামাত্র তা উদ্গার করতে না পারলে পরীক্ষা-পাসের সম্ভাবনা ছিল অতি অল্প। এ ছাড়া মাতৃভাষায় যে সব লিরিক্স পড়ানো হ'ত, তারও একটু নমুনা দিই—

এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান
সকল প্রকারে সুখ করিতেছে দান।
জীবন ধারণ কিংবা আরাম কারণ
যে যে বস্তু আমাদের হয় প্রয়োজন—ইত্যাদি

এ ছাড়া প্রতি শনিবারে ইস্কুলে এক ঘণ্টা ক'রে 'মর্যাল ট্রেনিং' দেওয়া হ'ত।

এই সব ভাঙা মিথ্যে কথা ও তার চাইতে সাংঘাতিক অর্ধসত্যের ওপর পালিশ চড়াবার জন্যে প্রতি রবিবারে আর একটি প্রতিষ্ঠানে আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয়। ব্রাহ্মদের সামাজিক ব্যাপারগুলো, উপাসনা থেকে বিয়ে পর্যন্ত, ছিল ক্রীশ্চান-ঘেঁষা। বোধ হয় ক্রীশ্চানদের 'সান্‌ডে স্কুলে'র অনুকরণেই এই রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আমাদের সান্‌ডে ইস্কুলটি ছিল একটি 'চালের' জায়গা। ইস্কুলে যাবার কাপড়চোপড় সম্বন্ধে বাড়িতে তেমন কড়াকড় নিয়ম আমাদের কিছু ছিল না বটে, কিন্তু সান্‌ডে ইস্কুলে যাবার কাপড়চোপড়ের ব্যবস্থা করতেন মা নিজে। সজ্জার সমারোহ না থাক, আভিজাত্যটা যাতে পারিপাট্যের দিক দিয়েও কিছু ফুটে ওঠে, তার ত্রুটি হ'ত না। আমার কোঁকড়া চুল শুকনো থাকলে টেরি হ'ত না ব'লে রবিবারে ভোরে উঠেই আমাকে স্নান করতে হ'ত চুল নরম করবার জন্যে।

সমাজের অনেক ধনী লোকের ছেলেমেয়ে আসত এখানে নীতি শিক্ষা করতে। তারা এখানে শিখত নীতি, আর তাদের কাছ থেকে

আমরা শিখতুম দুর্নীতি। অদ্ভুত ছিল তাদের হালচাল। ছেলেরা সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্র আর মেয়েরা লোরেটো বা অন্য কোন ফিরিঙ্গী ইস্কুলে পড়ত। তাদের মধ্যে অনেকেই বাংলা কথা কি রকম এড়িয়ে এড়িয়ে বলত, বাংলা রকমকে সাজা-ইংরেজ যেমন বাংলা বলে। ইংরেজীটা কি রকম বলত তা বোঝবার মত বিদ্যে আমাদের ছিল না। তবে একটা কথা আজও বেশ মনে আছে যে, এদের অধিকাংশই 'ড়'-এর পরিষ্কার উচ্চারণ করতে পারত না। আমাদের তারা অতি তুচ্ছ জ্ঞান করত। আমরাও তাদের তুচ্ছ জ্ঞান করতুম, কিন্তু সে মুখে, মনে মনে তাদের সম্ভ্রমই করতুম। নিজেদের মধ্যে যখন তারা—Shan't, Can't, Aren't, Oh my!—ব'লে কথা বলত, তখন আমরা অবাক হয়ে দেখতুম।

এই শ্রেণীর লোকের অস্তিত্ব বাংলা দেশ থেকে প্রায় লোপ পেয়েছে।

একদিন, আমি ও অস্থির তখনও সানডে ইস্কুলে ভর্তি হই নি, শুধু দাদাই নীতির নিদিধ্যাসন করছে,—দাদা সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চ'লে এল। তখন বোধ হয় বেলা নটা হবে। সানডে ইস্কুল শেষ হ'ত দশটায়। দাদা তাড়াতাড়ি চ'লে আসায় বাবার কি রকম সন্দেহ হ'ল। তিনি তাকে ডেকে তাড়াতাড়ি আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দাদা প্রথমটা লুকোবার চেষ্টা করলে, কিন্তু জেরায় প্রকাশ হয়ে পড়ল, গানের ক্লাসে যোগ না দিয়েই সে পালিয়ে এসেছে।

সঙ্গীতের বরপুত্রের ঘরে এতখানি কালাপাহাড়ি বাবা সহ্য করলেন না। তিনি দাদাকে সেদিন এমন দক্ষিণা দিলেন যে, নিতান্ত অকৃতজ্ঞ না হ'লে কোন মানুষই জীবনে তা ভুলতে পারে না।

আমি আর অস্থির দুজনে পরামর্শ ক'রে স্থির ক'রে ফেললুম, গানের ক্লাসে কখনও ফাঁকি দেওয়া হবে না।

এই ব্যাপারের দু-তিন সপ্তাহ পরেই আমাকে ও অস্থিরকে নীতি-বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হ'ল। প্রথম দিন, কি জানি কেন, গানের ক্লাস হ'ল না। পরের রবিবারে ইস্কুলের অন্যান্য কাজ হয়ে

যাবার পর গানের ক্লাস শুরু হ'ল। দুই ভাই আগে-ভাগে গিয়ে সেখানে জুটলুম। ইস্কুলের ছোট বড় সমস্ত ছেলেমেয়েকে একত্র ক'রে পাইকারি হিসাবে গান শেখানোর ব্যবস্থা।

গান শুরু হ'ল। সকলে সমস্বরে গেয়ে উঠল—"অদ্ভুত প্রকাণ্ড কাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কি চমৎকার"।

আহা, হৃদয় একেবারে উপচে উঠল! কি কবিত্ব, কি অনুপ্রাস! শিশুচিত্তকে আকর্ষণ করবার জন্যে এর চেয়ে মধুময় সঙ্গীত জগতে আর কোথাও বোধ হয় রচিত হয় নি। অক্ষয়কুমার দত্ত মশায় তখন পরলোকে, নইলে তাঁর চারুপাঠের মধ্যে এমন উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের বীজ লুকিয়ে আছে দেখলে তিনি পুলকিত হতেন নিশ্চয়।

ঘরে ও বাইরে গান শেখবার এত সুযোগ পেয়েও আমি একটা 'কালে খাঁ' হ'য়ে উঠতে কেন যে পারি নি, রসিকেরা এর মধ্যে তার সন্ধান নিশ্চয় পাবেন।

সানডে' ইস্কুলের প্রত্যেক ছেলেমেয়েরই একখানা ক'রে 'চরিত্র-পুস্তক' রাখতে হ'ত। এই পুস্তকের পৃষ্ঠায় রবিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত সাত দিনের 'ব্যবহার' এবং 'পাঠ' কে কি রকম ক'রছে, তা বাড়ি থেকে অথবা যে সব মেয়ে বোর্ডিঙে থাকত তাদের সাময়িক অভিভাবকদের কাছ থেকে লিখিয়ে এনে দেখাতে হ'ত। প্রায় সব ছেলে ও মেয়ের অভিভাবকেরাই লিখতেন 'পাঠ' ভাল, 'ব্যবহার' ভাল। অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ না করলে ব্যবহার সম্বন্ধে 'মন্দ' মন্তব্য কেউ করতেন না।

আমাদের বেলায় কিন্তু এ নিয়ম খাটত না। গুরুতর রকমের ভাল ব্যবহারের পরিচয় না পেলে আমাদের চরিত্র-পুস্তকে বাবা চোখ বুজে 'পাঠ' মন্দ এবং 'ব্যবহার'ও মন্দ লিখে দিতেন। পাঠ ও ব্যবহারের মধ্যে তিনি কোন প্রভেদ রাখতেন না। পাঠ খারাপ হ'লে ব্যবহার শুদ্ধ তাঁর কাছে মন্দ হয়ে যেত এবং ব্যবহার মন্দ হ'লে পাঠও মন্দ হ'ত। আমরাও 'পাঠ' ও 'ব্যবহার' এই দুই ভাল-বেতালকে

একসঙ্গে কিছুতেই সামলাতে পারতুম না। ফলে, নীতি-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাদের ওপর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না।

আমাদের নীতি-শিক্ষাদাত্রীরা,—এখানে একজন কি দুজন পুরুষ ছাড়া আর সকলেই ছিলেন মহিলা এবং সকলেই ছিলেন অবৈতনিক। তাঁরা আমাদের তিন ভাইকে নিয়ে হিমসিম খেতে লাগলেন। তাঁদের অধ্যবসায়কে ধন্য! প্রতি সপ্তাহের সাত দিনই 'পাঠ' ও 'ব্যবহার' মন্দ দেখেও আমাদের সম্বন্ধে তাঁরা হতাশ হতেন না। অত্যন্ত সহিষ্ণুতার সঙ্গে ভবিষ্যতে যাতে আমরা ভাল ব্যবহার করি, সে বিষয়ে উপদেশ দিতেন। পাঁচ সাত সপ্তাহের মধ্যেই ইস্কুল সুদ্ধ ছেলেমেয়ে টের পেয়ে গেল যে, আমরা এক একটা ডাকসাইটে দুষ্টু ছেলে।

চরিত্র-পুস্তকে মন্তব্য লেখা সম্বন্ধেও বাবার মৌলিকতা উল্লেখযোগ্য। ছাতের ওপরে লাট্টু ঘোরাচ্ছি, একবার এক 'ওড়ন পচ্চায়' লাট্টু ছাত থেকে উড়ে একবারে নীচের উঠোনে গিয়ে পড়ল। উঠোনের এক কোণে আমাদের বুড়ী ঝি শরতের মা বাসন মাজছে, লাট্টুটা ঠক ক'রে তার গায়ে লেগে মার পায়ে গিয়ে লাগল, ঘটনাটি এই।

চরিত্র-পুস্তকে সেদিনকার ব্যবহারের সামনে বাবা মন্তব্য লিখলেন, 'এই ব্যক্তি অত্যন্ত আত্মসুখপরায়ণ। দুর্বৃত্ত ক্ষণিক আত্মসুখের জন্য নারীহত্যা এমন কি মাতৃহত্যায়ও পরাঙ্মুখ নহে।'

এই রকম সব মন্তব্য প'ড়ে ইস্কুলময় হৈ-হৈ হুল্লোড় লেগে যেত। তবুও সানডে ইস্কুল আমাদের এডুরি ডে ইস্কুলের চাইতে অনেক ভাল ছিল। এখানে লেখাপড়ার বালাই ছিল না। শিক্ষয়িত্রীদের সত্তায় জলমহাবিজ্ঞের অংশ ছিল অপেক্ষাকৃত অল্প। মাঝে মাঝে ইস্কুল সুদ্ধ শিবপুরের বাগানে কিংবা আলিপুরের চিড়িয়াখানায় যাওয়া হ'ত চড়ুইভাতি করতে। এসব ছাড়া প্রায়ই কোন না কোন নামজাদা লোক এসে ছেলেমেয়েদের গল্পচ্ছলে নানা উপদেশের কথা শোনাতেন। রবিবারের সকালটা দিব্যি কাটত। সপ্তাহের ছটা দিন যদি সানডে ইস্কুল আর একদিন যদি আসল ইস্কুল বসত, তা হ'লে আমি অন্তত কিছু লেখাপড়া শিখতে পারতুম।

এই সান্‌ডে ইস্কুলের সঙ্গে আমার জীবনের ছুটি বিশেষ স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আমি এখানে ভর্তি হবার বোধ হয় বছরখানেক পরে একটি নতুন মেয়ে আমাদের ক্লাসে এল। সে থাকত বেথুন বোর্ডিঙে। বেথুন বোর্ডিঙের প্রায় সব মেয়েই সান্‌ডে ইস্কুলে আসত। এই নতুন মেয়েটি শিশু বললেই হয়। আমার তখন বছর সাতেক বয়েস হবে, সে ছিল আমার চাইতেও ছোট। ছোট্টখাট্ট ফুটফুটে মেয়েটি, চোখ-মুখ দিয়ে বুদ্ধি ফুটে বেরুচ্ছে, কথা বলছে—যেন খই ফুটছে। ফ্রক-পরা মেয়েটি ক্লাসে এসেই ছোট বড় সবার সঙ্গেই ভাব জমিয়ে ফেললে। প্রথম দিনেই কিছুক্ষণের মধ্যেই নতুন মেয়ে ব'লে আর তাকে মনে হ'ল না। মেয়েটির নাম ছিল নন্দা।

পরের রবিবারে নন্দা আমার পাশেই বসেছিল। দুই ভাই আমসত্ব চুরি ক'রে খাওয়ার অপরাধে বাবা চরিত্র-পুস্তকে মন্তব্য করেছেন, 'এ ব্যক্তি অতি চতুর তস্কর। শুধু তাহাই নহে, অন্যকেও তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিতে প্রলুব্ধ করে।'

শিক্ষয়িত্রীরা বোধ হয় বাবার এই সব মন্তব্যগুলোকে বিশেষ গ্রাহ্য করতেন না। নইলে নিশ্চয় তাঁরা আমাকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিতেন, না হয় পুলিসের হাতে সমর্পণ করতেন। তাঁরা আমাকে সামান্য একটু ধমক-ধামক দিয়ে ভবিষ্যতে সাবধান হবার উপদেশ দিতেন মাত্র।

সেদিন বাবার মন্তব্য শুনে ক্লাসসুদ্ধ ছেলেমেয়ে হেসে উঠল। আমি একটা চোর সাব্যস্ত হয়ে ক্ষুণ্ণ মনে ব'সে আছি, নন্দা আমার পাশেই ব'সে, সে খুব আস্তে আস্তে, যাতে অন্য কেউ শুনতে না পায়, আমায় বললে, তুমি খুব দুষ্টু, না?

মেয়েদের কাছে দুষ্টু ছেলে ব'লে বাহাদুরি নেবার মতন মনস্তত্ত্ব তখনও আমার তৈরি হয়ে ওঠে নি। নন্দার কথায় কি জবাব দোব ভাবছি, এমন সময় সে বললে, দুষ্টু ছেলেদের আমি বড্ড ভালবাসি। আমার দাদারা খা দুষ্টু, তুমি আর কি দুষ্টু।

নন্দার সঙ্গে ভারী ভাব হয়ে গেল। সে বললে, তোমার নামটি কিন্তু ভাই বেশ মজার!

নামটি যে আমার অসাধারণ, সে বিষয়ে আমি বিশেষ সচেতন ছিলুম। এ নিয়ে কোথাও কোন আলোচনা হ'লেই আমি বেকুব হ'য়ে। অথচ সর্ব্বত্রই আমার নাম নিয়ে আলোচনার অন্ত ছিল না।

নন্দার কথা শুনে চুপ ক'রে রইলুম। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বললে, আমার কথায় রাগ করলে ভাই?

এমন মিষ্টি কথা এর আগে আর শুনি নি। সেই একদিনেই নন্দার সঙ্গে আমার খুব ভাব জ'মে গেল।

একদিন নন্দাকে জিজ্ঞাসা করলুম, এই বয়সে সে বোর্ডিঙে এল কেন? নন্দা বললে তার মা মারা গেছেন, সেইজন্যে বাবা তাকে বোর্ডিঙে রেখে দিয়েছেন। বাবা সরকারী বড় চাকরে। তিনি বিলেত থেকে পাস ক'রে এসেছেন। তাঁকে মফস্বলে থাকতে হয়। তার আর একটি বোন আছে তার বয়স মাত্র দেড় বছর, সে মাসীর কাছে মানুষ হচ্ছে। বাবা তার দাদাদের নিয়ে থাকেন। পূজোর ছুটির সময় বাবা কলকাতার বাড়িতে আসবেন, সেই সময় নন্দাও বাড়ি যাবে। বাবার গরমের ছুটি নেই, সেজন্য গ্রীষ্মের ছুটির সময় সে বাবার কাছে গিয়ে থাকবে।

কারুর মা নেই শুনলে, কি জানি, আমার মনে ভারী কষ্ট হ'ত। এই সহমর্ম্মিতার আকর্ষণে নন্দা আমার একান্ত আপনার জন হয়ে উঠল। ছুটির সময় আমাদের পত্র-বিনিময় চলত। তাতে যে কত মনের কথা সে আমায় লিখত ও আমি তাকে লিখতুম, তার আর ঠিকানা নেই।

তখন পোস্টকার্ডের দাম ছিল এক পয়সা আর খামের দাম ছিল দু পয়সা।

বছর পাঁচেক বেশ কাটল। এক রবিবারে নন্দা আমাকে বললে, এবার ভাই, আমাকে বাবার কাছে গিয়ে থাকতে হবে। বোর্ডিং ছেড়ে দিতে হবে।

মনের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভব করলুম। নন্দা চ'লে যাবে!

জিজ্ঞাসা করলুম, কেন ভাই ?

নন্দা ফিসফিস ক'রে বললে, মামারা বলছে আমি বড় হয়ে গিয়েছি, এবার আমার বিয়ের সম্বন্ধ হবে, আর বোর্ডিঙে রাখা চলবে না।

নন্দার বয়স তখন বোধ হয় এগারো হবে। তার বাবা বিলেত-ফেরত এবং সু-উচ্চ-শিক্ষিত, কাল ১৯০২।

বিদায়ের সময় নন্দা বললে, খুবির, কাঁদিস নি ভাই। আবার দেখা হবে, নিশ্চয় দেখা হবে।

এই ঘটনার বোধ হয় সাত-আট বছর পরে, আমি তখন ভবঘুরে। বাংলা দেশ থেকে অনেক দূরে মধ্যপ্রদেশের এক শহরে এসে পড়েছি। শহরের ধার দিয়ে নর্মদা ব'য়ে চলেছে। নদীর ধারে বড় বড় উঁচু বাঁধানো ঘাট। ওপারে সাতপুরা গিরিশ্রেণী একেবারে দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। সারাদিন পথে পথে ঘুরে বেড়াই, সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলে নদীর ধারে নির্জ্জন ঘাটে এসে বসি। লোকজনের চেঁচামেচিতে দিনের বেলায় নদীর আওয়াজ কিছুই শুনতে পাওয়া যায় না, কিন্তু রাত্রে সে কি কলরোল! কত বিচিত্র সঙ্গীত শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি। যাই যাই ক'রেও জায়গাটা ছাড়তে পারছিলুম না। সঙ্গীতময়ী চপলা নর্মদা কি মায়ার বাঁধনেই আমায় বেঁধেছিল!

সে এক কোজাগর-পূর্ণিমা-রাত্রি। জনশূন্য ঘাটে একলা ব'সে আছি। আমার কি জানি মনে হতে লাগল, দূরে রহস্যময় নিদ্রিত সাতপুরা শৈলমালা ধীরে ধীরে যেন জেগে উঠছে। যেন তার প্রত্যেকটি বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, পতঙ্গ বিচিত্র সুরে কলরব করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। স্পষ্ট দেখতে লাগলুম, যেন সেই মহাকায় অস্তি ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে নদীর কিনারায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর অদ্ভুত এক ভাষায় আমাকে কি যেন বলতে আরম্ভ ক'রে দিলে। কত যুগযুগান্তের কাহিনী, কত দুর্লভ সংবাদ তার মধ্যে—নর্মদার কলধ্বনি কোথায় ডুবে গেল।

হঠাৎ আমার তন্ময়তায় আঘাত দিয়ে যেন পাহাড় ভেদ ক'রে

আমারই মাতৃভাষায় বাগীশ্বরীর মূর্তি ফুটে উঠল সঙ্গীতের প্রস্রবণে। চমকে ফিরে দেখলুম, দূরে অন্ধকারে ব'সে কে গান গাইছে—

অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া,
গেছে সুখ গেছে শান্তি গেছে আশা ফুরাইয়া।

মাতৃভূমি থেকে বহু দূরে, রাত্রি দ্বিপ্রহরে মাতৃভাষার সে সঙ্গীতে আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বাগেশ্রীর উদাস অন্তরা সরতে সরতে চড়তে লাগল উদাত্ত স্বরে—

সম্মুখে অনন্ত রাত্রি
আমরা দুজন যাত্রী—

উঠে লোকটির কাছে গিয়ে বসলুম। গান শেষ হয়ে গেল। গানের সুরে ও ভাষায় আমার মনের মধ্যে যে সুর জেগে উঠেছিল, তারই সঙ্গে মিলিয়ে নঙ্খল তুললে তার কলতান।

গায়ককে বললুম, বাঃ, কি চমৎকার।

দেখলুম, গায়ক প্রায় আমারই বয়সী, হয়তো দু-এক বছরের বড় হতে পারে। আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে, আপনি বাঙালী। নতুন এসেছেন বুঝি?

বললুম, এখানে আমি আগন্তুক, দুদিনের জন্যে এসেছি। আবার চ'লে যাব।

প্রশ্ন হ'ল, কাদের বাড়িতে আছেন?

কোনও বাঙালীর বাড়িতে উঠি নি শুনে সে অবাক হয়ে গেল। বললে, তা হবে না। আমরা বাঙালীরা থাকতে আপনি এখানে সেখানে থাকবেন, তা হবে না।

পরিচয় বাড়তে লাগল। শুনলুম তারা দু-পুরুষ ধ'রে এদেশে বাস করছে। তারা ব্রাহ্মণ। তার বাবা এখানকার মস্ত উকিল। সে নাগপুরে বি. এ. পড়ে। তার দাদার সাংঘাতিক ব্যামো, আজ যায় কাল যায় এমন অবস্থা। সেইজন্যে তাকে এই সময় এখানে আসতে হয়েছে। দাদা ব্যারিস্টার, তার হয়েছে রাজযক্ষ্মা। দাদার কথা বলতে বলতে সে চোখ মুছতে লাগল।

আমি বললুম, ভাই, আমি তোমার কোন উপকার করতে পারি কি? আমি উদাসীন লোক, যথাকথীর সেবার ভার আমায় দিতে পার।

সে বললে, যখন 'ভাই' বলেছ, তখন আর ছাড়ছি না। ভাইয়ের বাড়ি থাকতে অন্য জায়গায় থাকবে, সে হবে না।

তার কথাবার্তার মধ্যে এমন আন্তরিকতা ছিল যে, বেশিক্ষণ তাকে দূরে রাখা সম্ভব হ'ল না। সে বলতে লাগল, কিছুতেই তোমাকে এখানে সেখানে থাকতে দোব না। আমাদের বাড়ি চল, যতদিন খুশি সেখানে থাকবে। ইচ্ছে করলে সারা জীবন সেখানে থাকবে। আমি বলছি, কখনও যদি কোনও অসুবিধা হয় তো চ'লে যেও।

এই ব'লে সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে। আমি দু হাত দিয়ে তার হাতখানা চেপে ধরলুম।

সেই রাতেই সে আমায় তাদের ওখানে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, অনেক চেষ্টা ক'রে তখনকার মতন অব্যাহতি পেয়ে গেলুম।

পরদিন সকালে তাদের ওখানে গিয়ে হাজির হলুম। আমার নতুন বন্ধু তার ছোট ভাইদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা তিন চার ঘণ্টা ক'রে সেখানে কাটতে লাগল। অতি ভদ্র ও শিক্ষিত পরিবার তারা। প্রাসাদের মত বাড়ি। লোকজন, চাকরবাকর, গাড়িঘোড়া, জমজম করছে সংসার। কিন্তু সবাই ম্রিয়মাণ। ছোট ছেলেরা পর্যন্ত আস্তে কথা কয়, কারুর গলার আওয়াজ পাওয়া যায় না—কি যেন বিপদের শঙ্কায় সকলেই অবসন্ন।

তারপরে একদিন সেই দিন এল। সকাল থেকেই বাড়িতে ঘন-ঘন ডাক্তার-বদ্যি যাওয়া-আসা করতে লাগল। সন্ধেবেলায় আমার বন্ধু বললে, আজ রাতে আর তোমার যাওয়া হবে না, এখানেই থেকে যাও। সকাল থেকেই দাদার অবস্থা খুব খারাপ।

রাত্রে সেখানেই থেকে গেলুম। ধপধপে সাদা নরম বিছানা দেখে অতি দুঃখেও হাসি পেল। প্রায় দু মাস ভূমিতলে হাতে মাথা রেখে রাত কেটেছে। বিছানায় শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়লুম।

তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে। অন্দরমহলে নারীকণ্ঠে কান্নার রোল উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে এলুম, বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতেই সে বললে, দাদা চ'লে গেল এই মিনিট পনরো হবে। যেও না কিন্তু, শ্মশানে যেতে হবে। চা খেয়েছ ?

বেলা বাড়ার সঙ্গে বাড়িতে দলে দলে লোক আসতে লাগল—বাঙালী, হিন্দুস্থানী, মারাঠী। বজ্রাহত বনস্পতির মতন গৃহকর্তা একটা ঘরে চেয়ারে ব'সে আছেন, আর তাঁকে ঘিরে যত মুরুব্বী মক্কেল, কেউ বা ব'সে, কেউ বা দাঁড়িয়ে। কারুর মুখেই সান্ত্বনার ভাষা নেই। অন্তঃপুরে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগল।

শব বাইরে একটা উঠোনের মতন জায়গায় এনে রাখা হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি নারী ও ছোট ছেলেমেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। তার মধ্যে যাকে দেখেই চিনতে পারলুম। সকলেই কাঁদছে, ঝি-চাকর সবাই। বাহকেরা শব তুলব তুলব করছে, এমন সময় ভেতর থেকে ভিড় ঠেলে একটি নারী এসে পড়ল শবের বুকের ওপর, যেন উন্মূলিত তড়িল্লতা।

এই দৃশ্য দেখে ভিড়ের সবাই আবার চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। মানুষের এই নিষ্ফল অভিযোগ কত বন্ধুর গৃহপ্রাঙ্গণে ধ্বনিত হতে দেখেছি, তবুও অশ্রুসংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ পরে আমার বন্ধু মেয়েটির কাছে গিয়ে বললে, বউদি, ওঠ, এবার আমরা নিয়ে যাই।

এই ব'লে সে তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলে। এবার তার মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পেলুম। ক্রন্দমানা সে নারী—নন্দা! আমার বাল্যসখী!

বাহকেরা শব তুলে নিয়ে চ'লে গেল। আমার আর তাদের সঙ্গে যাওয়া হ'ল না। নন্দা আমার দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললে, কে, স্থবির!

হ্যাঁ।

দেখলি, আমার কি সর্বনাশ হয়ে গেল!

আমার জীবনপাত্র কোন্ অপূর্ব্ব রসে পরিপূর্ণ ক'রে দেবার জন্যে নর্ম্মদা তার দুঃকজাল বিস্তার করেছিল, এবার তা বুঝতে পারলুম।

বন্ধু, তার মা, বাবা আর নন্দা কেউ আমাকে ছাড়লে না। শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়ে যাবার পরদিনই নন্দার দাদা এল তাকে বাবার কাছে নিয়ে যাবার জন্যে।

আমিও তাদের সঙ্গে ট্রেনে চড়লুম। ট্রেনে চার ঘণ্টার মধ্যে তার সাত আট বছরের জীবন-কাহিনী আমাকে শোনালে। আমার এই সময়টা কেমন ক'রে কেটেছে আর কাটছে তন্নতন্ন ক'রে তার সন্ধান নিয়ে যথোপযুক্ত উপদেশ দিলে।

একটা বড় স্টেশনে আমরা নামলুম। এইখানে ট্রেন বদলে তারা অন্য গাড়ি ধরবে।

মিনিট পনরোর মধ্যেই তাদের ট্রেন এসে গেল। বিদায়ের সময় নন্দা বললে, স্থবির, গেল-জন্মে নিশ্চয় তুই আমার ভাই ছিলি, তা না হ'লে কোথা থেকে কি দিনেই আবার দুজনে দেখা হ'ল।

প্রথম ঘণ্টা পড়ল।

নন্দা জিজ্ঞাসা করলে, আবার কবে দেখা হবে ভাই?

তারপরে নিজেই ম্লান হেসে নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললে, বেঁচে থাকলে নিশ্চয় দেখা হবে, কি বলিস?

গার্ড হুইস্‌ল দিলে, ট্রেন চ'লে গেল।

সেই থেকে নন্দার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। আমি তো বেঁচেই আছি, নন্দা বোধ হয় চ'লে গিয়েছে।

সান্‌ডে ইস্কুলের দ্বিতীয় স্মৃতি হচ্ছে আমার বন্ধু শচীন। শচীনও ছিল মাতৃহীন। নন্দার কিছুদিন আগে সে সেখানে ভর্ত্তি হয়। প্রথম দিন থেকেই তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জ'মে গেল। শচীনের দিদি আগে থাকতেই সান্‌ডে ইস্কুলে আসত এবং আমি যে একটা সাংঘাতিক চরিত্রের লোক সে কথা জানত। তাই আমার সঙ্গে তার অত্যধিক বন্ধুত্ব সে বিশেষ সুনজরে দেখত না। দিদি আমার কীর্ত্তিকাহিনী বাড়িতে ব'লে দেওয়ায় শচীনের বাবা তাকে আমার সঙ্গে মিশতে বারণ

ক'রে দিলেন। এতেও আমাদের বন্ধুত্ব ছুটল না দেখে বাড়িতে তার ওপরে অত্যাচার শুরু হ'ল। আমরা শেষকালে ইস্কুলে দুজনের মধ্যে কথা বন্ধ ক'রে দিলুম। ইস্কুল ছুটি হওয়ার পর সেখান থেকে বেরিয়ে একজনদের রকে ব'সে দুজনে অনেকক্ষণ ধ'রে গল্প ক'রে যে যার বাড়ি চ'লে যেতুম। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বও বেড়ে উঠল। অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রেও আমাদের বন্ধুত্ব টিঁকে ছিল। এই সেদিন মৃত্যু এসে আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে।

শচীনের কথা এই কাহিনীর অনেক জায়গায় উল্লেখ আছে।

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

যাত্রাপথে

জীবনের যাত্রাপথে চলিয়াছে একা তপস্বিনী,
সম্মুখে আলোর উৎস প্রান্তরের দিগন্ত পারায়ে;
সাধনার দীর্ঘপথ ঢাকিয়াছে নিশি তমস্বিনী—
ব্রহ্মচারিণীর স্বপ্ন তমসায় যাবে কি হারায়ে!
কবিও শাশ্বত যাত্রী, তবু তার যাত্রা নিরুদ্দেশ,
তপশ্চর্যা নাহি তার, সুন্দরের সে যে স্বপ্ন-সাথী,
তাহার মানসলোকে উদ্ভাসিত জ্যোতির্ময় দেশ,
তাই সে নিঃশঙ্ক চিত্তে পাড়ি দেয় দীর্ঘ অমারাতি।

পথে দোঁহে মুখোমুখি—দেখা হ'ল আঁধারে আলোকে,
কবির মানস-মিতা চিনিল সে আলো-ইশারায়;
কহিল মরমী কণ্ঠে, ওগো বন্ধু, এস অগ্রসরি;—
আলোকিত মিলনের বংশীধ্বনি বাজে লোকে লোকে!
তপশ্চারিণী কহে, ভুলায়ো না মোহন-মায়ায়,
নিঃসঙ্গ আমার ব্রত, সাধ্য নাই তব হাত ধরি।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য

সত্যকাম

—কিসের প্রবোধ দাও ?—গৃহগুলি জীর্ণ পুরাতন,—
দক্ষিণের বাতায়নে লতাপাতা হয়েছে প্রাচীন,—
বেগুনী রঙের ফুল রৌদ্র লেগে বাদামী-বরণ,
আকীর্ণ ধূলার স্তরে বাতাসের গতি উদাসীন।
তোমার আমার শিশু ?...থাক থাক—পুরানো কল্পনা—
দুই মিলে এক নয়—তৃতীয়ের স্বতন্ত্র উদয়—
রূপের আড়ালে চলে জীবনের শিথিল আল্পনা,—
পুরানো প্রাচীর-ফাঁকে শিশুতরু মেলে পত্রচয়।
কি এনেছ ?...ছবি ?...গান ?...কবিতার অক্ষর-বিলাস ?
আমি কি এনেছি তব প্রেরণার জীবন-কামনা ?
মর্মর মূর্তির ফাঁকে ভাস্করের হৃদয় উদাস,—
নিশীথ-স্বপ্নের মাঝে অবশেষে চরম ভাবনা !
তার চেয়ে শান্ত হও—ব'স কাছে মুক্ত নভতলে,
হৃদয় উন্মুক্ত কর—আজ সত্য শোনাও আমায়,—
গৃহ নয়...শিশু নয়...আরাম বা অভিনয় ছলে
মিলন খুঁজেছ শুধু এতদিন মিথ্যার মায়ায়।
পুরাতন পত্রগুলি ঢেকে দাও তৃণগুচ্ছ-দলে
তৃষাতুর আলিঙ্গন ধরা দিক প্রত্যক্ষ কায়ায়।

শ্রীউমা দেবী

আকাশের মেঘ

হায় সরোবর, পাড়ের বাঁধনে
ছল ছল জল তোমার বুকে,
এ নীল গভীর ঘোর ছায়াখানি
ভেসে ভেসে যায় ধরে না কায়া,
যদি মেঘমালা মায়াতেই মোর
কতোই রচনা রঙের সুখে—
বায়ুর তাড়নে মেঘ ভেসে যায়,
নীচে জল, তারে ধরবো না।

সংবাদ-সাহিত্য

পিতৃভূমি বাংলা দেশকে জলপ্লুতা করিয়া দেবী এবারে নৌকায় আগমন করিতেছেন এবং সম্ভবত কৈলাসে থাকিতে থাকিতেই দৈনিক সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত এ. আর পি.-"সতর্কবাণী"-সম্বলিত বিজ্ঞাপনগুলি পাঠ করিয়া তাঁহার অনুগামী সন্তানসন্ততির বিপদ আশঙ্কায় চার দিনের কাজ তিন দিনে সারিয়া ত্রস্তপদে দোলায় পলায়ন করিবেন। ফলে মড়ক হইবে। 'শনিবারের চিঠি'র ষোড়শ বর্ষের প্রারম্ভে এবারকার পূজায় ইহাই সংবাদ। সংবাদ শুভ নয়। সুতরাং পূজার পূর্ব্বেই আমরা আমাদের পাঠক-অনুগ্রাহকবর্গকে বিজয়ার আলিঙ্গন-অভিবাদনাদি জ্ঞাপন করিতেছি। দেড় মাস পরে ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে এই ষোড়শীর দ্বিতীয় আত্মপ্রকাশ-দিবসে হয়তো কোলাকুলির নিরুপদ্রব সুযোগ মিলিবে না। শাস্ত্রজ্ঞগণ জানেন, যুগের প্রয়োজনেই ষোড়শী—ধূমাবতী অথবা ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি ধারণ করেন। কাগজের যেরূপ টানাটানি চলিয়াছে, তাহাতে ষোড়শী 'শনিবারের চিঠি' অদূরভবিষ্যতে ছিন্নমস্তা তো হইতেই পারে, একেবারে ধূমাবতী হওয়াও তাহার পক্ষে বিচিত্র নয়।

• • • •

"সাদা বাজার" সাদা কাগজের পক্ষে প্রায় শূন্য ও নিরাকার হইয়া আসিতেছে। তবু বাঁচোয়া, বিনা লজ্জায় লাল হইবার জন্য কোনও কোনও সাধু কাগজ-ব্যবসায়ী "কালো বাজার"টা আমাদের মত সাধারণের পক্ষে খোলা রাখিয়াছেন। দাম বেশি দিতে হইলেও তাঁহাদের অকৃত্রিম দয়া অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু তাঁহাদের ধৃতরাষ্ট্রীয় প্রেমালিঙ্গন একা একা সহ্য করিতে পারি—এমন জ্যান্ত অথবা লৌহ ভীম আমরা নই। তাই আমাদের সহৃদয় গ্রাহকবর্গকেও সেই আলিঙ্গনের কিঞ্চিৎ ভাগ দিতে মনস্থ করিয়াছি। আগামী সংখ্যা হইতে ষোড়শী 'শনিবারের চিঠি'র কী বাড়িল, নগদ মূল্য পাঁচ হইতে ছয় আনা হইল। বার্ষিক সডাক চার টাকার স্থলে চার টাকা বারো আনা। বয়সবৃদ্ধি এক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গত কারণ নয়, ইহা জানিয়া লজ্জিত ও শঙ্কিত আছি;

কিন্তু আমরা নিরুপায়। 'শনিবারের চিঠি'কে যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, আশা করি, তাঁহারা উদার হস্ত প্রসারিত করিয়া এ দুর্দিনেও তাহাকে আশ্রয় দিবেন।

যাঁহারা ইতিমধ্যেই আগামী বর্ষের জন্য বার্ষিক অথবা ষাণ্মাষিক গ্রাহক হইয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের যথাক্রমে বারো আনা ও ছয় আনা দাবি রহিল। তাঁহারা ডাকটিকিট অথবা মনি অর্ডার—যে ভাবে ইচ্ছা আমাদের নিকট অঋণী হইবেন। যাঁহাদের চক্ষুলজ্জা কম, তাঁহারা আমাদিগকে ফাঁকি দিলেও নালিশ করিব না।

—

বাংলা দেশের সর্ব্বত্র শহর এবং মফস্বলে দুর্ভিক্ষপীড়িত ও অনাহারক্লিষ্ট দুর্গত জনগণের সাহায্যার্থ শতাধিক আর্ত্তত্রাণ-সমিতি খুব নিষ্ঠার সহিত কাজ করিতেছেন। ভারতবর্ষের চারি প্রান্ত হইতে প্রত্যহ হাজারে হাজারে এবং লাখে লাখে টাকা আসিতেছে, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশের ধনী ব্যক্তিরা আশ্চর্য্য তৎপরতা দেখাইতেছেন। ভারতবর্ষের বাহির হইতেও সাহায্য আসিতেছে। এই দুর্দিনে মানুষের হৃদয়ের সৎবৃত্তিগুলি যে অনেক ক্ষেত্রেই অবিকৃত আছে, ইহা অত্যন্ত আশার কথা। মনে হইতেছে, মানুষের করুণার দৃষ্টি যে ভাবে আমাদের উপর পতিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের ক্ষতি খুব অধিক এবং ক্ষত খুব গভীর না হইতেও পারে। ইতিপূর্ব্বে বাংলা দেশে যে সকল মন্বন্তর ঘটিয়াছে তাহার মুদ্রিত ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিতেছি—স্বদেশীয় সাহায্যই শেষ পর্য্যন্ত চরম ধ্বংসের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিয়াছিল, ইংরেজ ঐতিহাসিকগণই তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সকল ঐতিহাসিকের দোষ এই যে, ইহারা শতাধিক বর্ষ পরে সত্য কথা বলেন। আমাদের এই যুগের ইতিহাস যখন এক শত বৎসর পরে ইংরেজ ঐতিহাসিকই লিখিবেন, তখন আমরা দেখিতে পাইব, দুই-চারিজন পাপিষ্ঠ মিরজাফর ও রেজাখাঁয়ের সাহায্যে কয়েকজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিই অপরিমিত লাভ ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বাংলা দেশের জনসাধারণকে কৌশলে দোহন ও শোষণ

করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহারা দলে দলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এই মৃত্যুকে রোধ করিবার জন্ম গবর্মেণ্ট অগ্রসর হইয়া আসেন নাই, সমগ্র দেশের প্রাণ কয়েকটি নির্দিষ্ট সমাজ অথবা কয়েক জন মহৎ লোককে কেন্দ্র করিয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া অবাধ মৃত্যু কিয়ৎপরিমাণে নিবারিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই সত্য ইতিহাস জানিবার জন্ম আমরা বাঁচিয়া থাকিব না।

* * * *

তাই বর্ত্তমানের বিচার আমরা অতীতের সাহায্যে করিতে চাহিতেছি। এদেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রগুলিতে দেখিতে পাইতেছি, পুরাতন "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর"কে বারংবার টানিয়া আনা হইয়েছে। গত ভাদ্রের 'মাসিক বসুমতী'তে প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে"র বিস্তৃত বিবরণ (পৃ. ৪৩৯—৪৪০) বিশেষ মুন্সিয়ানার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন ; 'কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যাল গেজেটে'ও শ্রীযুক্ত অমল হোম অনেক পুরাতন তথ্য আমাদিগকে শুনাইতেছেন ; কিন্তু নূতন মৃত্যুর চিত্র-প্রতিলিপির পাশে এই সকল পুরাতন কাহিনীর কি কোনও দাম আছে? আজিকার বাস্তব ঘটনার সহিত সেই পুরাতন ইতিহাসকে পাশাপাশি রাখিয়া ইহাই শুধু লজ্জার সহিত অনুভব করিতেছি যে, আমাদের কাপুরুষতা ও অসহায়তা বিগত দুই-শত বৎসরেও বিন্দুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই, ক্ষমতাপন্নদের বর্ব্বর শোষণ-প্রবৃত্তি অক্ষুণ্ণ আছে। যাহা ঘটিয়াছিল তাহা যখন আবার ঘটিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের স্বর্গীয় ঘোষণা বিফলে গিয়াছে, কোহিনূর-মণ্ডিত ময়ূর-সিংহাসনে বসাইয়াও ভারতবর্ষ জামাইকে ঘর-জামাই করিতে পারে নাই।

* * *

পুরাতনকে টানিয়া আনিয়া লাভ কি? আজও ইংলণ্ডের 'নিউ স্টেট্স্‌ম্যানে'র কণ্ঠে জন শোয়ের (পরে সার্ জন শোর এবং লর্ড টেন্‌মাউথ) কাব্যোচ্ছ্বাস শ্রুত হইতেছে। এ দেশের সংবাদপত্রেও শুনা যাইতেছে—

If you ask a Britisher what is on the debit side in the Pacific zone of this war he will tell you the loss of Malaya with its rich rubber estates, its prolific tin mines, the probable loss of the Naval Base, the sinking of the *Prince of Wales*; if you ask an American he will say the devastation that was wrought at Pearl Harbour; if you ask a Burmese he will acclaim the oil fields of Burma not to mention the ruby mines; if you ask an Indian there can be only one reply—the loss of life. Lives not slain swiftly and mercifully, on the battle-field but taken away in a lingering and terrible death through starvation—through the loss of rice to India from the Arakan coast.... When it comes to squaring accounts...India will have the heaviest bill to present...bill of flesh and blood...The life of innocents. Rubber trees can be grown again. New sources of tin, oil and rubies can be explored but men, women and children who are daily dying in the streets of Calcutta and in Bengal cannot be resurrected when the shining hour of victory is trumpeted.

Strange! Bengal steeled itself for air raids. It was prepared for the worst and then—overtaken by famine. Lack of food is taking a daily toll of more deaths than what it would be possible for Japan to take with her deadliest bombs. Think this over!

ইহাই বর্ত্তমানের কথা এবং প্রত্যক্ষ বাস্তবের কথা। এই বাস্তবকে বিস্মৃত হইয়া দুই শত বৎসর পিছু হাঁটিয়া আমরা কি ইহা অপেক্ষা বীভৎসতর রকমকে প্রবেশ করিতে পারিব? আসল ঘটনার এক শতেরও অধিক বর্ষ কাল পরে বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনানেত্রে সেদিনকার ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

...দেখিতে দেখিতে সম্মুখে দ্বারে একটা কি ছায়ার মত দেখিলেন। মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়, কিন্তু মনুষ্যও বোধ হয় না। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল, অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট অতি দীর্ঘ, শুষ্ক হস্তের দীর্ঘ শুষ্ক অঙ্গুলি দ্বারা কাহাকে যেন সঙ্কেত করিয়া ডাকিল। তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া—শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ,—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর আর একটা আসিল। তারপর আরও একটা আসিল। কত আসিল, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই প্রায়-অন্ধকার গৃহ নিশীথ-শ্মশানের মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।

আমরা আমাদের আবাস-গৃহের সম্মুখে, কলিকাতার অলিতে গলিতে প্রত্যহ নিশাগমে এই দৃশ্য দেখিতেছি; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহারা মরিবার জন্য সমবেত হইতেছে, বাঁচিবার জন্য নয়।

* * *

কিন্তু মানুষ অক্ষম হতভাগ্য ও ঘৃণ্য হইলেও তাহাদিগকে একেবারে উপেক্ষা করাটা কোনও গবর্মেণ্টের পক্ষেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যে মনস্বী এডমাণ্ড বার্কের সুযুক্তিপূর্ণ সতর্কবাণী সময়ে না শুনিয়া ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টকে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুতাপ করিতে হইয়াছিল, তিনি ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে উইলিয়ম পিটের নিকট প্রেরিত বিখ্যাত বিবৃতির প্রারম্ভে লিখিয়াছিলেন—

Of all things, an indiscreet tampering with the trade of provisions is the most dangerous, and it is always worst in the time when men are most disposed to it: that is. in the time of scarcity.

এই বিবৃতি তিনি শেষ করিয়াছিলেন এই বলিয়া—

Tyranny and cruelty may make men justly wish the downfal of abused powers, but I believe that no government ever yet perished from any other direct cause than its own weakness. My opinion is against an over-doing of any sort of adminstration, and more especially against this most momentous of all meddling on the part of authority; the meddling with the subsistence of the people.

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাহাই হউক, বিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট বার্কের উপদেশ স্মরণে রাখিয়াই বাংলা দেশ সম্বন্ধে হয়তো ব্যবস্থা করিতে পারেন। বাংলা দেশে সত্যকার দুর্দশা কতখানি ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে, সে সম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিয়া দিতেছি।—

বর্তমানে পৃথিবীর এই যুদ্ধকালীন যুগসন্ধিকে সর্বাপেক্ষা শোচনীয় বিয়োগান্ত নাটক এখানে [ভারতবর্ষে] অভিনীত হইতেছে। অভিনয় করিতেছে এই কৃষ্ণকায় বিশীর্ণ নরেরা—অনাহারজনিত নির্মম মৃত্যুর যন্ত্রণায় ইহাদের মুখমণ্ডল বিকৃত।—ইহাদের

প্রত্যেকবারই মৃত্যু সংবাদপত্রের শিরোনামায় একটি সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি মাত্র এবং হয়তো ওই একই স্তম্ভে আর একটি মৃত কঙ্কালের বিবরণী ঘটা করিয়া মুদ্রিত হইয়াছে।... দৈনিকের বিবরণী সচরাচর অত্যন্ত অতিরঞ্জিত এবং অতিবর্ণিত হইয়া থাকে। কলিকাতার দুর্দশার যে বাস্তব চিত্র ইঁহারা অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা এতই ভয়াবহ যে, আমার ভারতভ্রমণকালে আমাকে সর্ব্বত্রই এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে—যাহা বর্ণিত তাহা সত্য কি না। সত্য তো বটেই, আসল অবস্থা বর্ণনাকেও পরাস্ত করে।...কলিকাতার রাস্তাসমূহ ক্ষুধিত ও মুমূর্ষু ব্যক্তিদের দ্বারা আকীর্ণ। ইহারা সাধ করিয়া কেহই শহরে আসে নাই। ক্ষুধা উদর ইহাদিগকে তাড়া করিয়া আনিয়াছে।...তাহারা অর্থ চায় না, খাদ্য চায়। অর্থের আর খরিদ-ক্ষমতা নাই।... আমি ৩০ জুলাই তারিখে কলিকাতা ত্যাগ করি। শুনিলাম ১লা সেপ্টেম্বর হইতে খাদ্যদ্রব্যের উপর কণ্ট্রোল বসিবে। এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র বাজার হইতে চাউল খুদে সম্পূর্ণ অন্তর্দ্ধান করিল—রাতারাতি এই ব্যাপার ভারতীয় রোপট্রিককেও (দড়ির খেলা) হার মানাইয়া দেয়। শনিবারে যে বস্তু প্রচুর পরিমাণে ছিল, রবিবারে সে বস্তু এককণাও ছিল না। গেল কোথায়?...ইহা যে মজুতবিশারদদের কীর্ত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মজুদের ব্যাপারটাই এই প্রশ্নের পুরা জবাব নয়। ইহা গবর্মেণ্টেরও সেফ্টিভাল্ভ—গবর্মেণ্ট কি ইহার ব্যবহার না করিয়া ছাড়িয়াছেন?

It (Hoarding) is a good unloading platform for Government's sins of omission and commission. The pity is that the food question has developed into a paramount political question (which it should not be). It is the shuttlecock of politics. Every move in the foodgame in Bengal is a political move. *The chessboard is the jute fields of Bengal; The pawns are the starving people.*

কলিকাতা আজ বহু বিচিত্র (পরস্পরবিরোধী) সমস্যার ক্ষেত্র। এক দিকে দেখ, ক্ষুধার তাড়নায় মুমূর্ষু শত শত লোক ফুটপাথে পড়িয়া আছে; অন্য দিকে ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া রেস্তোরাঁয় প্রবেশ কর—ত্রিশপদী ডিনারের পদগুলি হইতে রুচিমাফিক ডিশ বাছাই করিতে তুমি হয়রান হইবে। হোটেলের মালিকরা বিনীতভাবে নিবেদন করিবেন, ত্রিশের অধিক ডিশের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই—যুদ্ধের বাজার কিনা!... এরূপ অবস্থা শোচনীয়। বিহার এবং কোয়েটার ভূমিকম্পেও মানুষের এত দুর্দশা হয় নাই। সেক্ষেত্রে মৃত্যুর যন্ত্রণা ক্ষণস্থায়ী ছিল। দীর্ঘকাল স্থায়ী তিলে তিলে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু অপেক্ষা তাহা ভাল ছিল।

• • • •

উপরে লিখিত সুগভীর চিন্তাজালে আচ্ছন্ন ছিলাম, হঠাৎ গোপালদার আগমনে চমক ভাঙিল। খুব উত্তেজিত ভাব—একটা যেন যুদ্ধ বা

করিয়া আসিয়াছেন। মুখচোখ প্রদীপ্ত। আসিয়াই আমার স্বল্পপরিসর পিঠে একটা বিরাট থাবা মারিয়া বলিয়া উঠিলেন, ছেড়ে দিয়ে এলাম গোলামি, এ সরকারের চাকরি আর করব না।

বিপন্ন বোধ করিলাম, গোপালদা এ. আর. পি.তে থাকার দরুন তবু চালটা-আসটা কণ্ট্রোল-মূল্যে পাওয়া যাইত ; আবার কি ভবে কলির নরক—কিউয়ে দাঁড়াইতে হইবে ?

গোপালদার যেন কি হইয়াছিল। আমাকে প্রশ্ন করিবার অবকাশ মাত্র না দিয়া পকেট হইতে দুইটি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ খেলার মার্বেলবৎ বর্তুলাকৃতি পদার্থ বাহির করিয়া একটি আমার হাতে দিলেন এবং নিজে একটি হাতে লইয়া আমার বালক-ভৃত্যকে দুই গ্লাস জল আনিতে বলিলেন। জল আসিলে নিজের গুলিটি মুখে পুরিয়া জল খাইতে খাইতে আমাকে অনুরূপ প্রক্রিয়া করিতে বলিলেন।

আমার প্রশ্নাতুর দৃষ্টি গোপালদাকে চকিতে সচেতন করিয়া দিল, বলিলেন, গায়ে স্বাধীনতার বাতাস লাগল ভায়া, তাই একটু সেলিব্রেট করলাম। খেয়ে দেখ, আনন্দ পাবে। আনন্দ পূর্ব্বেও পাইয়াছি, সুতরাং আপত্তি করিলাম না।

গোপালদা কোটের বুক-পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ এবং খাপ-পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া পরিতে পরিতে বলিলেন, একটা কবিতাও লিখে ফেলেছি আজকে—শেষ হয় নি, যতটুকু লিখেছি শোন।

* * *

গোপালদা পড়িতে লাগিলেন, ভৃত্য চা ও কিছু মিষ্টান্ন আনিয়াছিল, আমি সেগুলির সদ্গতি করিতে করিতে শুনিতে লাগিলাম—

মৃত্যু যেথা বরণীয়, পরাধীন কলঙ্কিত দেশে
সেথায় অন্তের দ্বারে মোরা নিত্য অন্নভিক্ষা মাগি ;
হে দেবতা, ক্ষমা কর, আমাদের দুর্বল হৃদয় ;
ক্ষমা কর মোহগ্রস্ত, আতঙ্কিত, দিবারাত্র মনে।
যুগ-যুগান্তর যদি অভিশপ্ত জীবন মোদের,
স্বাধীনতা-অপহারী বিদেশীর পদতলে বসি

আমরা লয়েছি পাঠ মৃত্যুধর্মী নব সভ্যতার।
আমাদের ধর্মপীঠে তাহাদের সিংহাসনখানি
সযত্নে ধরিয়া আছি, বহু প্রেমে করি যে লালন
মেদমাংসমজ্জা দিয়ে আত্মসুখপরায়ণ করে।
আপনা বিস্মৃত মোরা, দাসত্বের বিভীষিকা আজো
অহিফেন-মুগ্ধ চিত্তে জাগে না শঙ্কিত শিহরণ;
দাসত্বেরি গর্ব্ব করি—বিজাতীয় আত্মপ্রতারণা!
যে শিক্ষা মানুষে টানে তিলে তিলে পাতালের পাকে,
সে শিক্ষার অভিযানে আত্মহারা, শিখেছি আমরা
ঠেলিয়া ফেলিতে দূরে নিজজনে ঘৃণা তিরস্কারে।
আপন ঐতিহ্য-গর্ব্ব ভুলে গিয়ে পরের নকলে
মানুষে মানুষে ভেদ গড়ে তুলি নব পদ্ধতিতে :—
জাতির ঐশ্বর্য যারা তিলে তিলে করিয়া লুণ্ঠন
মূর্ত্ত দুর্ব্বার লোভ সারা দেশে করিয়া সঞ্চার
ফিরিয়া করিছে পশু কর্ম্মক্ষম সকল মানুষে,
সকল সত্তার প্রাণ শাসনের নিষ্পেষণ-তলে
আইনের বেড়া-পাকে যারা করে নিষ্প্রাণ প্রত্যহ—
তাহাদের প্রাণশক্তি আমরাই যোগাইয়া চলি
আত্মক্ষয়ে আত্মবঞ্চনায়। আমরা পরান্নজীবী—
আপনার গৃহে বসি পরের উচ্ছিষ্ট খুঁটে খাই—

বুঝিলাম, গোপালদার মাথাটা জোর বাজিয়াছে। মনে মনে হাসি পাইল, তবু গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া বলিলাম, থামো থামো, গোপালদা, এ ডাহা সিডিশন হচ্ছে। ব্যাপারটা কি বল তো? ভাগে বনল না বুঝি ওই কবীরউদ্দীনের সঙ্গে?

গোপালদা কোনও জবাব দিলেন না, চায়ের পেয়ালাটা ডিশ হইতে মুখে তুলিলেন। এই পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখিলাম। হঠাৎ সদর দরজার কাছে ব্যথিত নারীকণ্ঠের "ওগো বাবু, আজ তিন দিন কিছু খাই নি গো" বিলাপধ্বনি কানে আসিল। তাহার পরই কেমন যেন বিপর্য্যয় হইয়া গেল। গোপালদাকে আর দেখিতে পাইলাম না। তাঁহার স্থলে সহস্র-শিখায় প্রজ্বলিত একটি অগ্নিকুণ্ড দৃষ্টিগোচর হইল। তাজ্জব ব্যাপার,

সদর দরজার ভিখারিণী পাখা-গজানো পিপীলিকার মূর্তি ধারণ করিয়া সেই কুণ্ডের দিকেই আগাইয়া আসিতেছে দেখিলাম। সে একা নয়, তাহার পশ্চাতে এক, দুই, দশ, বিশ, হাজার, লক্ষ পিপীলিকা, সদ্য-উদ্গত পাখায় ভর করিয়া পঙ্গপালের মত আকাশে উড়িতেছে, সমবেত পক্ষধ্বনিতে একটা গুঞ্জন উঠিয়াছে।

এই পিপীলিকা-যজ্ঞের আয়োজন আমার ভাল লাগিল না। আমারই চক্ষের সম্মুখে এই লক্ষ লক্ষ প্রাণী পুড়িয়া মরিবে, আর আমাকে তাই চুপ করিয়া দেখিতে হইবে? আমি চীৎকার করিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে গেলাম।

* * * *

গোপালদার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। বলিলেন, মরতে দাও ভায়া। না ম'রে ওদের উপায় আছে? যে কোটর থেকে ওরা বেরিয়ে এসেছে, সে কোটরে আর ওরা ফিরে ঢুকতে পারবে না। ওদের মরতেই হবে।

মরতেই হবে! তা হ'লে এত রিলিফ, এত লঙ্গরখানা, এত—

অন্তর্জলীর আহার ভাই, তোমাদের দয়াধর্মটাই অক্ষয় হয়ে থাকবে, এরা বাঁচবে না।

বাঁচবে না?

কদিন ভিক্ষা-অন্নে বাঁচিয়ে রাখবে এদের? ঘরের ঠিকানা হারিয়ে এরা বাইরে বেরিয়েছে। বেরিয়েছিল অনেকেই, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে পরস্পর, পাখা খ'সে দেখ অনেক ওই ধুলোয় গড়াচ্ছে, আগুনে পুড়ে মরেছে কয়েকটা। অন্ধ হয়ে গেছে চোখ। ফেরবার উপায় নেই।

তা হ'লে—

* * *

বসিয়া বসিয়া ছবি দেখিতেছি। দিগন্তপ্রসারী মাঠ, চাষের ক্ষেত। বর্ষা উত্তীর্ণ হয়, তবু জমিতে লাঙল পড়ে নাই, আগাছা জন্মিয়াছে। চাষ করিবার মানুষ নাই। মানুষ যাহারা আছে, তাহারা ললাটে করাঘাত করিতেছে। তাহাদের 'নাস্তা' আনিবার লোক হারাইয়াছে। চাষ করিবে? কাহার জন্য? বাড়ি ফিরিলে বাচ্চাটা দুইটি কচি হাত

প্রসারিত করিয়া কাছে ডাকিত। কোথায় সে? গরু নাই। লাঙল নাই। ফসলের প্রয়োজন কি?

মানুষের অবহেলায় ভূমি বিমুখ হইয়া আছেন, যত্ন করিয়া মাটির অভিমান ভাঙাইবার লোক নাই। শুধু কি নিজেদেরই আহার্য্য প্রার্থনা করিত তাহারা? তোমার আমার রামের শ্যামের। সংসারের চোরাবালিতে তাহারা কোথায় তলাইয়া হারাইয়া গিয়াছে। তোমার আমার রাম শ্যামের কি হইবে? এক বৎসর—দুই বৎসর—

• • •

একটা "ল পয়েণ্ট" লইয়া বিচার চলিতেছে। জজেরা সকলে গম্ভীর মুখে বসিয়া আছেন। রেসের ঘোড়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে জখম হইলে তাহাকে গুলি করিয়া মারা হয়। ভবিষ্যতে ক্ষেপিতে পারে, এই অজুহাতে কুকুরকে ঠেঙাইয়া মারিতেও দেখিয়াছি। প্রশ্ন উঠিয়াছিল, ওই ভাবে প্রাণীহত্যায় যদি পাপ না থাকে, যে মানুষ নিশ্চিত মরিবে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিলে পাপ হয় কেন? শেষ পর্য্যন্ত অঘটন ঘটিতে পারে বলিয়া? সমুখের দলটাকে মারিবার হুকুম দাও হুজুরেরা, পিছনে যাহারা রহিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করি। যাহাদের নাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে, তাহাদের জন্য অকারণে শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করিবার সময় এ নয়। বিস্তর মানুষ এখনও অর্দ্ধমৃত হইয়া আছে। দোহাই তোমাদের, মুমূর্ষু মানুষকে ঠেঙাইয়া অথবা গুলি করিয়া মারিলে যে অপরাধ হয় না, বরঞ্চ পুণ্যই হয়—এই সহজ কথাটা আইনের ভাষায় আমাদিগকে বলিয়া দাও। দেখ, এই দুর্ভিক্ষ আমরা নিবারণ করি। যাহা বিলম্বে ঘটিবে, তাহাই অবিলম্বে ঘটাইবার অধিকার দাও। সময় সংক্ষেপ কর প্রভুরা।

• • •

কাহারা কোথা হইতে চীৎকার করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছিল, বুঝিতে পারিলাম না। কেমন একটা অজ্ঞাত অস্বস্তিকর ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম। গোপালদা সামনেই বসিয়া, তাঁহার চা-পান তখনও শেষ হয় নাই।

গোপালদা বলিলেন, একটা রিলিফ-কো-অর্ডিনেশন কমিটি খুলেছে, দেখেছ কাগজে? সমস্ত বাংলা দেশ জুড়ে যে যে সমিতি কাজ করছেন, তাঁদের কাজ যাতে এলোমেলো হয়ে না যায়, এক জায়গায় মাত্রাধিক এবং অন্যত্র নামমাত্র সাহায্য যাতে না প্রেরিত হয়, এই সব ব্যবস্থা এই কো-অর্ডিনেশন সমিতি করবেন। যে রকম ভাবে টাকা আসছে এবং যে রকম ভাবে নানা খ্যাত ও অখ্যাত প্রতিষ্ঠান এই কাজে এগিয়ে আসছেন, তাতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে।

আমার কানে এসব কথা কিছুই যায় নাই। আমি গোপালদা-প্রদত্ত ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ মার্বেলাকৃতি পদার্থের কথা চিন্তা করিতেছিলাম।

আশ্বিনের 'কবিতা'য় শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চক্রবর্তী "শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু"কে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন—

অজস্র নক্ষত্র-গ্রহ-চন্দ্র-সূর্য-আকাশের ওগো সম্পাদক!
বিন্দুমাত্র ধরিত্রীর পরমাণু অধিবাসী,
অবজ্ঞাত কবি এক
এ-ক্ষুদ্র কবিতাখানি শুধু তব নামোদ্দেশে উড়ালো হাওয়ায়।
ইথার-তরঙ্গে ভেসে কিংবা উড়ে-উড়ে,
লক্ষ কোটি আকাশের মহাশূন্যে ঘুরে
প্রণবের জ্যোতির্দেশে যদ্যপি পৌঁছায়—
নির্জন মুহূর্তে কোনো যদি চোখে পড়ে,
যদি ভালো লাগে, যদি মনোনীত হয়!

মনোনীত যে হইয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই। না হইলে "বিন্দুমাত্র ধরিত্রী"র (বালিগঞ্জ?) "পরমাণু অধিবাসী এক অবজ্ঞাত কবি"র কবিতা আপনারা দেখিতেই পাইতেন না। কিন্তু অবজ্ঞাত হইলে কি হইবে? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপ দর্শনের সমগোত্রীয় স্তুতি ইনি রচনা করিতে পারিয়াছেন। সম্পাদক তো আমরাও, কিন্তু এইরূপ "পশ্যামি দেবাংস্তবদেবদেহে"-গোছের স্তব-

তো জুটাইতে পারিলাম না! এই ভক্তের বিনয়ও অসাধারণ। তিনি এই ভাবে আত্মপরিচয়ও দিয়াছেন—

কলঙ্কিনী শতাব্দীর বিকলাঙ্গ পুত্র আমি

বিকৃতমস্তিষ্ককে বিকলাঙ্গ বলা যায় কি না, সুনীতিবাবুরা তাহার বিচার করিবেন। আমরা আগামী সংখ্যা 'কবিতা'য় "কোরের" শীর্ষক ইহার একটি প্রত্যুত্তর আশা করিতেছি।

* * *

একটা কথা। ভক্ত হইলেও গুরুর সকল দুর্বলতার সংবাদ ইনি রাখেন না। রাখিলে "কুলবতী রাণী"র স্থলে "যুগবতী রাণী"র প্রয়োগ দেখিতে পাইতাম।

"যুগবতী" লইয়া এইবারেও আলোচনা দেখিলাম। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর "যুগবতী"র সমর্থন-পত্রে 'গড্ডলিকা'র পরশুরামের অন্তর্দ্ধানের সংবাদটাও মিলিল। পার্শিবাগান ছাড়িয়া তাঁহার ভবানীপুরে বাস আমাদের পক্ষে ক্ষতির কারণই হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বয়স এখনও পঞ্চাশের কোঠাতেই আছে, তাই তিনি বালিগঞ্জে বসিয়াও সামলাইয়া লইতে পারিয়াছেন।

ভাদ্রের 'মাসিক বসুমতী'তে "দর্পচূর্ণ" নামক একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। গল্পের শেষে এইরূপ লিখিত আছে—

বিনীত এবং আপনাদের একান্ত অনুগত ছদ্মবেশী চোর।"

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)

ইহার পর আমাদের আর কিছুই বলিবার থাকে না।

আশ্বিনের 'নিরুক্তে' কবি শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "প্রেমালাপ" যেমন প্রাঞ্জল তেমনই মধুর!

একটি কোমল দেহ মদির মন্থর;
ক্রেমলিন ইডিয়ুতে চক্রযুক্তি-হৃদে-বাড়া বিধাতার উঁচু ও জীবন,
পৌত্তিক প্রেমের দান: পুরুভুজ ভক্তি-কণ,
কিছু প্রেম কিছু ঘৃণা কিছু হাসি কিছু ভয়,
ভাঙলা পিছল পথে দিনদিন করেক পা হাঁটা:
(অবক্ষয়ে অগ্রগতি), প্রাগৈতিহাসিক জবা যত পুঁথিপাটা

"বন্ধকী তমসুক" ও "মজদুর" অনবধানতাবশতঃবাদ পড়িয়াছে।

* * *

কবি জীবনানন্দ (জীবানন্দ নহে) দাশ আরও "সাবলীল"—

মাঝে মাঝে পুরুষার্থ উত্তেজিত হ'লে—
(এ রকম উত্তেজিত হয় ;)
উপস্থাপয়িতার মতন
আমাদের চায়ের সময়
এসে প'ড়ে আমাদের স্থির হ'তে বলে।
সকলেই স্নিগ্ধ হ'য়ে আত্মকর্ষকম ;
ঐক পৃথিবীর যেন হিংসা কেটে ফেলে
চেয়ে দেখে স্তূপাকারে কেটেছে রেশম।

পুরুষার্থ তো সকলেরই উত্তেজিত হয়, শুধু বাংলা কবিতার পাঠকদের হয় না! রেশম তো?

* * * *

পৃথিবীতে ভাল জিনিসের এক পিঠ দেখানোটাই নিয়ম, কারণ এক পিঠেই দুই পিঠের পরিচয় পাওয়া যায়। 'কবিতা' তো বেশ ছিল, আবার 'নিরুক্ত' বাহির হইল কেন, 'নিরুক্তে'র চতুর্থ বর্ষের গোড়াতেও তাহা প্রণিধান করিতে পারিলাম না। আরম্ভে রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) এবং সম্পাদকীয় বাহ্বাস্ফোটে যে নূতন আদর্শের ঢক্কানিনাদ করা হইয়াছিল, সেই আদর্শ যে কবে ক্যাপস্টিক ও ছাপাখানার তলায় চাপা পড়িয়াছে, সম্পাদকদ্বয়ের তাহা হিসাব করিয়া দেখিবারও অবকাশ নাই। সেই চিরন্তন আমিত্বের প্রসারই যদি শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল, তাহা হইলে বুদ্ধদেববাবুর সহিত প্রেমেন্দ্র মিত্রের তফাত রহিল কোথায়? আমরা এই সমস্যার "সমাধান" "দাবী" করি।

—

'ক্ষণিকা'র কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ যখন বঙ্গভারতীকে "ডাক পাড়াইয়া" ছিলেন, তখনই অনুক্রমণিকা-পর্বে ধৃতরাষ্ট্রের মত বিজয় সম্বন্ধে আমাদের সংশয় জন্মিয়াছিল। আজ রবীন্দ্রনাথ বাঁচিয়া থাকিলে

'কবিতা'য় বুদ্ধদেববাবুর এই কয়েকটি পংক্তি দেখিলে পশ্চিমের উপর পূর্বের প্রভাব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতে পারিবেন—

মিলের খাতিরে শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণ বিকৃত করতে রবীন্দ্রনাথও কখনো কখনো বাধ্য হয়েছেন :

দুগ্ধফেনশয়ন করি আলা
স্বপ্ন দেখে ঘুমায়ে রাজবালা।

'আলা' কথাটি এখানে একটু শ্রুতিকটু তাতে সন্দেহ কী। 'আলো' বলতে পারলে কত ভালো হ'তো! এখানে না-হয় কোনো উপায়ই ছিলো না, কিন্তু ওরই ঠিক পরের কবিতায় ('সুপ্তোত্থিতা') 'মালা' ও 'বালা'র সঙ্গে মেলাবার জন্য 'উতলা'কে তিনি 'উতালা' লিখেছেন—নিতান্তই যুগ মনের সংস্কারের বশবর্তী হ'য়ে। 'উতালা'র কোনো দরকার ছিলো না, উতলাই যথেষ্ট মিল হ'তো।

নিতান্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, উপরোক্ত উক্তি যে কত বড় বর্বরতার পরিচায়ক, এযুগের বাঙালীকে তাহা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে হইতেছে। পাপ আমাদের অস্থিমজ্জায় কতখানি প্রবেশ করিয়াছে, ইহাতেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। 'আলা' এবং 'উতালা'র মাধুর্য্য ও তাৎপর্য্য গৌড়জন হয়তো এখনও বুঝিবেন। এই যুদ্ধের হিড়িকে যে পরিমাণে "এক্সোডাস" আরম্ভ হইয়াছে, ইহার পর বুঝা আর সম্ভব হইবে না।

—

বাংলা কাব্য-সাহিত্যের কোমলতা ও পেলবতার অপবাদ আর দেওয়া চলিবে না। কবিপুঙ্গবেরা দিকে দিকে উৎক্ষিপ্ত হইয়া শিখাগ্রে কোমলতার জড় উৎখাত করিতেছেন। আমরা আশা করিতেছি, এমন দিন আসিবে যখন মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' এবং সুধীন্দ্রনাথের 'অর্কেস্ট্রা' পান্‌সে বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে। নিম্নের কবিতায় তাহারই আভাস পাওয়া যাইবে।

বজ্রমুষ্ঠে বন্দিকৃত পূর্ণ ভ্যাজ মোর স্বপন,
মুলতুবী মাধুরী বিলাস; প্রজ্বলন্ত বিভীষিকা…
দুর্যোগে দুর্বলপ্রাণ প্রাপ্রনয় হনিস শিবিরে,
কন্তোভী আংকোট বর, আকাশ দুলীর নখরে,

বেশ!

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে অত্যল্পকাল মধ্যে 'মধুসূদন-গ্রন্থাবলী'র পুনর্মুদ্রণ হইতেছে; ইহা আনন্দ করিবার মত সংবাদ। পূর্ব্বে 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, এবারে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ও 'মেঘনাদ-বধ কাব্যে'র পুনর্মুদ্রণ হইল। "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র ৩০ নং গ্রন্থ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তরাম বিদ্যাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি' সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

বিশ্বভারতী হইতে "বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ" গ্রন্থমালার ষষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের 'মায়াবাদ'—দুরূহ বিষয়ের সরল সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর সচিত্র গল্প-সংগ্রহ 'বল্লভপুরের মাঠ" এবং সামাজিক নাটক 'নতুন হাওয়া' সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়া কথা-শিল্প ক্ষেত্রেও দেবীপ্রসাদের প্রতিষ্ঠা দিয়াছে। দুইটি পুস্তকেই যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় মিলিবে।

শ্রীমনোজ বসুর 'ভুলি নাই' নূতন বিষয়বস্তু লইয়া নূতন ভঙ্গিতে লেখা উপন্যাস, দুঃসাহসিকতায় প্রদীপ্ত।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গল্প-সংগ্রহ 'বেদেনী'র দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা ও গেট-আপের দিক দিয়া প্রথম সংস্করণকে নানাভাবে অতিক্রম করিয়াছে।

বিনয় ঘোষের গল্প-সংগ্রহ 'বোধন' পড়িয়া আমরা সবিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। অতি সূক্ষ্ম সূত্রের উপর প্রত্যেক গল্পের প্রাণ ঝুলিতেছে, লেখক দক্ষতার সহিত সূত্রগুলি অটুট রাখিয়াছেন। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা সাহিত্যে নূতন।

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'ভাড়াটে বাড়ি' একটি উল্লেখযোগ্য গল্পের বই—'ত্রিয়াশ্চরিত্রমে'র লেখকের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

পূজা-সংখ্যা 'যুগান্তর' এবারে আশ্চর্য্য নবরূপান্তর লাভ করিয়াছে। সম্পাদক শ্রীবিনয় ঘোষকে এই সংখ্যাটির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। গল্পে কবিতায় প্রবন্ধে চিত্রে রূপসজ্জায় এবার পূজার বাজারে 'যুগান্তর' অভিনব বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিবে। একসঙ্গে এমন নয়নাভিরাম ও চিত্তাভিরাম পত্রিকা প্রকাশ এই বাজারে উল্লেখযোগ্য।

দেব-সাহিত্য-কুটিরের 'রূপ-রেখা' বার্ষিকী পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত কিশোর-কিশোরীদের লোভনীয় হইয়া বাহির হইয়াছে।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস 'চিতা-বহ্নিমান' সুলিখিত। এই গ্রন্থে লেখক মানবীয় চিরন্তন আদর্শকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। উপন্যাসটি পঠিত হইলে আদৃত হইবে।

শ্রীনবগোপাল দাসের উপন্যাস 'অনবগুণ্ঠিতা' সকল দিক দিয়া চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

শ্রীশিশিরকুমার বসুর 'দাম্পত্য-কলহে-চৈব' লঘু গল্পের সমষ্টি, এই রক্তারক্তির বাজারে অনেক ক্ষতে প্রলেপের কাজ করিবে।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্যের 'প্রভাত-রবি' রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম চতুর্থাংশের ইতিহাস। অনেক নূতন কথা ও জ্ঞাতব্য কথা আছে।

শ্রীমতী আভা দেবীর কাব্যগ্রন্থ 'অর্চ্চনা' বঙ্গভারতীর সার্থক অর্চ্চনা।

শ্রীচুনীলাল বসুর উপন্যাস 'দীপা'—সুখপাঠ্য। এই তরুণ লেখক সম্বন্ধে আমরা অনেক আশা পোষণ করিব।

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহের কাব্যগ্রন্থ 'রূপায়ণ'—সত্যকারের কবিমনের পরিচয় বহন করিতেছে।

এতদ্ব্যতীত শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও শ্রীফণীন্দ্রভূষণ সরকারের নাটিকা 'অন্তরালে রবীন্দ্রনাথ'; শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র গুপ্তের কুলজী গ্রন্থ 'কেদারপুর মুন্সীবাটী'; শ্রীবিজয়রত্ন সেনশর্ম্মার 'চিন্তাকণা' ১ম ও ২য় পর্ব্ব, ও 'অর্চ্চনা'; শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের নাটক 'বঙ্গ-গৌরব'; ডাঃ শ্রীঅভয়কুমার সরকারের 'ওলাওঠা রোগের প্রতিকার ও চিকিৎসা'; শ্রীরাইচরণ চক্রবর্ত্তীর "কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ'; শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের 'ক্ষত্রিয় গোপজাতির নবজাগরণ'; শ্রীনকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *Psychotherapy of Indian Riots* এবং মহারাজা শ্রী শ্রীশচন্দ্র নন্দীর *Rationale of Food Crisis*—প্রত্যেকটি পড়িয়া দেখিবার মত বই।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অতিষ্ঠ দিবসটি আজ সমাগত !

●

শুভারম্ভ

১লা অক্টোবর

শুক্রবার

●



শ্রেষ্ঠাংশে :

নাথ' চিত্রের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী

সুনন্দা

'গরমিল' চিত্রের সুধাকণ্ঠ-গায়ক

রবীন

অন্যান্য ভূমিকায় :—সাবিত্রী, জহর, ছবি, চিত্রা, দেববালা, রবি রায়, শ্যাম লাহা, প্রভৃতি

—যুগপৎ ৪টি চিত্রগৃহে—

শ্রী • পূরবী • রূপালী • আলেয়া

(শ্যামবাজার) (মির্জ্জাপুর) (ভবানীপুর) (বালীগঞ্জ)

এসোসিয়েটেড্ ডিষ্ট্রিবিউটার্স রিলিজ

অভিনয়োপযোগী কয়েকখানি নাটক

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দুই পুরুষ

—দেড় টাকা—

দ্বীপান্তর

—পাঁচ সিকা—

•

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

[illegible]

—বারো আনা—

•

শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর

ঋণং কৃত্বা

—পাঁচ সিকা—

ঘৃতং পিবেৎ

—পাঁচ সিকা—

মৌচাকে ঢিল

—এক টাকা বারো আনা—

ডিনামাইট

—দুই টাকা বারো আনা—

•

শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদারের

শুভযাত্রা

—আট আনা—

•

কৃষ্ণদাসের

খুনে

—এক টাকা—

হোটেল

—এক টাকা—

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস : কলিকাতা

আপনার কর্তব্য—



যাঁহারা [illegible] জাতীয়
[illegible] ও [illegible]
[illegible]
[illegible] কারখানা হইতে
প্রস্তুত [illegible] লইয়া [illegible]
[illegible] বিলাতি সামগ্রী [illegible]
[illegible] আসিতেন না। এমতস্থলে
এই [illegible] উৎসাহ দেওয়া
আমাদের [illegible] কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর